আনতোনিও গ্রামশি
নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা ও অনুবাদ

সৌরীন ভট্টাচার্য

ও

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

পার্ল পাবলিশার্স

২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০০০৬

Antonio Gramsci
Selected Writings
Volume I
in Bengali
Edited and Translated by
Sourin Bhattacharya
and
Samik Bandyopadhyay

জুলাই, ১৯৬৪

প্রকাশক
মদন ভট্টাচার্য
পার্ল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রাকর
অশোককুমার চৌধুরী
তরুণ প্রিন্টিং
১৭৪ রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

আনতোনিও গ্রামশি

নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

বিষয়সূচী

গ্রামশি পরিচয়

আমাদের গ্রামশিচর্চা

মার্কসের দর্শন বা কর্মকাণ্ডের দর্শন আলোচনায় আনতোনিও গ্রামশি একটা পদ্ধতির প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলেন। প্রশ্নটা অন্তত তাঁর সময়ে খুবই জরুরি ছিল। গ্রামশি প্রথমেই পরিষ্কার করে বলে নিয়েছিলেন যে মার্কসের চিন্তা জানতে গেলে মার্কসের রচনার দিকেই আমাদের নজর দিতে হবে, অন্তত প্রাথমিকভাবে। সেটাই হবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব। এ কথাটা বলার দরকার ছিল, কারণ মার্কসের অধিকাংশ রচনাই, অন্তত অনেক প্রধান রচনা তাঁর নিজের হাতে প্রকাশযোগ্য রূপ পায়নি। বিশেষত, মার্কস ও এঙ্গেলস-এর অন্তরঙ্গ সহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে পদ্ধতি হিসেবে এ উচ্চারণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর মধ্যেকার এই এক ধরনের বিভাজন গ্রামশির মার্কসবাদ চর্চার একটা জরুরি দিক। এটা ঠিক কেন ও কতটা জরুরি সে আলোচনায় আমরা পরে যাব। কিন্তু এখন যে-কথাটা লক্ষ করতে চাই তা এই যে, মার্কসের বেলায় গ্রামশিকে এরকম কোনো কৈফিয়ৎ তৈরি করতে হচ্ছে না কেন তিনি আদৌ মার্কসের দর্শন আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন। এই শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে গ্রামশি যখন অল্পবিস্তর মার্কস-প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করছেন ও পরে তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরে কারারুদ্ধ অবস্থায় তিনি যখন তাঁর জেলখানার নোটবইগুলো ভরিয়ে তুলছেন তখন কিন্তু ইতালিতে মার্কসচর্চার একটা রীতিমতো পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে গেছে। এবং এ কথাটা দু-স্তরেই সত্য। বাস্তব রাজনীতির স্তরে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আবহে মার্কস তখন ইতালির রাজনৈতিক মঞ্চেও অবশ্যই এক জীবন্ত প্রভাব। ১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিফলনও ইতালীয় বিচার বিতর্কে খুব প্রত্যক্ষ। আর চিন্তাচর্চার স্তরেও ইতালিতে মার্কসবাদের জন্য একটা জমি ততদিনে তৈরি হয়ে গেছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক আনতোনিও লাব্রিয়োলার প্রথম প্রবন্ধ **ইন্ মেমোরিয়া দেল্ 'মানিফেস্তো দেই কম্যুনিস্তি'** (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর স্মরণে) ১৮৯৫-তেই প্রকাশিত হয়ে গেছে। ১৮৯৬-তে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ **দেল্ মাতেরিয়ালিস্মো স্তোরিকো, দিলুচিদার্ৎসিয়োনে প্রেলিমিনারে** (ঐতিহাসিক বস্তুবাদ : প্রাথমিক ব্যাখ্যা)। বেনেদেত্তো ক্রোচেরও একটা সংক্ষিপ্ত মার্কস-চর্চার পর্ব ছিল। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও কার্ল মার্কসের অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির রচনার সময় ১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৮৯৯। এসব প্রসঙ্গ নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদেরও একটা আবহ তৈরি হয়েছিল। বস্তুত আনতোনিও লাব্রিয়োলার গ্রন্থ নিয়ে ক্রোচে যে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তার অন্যতম কারণ এই যে ইতালিতে ততদিনে ঐতিহাসিক বস্তুবাদী তত্ত্বের একটা পরিচিতি তৈরি হয়ে গেছে অর্থনীতির অধ্যা-

পক আছিল লোরিয়ার রচনার মধ্য দিয়ে ; এবং ক্রোচে মনে করেন সেই পরিচয় সর্বৈব বেঠিক। উপরন্তু লোরিয়া নাকি নিজেকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আবিষ্কর্তা বলেও জাহির করতেন। এইসব মিলিয়ে সমাজতান্ত্রিক কর্মধারা ও মার্কসীয় দর্শনচর্চার পরিমণ্ডলে প্রাসঙ্গিক তত্ত্বচিন্তার একটা তাজা চেহারা গ্রামশির সময়ের আগেই তৈরি হয়েছিল। তাই গ্রামশি সরাসরি মার্কসচর্চার পদ্ধতি বিষয়ে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে পেরেছিলেন, এর প্রাসঙ্গিকতার সূত্র নিয়ে তাঁকে বিশেষ ভাবিত হতে হয় নি।

আমাদের ক্ষেত্রে গ্রামশিচর্চার এই পরিমণ্ডল কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে কোনো অর্থেই কোনো জমি তৈরি নেই। গ্রামশি-আশ্রিত কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা গড়ে ওঠেনি আমাদের এখানে। আমাদের বামপন্থী রাজনীতির পরিমণ্ডলে অন্তত কিছুটা পরিমাণে, কমবেশি মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন, মাও জে দং এঁরা আছেন, এমনকী যৎসামান্য হলেও ত্রৎস্কি আছেন, কিন্তু গ্রামশি কোথাও নেই। নিতান্ত দার্শনিক চর্চার স্তরেও গ্রামশির জন্য তেমন কোনো জায়গা নেই। গ্রামশির রচনার সঙ্গে আমাদের অল্পবিস্তর পরিচয় ঘটতে আরম্ভ করেছে ষাটের দশকে। ষাটের দশকের গোড়ার দিকেই **মডার্ন প্রিন্স অ্যান্ড আদার রাইটিংস** (লরেন্স অ্যান্ড উইশার্ট, ১৯৫৭) এই নামে গ্রামশির যে-বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ (অনুবাদক : লুই মার্ক) এখানে এসে পৌঁছয় সেটাই বোধ হয় বাঙালি পাঠকের সঙ্গে গ্রামশির রচনার পরিচয়ের সূত্রপাত। অল্পদিনের মধ্যেই এই গ্রন্থের এক রিভিউ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকাতে (চৈত্র, ১৩৬৯)। ঐ প্রবন্ধের লেখক ভবানী সেন। যতদূর জানা যায় গ্রামশি বিষয়ক এটাই প্রথম প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধ। এর আগেই অবশ্য সরোজ দত্তের বাংলা অনুবাদে রমাঁ রলাঁর গ্রামশি প্রসঙ্গে ১৯৩৪-এ লেখা একটি রচনা প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ। তারপর থেকে খুব ক্ষীণ ধারায় হলেও একটু আধটু চর্চা আমাদের এখানে হচ্ছে। তবে সে-চর্চার কোনো বিশেষ ধরন তৈরি হয়নি, আমাদের গ্রামশিচর্চা কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র অর্জন করতে পারে নি। ১৯৬৫-তে মেইনস্ট্রিম পত্রিকায় সুশোভন সরকারের দীর্ঘ ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'দি থট অব গ্রামশি' এই নামে। স্বাভাবিকভাবে ভবানী সেনের রিভিউ প্রবন্ধের তুলনায় এই প্রবন্ধে গ্রামশির পরিচয় ছিল অনেক বিস্তৃততর। সাতটি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত এই প্রবন্ধে গ্রামশির জীবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তো ছিলই, তাঁর চিন্তাকাঠামোর প্রধান প্রসঙ্গগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও ছিল। এজেমোনিয়া বা আধিপত্যের ধারণা, বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা, গ্রামশির দর্শনচিন্তা, পার্টির প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক পরিচয়ের জন্য এ প্রবন্ধ বেশ উপযোগী। এরই কাছাকাছি সময়ে **ফ্রন্টিয়ার** পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় পরেশ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ। সে প্রবন্ধ আয়তনে ও প্রসঙ্গ বিস্তারে আরো ছোট, তবে **ফ্রন্টিয়ার** পত্রিকাতে এ প্রবন্ধ প্রকাশের কিছুটা তাৎপর্য লক্ষ করতে হয়। ষাটের দশকের এই সময়টাতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

ইতিমধ্যেই দ্বিধাবিভক্ত। কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইন্ডিয়া ও কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট) এই নামে দুটো প্রধান কমিউনিস্ট পার্টি তখন ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়। 'ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়'কথাটাকে কিছু সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করতেই হবে। জাতীয় জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব তখনো তেমন ব্যাপক ছিল না, এখনো কি তা খুব ব্যাপক ? জাতীয় জীবনের স্তরে প্রভাবের বিষয়ে এই দুই দলের প্রভাবই কিছুটা আঞ্চলিকতায় আচ্ছন্ন বলে ভাবতেই হয়, যদিও রাষ্ট্রীয় রাজনীতির স্তরে এদের প্রভাব তুলনায় ব্যাপকতর। কিন্তু ষাটের দশকের যে-সময়টার কথা আমরা আলোচনা করছি তখন অন্তত পশ্চিমবঙ্গে এই দুই প্রধান কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও অন্য আরো কিছু কিছু ধারার বিকাশের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ১৯৬৭-র নকশালবাড়ি উত্থান থেকে যে-অন্য ধারার শুরু সে-ধারা ক্রমশ নানা দিকে নানা খাতে বইতে থাকে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এর কিছু কিছু ভৌগোলিক বিস্তারও লক্ষ করা যায়। জনজীবনের বিচারে এ ধারাও যে খুব বেশি গভীরে যেতে পেরেছে তা হয়তো নয়, কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারায় এতে করে একটা নতুন মাত্রা যোগ হল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমর সেন সম্পাদিত **ফ্রন্টিয়ার** পত্রিকা ক্রমশ এই তৃতীয় ধারার রাজনৈতিক দর্শনের কাছাকাছি এসে গেল। গ্রামশি বিষয়ক প্রবন্ধ **ফ্রন্টিয়ারে** প্রকাশিত হবার তাৎপর্য এখানে। যদিও এরকম ভাবলে ভুল হবে যে এতে করে ঐ তৃতীয় ধারার রাজনৈতিক আন্দোলন কোনো অর্থে গ্রামশি চিন্তার কাছাকাছি এসে গেল। তা বস্তুত যায়নি। গ্রামশি কখনোই এই আন্দোলনের ধারাতে গৃহীত হননি। এই আন্দোলন তার বিভিন্ন ধারা উপধারায়, তার তত্ত্বচিন্তায় মাও জে দং, লিউ শাও চি, লিন বিয়াও প্রভৃতি চীনা নেতাদের দিকে হাত বাড়িয়েছে, কিন্তু গ্রামশির দিকে এগোয় নি কখনো। যে-অর্থে ইয়োরোপীয় প্রসঙ্গে ইয়োরোকমিউনিজমের পেছনে তাত্ত্বিক প্রেরণার জন্য কখনো কখনো গ্রামশির কথা চিন্তা করা হয় সেই পরোক্ষ অর্থেও এখানে গ্রামশির প্রভাব লক্ষ করা যায় না।

ষাটের দশকে অন্য [illegible] পত্রের যে-কথা বলা হল সেই ধারাটা [illegible]। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলন [illegible] ছাড়াই গ্রামশি বিষয়ে কিছুটা আগ্রহ কিন্তু বজায় রইল। বস্তুত সত্তরের দশকের শেষে আমাদের চর্চার জগতে সেই ধারাটা আরো একটু সজীব হয়ে উঠল। এর একটা অংশে ছিল শুধুই কিছু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত স্তরের প্রয়াস। এ রকম কারো কারো চিন্তাভাবনায়, একটু আধটু প্রয়োগে গ্রামশির প্রসঙ্গ অল্পবিস্তর দেখা দিতে থাকল। প্রথম পর্যায়ে এর অনেকটাই ছিল আনুষ্ঠানিকতার বাইরে, নেহাতই হয়তো আলাপ আলোচনার স্তরে। সমাজবিজ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চার নানা প্রসঙ্গে গ্রামশির চিন্তাভঙ্গির আদল যেন একটু একটু করে ফুটে উঠছিল আমাদের কথাবার্তায়। এ সবের কোনো সংহত রূপ সত্তরের দশকেও খুব

বেশি দেখা যায়নি। কিন্তু এই রকমের অস্ফুট মনোযোগের মধ্যে থেকেই ক্রমশ এমন কিছু গবেষণাকর্ম বেরিয়ে এল যার চিন্তা, পরিকল্পনা ও প্রকাশে গ্রামশির চিন্তাকাঠামোর প্রভাব প্রত্যক্ষ। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের **ন্যাশনালিস্ট থট অ্যান্ড দ্য কলোনিয়াল ওআর্ল্ড—আ ডেরিভেটিভ ডিসকোর্স?** আমাদের গ্রামশিচর্চায় বেশ এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন, অন্তত প্রয়োগের স্তরে। প্রয়োগের স্তরে এরকম উদাহরণ আরো কিছু দেখা দিল আশির দশকে। এখানকার থিয়েটার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপল দত্তের থিয়েটার বিশ্লেষণে গ্রামশির ধারণার প্রয়োগ দেখা গেল হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়। এ সবই ছিল খানিকটা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত প্রয়াস। কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার পরিচয় পাওয়া গেল গ্রামশি বিষয়ক কিছু আলোচনাচক্রে। এর প্রথম দিককার উদাহরণের মধ্যে কলকাতার অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশাল চেঞ্জ আয়োজিত ১৯৫৮-র আলোচনাচক্র উল্লেখযোগ্য। তারপর ১৯৮৭-তে অনুষ্ঠিত হল কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশাল সায়েন্সেজ আয়োজিত দু-দিন ব্যাপী এক গ্রামশি সেমিনার; 'আনতোনিও গ্রামশি ও দক্ষিণ এশিয়া' এই ছিল সেমিনারের শিরোনাম। এই আলোচনাচক্রের অনেক প্রবন্ধেই আমাদের দেশ ও সমাজের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গ্রামশির নানা ধারণার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করা হয়েছে বেশ খুঁটিয়ে। এ ব্যাপারে অরুণ পট্টনায়কের এই আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত প্রবন্ধ ছাড়াও আরো দু-একটা কাজ উল্লেখযোগ্য। আমাদের বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে, অনেক সময়ে তারই আওতায়, গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রসঙ্গে ক্ষমতার কাঠামো ও আধিপত্য বিকাশের বিশ্লেষণে এইসব গবেষণায় গ্রামশির বিভিন্ন ধারণা ও প্রত্যয়ের ব্যবহারের সরাসরি পরিচয় মেলে। এ ছাড়াও অশোক সেন, অজিত চৌধুরী, সুদীপ্ত কবিরাজ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ সান্যাল ও ডেনজিল সালধানার একগুচ্ছ প্রবন্ধের মধ্যে আমাদের ক্রমবর্ধমান গ্রামশি মনস্কতার চেহারা অনেকটাই ধরা পড়ে। কাউন্সিল ফর পলিটিকাল স্টাডিজও একটি আলোচনার আয়োজন করেন ১৯৫৮-র মে মাসে। আশির দশকের এইসব কাজের ক্ষেত্রে যে-কথাটা লক্ষ করা দরকার তা এই যে এখান থেকে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি চিন্তায় ক্রমশ একটা অস্থির সন্ধানের চেহারা বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। মার্কস-লেনিন-মাও বৃত্তের বাইরে গিয়ে আরো বেশ কিছু প্রসঙ্গকে ধরবার প্রয়োজন ক্রমশ তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। নতুন কোনো তত্ত্ববিশ্বে প্রবেশ করবার প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে বেশ জরুরি হয়ে উঠছে। এই আলোচনাচক্রের আরো কিছুটা পরে জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীসংঘের আয়োজনে আরো একটা গ্রামশি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামশি চিন্তার ক্রম-বিস্তারের দিক থেকে এ ধরনের আয়োজন খানিকটা তাৎপর্যপূর্ণ। কথাবার্তা ক্রমশ ছড়াতে ছড়াতে একটা নতুন চিন্তাকাঠামোর অপরিচয়ের দূরত্ব খানিকটা তো ঘোচে এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রথম দিকে আমাদের চিন্তাভাবনা গ্রহণ বর্জন খুব যে সচেতনভাবে সমালোচনাভিত্তিক হয় সব সময়ে তাও নয়। অনেক

সময়ে এ সবের মধ্যে কিছুটা হুজুগও থাকে নানা রকমের। যেমন, এই গ্রামশির ক্ষেত্রেই ১৯৯১-এ গ্রামশির জন্মশতবর্ষ পালনের আগ্রহ নিশ্চয়ই কিছুটা সক্রিয় ছিল এত সব আলাপ আলোচনার পেছনে। কিন্তু তবুও কিছু প্রবন্ধ ও কিছু বইপত্র তো পাওয়া গেল। **'আনতোনিও গ্রামশি : জীবন ও তত্ত্ব'** এই নামে অজিত রায়ের ছোট বইটি গ্রামশি পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে অনেকের কাজে লাগতে পারে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকেও প্রকাশিত হয়েছে গ্রামশি বিষয়ক এক প্রবন্ধ সংকলন। এ ছাড়াও **সেমিনার**, **সোশাল সায়ান্টিস্ট**, **ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি** ইত্যাদি পত্রিকাতেও বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। খানিকটা তাৎক্ষণিকতা নিশ্চয়ই ছিল এ সবের মধ্যে। কিন্তু তবুও কথাবার্তা এগোতে এগোতে একটা জমি তৈরি হতে পারে আস্তে আস্তে। অনেক সময়ে এ সবের মধ্য দিয়েই বিষয়টা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তাতে করে একদিকে যেমন এর সজীবতা শুকিয়ে গিয়ে প্রাণহীনতায় পর্যবসিত হবার বিপদ আছে তেমনি অন্যদিকে চর্চাটা আরো বেশি সমর্থ ও সমালোচনাময় হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও থাকে। গ্রামশির ক্ষেত্রেও তাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গ্রামশি ইতিমধ্যেই কিছুটা পাঠক্রমে গৃহীত। আমাদের সামগ্রিক চর্চায় তার ফল কী হবে সে কথা বলার সময় এখনো আসে নি।

আশির দশকে আমাদের চর্চায় প্রয়োগের স্তরে একটা লক্ষণীয় সংগঠিত চেষ্টা হল সাবঅলটার্ন ইতিহাস রচনার প্রয়াস। রণজিৎ গুহের সম্পাদনায় **সাবঅলটার্ন স্টাডিজ** এই শিরোনামে প্রথম প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৮২তে। এই সংকলন ঘোষিতভাবে এক বৃহত্তর প্রকল্পের অংশ। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস তথা ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে-উচ্চবর্গ ঝোঁক দীর্ঘদিন ধরে প্রকট হয়ে আছে সেই ঝোঁকের বিরুদ্ধে এক নতুন ইতিহাস রচনার প্রয়াস এই প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য। এই নতুন ঝোঁকের-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাবঅলটার্ন ধারণার পরিচয় দিতে গিয়ে সম্পাদকীয় মুখবন্ধে গ্রামশির প্রেরণার স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। গ্রামশির **জেলখানার নোটবই**-এর অন্তর্গত ইতালীয় ইতিহাস বিষয়ক রচনায় গ্রামশি সাবঅলটার্ন ইতিহাস চর্চার জন্য এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন। এই রূপরেখা দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতের নতুন ইতিহাস রচনার জন্য রণজিৎ গুহের প্রকল্পেরও দূর লক্ষ্য। গ্রামশি প্রণীত সাবঅলটার্ন ইতিহাস প্রকল্পের চেহারাটা এই রকম :

> 'সংজ্ঞা থেকেই একথা বলা চলে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অধস্তন শ্রেণীসমূহ "রাষ্ট্রে" রূপান্তরিত হতে না পারছে ততক্ষণ তাদের পক্ষে একীভূত সংহত কোনো রূপ অর্জন করা সম্ভব না: অতএব তাদের ইতিহাস জনসমাজের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যায়, আর সেইভাবে রাষ্ট্রের ইতিহাস ও রাষ্ট্রপুঞ্জের ইতিহাসের সঙ্গেও। তাই আমাদের চর্চা করতে হবে :
>
> ১. কীভাবে অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রের বিকাশ ও রূপান্তরের মধ্য

দিয়ে অধস্তন শ্রেণীসমূহ গড়ে উঠছে তার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ : কীভাবেই বা এইসব শ্রেণীসমূহের সংখ্যাগত বিস্তারলাভ ঘটছে এবং আগের যে-সব সামাজিক গোষ্ঠীর মানসিকতা, মতাদর্শ এবং লক্ষ্য-আদর্শ যা এরা কিছুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে তাদের মধ্যে থেকে এদের উদ্ভব হচ্ছে এইসব।

২. প্রধান রাজনৈতিক গড়নগুলোর সঙ্গে এইসব অধস্তন শ্রেণীসমূহ কীভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে লগ্ন হয়ে থাকে এবং কীভাবেই বা নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য তারা ঐসব প্রভুত্বময় গড়ন-গুলোর কর্মসূচিকে প্রভাবিত করে আর এ সবের ফলে নানারকম ভাঙচুরের মধ্য দিয়ে যেসব নতুন নতুন গড়ন তৈরি হয় সেসব।

৩. অধস্তন গোষ্ঠীসমূহের সম্মতি আদায় ও সংরক্ষণ করে তাদের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য প্রধান গোষ্ঠীসমূহের নতুন রাজ-নৈতিক দলের উদ্ভব।

৪. আংশিক ও সামান্য কিছু দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গঠিত অধস্তন গোষ্ঠী সমূহের নিজস্ব দল গঠন।

৫. পুরনো কাঠামোর মধ্যেও অধস্তন গোষ্ঠীসমূহের স্বাধিকার প্রতি-ষ্ঠার জন্য গড়ে তোলা নতুন নতুন সংঘ সংগঠন।

৬. সার্বিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গড়ে তোলা সংঘ সংগঠন... ইত্যাদি।'

গ্রামশি সাবঅলটার্ন ইতিহাস রচনার জন্য এরকম গোটা ছয়েক স্তরের কাজের উল্লেখ করেছেন। তবে গ্রামশির চিন্তার যা ধরন তার থেকেও মনে হয়, আর ঐ ছ-নম্বরের ধাপটার মধ্যে ব্যবহৃত ঈষৎ ফাঁক ও 'ইত্যাদি' শব্দের প্রয়োগের মধ্য থেকেও মনে হয় যে, গ্রামশি এই ধরনের কোনো গবেষণ প্রকল্পকে ছটা মাত্র নির্দিষ্ট গণ্ডিকাটা স্তরে একেবারে বেঁধে দিচ্ছেন তা নয়। তার দরকারও নেই খুব। অধস্তন শ্রেণীর কাজকর্ম, জীবনযাপন, আন্দোলন-বিদ্রোহ, চিন্তাভাবনা ও মনোভঙ্গি ইত্যাদির দিকে মনোযোগ দিয়ে গবেষণা করতে গেলে এরকম বন্ধ খোপে চিন্তা না করাই ভালো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই রকম আঁটো কাঠামোর অদলবদলের প্রয়োজন দেখা দিতেও পারে। কিছু পরিবর্তন হলেই সেটা গ্রামশি চিন্তার পরিপন্থী হয়ে গেল বলে হায় হায় করবার কোনো মানে হয় না। দেখতে হবে কোথায় কেন বা কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন মনে হচ্ছে। গ্রামশি চিন্তার গোটা আদলটার কথা মাথায় রেখে তবে এসব পরিবর্তনের বিচার হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে বিচার বড় বেশি যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। রণজিৎ গুহ তাঁদের প্রকল্পের জন্য এই ছ-টা স্তরের উল্লেখই করেছেন, তবে সে কথাটাকেও ওরকম আক্ষরিক অর্থে নেবার কোনো দরকার নেই। প্রয়োজনে কোনো কোনো প্রসঙ্গে বিস্তার ও বিচ্যুতি হতেই পারে। এতে করে এই প্রকল্পের পেছনের গ্রামশি চিন্তার প্রেরণার কথাটা মিথ্যে হয়ে যায় না।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত ছ-টি খণ্ডের মোট ছেচল্লিশটা প্রবন্ধে একদিকে যেমন আমাদের ইতিহাস গবেষণার অন্য একটা ধরন তৈরি হয়ে উঠছে তেমনি অন্যদিকে গ্রামশির তত্ত্বকাঠামোর অনেক মৌলিক ধারণার প্রসার ও প্রয়োগ ঘটেছে। ফলে আমাদের গ্রামশি চর্চার ক্ষেত্রেও এই প্রবন্ধ সংকলনের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। চতুর্থ খণ্ড থেকে অন্যান্য মৌলিক প্রবন্ধের সঙ্গে 'আলোচনা' অংশে যে লেখাগুলো সংকলিত হচ্ছে এই দিক থেকে সেগুলো খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই 'আলোচনা'-অংশের অনেকগুলো প্রবন্ধেই গ্রামশির কয়েকটি জরুরি ধারণার বিস্তার ও বিশ্লেষণ পাওয়া যাচ্ছে তাত্ত্বিক স্তরে। 'প্রভুত্ব', 'আধিপত্য', 'রাষ্ট্র', 'জনসমাজ', 'সক্রিয়', 'নিষ্ক্রিয়', 'বিস্তার' ইত্যাদি ধারণার প্রয়োগ ও আলোচনা-সমালোচনায় **সাবঅলটার্ন স্টাডিজ** গ্রন্থমালা আমাদের গ্রামশিচর্চায় বেশ খানিকটা জমি তৈরি করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও কতটুকু কী দাঁড়াল তা একবার দেখে নেওয়া দরকার।

আমরা এরকম একটা কথা থেকে শুরু করেছিলাম যে আমাদের এখানে গ্রামশিচর্চার তেমন কোনো ক্ষেত্র তৈরিই হয়নি এখনো পর্যন্ত—না প্রকৃত রাজনীতির স্তরে, না আমাদের তত্ত্বচর্চার বা বিদ্যাচর্চার স্তরে। **সাবঅলটার্ন স্টাডিজ** প্রবন্ধ সংকলন নিশ্চয়ই বেশ একটা বড় মাপের কাজ। তার ভেতরকার সংহতি অটুট থাকুক না থাকুক, তার ভেতরেই নিহিত কোনো বীজের জন্য তার নিশ্ছিদ্র চেহারায় ফাটল ধরুক না ধরুক, নিশ্ছিদ্র এমন কোনো আদল সম্ভব বা কাম্য বা এমনকী সংকলনের সম্পাদকীয় কল্পনায় ছিল কি ছিল না সে সব কথা ছেড়ে দিয়েও এই মাপের এতখানি কাজ যে হাতে পাওয়া গেল সেটা তো হিসেবের মধ্যে নিতে হবে। তাহলে কি আগের কথাটা আমরা ফিরিয়ে নেব এবং ধরে নেব যে গ্রামশিচর্চার একটা উপযুক্ত ক্ষেত্র এখন তৈরি? এতটা বোধ হয় ঠিক হবে না। কেন সেটা একটু বুঝে নিলে গ্রামশিচর্চার একটা সূত্রও আমরা হয়তো পেতে পারি। ষাটের দশকের সঙ্গে তুলনায় আজ নব্বইয়ের দশকে অবস্থা এখন নিশ্চয়ই অন্য রকম। কিন্তু পরিবর্তন যথেষ্ট কি না এবং তা কতটা ব্যাপক সেটা বুঝে দেখা দরকার। আমরা ওপরে যে-সব কাজের কিছু উল্লেখ করলাম সে তালিকা হয়তো সম্পূর্ণ নয়। আরো মনোযোগ দিয়ে পঞ্জি রচনা করলে হয়তো আরো কিছু কাজের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু যে-অবস্থার কথা মাথায় নিয়ে আমরা এখন এগোতে চাইছি তার বিশেষ বদল হবে না। আমাদের সংগঠিত রাজনৈতিক কর্মের স্তরে গ্রামশির প্রবেশ আগের মতোই এখনো নিষিদ্ধ। ফলে দৈনন্দিন অস্তিত্বের স্তরে, অভাব অভিযোগ, প্রতিবাদ প্রতিরোধের স্তরে গ্রামশি চিন্তার কোনো বোধ সঞ্চারিত হতে পারেনি আমাদের সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক জীবনে। গ্রামশির বিশ্ববীক্ষা কোনো রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছতে পারেনি। কোনো রাজনৈতিক দল বা তার কর্মসূচির এই মধ্যস্থতার ফলে কোনো বীক্ষা যখন আমাদের কাছে পৌঁছয় তা খুব স্বাভাবিকভাবেই হয়তো প্রতিসরিত হয়ে যায়। এই প্রতিসরণ সত্ত্বেও কিন্তু একটা

ভুবন আমাদের কাছে ধরা পড়ে। ঐ প্রতিসরিত বীক্ষা, আমাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অঙ্গের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ জনজীবনের স্তরে এক ধরনের একটা বোধ তৈরি হয়। সেই স্তরে দেখা দেয় কিছু প্রশ্ন, কিছু সংশয়; দৈনন্দিন বাঁচা ও সংলগ্ন সফলতা, অসফলতা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে সেসব দ্বিধা-সংশয় ও প্রশ্নের এক ধরনের মোকাবিলা করার সামর্থ্য। নতুন কোনো দর্শন বা তত্ত্বকাঠামোর ভূমিকা তো ঠিক এই বীক্ষণ ও মোকাবিলার ক্ষেত্রে। তার সামর্থ্য যাচাই-য়েরও এক জোরালো মাপকাঠি এখানে।

এই জমিটা তৈরি থাকলে আমাদের বুদ্ধিচর্চার স্তরে একটা শক্ত অবলম্বন মেলে। এই অবলম্বন যে সব সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন বা রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়েই তৈরি হতে হবে তা নয়। কিন্তু জনজীবনের স্তরে যেভাবেই হোক শিকড় ছড়ানোটা দরকার। তাতে প্রশ্নগুলো শারীরিক চেহারা পেয়ে জীবন্ত রূপ ধারণ করতে পারে। তত্ত্ববীক্ষা তখন আমাদের বাঁচার ভুবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। এইসব প্রশ্ন, আমাদের সংশয়দীর্ণ অস্তিত্ব, আমাদের তত্ত্ববিশ্বে ও কর্মকাণ্ডের স্তরে তাদের মোকাবিলা এইসব মিলেমিশে এমন একটা জগৎ গড়ে ওঠে যেখানে আমরা ভেতরকার বাসিন্দা হয়ে উঠতে পারি। তা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ আমাদের প্রশ্ন ও তার সমাধানের চেষ্টা দুইই থাকে কিছুটা বহিরাগতের মতো, খানিকটা শৌখিন পর্যায়ের। যেন আমরা শুধু ক্লাসে পড়া বলার মতো করে বা পরীক্ষায় পাশ করবার জন্য কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। এসব প্রশ্ন বা তার উত্তর এর কোনোকিছুর সঙ্গেই যেন আমাদের বাঁচা-মরার কোনো সম্পর্ক নেই। এই অবস্থাটাকে বলছি বহিরাগতের অবস্থা। যেন আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বোত্তম পন্থা বিষয়ে কোনো বহিরাগত বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিচ্ছি। তাঁর পরামর্শের সুফল কুফলে তাঁর তো কিছু এসে যায় না। তিনি তো বহিরাগত; এটা কিন্তু শুধু নাগরিকত্বের প্রশ্ন নয়। দেশি নাগরিক হয়েও দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে বহিরাগতের মতো। বহিরাগতের এই দৃষ্টিভঙ্গি বা ধরনটা আমরা যতক্ষণ না উতরে যেতে পারছি ততক্ষণ কিন্তু আমাদের প্রশ্নে বা তার উত্তরে সেই সংরাগ কখনোই সঞ্চারিত হবে না যা কেবলমাত্র মরণপণ লড়াইয়ের ক্ষেত্রেই সম্ভব। জীবনযাপনের নিহিত ভূমি থেকে উঠে না এলে আমাদের রাজনীতি, তত্ত্বচর্চা বা দার্শনিক বীক্ষা কোনো কিছুতেই সেই বাড়তি জোশটা আসে না। এটা কিন্তু কেবলমাত্র সামর্থ্যের প্রশ্ন নয়। সামর্থ্য, নৈপুণ্য এসব অর্জন করা যেতেই পারে, তাতেও কিন্তু ঐ জোশ অনায়ত্ত থেকে যেতে পারে, এই জোশটাকেই ইতালীয় তত্ত্বপ্রসঙ্গে 'বীরের আক্রোশ' বলা হয়ে থাকে। গ্রামশি যে-তত্ত্বজগতের বাসিন্দা সেখানে এই বীরের আক্রোশ বা **এরোয়িকো ফুরোরে**-র ধারণা খুব জরুরি। আমাদের গ্রামশি চর্চার ভূমি প্রস্তুত কি না বা কতটা প্রস্তুত তা বিচারের জন্য অন্ত-রঙ্গতার এই ধারণা একটা প্রকৃষ্ট প্রকরণ হয়ে উঠতে পারে। সত্তর-

আশির দশকে গ্রামশি বিষয়ে যেটুকু লেখালেখি প্রয়োগ বা আলোচনা-সমালোচনা দেখা দিয়েছে আমাদের এখানে তাকে যদি খুব যান্ত্রিকভাবে না দেখি তাহলে জমি তৈরির ক্ষেত্রে খুব বাহবা পাবার কোনো কারণ নেই। ঐসব চর্চার ভূমিকা মেনে নিয়েও বলা চলে যে আমাদের গ্রামশিচর্চার জন্য অন্তরঙ্গ কোনো ক্ষেত্র এখনো ঠিকমতো গড়ে ওঠেনি।

তাহলে প্রশ্ন উঠবে: আমাদের গ্রামশিচর্চার সূত্র কোথায়? ধরতাইটা পাব কীভাবে? যে-অন্তরঙ্গতার সন্ধান একান্ত প্রয়োজন তা সাধিত হবে কেমন করে? আমাদের এখানে গ্রামশির ভুবন অনাবিষ্কৃত হলেও মার্কসীয় বীক্ষা কিন্তু অনেকদিন ধরেই নানাভাবে আমাদের বোধে বিদ্যমান। মার্কসের তত্ত্বচর্চায় আমাদের মৌলিক অবদান কত গুরুত্বপূর্ণ সে-প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আমাদের প্রত্যক্ষ রাজনীতির জগতে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে এবং সংলগ্ন আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কের মধ্য থেকে একটা যা হোক মার্কসীয় ভুবন আমাদের এখানে কিন্তু গড়ে উঠেছে। এই ভুবনটা যে একটা মোলায়েম সমতল স্থির নির্দিষ্ট প্রত্যয়ে চিহ্নিত কোনো জগৎ তা নয়। এরও আছে একটা রীতিমতো বিকাশের ইতিবৃত্ত। তার মধ্যে মধ্যে আছে ইতিহাস-সংলগ্ন বিভিন্ন মোচড়। বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত শরিকি মীমাংসার তর্কবিতর্ক। এমনকী মার্কসীয় ভুবন বললে স্পষ্ট কোনোকিছু বোঝায় কিনা এ নিয়েও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। আর এই অসমতল বন্ধুর চেহারা মার্কস-প্রাসঙ্গিক ভুবনে যে শুধু আমাদের বেলায় সত্যি তা তো নয়। প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই এ ব্যাপারটা আছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। থাকাটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কারণ, এই ধরনের দর্শন-চিন্তা তো জগতের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরে কুলুপ আঁটে নি। ফলে সমাজ ইতিহাসের পরিবর্তনের ঢেউ লাগে তত্ত্ববিশ্বেও, দেখা দেয় নানা বাদানুবাদ ও মত উপমত। মার্কসীয় দর্শনের প্রেরণাপ্রসূত আন্তর্জাতিক সংগঠন যে বারবার ভেঙে যায় আবার নতুনভাবে সংগঠিত হয় তার মধ্যে এই পরিবর্তন ও চিন্তাজগতে তার অভিঘাতের ইতিবৃত্ত নিশ্চয়ই অনেকখানি ধরা পড়ে। দ্বিতীয়, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের পরে কমিনটার্ন-এর পর্ব পার হয়ে পঞ্চাশের পরবর্তী পৃথিবীতে যে ঠিক অমনি ধরনের আঁটোসাটো আর কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠনের অস্তিত্ব রইল না বা তেমন করে আর চিন্তাও যে করা হল না এর মধ্যে ঐ পর্বের বিশ্ব ইতিহাসের কিছু জরুরি ইঙ্গিত লুকোনো আছে। মার্কসীয় বীক্ষা ও মার্কস-কেন্দ্রিক সংগঠন ও আন্দোলনের জগতে এই রকম সময় থেকে এক ধরনের বহুত্বের স্বীকৃতি মিলতে থাকল যেটা দীর্ঘ-মেয়াদি পরিণতির দিক থেকে খুব জরুরি। পঞ্চাশের দশকের পৃথিবীতে একদিকে চলছে পশ্চিমি ধনতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে পূর্ব ইয়োরোপের সমাজ-তান্ত্রিক দুনিয়ার তীব্র দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক। অন্যদিকে চীনের উত্থান ও ইন্দোচীন ভূখণ্ডের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক ধরনের এশীয় মার্কসবাদের বিকাশ সূচিত হচ্ছিল। ইয়োরোপীয় মার্কসবাদের তুলনায় নানা দিকেই এর

চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এশিয়া ও আফ্রিকায় ক্রমশ দেশে দেশে আর এক রকমের জাতীয়তাবাদী শক্তির বিকাশও লক্ষণীয় হয়ে উঠছিল। ভারত সমেত এই নতুন স্বাধীন দেশগুলির কোনো কোনোটাতে মার্কসবাদের কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি তো ছিলই। কিন্তু এই বহুধা বিভক্ত জগতে মার্কসবাদের প্রয়োগ ব্যাখ্যা ও গতি প্রগতি কোনো অর্থেই এক ধাঁচের হবে এরকম মনে করার কারণ নেই। হয়ও নি। ফলে আন্তর্জাতিকের মতো শক্ত কোনো কেন্দ্রীয় ঘাঁটি এই পর্বে না থাকবারই কথা। এমনকী ইয়োরোপের মার্কসবাদের চেহারাও এই পর্বে আদৌ আর এক রকমের থাকছিল না। বিভিন্ন দেশের সমস্যার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে প্রয়োগের স্তরে মার্কসবাদের রকমফের একেবারে অনিবার্য হয়ে উঠছিল। ফ্রান্স, জর্মনি, ইতালি ও স্পেনে কমিউনিস্ট পার্টি ও মার্কসীয় তত্ত্বের সমস্যা ও চেহারা কখনোই এক ধরনের ছিল না। আন্তর্জাতিক কোনো সংগঠনের দৃঢ় কেন্দ্রিকতার জোরে আঁটোসাটো এক সমতার চেহারা এই পর্বে আর মোটেই সম্ভব কিংবা স্বাভাবিক ছিল না। এই পর্বের যে বহুত্ব ও নানা বৈচিত্র্যের সমাহার তার পেছনে ১৯৫৬-র সোভিয়েত পার্টির বিংশতিতম সম্মেলনের একটা ভূমিকা নিশ্চয়ই মানতে হয়। স্তালিনীয় প্রকল্পটাকেও যে প্রশ্নবিদ্ধ করা সম্ভব এরকম কথা এর আগে কমিউনিস্ট দিগ্‌দর্শনে কখনো ধরা পড়ে নি। এর থেকে মার্কসবাদের তত্ত্বচর্চাতেও এক নতুন বহুত্বের সংক্রাম মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না।

তাত্ত্বিক মার্কসবাদের একটা কাটাছাঁটা ধরাবাঁধা চেহারা মোটামুটি পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ধার্য হয়ে ছিল। সর্বাংশে সমতল চেহারা হয়তো কোনো সময়েই ঠিক বাস্তব ছিল না। আন্তর্জাতিকের ইতিহাসের পর্বে পর্বে তথাকথিত শোধনবাদী উত্থানের মধ্যেও এইরকম নানা তর্কবিতর্কের এক বন্ধুর চেহারার সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব পর্বে সাংগঠনিক কিংবা তাত্ত্বিকতার স্তরের কেন্দ্রিকতার ধারা ঠিক মৌলিকভাবে আক্রান্ত হয়নি। যখনই সংকট দেখা দিয়েছে তখনই সংগঠনটা হয়তো ভেঙে গেছে। কিন্তু পরে আবার অনুরূপ সংগঠনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং তাত্ত্বিকতার স্তরেও যতদিন এই কেন্দ্রিকতার ব্যাপারটা পুরোপুরি ভেঙে পড়েনি ততদিন মার্কসবাদী কাঠামো বলতে মোটামুটি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রভাবিত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদভিত্তিক এক ধরনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রশ্রয় পেয়ে আসছিল দেশে দেশে। এর মধ্যে পদ্ধতিগত স্তরে ছিল বৈজ্ঞানিকতার ধারণা আর প্রয়োগের স্তরে ঐতিহাসিক অনিবার্যতার। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই রেশ এখনো পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। তাই এখনো দেয়াল লিখনে দেখা যায়, এরকম বাণী : 'মার্কসবাদ সত্য, কারণ ইহা বৈজ্ঞানিক।' দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শোধিত মার্কসবাদের এই সমতল নিশ্ছিদ্র নিরুপদ্রব তত্ত্বকাঠামোয় বড় রকমের ভাঙন দেখা দিল ষাটের দশকে। এই দশকের পশ্চিমি মার্কসবাদের চর্চায় ফরাসি দার্শনিক লুই আলতুসের-এর প্রভাব একটা সময়ে ছিল সত্যিই অগ্রগণ্য। ফরাসি স্ট্রাকচারালিজম-এর

অঙ্গীভূত মার্কসবাদের এই স্ট্রাকচারালিস্ট পাঠ ইয়োরোপীয় অনেক ভাবুককে দারুণভাবে আকর্ষণ করেছিল। এক অর্থে আলতুসের-এর স্ট্রাকচারালিস্ট মার্কসবাদের পেছনে ছিল কিছুটা পরিমাণে সার্ত্রীয় ধরনের অস্তিত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রভাবিত মার্কসবাদের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা ও তার চৈতন্য, মানুষের স্বজ্ঞা ও তার কর্মপ্রণোদনা ইত্যাদি ধারণা ভাববাদী, মনোগত ইত্যাদি অভিযোগে প্রায় অপাংক্তেয় হয়ে রইল। সামাজিক পরিবর্তন বা বৈপ্লবিক রূপান্তরের পেছনে মূল চালিকাশক্তি যে বস্তুমুখী জড়বাদী নিয়মশাসিত এই প্রত্যয়ে ভর করে মার্কসবাদী ইতিহাস-বীক্ষাকে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক বলে গ্রহণ করা হল। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে, বিশেষত নাৎসি উত্থানের কলঙ্কের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের এই অমোঘ নিয়মশাসিত বৈজ্ঞানিক বীক্ষা বিষয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিল। অস্তিত্ববাদের অন্তর্গত স্বাধীনতা, চৈতন্য, মানুষের সচেতন দায়বদ্ধ নির্বাচন, সামাজিক পরিস্থিতিতে নৈতিক দায়িত্ব ইত্যাদির ধারণাবিশ্ব থেকে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ঘরানার মার্কসবাদ সম্বন্ধে অসন্তোষ ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠল। ফরাসি চিন্তার জগতে একটা সময়ে অস্তিত্ববাদ বনাম মার্কসবাদ এইরকম একটা বৈর সম্পর্ক তৈরি হয়ে উঠেছিল। সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদ অবশ্য অনেক সময়েই মার্কসবাদের সঙ্গে একটা দার্শনিক মোকাবিলা করার চেষ্টা করে গেছে। এই দার্শনিক সংলাপ সার্ত্র প্রায় কখনোই রুদ্ধ করেন নি এবং ফলত তিনি শেষমেশ মার্কসের সঙ্গে এমন একটা অন্বয়ে এসে পৌঁছতে পারেন যেখানে সম্পর্কের বৈরিতা প্রায় মিলিয়ে যায়। এক অর্থে আলতুসের-প্রণোদিত মার্কসপাঠ মার্কস বিষয়ে এই অস্তিত্ববাদী অভিপ্রায়ের প্রায় বিপরীতে অবস্থিত। এক অর্থে আলতুসের মার্কসবাদকে পুনরায় 'বৈজ্ঞা-নিকতায়' স্থাপিত করেন। এই 'বৈজ্ঞানিকতা' অবশ্যই দ্বিতীয় আন্ত-র্জাতিকের যান্ত্রিক বৈজ্ঞানিকতা থেকে ভিন্ন। 'স্ট্রাকচার' বা অন্তর্গত কাঠামোর যে ব্যক্তি অতিক্রমী ধারণা, আলতুসের ব্যক্তিসত্তা ও চৈতন্যের বদলে তাকেই সমাজ-ইতিহাসের নিহিত চরিত্রের নির্ধারণে নায়কের ভূমিকায় বসান। ফের্দিনঁ দ্য স্যস্যর-এর ভাষাবিজ্ঞান ও ক্লোদ্ লেভি-স্ত্রোস-এর নৃতত্ত্বের 'স্ট্রাকচার'-এর ধারণা ব্যবহার করে আলতুসের সমাজ-ইতিহাসেরও বিবর্তনে এই কাঠামোর ভূমিকা অগ্রগণ্য করে তুললেন। কিন্তু অস্তিত্ববাদের বিপ্রতীপ এই অবস্থানটা নিতে গিয়ে আলতুসের-এর মার্কসবাদ প্রায় ইতিহাসেরই বিপ্রতীপে গিয়ে দাঁড়াল। অন্তর্গত কাঠামোর ভূমিকা খুব বেশি বড় করে দেখতে গেলে ইতিহাসের গতির মোড়ে মোড়ে যে নানারকম অনির্দেশ্য মোচড় লুকোনো থাকতে পারে সে সম্ভাবনা প্রায় অস্বীকৃত হয়ে যায়। সমাজ রূপান্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এতটা স্ট্রাকচারালিস্ট পাঠ আমাদের সমাজদর্শনকে খানিকটা বিবর্ণ করে দেয়। শুধু ব্যাখ্যা বা অনুধাবনের প্রশ্নে স্ট্রাকচারালিজমের দার্শনিক ছকের একটা ভূমিকা নিশ্চয়ই গ্রাহ্য. কিন্তু পরিবর্তন বা রূপান্তর বা কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এই কাঠামোর চাপ যদি

অনতিক্রম্য হয় তাহলে তো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায় নির্বিচারে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তাই সমাজশরীরে পরিবর্তনের লক্ষণ যখন ফুটতে থাকে, অস্থিরতা-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ যখন আস্তে আস্তে মাথাচাড়া দিতে থাকে তখন স্ট্রাকচারালিস্ট সমাজদর্শনের আবেদন কমবারই সম্ভাবনা। সম্ভবত এরকমই কিছু একটা ঘটে থাকবে সত্তরের দশকের শুরু নাগাদ সময়টাতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে যে সমাজ-অর্থনীতির বিন্যাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল সত্তরের দশকের শুরুতে সেই বিন্যাসে বড় রকমের ধাক্কা লাগে। দেশে দেশে সেই অস্থিরতার প্রেক্ষিতে আলতুসের-এর মার্কসবাদে ভাঁটার টান লাগতে থাকে। কিন্তু মার্কসবাদের যে-বহুত্বের কথা দিয়ে এই প্রসঙ্গটা শুরু করেছিলাম সেদিক দিয়ে কাঠামো-ভিত্তিক মার্কসপাঠের এই ধারার একটা বড় ভূমিকা থেকে গেছে।

পশ্চিমি মার্কস চর্চায় এরকম আর একটা বড় ধরন হল ফ্রাংকফুর্ট ঘরানার সমালোচনাত্মক তত্ত্ব। আলতুসের-কেন্দ্রিক স্ট্রাকচারালিস্ট মার্কসবাদের প্রধান উৎস আলতুসের-এরই দুটো বই : **মার্কসের জন্য** (১৯৬৫) [প্যুর মার্কস] এবং **পুঁজির পাঠগ্রহণ** (১৯৬৫) [লির ল্য কাপিতাল]। দ্বিতীয় গ্রন্থের সহ-লেখক এতিয়েঁ বালিবর। তবে আলতুসেরই নিশ্চয় এই ধারার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। তুলনায় সমালোচনাত্মক তত্ত্বের ধারাটা ঠিক কোনো একক ব্যক্তিত্বের কৃতিত্ব নয়। এর চরিত্র বেশ খানিকটা প্রাতিষ্ঠানিক। জর্মনির **ইনস্টিট্যুট ফ্যুর সোৎসিয়ালফোরশুং** এর প্রাথমিক পীঠস্থান। এই ধারার সূত্রপাত বলতে গেলে এই শতকের বিশের দশকে, তবে এর প্রধান বিকাশপর্ব নিশ্চয়ই পঞ্চাশের দশকে। এরও পেছনে ছিল জর্মনির নাৎসি উত্থানপর্বের কুৎসিত স্মৃতি। বস্তুত নাৎসি-প্রত্যাখ্যান প্রতিক্রিয়া সমালোচনাত্মক তাত্ত্বিকদের অনেকের ক্ষেত্রে ছিল একেবারে প্রত্যক্ষ। এই ঘরানার প্রথম দিককার প্রবক্তাদের অনেকেই জাতিতে ইহুদি। তাঁদেরই উদ্যমে প্রেরণায় ও এমনকী অর্থসাহায্যেও ফ্রাংকফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৩-এ প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজগবেষণার এই কেন্দ্র। এর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ফ্রিডরিশ পোলক (১৮৯৪-১৯৫৫) ও কার্ল গ্রুনবের্গ (১৮৬১-১৯৪০)। তাত্ত্বিক দিক থেকে এই ঘরানার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব মাক্স হোরকহাইমার (১৮৯৫-১৯৫৫) ও পরবর্তীকালে তেয়োডোর আডরনো ও হ্বালটার বেন্য়ামিন। বর্তমানে এই ঘরানার সবচেয়ে সক্রিয় প্রবক্তা য়ুর্গেন হাবেরমাস।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন পর্বে মার্কসীয় তত্ত্বচিন্তা ও মার্কসীয় বীক্ষার নানা প্রসঙ্গ নিয়ে যে-সব দ্বন্দ্ব ও তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধারা-উপধারা তারা সবাই কিন্তু মোটামুটি প্রত্যক্ষভাবে ছিল রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে, তার অন্তর্গত সংঘর্ষ ও প্রতিরোধের ইতিহাস থেকেই উঠে আসছিল ঐসব ধারা-উপধারার তাত্ত্বিক অবস্থান। সেই তুলনায় যুদ্ধোত্তর এইসব প্রধান ধারা প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অনেকটাই দূরে অবস্থিত। এইসব ধারার

অন্তর্গত ব্যক্তিরা কেউ কেউ হয়তো কমবেশি রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন. কিন্তু সেটা ঠিক তাঁদের গোষ্ঠীচক্রের চরিত্র ছিল না। গোষ্ঠীগত বা একক তত্ত্বচিন্তায় বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অনেক প্রধান ধারাই সেই অর্থে খানিকটা 'স্বাধীন', অর্থাৎ সংঘবদ্ধ, সংগঠিত রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রও নয়, মুখাপেক্ষীও নয়। বাস্তবে অনুসৃত রাজনীতির তত্ত্বসমর্থন জোগাড় করা বা খুঁজে বার করা যে তাত্ত্বিকের প্রধান কাজ নয় এই বোধ ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকল এবং এ ব্যাপারে সমালোচনাত্মক তত্ত্বের ধারা সোভিয়েত ধাঁচের রাষ্ট্রশাসন ও তত্ত্ব-সম্পর্কের কঠোর সমালোচক। তত্ত্ব যদি প্রত্যক্ষ বাস্তবতার, রাষ্ট্রের, রাজনৈতিক দলের অতটা ঘনিষ্ঠ সহযোগে নিজেকে আশ্রিত করে তাহলে তত্ত্বচেহারা বিবর্ণ হবার আশঙ্কা থাকে। আবার বৃহত্তর অর্থে তত্ত্বের সঙ্গে কর্মকাণ্ডের সম্পর্কও অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে মার্কস-প্রাসঙ্গিক তত্ত্বচিন্তায় তত্ত্ব ও কর্মকাণ্ডের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্বের জগৎ কতটা স্বাধীন, কর্মকাণ্ড বা প্র্যাক্সিস তাকে কতদূর পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে নিতে পারে বা কতদূর পর্যন্ত সেটা বাঞ্ছনীয় এ-প্রশ্ন সমালোচনাত্মক তত্ত্বের এক কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ। একদিকে স্বাধিকার-সচেতন, স্বজ্ঞাশাসিত, চৈতন্যনন্দিত মানুষের স্বাধীন সত্তা আর অন্যদিকে অন্তর্গত কাঠামোর দুরতিক্রম্য চাপ—এর মধ্যে ইতিহাসের নায়ক ভূমিকা রীতিমতো প্রশ্নসংকুল। নাৎসি বীভৎসা উত্তীর্ণ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এই নায়কের সন্ধান দৈনন্দিন জীবনযাপনের মতো এক প্রত্যক্ষ সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করায় আমাদের। মানুষ ও তার সমাজ-অভিজ্ঞতা কি ইতিহাসের হাতে ক্রীড়নক মাত্র না কি মানুষ নিজেকে ইতিহাসের নিয়ন্তা ভূমিকাতেও দাঁড় করাতে পারে? দার্শনিকতার এই স্তরে কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমাদের তত্ত্বের সম্পর্কের প্রশ্নটা খুব জরুরি হয়ে ওঠে। ফ্রাংকফুর্ট ঘরানার সমালোচনাত্মক তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গটির এক কেন্দ্রীয় গুরুত্ব রয়েছে। এই ঘরানার সমাজদর্শনে তত্ত্ব সম্পূর্ণ স্বনিয়ন্ত্রিত বা স্বশাসিত নয়, তবে তত্ত্ব যে আপাদমস্তক কর্মকাণ্ডের প্রবাহে নিমজ্জিত তাও নয়। এদের সম্পর্কের মধ্যে একতরফা নির্ধারণবাদের পরিবর্তে কিছুটা আদানপ্রদান ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার একটা ছক কল্পনা করা হল। এই ছক থেকে এগোলে মার্কসবাদের প্রচলিত ধারার অনেকগুলো মৌল প্রত্যয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়। তথাকথিত ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর যে সরল ছক মার্কসবাদী ধারণায় দৃঢ়মূল তার চরিত্রও এই নতুন বীক্ষায় অনেকখানি পাল্টে যেতে পারে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রাণিত মার্কসবাদী কাঠামোর সমর্থনে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর কোনো কোনো বচন উদ্ধার করা সম্ভব নিশ্চয়ই এবং তা করা হয়েও থাকে। কিন্তু এ নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছিল বলেই মার্কসের মৃত্যুর পরে এঙ্গেলসকে আবার কলম ধরতে হয়েছিল এবং স্পষ্ট ভাষায় জানাতে হয়েছিল যে ওরকম কোনো এককাট্টা নির্ধারণবাদ তাঁর বা মার্কসের কল্পনায় ছিল না। সমালোচনাত্মক তত্ত্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকপন্থী মার্কসবাদের অনেক

প্রত্যয়কে সমালোচনার মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছিল এবং এসব সমালোচনের ফলে মার্কসবাদের 'বৈজ্ঞানিক' আখ্যায় অনেক সংশয় দেখা দিল। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি, বৈজ্ঞানিক ধ্রুববাদ, প্রযুক্তির জয়যাত্রা ইত্যাদির বেড়াজাল থেকে মার্কসবাদকে সরিয়ে এনে সমাজসত্তা, চৈতন্য, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদির পরিমণ্ডলে স্থাপিত করতে পারলে মার্কসীয় তত্ত্বে এক নতুন দিগ্‌দর্শনের সন্ধান মেলে। বিশেষত সত্তা-চৈতন্যরহিত প্রযুক্তিনির্ভর সমাজের প্রেক্ষায় সামগ্রিক স্বৈরাচারের দাপটের যে সম্ভাবনা থাকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজস্মৃতিতে সেই দাপটের পরিপ্রেক্ষিতেই জ্ঞানতাত্ত্বিক এই নতুন বীক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি থেকে কিঞ্চিৎ সরে এসে সমালোচনাত্মক তত্ত্বে খুব বড় জায়গা ছেড়ে দেওয়া হল সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণের জন্য। সমাজ-সংস্কৃতির সব অঙ্গই এখন সমালোচনাত্মক তত্ত্বের বিষয় হয়ে উঠল—সংগীত থেকে সমাজমনস্তত্ত্ব সবই।

এইসব বিচার-বিবেচনার মধ্য দিয়ে যান্ত্রিক মার্কসবাদ থেকে সরে আসার একটা পথ তৈরি হচ্ছিল। এই রকম সময়ে মার্কসের তরুণ বয়সের কিছু রচনার দিকে নজর গেল। **১৮৪৪-এর অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি,** পারী পাণ্ডুলিপি নামে যা সমধিক পরিচিত, এই প্রসঙ্গে বিশেষ আলোড়ন তোলে। ১৮৪৪-এর এপ্রিল থেকে অগস্ট-এর মধ্যে রচিত এই পাণ্ডুলিপি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২-এ। ইংরেজিতে এই রচনার প্রথম প্রকাশ ১৯৫০-এ। মার্কসের অনেক প্রধান রচনাই তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, সেটা এমন কোনো বড় কথা নয়। কিন্তু মার্কসের তেইশ বছর বয়সের এই রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হল রচনাকালের অষ্টআশি বছর বাদে। ফলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বা তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা লেনিন কারো বীক্ষায় এই রচনার ছায়াপাত হল না। স্তালিন বা ট্রৎস্কি কি কোনো মনোযোগ দিয়েছিলেন এই রচনায়? এঙ্গেলস নিজে কি জানতেন এই পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব? জানলেও খুব কি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি? তাহলে প্রকাশ করেন নি কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই। তবে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রচলিত ব্যাখ্যায় **পারী পাণ্ডুলিপির** যে কোনো ভূমিকা ছিল না তা বলাই চলে। ষাটের দশকে তাই এই গ্রন্থের পঠন-পাঠন চর্চা নতুন আবিষ্কারের তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিল। বিশেষ করে যাঁরা মার্কসবাদের যান্ত্রিকতায়, তার [illegible] [illegible], তার অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী ঝোঁকে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা এই বইয়ে নতুন আশ্রয় খুঁজে পেতে চাইলেন। আমাদের এখানেও এ বইটা নিয়ে চর্চা ষাটের দশকেই শুরু হয়। বস্তুত, পার্টি-কেন্দ্রিক মার্কসচর্চার বাইরে এ বইটা ক্রমশ বেশ খানিকটা জায়গা করে নেয়। মার্কস-প্রাসঙ্গিক আলাপ আলোচনা লেখাপত্রে এমন এক ধরনের কথাবার্তা চালু হল যা স্বীকৃত মার্কসবাদী তত্ত্বের চৌহদ্দিতে একেবারে অপরিচিত। এখানকার মার্কসীয় পরিমণ্ডলে লক্ষণীয় বদল ঘটতে শুরু করল।

কী ছিল এই **পারী পাণ্ডুলিপিতে**? মার্কসীয় বীক্ষার নতুন কোন

দিগ্দর্শন এখানে নিহিত বলে ভাবতে পারি আমরা ? একটা কথা এখানে বোধহয় পরিষ্কার বলে নেওয়া ভালো। **প্যারী পাণ্ডুলিপি** মার্কসের **পুঁজি** গ্রন্থের আগে রচিত, অনেকটাই আগে; এমনকী পরবর্তী ঐ মহাগ্রন্থের ভূমিকা হিসেবেও একে দেখা চলে, অন্তত সে রকম দেখায় কোনো বাধা নেই। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, **প্যারী পাণ্ডুলিপি** আমরা **পুঁজি** গ্রন্থের আগে পড়ছি না পরে পড়ছি সেটা খুব জরুরি ব্যাপার। বৌদ্ধিক ঘটনা হিসেবে এ দুটো ঠিক এক জিনিস নয়। মার্কসীয় তত্ত্বকাঠামোকে আমরা মূলত অর্থনীতির কেন্দ্রে রেখে দেখব না মূলত দর্শনের কেন্দ্রে রেখে দেখব এ ধরনের ক্লাসঘর মার্কা প্রশ্নের বেশি কোনো মানে নেই একথা ঠিক। তবে একথাও ঠিক যে **পুঁজি** ও **প্যারী পাণ্ডুলিপির** ধারণাগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও দুটো বইয়ের মধ্যে স্বরভঙ্গির এমন একটা তফাত আছে যেটা লক্ষ করতেই হয়। **পুঁজি**-র শীতল বিশ্লেষণী মেজাজের তুলনায় **পাণ্ডুলিপির** মেজাজ অনেক বেশি আবেগতপ্ত। 'মানুষ'-এর ধারণা ও প্রসঙ্গ '**পাণ্ডুলিপির** কেন্দ্রে স্থাপিত। **পাণ্ডুলিপির** তত্ত্বচিন্তা এক বিশেষ সমাজকাঠামোয় মানুষেরই তত্ত্বচিন্তা। এই রচনাকে আমরা সরাসরি দার্শনিক নৃতত্ত্বের ভূমিতে স্থাপন করে নিতে পারি। মানুষ, মানুষের শ্রম, শ্রমোৎপাদনের সঙ্গে উৎপাদক মানুষের বিযুক্তি, বিযুক্ত সেই মানুষের ওপর শ্রমোৎপাদনের প্রভুত্ব, এই সূত্রে মানুষ বনাম দ্রব্য, দ্রব্যের দাপট, দ্রব্যের পণ্যপরিণতি ও ফলত মানুষেরই অবমূল্যায়ন, শ্রমিক ও তার শ্রমের দ্বন্দ্ব, শ্রমিকের অধোগতি ইত্যাদি প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে মার্কস এই রচনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পুঁজির মালিকানা-ভিত্তিক সমাজ ও অর্থনীতির যে-চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে এক নতুন সমাজবীক্ষার জনক। সেই বীক্ষার পূর্ণ রূপায়ণই মার্কসের সারা জীবনের গবেষণা প্রকল্প। সেই অর্থে ১৮৪৪-এর পাণ্ডুলিপিকে সামগ্রিক মার্কস রচনাবলিতে কোনো অর্থেই 'প্রক্ষিপ্ত' মনে করার কোনো কারণ নেই। মার্কস তাঁর ঐ মৌল বীক্ষা থেকে কিন্তু কখনোই সরে আসেননি। তাঁর আলোচনার ধরন বদলেছে, বহু প্রসঙ্গ পরবর্তী রচনায় আরো বিস্তার লাভ করেছে, কোনো কোনো প্রসঙ্গ থেকে সাময়িকভাবে কখনো কখনো হয়তো কিছুটা সরেও এসেছেন, কিন্তু প্রথম পর্বের সেই মৌল প্রত্যয় কখনো বর্জন করেন নি। অর্থাৎ ১৮৪৪-এর তরুণ মার্কস আর পরবর্তীকালের পরিণত মার্কসের মধ্যে কোনো অবিচ্ছিন্নতার বিরোধ নেই, 'দুই মার্কসের' দ্বন্দ্ব তাই কিছুটা কাল্পনিক। অথচ এই দ্বন্দ্ব কল্পনাই একটা সময়ে 'দুই মার্কসের' বিতর্কটাকে বেশ জীইয়ে রেখেছিল। মার্কসের **প্যারী পাণ্ডুলিপি** অবশ্যই একটা অসম্পূর্ণ রচনা এবং পাণ্ডুলিপির সব অংশ রক্ষিতও হয় নি। এই রচনাবলিতে মোট তিনটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে—বর্তমানের সম্পাদিত চেহারায় প্রথম পাণ্ডুলিপির মূল শিরোনাম 'শ্রমের মজুরি', দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির শিরোনাম 'মূলধন ও শ্রমের দ্বন্দ্ব-বিরোধ। ভূসম্পত্তি ও মূলধন' আর তৃতীয় পাণ্ডু-

লিপির শিরোনাম হল : 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রম'। ব্যক্তিগত সম্পত্তির গতিপ্রকৃতি থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি'। প্রথম পাণ্ডুলিপির শেষ অংশটা (মার্কসের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২ থেকে ২৭) বিযুক্ত শ্রম বিষয়ক। বিযুক্তির এই ধারণাই ইংরেজিতে 'এলিয়েনেশন' শব্দ দিয়ে নির্দেশিত হয়। মার্কসের ব্যবহৃত দুটো শব্দ ছিল এই প্রসঙ্গে—'এনটাউসসেরুং' আর 'এনট্‌ফ্রেমডুং'। ইংরেজি অনুবাদে এর প্রথমটার জন্য ব্যবহার করা হয় 'এলিয়েনেশন' আর দ্বিতীয়টার জন্য 'এসট্রেঞ্জমেণ্ট'। বাংলাতেও 'বিযুক্তি', 'বিচ্ছিন্নতা', 'আত্মচ্যুতি' ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা সম্ভব। আমরা 'বিযুক্তি' শব্দই ব্যবহার করছি। এই 'বিযুক্তি'-র ধারণা **পারী পাণ্ডুলিপির** একেবারে কেন্দ্রীয় ধারণা। এই ধারণার সাহায্যেই মজুরি, শ্রম, মূলধন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ভূসম্পত্তি ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রসঙ্গগুলিকে এক জরুরি দার্শনিক চেহারায় উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই দার্শনিক উপস্থাপনার জন্যই প্রসঙ্গগুলি দার্শনিক নৃতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছে। সেই সূত্রেই ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক সম্পত্তি-কাঠামো ও তার সংলগ্ন অর্থনৈতিক গড়নের বিশ্লেষণে মানুষ, তার সত্তা ও চৈতন্য, তার আত্মবোধ, নিহিত মনুষ্যত্ব ও সমাজ-ইতিহাসের বিশেষ মুহূর্তে তার অবমূল্যায়ন ইত্যাদি প্রসঙ্গ অত্যন্ত জরুরি হয়ে ওঠে। শ্রম, মজুরি, মূলধন ও তার বিকাশের কাহিনী এই সূত্রেই মার্কসের হাতে বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশের এক পূর্ণাঙ্গ সমালোচনায় রূপান্তরিত হয়। এই কারণেই **পারী পাণ্ডুলিপির** পরে ১৮৫৯-এর **আ কনট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটীক অব পোলিটিকাল ইকনমি** এবং তারও পরে ১৮৬৭-তে **ডাস কাপিটাল**-এর প্রথম খণ্ডের প্রকাশকে আমরা এক নিরবচ্ছিন্ন বৌদ্ধিক বিকাশের ধারাতে দেখতে পারি।

কিন্তু এই নিরবচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গেই ঐ কথাটা আর একবার বিবেচনা করে দেখা দরকার। **পারী পাণ্ডুলিপি** যদি **পুঁজি**-গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয়বিহীনভাবে আমরা পড়ি তাহলে এর দার্শনিকতায় ঈষৎ বিভ্রান্ত হবার বিপদ আছে। বিশেষ করে 'বিযুক্তি'-র হেগেলীয় অনুষঙ্গে এ বিভ্রান্তি খুব স্বাভাবিক বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার আছে যে মার্কসের হাতে, ঐ তরুণ বয়সের মার্কসের হাতেও, এইসব প্রসঙ্গ বিস্তারে কোনো অতীন্দ্রিয়তার আভাস ছিল না। তাঁর পাণ্ডুলিপির xxii-সংখ্যক পৃষ্ঠায় 'বিযুক্ত শ্রম' শীর্ষক অংশের গোড়াতেই মার্কস লিখছেন, 'আমরা এ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রত্যয় থেকে শুরু করেছি। এই বিদ্যার ভাষা ও সূত্রগুলোকে আমরা মেনে নিয়েছি। আমরা ধরে নিয়েছি যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রম, পুঁজি ও ভূসম্পত্তি এবং মজুরি, পুঁজির লাভ ও জমির খাজনা ইত্যাদির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে—এবং অনুরূপভাবে শ্রমবিভাজন, প্রতিযোগিতা, বিনিময়মূল্যের ধারণা ইত্যাদি।' এইসব প্রত্যয় থেকে শুরু করে তিনি ইতিমধ্যেই এ পর্যন্ত দেখাতে পেরেছেন কীভাবে শ্রমিক (মোটা

হরফ আমাদের) পণ্যের স্তরে পরিণত হয় এবং বস্তুত কীভাবে সে সবচেয়ে দুর্গত এক পণ্যের চরিত্র অর্জন করে। বিযুক্ত শ্রম আলোচনার এই যাত্রাপথ নিশ্চিতভাবে ধারণাটিকে সমাজভূমিতে স্থাপিত করে। শ্রমিকের বিযুক্তি, শ্রমশক্তির পণ্যায়ন ও সংশ্লিষ্ট মানুষের অবমূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সমাজ-সংস্থান ও সম্পত্তির বিন্যাস কাঠামোর ফল। মার্কসের হাতে এই প্রক্রিয়া কোনো অতীন্দ্রিয়তায় আচ্ছন্ন নয় আর নয় বলেই এই বিযুক্তির ধারণাকে কেন্দ্রে রেখে মার্কস সমাজবিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ের সমালোচনে পৌঁছে যেতে পারেন। আবার বিযুক্তির ধারণা কেন্দ্রগত থাকছে বলেই ঐ সমালোচন এক মানবিক মাত্রা অর্জন করে। দার্শনিক নৃতত্ত্বের এই অনুষঙ্গ মাথায় না রাখলে শুধু 'পুঁজি' গ্রন্থের রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক পাঠ থেকে আমরা অ-মানবিক যান্ত্রিক মার্কসীয় তত্ত্বের ধারায় পৌঁছে যেতে পারি। এরকম যান্ত্রিক পাঠ থেকে ভুল অর্থে 'বৈজ্ঞানিক' মার্কসবাদের সৃষ্টি হতে পারে, সেই তত্ত্বকাঠামোয় মনে হতে পারে ইতিহাসের অনিবার্য এক অমোঘ পরিণতিতে আমরা সবাই অংশীদার। 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতিতে লভ্য ইতিহাসের সেই অনড় সূত্রসন্ধানই সমাজইতিহাস দর্শনের লক্ষ্য এবং আমাদের সামাজিক কর্মকাণ্ডকে তখন সেই 'বৈজ্ঞানিক' ইতিহাসের সূত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলাই হতে পারে বিপ্লবসাধনের ইতিকর্তব্য। মার্কসবাদের কোনো ব্যাখ্যাই ভবিতব্যবাদকে নিশ্চয়ই প্রশ্রয় দেয় না। প্লাতো, হেগেল ও মার্কসকে যাঁরা একাসনে বসিয়ে মুক্ত সমাজের পরম শত্রু বলে গণনা করেন তাঁরা হয়তো এ বিষয়ে একটু বেশি শঙ্কিত। তবে 'বৈজ্ঞানিক' মার্কসবাদের যান্ত্রিকতার ধরনে সমাজমানুষের সক্রিয়তা এবং সেই অর্থে তার মানবতা যে কিছুটা উপেক্ষিত তাতে সন্দেহ নেই। প্রয়োগের স্তরে বিশেষ রাষ্ট্রযন্ত্রের সমবায়ে যখন একটা সামগ্রিক অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্রের চেহারা ফুটে ওঠে তখন ঐ উপেক্ষা দার্শনিক দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। সেইজন্যেই ঐ কথাটা বলেছিলাম যে **প্যারী পাণ্ডুলিপি** আমরা 'পুঁজি' গ্রন্থের আগে পড়ছি না পরে পড়ছি সেটা জরুরি। অর্থাৎ, ঐ পাণ্ডুলিপি আর 'পুঁজি'-র মধ্যে আমরা খুব স্পষ্ট বড় রকমের কোনো ভেদরেখা কল্পনা করছি কিনা সেটা খুব জরুরি কথা। মার্কসীয় তত্ত্ববিকাশের নিরবচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গ এ কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। 'দুই মার্কস' বিতর্ক তাই এক সময়ে অনেককে মাতিয়েছিল।

আমাদের গ্রামশিচর্চার ধরতাই আমরা এখানে খানিকটা পেতে পারি। আমাদের রাষ্ট্রনীতির প্রেক্ষায় গ্রামশি কোথাও নেই। আমাদের সরাসরি গ্রামশিচর্চার যে-সামান্য ইতিহাস রয়েছে বা আমাদের ব্যাপক চিন্তাচর্চায় এখনো পর্যন্ত গ্রামশি-ভুবনের যেটুকু ব্যবহার তা খুবই প্রান্তিক, কোনো বিস্ফোরক অভিঘাতের তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু একটা কথা তা সত্ত্বেও মেনে নিতে হয় যে, আমাদের মার্কসচর্চায় 'বৈজ্ঞানিকতা' ও 'যান্ত্রিকতা'-র বিপ্রতীপ কণ্ঠস্বর আদৌ অশ্রুত নয়। এ বিষয়ে অসন্তোষ এখানে অনেক দিন ধরেই স্পষ্টভাবে ধ্বনিত। ষাটের দশকে যখন এখানে **প্যারী পাণ্ডু-**

লিপির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটছে তখনকার আলোচনা-সমালোচনা ও বাদানুবাদ একটা আবহ তৈরি করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। পঞ্চাশের দশকে অস্তিত্ববাদের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় ষাটের দশকের এই মার্কস-অনুষঙ্গী বিসম্বাদে তা তখনো তেমন করে মিশতে পারে নি এটা ঠিক। আরো কিছু পরে, মূলত সত্তর দশকের শেষ দিক থেকে আলতুসের-পন্থী স্ট্রাকচারালিস্ট মার্কসবাদের চর্চা ও তর্কবিতর্কের ভেতর দিয়ে মার্কস-প্রসঙ্গের বয়নে ও বাচনে যে ভিন্ন স্বরের একটা চাহিদা তৈরি হল এটুকু বলাই চলে। মার্কসীয় বাচনের চেনা প্রসঙ্গগুলির সঙ্গে আরো অনেক, কিছুটা নতুন ও বিস্তৃততর প্রসঙ্গের দিকে আমাদের নজর গেল। সমাজকাঠামো, সম্পত্তির বিন্যাস, বস্তুবাদ, উৎপাদন প্রক্রিয়া, শ্রেণী সংগ্রাম ইত্যাদি প্রসঙ্গের সঙ্গে এখন আস্তে আস্তে আমাদের আলোচনায় অন্তর্গত হয়ে গেল মানুষের স্বাধীনতা, তার সৃজনশীলতা, সমাজমানুষের স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রণ আর সেই সূত্রে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। গ্রামশি ঠিক এই জায়গাতে আমাদের চিন্তায় ও চর্চায় অন্তঃপ্রবিষ্ট হতে পারেন। আর তাতে আমাদের সমাজবীক্ষায় কিছুটা ব্যাপ্তি সম্ভব। বিশেষত, বর্তমানের বিশ্বব্যাপী তথ্যবিস্ফোরণের যুগে সমাজচিন্তায় এদিকে দৃষ্টি দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আজকের তথ্যনির্ভর পৃথিবী মাধ্যমের অভিনব ও বিচিত্র বিকাশের সুবাদে প্রায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ। ব্যয়বহুল উপগ্রহ প্রযুক্তির কল্যাণে সামরিক সম্ভার থেকে স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক ও পাঠক্রম পর্যন্ত ঘটে চলেছে এক অলক্ষ্য নীরব বিপ্লব। এর গতিপ্রকৃতি বিচিত্র, তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী, আমাদের চেনাজানা কোনো সমাজদর্শনেই হয়তো এর পুরো নাগাল পাওয়া যাবে না, যাবার কথাও নয়। বিকাশের এই স্তর, এ একেবারে আমাদের সময়ের বৈশিষ্ট্য। এর কোনো জুড়ি মার্কসের জগতে ছিল না, গ্রামশির জগতেও না, লেভি-স্ট্রোস বা সুস্থ অবস্থায় যতদিন বেঁচেও ছিলেন ততদিন পর্যন্ত আলতুসেরেরও ভুবনে সমাজবিকাশের এই পর্বের কোনো ছায়াপাত ঘটেনি। এ একেবারে আমাদের সময়ের নিজস্ব চ্যালেঞ্জ, আমাদের সময়ের সমাজবিজ্ঞানীর জন্য প্রয়োজন তাই এক নতুন বীক্ষা। সেই বীক্ষা অর্জনে অনেককেই আমরা হয়তো সহযোগী হিসেবে পেতে পারি, আপাদমস্তক না হলেও অন্তত অংশত। মিশেল ফুকো, নোঅম্ চোম্স্কি, জাক দেরিদা, রলাঁ বার্ত, পিয়ের বর্দিউ, সোন ম্যাকব্রাইড প্রমুখ এ কালের তাত্ত্বিকদের সঙ্গে যেমন মোকাবিলা করতে হবে, তেমনি স্ট্রাকচারালিজম-উত্তর পর্বের সমাজদর্শন, তার নতুন পদ্ধতিগত প্রত্যয় ও চিহ্নতত্ত্বগত একালের সমাজবিশ্লেষণের প্রকরণ ইত্যাদি সবকিছুর সঙ্গেই ঠাণ্ডা মাথায় বোঝাপড়ার প্রশ্ন আছে। গ্রামশি এর অন্যতম প্রকরণ, হয়তো অ-স্থির ; নিশ্চিত, স্থির, অনড় প্রতীতি গড়ে তোলবার কোনো দরকার নেই।

মার্কসের দর্শন আলোচনায় গ্রামশি একটা পদ্ধতির প্রশ্ন দিয়ে শুরু

করেছেন। কথাটা আমরা গোড়াতেই তুলেছিলাম। প্রসঙ্গটিকে একটু বিশদ-ভাবে বিবেচনা করা দরকার। গ্রামশির এই পদ্ধতির প্রশ্ন এমন কিছু জ্ঞানতাত্ত্বিক জটিলতায় জড়িত নয়। প্রশ্নটা খুব শাদামাটা। কিন্তু এর তাৎপর্য বেশ গভীর। গ্রামশি মার্কসকে এক নতুন বিশ্ববীক্ষার জনক হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর আলোচনা আরম্ভ করছেন। এই বিশ্ববীক্ষাই মার্কসবাদ, গ্রামশীয় ভাষ্যে কর্মকাণ্ডের দর্শন। এই বিশ্ববীক্ষার অন্তর্গত রচনাগুলিকে নিশ্চিত করে শনাক্ত করা দরকার। এখানেই সমস্যা। মার্কসের বেশির ভাগ রচনা বিশৃঙ্খল, অধিকাংশই তাঁর জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত, অনেক রচনা অসমাপ্ত। মার্কসের রচনা হিসেবে আমরা যা পাই তা সম্পাদিত, অনেক ক্ষেত্রেই সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন মার্কসের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও তত্ত্বসহচর এঙ্গেলস। প্রচলিত মার্কসচর্চায় রচনাবলির ক্ষেত্রে মার্কস ও এঙ্গেলস প্রায় অবিভাজ্য। এই অবিভাজ্যতাই গ্রামশির পদ্ধতিগত প্রশ্নের লক্ষ্য। তিনি চান মার্কসের রচনার কূটনৈতিক সংস্করণ, এটাই তাঁর মতে প্রাথমিক কর্ম। কোনো লেখকের রচনা যথাযথ, অর্থাৎ, লেখক ঠিক যেভাবে যা লিখেছিলেন তাই পরিবেশন করা কূটনৈতিক সংস্করণের কাজ। অনেক সময়েই এমন হতে পারে যে সুসম্পাদিত রচনা নানা বিচারে হয়তো উন্নততর, হয়তো অনেক বেশি পাঠযোগ্য, হয়তো আরো অনেক কার্যকরী। কিন্তু এর কোনো অবস্থাতেই সেই রচনা লেখক নিজে ঠিক যা লিখেছিলেন তার বিকল্প হতে পারে না। তাই প্রয়োজন পড়ে কূটনৈতিক সংস্করণের, তা যতই অগোছালো বা দুর্বোধ্য বা অসঙ্গতি দোষে দুষ্ট হোক না কেন। গ্রামশির পদ্ধতিগত সূচির প্রথম কাজ মার্কসের রচনাবলির জন্য নির্ভরযোগ্য কূট-নৈতিক সংস্করণ প্রণয়ন করা।

পদ্ধতিগত প্রস্তাব হিসেবে এ খুব নির্দোষ শাদামাটা সর্বজনগ্রাহ্য এক প্রস্তাব। কিন্তু সত্যিই কি প্রস্তাবটা অত শাদামাটা? গ্রামশির রচনায় এই প্রাসঙ্গিক অংশ একটু মন দিয়ে পড়লে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, মার্কস-এঙ্গেলস-এর তাত্ত্বিক অবিভাজ্যতাই গ্রামশির সমালোচনার লক্ষ্য। মার্কসের রচনার সঙ্গে এক সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে এঙ্গেলসের রচনার মিলন ঘটিয়ে যে মার্কসবাদ-চর্চার ধারা গড়ে উঠেছে গ্রামশি সেটাকেই ভাঙতে চাইছেন। বস্তুত, গ্রামশি যে সময়ে এই প্রস্তাব পেশ করছেন তখন (এমনকী কিছুটা পরিমাণে, বা কোনো কোনো মহলে এখনও) এর মধ্যে বেশ একটা কালা-পাহাড়ি ভাব ছিল। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর বিভাজন প্রস্তাব প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদী সংস্কারে বেশ বড় রকমের ধাক্কা। তিরিশের দশকে গ্রামশি যখন এসব কথা ভাবছেন তখন তো বটেই। তার পরেও। আশির দশকের গোড়ার দিকে মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস ইন্স্টিটিউট্-এর এক উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদল একবার এদেশ সফরে এসেছিলেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিক্রমার অঙ্গ হিসেবে তাঁরা যখন এই শহরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন তখন আলো-চনা প্রসঙ্গে এই বিভাজন নিয়ে তাঁদের প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নটা গ্রামশির

প্রসঙ্গ টেনেও নয়। মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা আলাদা করে বিচার করবার কোনো প্রয়োজন তাঁরা তখন স্বীকার করেন নি। এর অনেকটাই হয়তো তদানীন্তন সোভিয়েত মার্কসবাদের গৃহীত প্রত্যয়। এই অবিভাজ্যতা তাঁদের চিন্তায় ও মানসিকতায় অন্তত তখনো পর্যন্ত খুব দৃঢ়মূল। এই সংস্কারটা যে খুব সমালোচিতভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল তা হয়তো নাও হতে পারে, এর অনেকটাই হয়তো কালক্রমিক ধারাবাহিত। কিন্তু এই সংস্কার যে অনেকটাই প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদের অঙ্গীভূত তাতে সন্দেহ নেই। গ্রামশি সচেতনভাবে এই সংস্কারেই ধাক্কা দিতে চেয়েছিলেন এবং কাজটা যে কিছু পরিমাণে কালাপাহাড়ি এ কথাও তাঁর বোধে ছিল। ঈষৎ মার্জনা প্রার্থনার সুরে তিনি লিখছেন যে, এঙ্গেলসের অবদানকে ছোট করে দেখার যেমন কোনো প্রয়োজন নেই, তেমনি মার্কসের রচনার সঙ্গে এঙ্গেলসের রচনা এক করে দেখারও কোনো দরকার নেই এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলতে ভুলছেন না যে, অ-বিতর্কিত সততা সত্ত্বেও এঙ্গেলসের সম্পাদনার মধ্য দিয়ে মার্কসের রচনায় অবাঞ্ছিত কোনো কিছুর অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে গ্রামশি এ কথাটা বেশ স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন যে, প্রশ্নটা ব্যক্তিগত সখ্য, সততা বা কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতার নয়। গ্রামশির নিজের চিন্তা অনুধাবনের জন্য ঠিক এই জায়গায় আমাদের বুঝে নিতে হবে যে পদ্ধতির এই প্রস্তাব মূলত এক বিকল্প দার্শনিক প্রস্তাব। গ্রামশির প্রস্তাবের গুরুত্বও এখানে।

এই বিকল্প দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত বুঝে নিতে গেলে 'বৈজ্ঞানিক' মার্কসবাদের ধারাটাকে আরো একটু বিচার করে দেখতে হবে। মার্কসবাদের 'বৈজ্ঞানিকতা'-র দার্শনিক ভিত্তি মূলত এঙ্গেলসের রচনা এবং এ ব্যাপারে এঙ্গেলসের প্রধান দার্শনিক উপাদান হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তত্ত্ব। এঙ্গেলস মনে করতেন যে, প্রকৃতিবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে আমরা যেমন এক সুঠাম বৈজ্ঞানিক বর্ণনা পেয়ে যাই, তেমনি মানুষের সামাজিক জীবন ও তার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপ এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেতে পারি মার্কসের চিন্তাকাঠামোর সাহায্যে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তত্ত্ব আমাদের সেই নিশ্চিত বৈজ্ঞানিকতায় পৌঁছে দিতে পারে। কারণ, বিকাশমান জগতের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করবার জন্য দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সূত্র এক অমোঘ অস্ত্র। এই সেই সূত্র যার সাহায্যে জড় জগতের বিকাশপ্রক্রিয়াও মানুষের অধিগম্য হতে পারে। থীসিস-অ্যান্টিথীসিসের দ্বন্দ্ব ও তার নিরসনের মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়ে চলেছে বিশ্বচরাচরের জড়জাগতিক ঘটনাবলি ও মানুষের সমাজ-ইতিহাসের নানা উত্থানপতন। নিউটনীয় অভিকর্ষ তত্ত্বের মতো এমন এক সূত্র যেন আমাদের হাতে এসে গেল যাতে করে আমরা এমন বহু ক্ষেত্রকে এখন মিলিয়ে নিতে পারি যাদের মধ্যে ব্যবধান আপাতদৃষ্টিতে দুস্তর। প্রকৃতিবিজ্ঞানের পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান পর্যন্ত যেন একই সূত্রে গ্রথিত করা সম্ভব হতে পারছে। হেগেলের 'লজিক'-এর অন্তর্গত

দ্বন্দ্ববাদের ধারণা এঙ্গেলস-এর হাতে অনেকটাই শোধিত। এঙ্গেলস-এর নিজের বোধ অনুসারে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ যেন মানুষের চিন্তাজগতের ক্রম ও পরম্পরাকেই বস্তুজগতের ওপর আরোপ করে। যেন মানুষের চিন্তাজগৎ ও তার মেধা-মননের কাঠামোই বস্তুবিশ্বের নিয়ন্তা। বস্তুবিশ্ব যেন মানুষের এই অন্তর্জগতের প্রতিচ্ছবি। দ্বন্দ্ববাদের এই ভাববাদী ধরন এঙ্গেলস-এর হাতে অনেকটাই পরিবর্তিত রূপ পায়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর গবেষণার মধ্য দিয়ে এঙ্গেলস এই সত্যে পৌঁছতে চান যে বস্তুজগৎ ও গণিত ও জীবজগৎ সর্বত্রই বিকাশপ্রক্রিয়া বিবর্তিত হচ্ছে দ্বন্দ্ববাদেরই সূত্রানুযায়ী। অর্থাৎ দ্বন্দ্ববাদ আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত এক কল্পনাকাঠামো মাত্র নয়, যা কিছুটা অযৌক্তিকভাবে যেন আমরা বস্তুজগৎ ও বহির্বিশ্বের ওপর আরোপ করছি। এঙ্গেলস-এর পদ্ধতি অনুসারে হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদে এম্পিরিকাল বিজ্ঞান গবেষণার যেন সমর্থন নেই। তাই দ্বন্দ্ববাদের এই প্রয়োগে কিছুটা অযৌক্তিক আরোপ যেন অনিবার্য এবং দ্বন্দ্ববাদের এই উপস্থাপনা শুধুই দার্শনিক কল্পনার ফসল, এই প্রয়োগে দর্শন ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটতে পারছে না। এঙ্গেলস-এর বিজ্ঞান গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য বিজ্ঞান ও দর্শনের এই দ্বন্দ্ব নিরসন। বস্তুবিশ্বের প্রকৃতি ও স্বরূপ যে দ্বন্দ্ববাদ-নির্ধারিত এই বক্তব্যের প্রতিষ্ঠাই এঙ্গেলস-এর বিজ্ঞান গবেষণার প্রেরণা। আমাদের চিন্তাকাঠামো দ্বন্দ্ববাদী গড়নের বলে বস্তুবিশ্ব ঐরকম প্রতীয়মান হচ্ছে তা নয়, বস্তুবিশ্বই দ্বন্দ্ববাদী ধাঁচে বিকশিত হচ্ছে। স্থিতি বিশ্বের স্বরূপ নয়, নিয়ত স্ফুটনোন্মুখ বিকাশমান এই স্বরূপের উপযুক্ত বর্ণনার ভাষাই দ্বন্দ্ববাদ। এমনি এক যুক্তিপরম্পরার মাধ্যমে এঙ্গেলস বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সাযুজ্য সাধন করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর মৌলিক ও প্রধান গ্রন্থ ইংরেজিতে 'ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌ অব নেচার' নামে পরিচিত। এ বইয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন অধ্যায়, অংশ, নোট ইত্যাদির রচনাকাল ১৮৭৩ থেকে ১৮৮২। পূর্ণাঙ্গ বইটি এঙ্গেলস-এর জীবদ্দশায় কখনো প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রথম প্রকাশিত হয় জর্মন মূলে ও রুশ অনুবাদে ১৯২৫-এ। এ বইয়ের প্রকাশ অত বিলম্বিত হলেও দ্বন্দ্ববাদ বিষয়ে এঙ্গেলস-এর ধারণা যে একেবারে অজানা ছিল এর আগে তা নয়। এই বইয়েরই দুটো অধ্যায় আগে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৬ ও ১৮৯৮-এ। তা ছাড়াও সংলগ্ন বিষয়ে এঙ্গেলস-এর অন্য বই 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' এ বইয়ের অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৭৩ থেকেই এঙ্গেলস 'ডায়ালেক্‌টিকস্‌ অব্‌ নেচার'-এর জন্য গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। অন্যান্য নানা কাজে বারবার ছেদ পড়ায় সে বই শেষ হতে অনেক দিন সময় লেগেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে একটু জরুরি ভিত্তিতেই বিতর্কের খাতিরে এঙ্গেলসকে 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' বইটা শেষ করে ফেলতে হয়। এ বইয়ের প্রথম প্রকাশ ১৮৭৮।

অয়গেন ড্যুরিং ১৮৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে জর্মনির সোশাল ডেমোক্র্যাটিক মহলে বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন।

১৮৬৭-র ডিসেম্বরে ড্যুরিং-এর লেখা মার্কসের 'ডাস কাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ডের রিভিউ প্রকাশিত হবার পর থেকেই মার্কস ও এঙ্গেলস ওঁর সম্বন্ধে সমালোচনাত্মক মনোভাব পোষণ করতে থাকেন। ১৮৬৮-র জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে লিখিত তাঁদের চিঠিপত্রের মধ্যে এর পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৭৫ নাগাদ ড্যুরিং তাঁর রচনাবলির মধ্য দিয়ে বেশ খানিকটা পরিচিতি লাভ করেন ও তাঁর প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ছিলেন যোহান মোস্ট, ফ্রিডরিশ ফ্রিট্শে ও এডুয়ার্ড বের্নস্টাইন। এমনকী আউগুস্ট বেবেলও কিছু সময়ের জন্য তাঁর মতামতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এসব দেখেশুনে কার্ল লিবক্নেক্ট ১৮৭৫-এ এঙ্গেলসকে ড্যুরিং-এর মতামত সমালোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। সোশাল ডেমোক্র্যাটিক ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র ফোলক্স্টাট্-এ এঙ্গেলস তাঁর প্রথম ড্যুরিং সমালোচনার প্রবন্ধ লেখেন ১৮৭৬-এর ফেব্রুয়ারিতে। তারপর মার্কসের সঙ্গে পত্র বিনিময়ের পরে এবং মার্কসের সমর্থনেই তিনি ড্যুরিং-এর মতামতের আরো নিবিষ্ট সমালোচনায় ব্রতী হন। 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' গ্রন্থ এই প্রচেষ্টার ফল। ১৮৭৮-এর এই বইয়ের প্রথম ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৭-এ। ১৮৮০-তে পল লাফর্গ-এর অনুরোধে এই বইয়েরই তিনটি অধ্যায় নিয়ে একটি আলাদা পুস্তিকা প্রকাশিত হয় 'সোশালিজম : ইউটোপিয়ান অ্যান্ড সায়ান্টিফিক' এই নামে। প্রধানত এই পুস্তিকার মাধ্যমেই বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বিষয়ে এঙ্গেলস-এর ধারণা ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। বস্তুত, স্যাঁ-সিম*, ফুরিয়ের ও ওয়েন-এর সমাজতন্ত্রের ধারণা থেকে মার্কসীয় সমাজতন্ত্র যে আলাদা ঘরানার সে চিন্তার প্রকৃত ভিত্তি এঙ্গেলস-এর এই পুস্তিকা। 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' এই বৈজ্ঞানিক সমাজবাদেরই দর্শন এবং 'ডায়ালেকটিকস্ অব নেচার' সেই দর্শনের, অর্থাৎ ডায়ালেকটিকসের বিস্তৃত পরিচয়।

মার্কসের 'বৈজ্ঞানিকতা' যে শুধু সমাজতন্ত্রের বীক্ষাতেই সীমাবদ্ধ তা নয়। এঙ্গেলস-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তা আরো অনেক ব্যাপক। বস্তুত এঙ্গেলস মনে করেন যে মার্কসের আলোচনার পদ্ধতিই মূলত 'বৈজ্ঞানিক' এবং তখনকার সমসাময়িক বিজ্ঞানের পদ্ধতির সঙ্গে এর সাযুজ্য লক্ষ না করে উপায় নেই। এই পর্যায়ে এঙ্গেলস-এর অন্যতম বড় আশ্রয় চার্লস ডারউইন। ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিশ্চয়ই মার্কসীয় দর্শনের বিকাশের সময়কার এক বড় ঘটনা। মার্কসের 'কন্ট্রিবিউশন টু আ ক্রিটীক অব্ পলিটিকাল ইকনমি' আর ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিশীজ'-এর প্রকাশ একই বছরে, ১৮৫৯-এ। এঙ্গেলস সে বছরেই পড়ে ফেলেন ডারউইনের বই, মার্কস পড়েন বছর খানেক পরে। এই সময়কার চিঠিপত্র থেকে বুঝতে পারা যায় যে মার্কসের তুলনায় ডারউইনের তত্ত্বে ও পদ্ধতিতে এঙ্গেলস-এর উৎসাহ ছিল অনেক বেশি। ডারউইন বিষয়ে মার্কসের সপ্রশংস উল্লেখ আছে, তাঁর প্রতি মার্কস এক ধরনের শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই পোষণ করতেন, কিন্তু ডারউইনের

জীবজগৎ বিষয়ক গবেষণা আর সমাজজীবন বিষয়ক তাঁর নিজের গবেষণাকে মার্কস কখনোই একই ছাঁচে ঢেলে দেখতে চান নি। ডারউইনের গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির ইতিহাসে এক ধরনের জড়বাদের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, মার্কস এ পর্যন্ত মানতেও হয়তো রাজি ছিলেন। জীবজগৎ সৃষ্টি কিংবা তার বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তির পেছনে যে কোনো সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যমূলক হাত নেই, সেই অর্থে দূরান্বয়ী কোনো পরিণতির কল্পনা যে কোথাও নিহিত নেই ডারউইনের জীববিজ্ঞানের এদিকটা মার্কসের মনঃপূত ছিল। ডারউইনের চর্চায় জীবজগতের ক্ষেত্রে টেলস্-এর প্রত্যয়ে যে বড় ধাক্কা লেগেছিল এদিকটা মার্কসের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল একথা ঠিক। এ বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট উল্লেখও পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর নিজের গবেষণাকে, সমাজজীবনের রূপান্তর প্রক্রিয়াকে মার্কস কখনোই ডারউইনীয় ছাঁচে ফেলতে চান নি। পদ্ধতিগতভাবে এই সমীকরণকে তিনি ভুল বলেই মনে করতেন। মানুষের সমাজজীবনের ইতিহাসকে জড় প্রকৃতি ও জীবজগতের ইতিহাসের সমতুল কিংবা অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করলে যে মার্কসীয় পদ্ধতির মূল প্রত্যয়ে আঘাত লাগে এ বিষয়ে মার্কস বরাবর সচেতন ছিলেন। বস্তুত সমাজ-ডারউইন-বাদ, ইংরেজিতে যাকে সোশাল ডারউইনিজম বলে সে বিষয়ে মার্কস রীতি-মতো সমালোচনাত্মক মনোভাব পোষণ করতেন। 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' আর 'শ্রেণীসংগ্রাম'-এর ধারণাকে একাকার করা মার্কসের কাছে আদৌ গ্রাহ্য ছিল না। ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে মার্কস এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে ডারউইন তাঁর জীবজগতের প্রতিযোগিতার ছবিটা ঠিক যেন তাঁর সমসাময়িক ইংল্যান্ডের সমাজজীবনের প্রতিযোগিতার আদলেই সাজিয়েছেন। এতসব সত্ত্বেও কিন্তু মার্কস ও ডারউইনের মধ্যে এক পদ্ধতিগত ঐক্যে এঙ্গেলস-এর বিশ্বাস ছিল অটুট।

মার্কসের মৃত্যুর পরে তাঁর সমাধিক্ষেত্রের ভাষণে এঙ্গেলস বিশেষভাবে এই 'বৈজ্ঞানিকতা'র দিকে জোর দিয়েছিলেন। ১৮৮৩-র ১৭ মার্চ লন্ডনের হাইগেট সেমিট্রিতে এঙ্গেলস যখন মার্কসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করছিলেন তখন মার্কসের সারা জীবনের কাজকে তিনি বিজ্ঞানের অগ্রগতি হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলেন। এঙ্গেলস-এর মতে মার্কসের মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হল ইয়োরোপ ও আমেরিকার সংগ্রামী প্রলেটারিএট ও ইতিহাস-বিজ্ঞান-এর। 'ইতিহাস-বিজ্ঞান' বা এঙ্গেলস যাকে বলেছিলেন historical science, সেকথাটা কিন্তু তখন তেমন কিছু চালু কথা ছিল না। এখনকার দিনে কথাটা হয়তো খানিকটা পরিচিত। বিশেষত প্রাক্তন সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির অন্তর্ভুক্ত নানা বিদ্যা-ক্ষেত্রকেই যেমন বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করা হয়েছিল তেমনি ইতিহাসও অন্যতম বিজ্ঞান বলে সেখানে স্বীকৃত ছিল। সেই সূত্রেও ইতিহাসবিজ্ঞান কথাটা আজ নিশ্চয়ই খানিকটা বেশি পরিচিত। কিন্তু এঙ্গেলস যখন বলছিলেন তখন-কার ইতিহাস বীক্ষা ও ইতিহাস দর্শনে ইতিহাসের চর্চাক্ষেত্র ও পদ্ধতির

সঙ্গে বিজ্ঞানের চর্চাক্ষেত্র ও পদ্ধতির এক দুস্তর ব্যবধানই কল্পনা করা হত। সে হিসেবে এঙ্গেলস-এর historical science এই বর্ণনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত, সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির চিন্তা কি কিছুটা এঙ্গেলস-এর এই বর্ণনার কাছে ঋণী? শুধু এটুকুই নয়। ঐ ভাষণে মার্কসের তত্ত্বকাঠামোর প্রতিটি অঙ্গই এঙ্গেলস-এর বিচারে এক একটি 'আবিষ্কার'। ঠিক যেমন 'বিজ্ঞান'-এর ক্ষেত্রে আমরা আবিষ্কারের কথা বলি এও যেন তেমনি। মার্কসের প্রধান দুটি আবিষ্কার ছিল 'special law of motion governing the present-day capitalist mode of production,' এবং 'surplus value'। তত্ত্বকাঠামোর অঙ্গ হিসেবে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বিশেষ বিশ্লেষণ বা উদ্বৃত্ত মূল্যকে এক একটি আবিষ্কার হিসেবে কল্পনা করার পেছনে এঙ্গেলস-এর এক বিশিষ্ট মার্কস-বীক্ষা কাজ করছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেই বিশেষ বীক্ষা মার্কসীয় তত্ত্বকে 'বৈজ্ঞানিক' অভিধায় চিহ্নিত করেছিল। আর তাই মার্কস বিষয়ে এঙ্গেলস-এর এই উক্তি, 'Such was the man of science'। এই 'বৈজ্ঞানিকতা'র মেজাজেই এঙ্গেলস মার্কসকে ডারউইনের সঙ্গে এক পদ্ধতিগত ঐক্যে মিলিয়ে নিতে পারেন। এই ভাষণেই আমরা পেয়ে যাই এঙ্গেলস-এর অতি পরিচিত সেই অমোঘ বাক্য: 'Just as Darwin discovered the law of development of organic nature so Marx discovered the law of development of human history' জীবজগতের বিকাশে ডারউইনের তত্ত্ব ও মানুষের ইতিহাসের বিকাশে মার্কসের তত্ত্বকে একাসনে বসিয়ে এক ধরনের যান্ত্রিক মার্কসবাদের পথ প্রশস্ত করা হল।

আসলে মার্কস-ডারউইন প্রসঙ্গটা নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে, নইলে এ বিষয়টাকে অত বড় করে না দেখলেও হযতো চলত। দীর্ঘদিন ধরে এরকম একটা বিশ্বাস চালু ছিল যে মার্কস তাঁর কোনো একটা বই ডারউইনকে উৎসর্গ করার জন্য তাঁর অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। সম্ভবত **ডাস কাপিটাল**-এরই কোনো সংস্করণ। কিন্তু ডারউইন সবিনয়ে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। মার্কস ও ডারউইনের তত্ত্বচিন্তার সাযুজ্যের প্রসঙ্গেই কথাটা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ১৮৮০-র ১৩ অক্টোবর তারিখে লেখা ডারউইনের একটা চিঠি সোভিয়েত সূত্রে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১-এ। সেই চিঠিতে ডারউইন তার বিনীত প্রত্যাখ্যানের কথা লেখেন। সেই থেকে মার্কসের অনেক জীবনীতেই কথাটা এইভাবে বলা হয়ে আসছে যে মার্কসের অনুরোধ ডারউইন রক্ষা করতে পারেন নি এবং সেই কারণে **কাপিটাল**-গ্রন্থের কোনো সংস্করণই ডারউইনকে উৎসর্গ করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু পরবর্তীকালে অধ্যাপক লিউইস এস ফয়ার, শ্রীমতী মার্গারেট ফে ইত্যাদির গবেষণায় একথা প্রায় নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে মার্কস কখনো ডারউইনকে বই উৎসর্গ করার অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখেন নি এবং ডারউইনের ঐ প্রত্যাখ্যানও আদৌ মার্কসের প্রতি উদ্দিষ্ট নয়। এডওয়ার্ড

আভেলিং আজীবন ডারউইন অনুরাগী ছিলেন। তিনি এঙ্গেলস-এর মতোই, হয়তো বা আরো দৃঢ়তার সঙ্গে, মার্কস ও ডারউইনের তত্ত্বসাযুজ্যে বিশ্বাস করতেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধও আছে। তিনি মনে করতেন এই দুজনের তত্ত্বকাঠামো পরস্পর বিরোধী তো নয়ই, বরঞ্চ পরিপূরক। প্রাণীবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড আভেলিং তাঁর লেখা *The Student's Darwin* নামের বই ডারউইনকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। এই মর্মে লেখা আভেলিং-এর চিঠিরও (১২ অক্টোবর ১৮৮০) পরে সন্ধান পাওয়া গেছে এবং প্রকাশিত হয়েছে। ডারউইনের প্রত্যাখ্যানপত্র যতদূর অনুমান করা যায় আভেলিং-এর এই পত্রের উত্তর। অর্থাৎ, ১৮৮০-র ১৩ অক্টোবরের চিঠির প্রাপক মার্কস নন, তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা এলিয়ানোর-এর সঙ্গী এডওয়ার্ড আভেলিং। সম্ভবত মার্কসের কাগজপত্রের মধ্যে চিঠিটা পাওয়া গিয়েছিল বলে এত বড় একটা ভুল হতে পেরেছিল। মার্কস-ডারউইন তত্ত্বসম্পর্ক বিষয়ে তদানীন্তন চিন্তাও এই ভুলকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকবে।

মার্কসীয় তত্ত্বকে 'বিজ্ঞান' আখ্যা দেওয়া বা মার্কসের পদ্ধতিকে নিতান্ত 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতি বলে বিবেচনা করার পেছনে এক ধরনের উনিশশতকী জ্ঞানতত্ত্বের প্রভাব হয়তো লক্ষ করা যায়। এই জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিধিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লব্ধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান বলে স্বীকৃত, অন্তত অন্য-প্রকার 'জ্ঞান'-এর তুলনায় তার মর্যাদা বেশি। মোটামুটিভাবে রেনেসাঁস পরবর্তী ইয়োরোপের তত্ত্বভূমিতে এই চিন্তা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। কোপার্নিকাস-গালিলেওর জ্যোতির্বিদ্যা ও নিউটনীয় বলবিদ্যা এই প্রতিষ্ঠার পেছনে শক্তিশালী প্রভাব হিসেবে কাজ করছিল নিশ্চয়ই। বলবিদ্যার পদ্ধতি ও প্রকরণই এক অর্থে বিজ্ঞানের এবং সেই অর্থে তা জ্ঞানেরই আদর্শ হয়ে দেখা দিল। আস্থা, বিশ্বাস, সংস্কার ও কর্তৃত্বের বদলে এর মধ্য দিয়ে যুক্তির, মানুষের মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। যুক্তিবাদের এই যুক্তির মধ্যেই ইয়োরোপীয় আধুনিকতার বিকাশ। রেনেসাঁস ইয়োরোপ এই যুক্তিবাদের পথেই ক্রমে ক্রমে ধর্মের প্রভাবকে সরিয়ে সরিয়ে, চার্চের ক্ষমতাকে সংকুচিত করে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সার্বিক রাষ্ট্রের বদলে প্রজাতন্ত্র ও গণতান্ত্রিকতার ধারণার প্রসার ঘটিয়ে আঠারো শতকের এনলাইটেনমেণ্ট বা আলোকোদ্ভাসের যুগে পৌঁছতে পেরেছিল। আলোকোদ্ভাসিত এই যুগ শিল্পবিপ্লবেরও যুগ। নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া, নানা রকমের কলা-কৌশল ও প্রযুক্তির প্রাধান্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সূচিত হচ্ছিল বিজ্ঞানের অবিসংবাদিত অগ্রগতি। ঐ যুগে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তেমন করে দেখা দেয় নি, তা খুব স্বাভাবিকও ছিল না। তখনকার পরিপ্রেক্ষিতটা ছিল বিকাশের, বিস্তারের ও অগ্রগতির। সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরেই যে সমান-ভাবে একই রকম মসৃণ ছিল তা মোটেই নয়। বস্তুত, শিল্পবিপ্লবের তলায় তলায় নানারকমের সংঘাত ও সংঘর্ষ বরাবরই ছিল। সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটছিল এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বও তার মধ্য দিয়ে প্রকট হচ্ছিল।

আর একদিকে ছিল উপনিবেশবাদের বিস্তার; শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে তারও ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। কিন্তু শিল্পে অগ্রসর যেসব ইয়োরোপীয় সমাজ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পেরেছিল তারা তাদের অভ্যন্তরীণ শ্রেণী সংঘর্ষের ক্ষেত্রেও এর থেকে কিছু সুফল আদায় করতে পেরেছিল। বস্তুত সফল ঔপনিবেশিকতা অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ওপর অনেকটাই প্রলেপের কাজ করেছিল, অন্তত অনেক দিন পর্যন্ত। ফলে সম্পূর্ণ নির্দ্বন্দ্ব না হলেও আঠারো-উনিশ শতকী পরিপ্রেক্ষিত ছিল অনেকটাই উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত। প্রগতির ধারণা এই পরিপ্রেক্ষিতে যে খুব প্রশ্রয় পাবে তাতে সন্দেহ নেই এবং এই প্রগতির ধারণা খুব নিশ্চিতভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিনির্ভর। রেনেসাঁস ইয়োরোপের এই ঐতিহ্য অন্তত শ-চারেক বছর লালন করা গিয়েছিল। উনিশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত সমাজ ইতিহাসে নানা ওঠাপড়া ও দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের ইতিবৃত্ত পাওয়া গেলেও বিজ্ঞানের কোনো পদ্ধতিগত সংকট তেমন করে দেখা দেয় নি। জ্ঞানতাত্ত্বিক ভূমিতে বিজ্ঞানের মর্যাদার আসন গোটা উনিশ শতক জুড়ে অটুট ছিল। এই অবস্থা বিবেচনা করলে মার্কসীয় তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক' পাঠ খুব অস্বাভাবিক ছিল না। বিশেষত মার্কসবাদের প্রেক্ষায় একটা প্রায়োগিক লক্ষ্য তো অবশ্যই ছিল। সমাজ-রূপান্তর ও তার কর্মসূচি মার্কসীয় প্রকল্পের আবশ্যিক অঙ্গ। তাই লক্ষ্য সাধনে সফলতার ইঙ্গিত তত্ত্বপদ্ধতি থেকেই আহরণ করবার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এঙ্গেলস যখন মার্কসীয় তত্ত্বকাঠামোকে বিজ্ঞান হিসেবেই দেখতে চাইছেন তখন তার পেছনে এরকম মনোভঙ্গিও কাজ করে থাকতে পারে। ওঁদের সমাজতন্ত্র যে কোনো অলীক ইউটোপিয়া নয়, তা যথেষ্ট বাস্তব, 'বৈজ্ঞানিক'ভাবে নির্ধারিত, ইতিহাসের ক্রমবিকাশে অনিবার্য এক পর্যায় এরকম বার্তা এঙ্গেলস-এর সময়কালের রাজনীতিতে খুবই জরুরি ছিল।

মার্কস-এঙ্গেলস-এর সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতের আর একটা দিকও বিবেচ্য। কোনো তত্ত্বচিন্তাই তো ঠিক স্বয়ম্ভূ নয়। প্রতিটি তত্ত্বচিন্তার পেছনেই থাকে এক বা একাধিক প্রতিপক্ষ। অন্তত বড় মাপের কোনো তত্ত্বকাঠামোর একটা দায় থাকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের বা ক্ষেত্র বিশেষের প্রচলিত ধ্যানধারণাকে সরিয়ে নতুন কিছু চিন্তা, ধারণা বা প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা করা। সেই অর্থে যে-কোনো বড় তত্ত্ব প্রকল্প আসলে একটা দীর্ঘায়িত সংলাপ। এ সংলাপ সোজা ধরাবাঁধা পথে চলে সবসময়ে তা হয়তো নয়। এর বিভিন্ন পর্বে নানা কণ্ঠস্বরের ব্যঞ্জনা থাকতেই পারে, আর তাতেই অনেক সময়ে সংলাপের সমৃদ্ধি। মার্কসের তত্ত্বকাঠামোর প্রসঙ্গে উনিশশতকী পরিমণ্ডলে জর্মন দার্শনিক পটভূমিতে অনিবার্য প্রতিপক্ষ নিঃসন্দেহে হেগেল। ধ্রুপদী জর্মন দর্শনের যে-উত্তরাধিকার হেগেল পর্যন্ত প্রবাহিত মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তারই প্রবল প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মার্কসকে কত দূর পর্যন্ত হেগেলকে আত্মসাৎ করতে হয়েছিল সে বোধ তখনই অন্তত ওঁদের নিজেদের কাছে যথেষ্ট পরিষ্কার না থাকতেই পারে। পরবর্তী

কালের বিচারে এমনও মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, মার্কসের মধ্যে হেগেলের উপস্থিতি যতটুকু মাত্র ভাবতে আমরা অভ্যস্ত, বস্তুত সে উপস্থিতি হয়তো তার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল। হেগেলের লজিক-এর অন্তঃসার তত্ত্ব মার্কসের চিন্তাকাঠামোয় অনেকটাই অন্তঃপ্রবিষ্ট। মার্কস তাঁর নানা সমস্যাকে যেভাবে উপস্থিত করেন তার ধরনটাই যে অনেক সময়ে হেগেল থেকে তুলে নেওয়া একথা আমরা অনেক সময়ে খেয়াল রাখি না। হেগেলের ইতিহাস দর্শন আর মার্কসের ইতিহাস দর্শন নিশ্চয়ই এক নয়। কিন্তু উনিশ শতকের এম্পিরিসিজমের প্রবল প্রতাপের মধ্যে দাঁড়িয়েও মার্কস কিন্তু তাঁর ইতিহাসবীক্ষাকে নির্ভুলভাবে হেগেলীয় ইতিহাসবাদিতার ভূমিতে স্থাপিত করেছিলেন। মার্কসের ইতিহাস প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল সমাজ সামগ্রিকের সমগ্রতায় মানব অভিজ্ঞতাকে বুঝে নেবার চেষ্টা করা, ব্যক্তিবিচ্ছিন্ন চূর্ণ রূপের কোনো এম্পিরিকাল বিজ্ঞানের আদলে একে সাজানো চলে না। আবার একথাও তো ঠিক যে, এই হেগেলীয় উত্তরাধিকার সত্ত্বেও মার্কসের কুললক্ষণ হেগেল থেকে আলাদা করে না চিনতে পারলে দুজনের প্রতিই অবিচার করা হবে। হেগেলীয় পদ্ধতি ও প্রত্যয়ের অনেক কিছুকে আত্মস্থ করে নিয়ে মার্কস তাঁর সমাজবীক্ষায় যে পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন তা হেগেলের নাগালের বাইরে ছিল। সমাজরূপান্তরের লক্ষ্যে মানুষের চৈতন্য ও তার কর্মসিদ্ধিকে নিয়োজিত করবার যে তত্ত্বসন্ধান আমরা মার্কসে পাই, চৈতন্যের ওপরে অত জোর সত্ত্বেও হেগেলীয় দর্শন কখনোই আমাদের সে দিশা দিতে পারে না। হেগেল ও মার্কসের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কের জন্যই তত্ত্ববিচারের ক্ষেত্রে একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। নানা ঐতিহাসিক ও দার্শনিক কারণের সমবায়ে হেগেল ও মার্কসের সম্পর্ক বুঝতে গিয়ে আমাদের বোধের ক্ষেত্রে জোরটা কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে একটু বেশি পড়ে যেতে পারে। মার্কসীয় শিবিরের প্রধান সেনানী হিসেবে লড়তে গিয়ে এঙ্গেলস-এর ক্ষেত্রে হয়তো এরকম কিছু একটা ঘটেছিল। অন্তত ঘটে থাকা খুব অস্বাভাবিক ছিল না। এঙ্গেলস-এর সমসাময়িকতার পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁদের সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতির খাতিরে ও সম্ভবত নানা সাংগঠনিক কারণেও এঙ্গেলস-এর নজরে মার্কসের তত্ত্বক্ষেত্রে 'বৈজ্ঞানিকতা' খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এতে করে হেগেল থেকে মার্কসকে দূরে রাখা খুব সহজ ছিল। শুধু দার্শনিক গুরুত্ব নয়, এই দূরত্বের বেশ খানিকটা রাজনৈতিক তাৎপর্যও ছিল। 'বৈজ্ঞানিকতা'র সূত্রে বিধৃত মার্কসীয় ইতিহাস দর্শন সমাজরূপান্তরে অনেক বেশি নিশ্চিত দিশা দেখাতে পারে। অন্তত এই রকমটা ভাবতে চাওয়া হয়েছিল 'বৈজ্ঞানিক' মার্কসবাদের প্রত্যয়ে, সেটাই ছিল অনেক 'বৈজ্ঞানিক' মার্কসবাদীর প্রতীতি। অনেকেই হয়তো এঙ্গেলসকে এই ঘরানার মার্কসবাদের উৎসপুরুষ হিসেবে কল্পনা করতে অভ্যস্ত। বাস্তব রাজনীতির সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে এই ঘরানার মার্কসবাদই দার্শনিক প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেতে বসেছিল।

গ্রামশি যখন মার্কসের রচনাকে এঙ্গেলস-এর সম্পাদকীয় ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে আলাদা করে চিনে নিতে চাইছেন, তিনি যখন মার্কস-রচনাবলির কূটনৈতিক সংস্করণের দাবি জানাচ্ছেন, তখনই আমরা অনুমান করে নিতে পারি যে তিনি বোধ হয় ভিন্ন কোনো মার্কসবীক্ষার দিকে এগোতে চলেছেন। মনে রাখতে হবে গ্রামশির ভুবন এঙ্গেলস-এর ভুবন থেকে আলাদা, বেশ অনেকটাই আলাদা। তাঁর দার্শনিক পরিমণ্ডল খুব নিহিত কোনো অর্থে এঙ্গেলস থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, তাঁর রাজনীতির দৈনন্দিনতার চেহারাও এঙ্গেলস-এর দিনের থেকে অনেক আলাদা। গ্রামশি বিশ শতকের মানুষ, তাঁর পরিণত রচনা দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের, রুশ বিপ্লব গ্রামশির ব্যক্তি অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত, লেনিনোত্তর রুশ সমাজের পরিণতির কিছু কিছু ঝোঁক তখন ফুটে উঠছে এবং গ্রামশির দৃষ্টিতে তার অনেক কিছুই ধরা পড়ছে। রুশ সমাজ ও অর্থনীতির পুনর্গঠনে আমলাতান্ত্রিকতার বেড়াজালের বিপদ গ্রামশি কিছু কিছু আঁচ পাচ্ছেন, উৎপাদন ভিত্তির ব্যাপক বিস্তার ও নির্দেশনামাভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার সীমাবদ্ধতা বিষয়েও তিনি ক্রমশ উদ্বিগ্ন বোধ করছেন। বিশ শতকের বিজ্ঞান ও দর্শনের পরিমণ্ডলে উনিশ শতকী নিশ্চিতির বোধ অপসৃত। বিজ্ঞানের মর্যাদার আসন ততদিনে অনেকখানি টলে গেছে। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব, কোয়ান্টাম বলবিদ্যা, অনিশ্চয়তার সূত্র ও সম্ভাবনা তত্ত্বের নতুন বিকাশের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের চেহারায় আমূল পরিবর্তন আসছে এই শতকে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ জড় জগতের ছবিতে অনেক অদলবদল ঘটিয়ে দিয়েছে। নিউটনীয় বলবিদ্যার সুঠাম বিন্যস্ত চেহারা বিশ শতকের বিজ্ঞানীর কাছে আর সর্বতো-গ্রাহ্য থাকছে না, পদার্থের মৌল চরিত্র নিয়েই দেখা দিচ্ছে দ্বিধা ও সংশয়। পদার্থের কণা চরিত্র ও তরঙ্গ ধর্ম বিষয়ে যে বোধ ক্রমশ গড়ে উঠছিল বিশ শতকী বিজ্ঞানে তা আর ধ্রুপদী বলবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ থাকছিল না। একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী পি এ এম ডিরাক-এর এক সংক্ষিপ্ত ভাষ্য উদ্ধৃত করা যাক :

> 'পদার্থবিদরা তাঁদের বিষয়ের গাণিতিক ভিত্তি সম্বন্ধে যে-ধারণা এত-দিন পোষণ করেছেন বর্তমান শতাব্দীতে সে-ধারণায় এক গভীর পরি-বর্তন দেখা দিয়েছে। এতদিন তাঁরা মনে করতেন যে নিউটনীয় বল-বিদ্যার সূত্র থেকেই জড়জগতের যাবতীয় দৃশ্যমান ঘটনাবলির বর্ণনার মূলসূত্র পেয়ে যাওয়া যাবে এবং তাত্ত্বিক পদার্থবিদের কাজ হবে ঐ সূত্রগুলিকে যথাযথভাবে প্রণালীবদ্ধ করে নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। নিউটনীয় ও অন্যান্য ধ্রুপদী সূত্রসমূহের যে-সব ক্ষেত্রে পরীক্ষা-মূলক সমর্থন পাওয়া গেছে তার বাইরে তারা আদৌ কেন প্রযোজ্য হবে তার কোনো ন্যায়তাত্ত্বিক যুক্তি যে নেই এ কথাটা স্পষ্ট হবার পরে এই বোধও জাগ্রত হল যে, এইসব সূত্র থেকে সত্যিই সরে আসা দরকার হয়ে পড়েছে। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার পদ্ধতির মধ্যে নতুন ধরনের

পার্শিতিক কাঠামো, স্বতঃস্বীকার্যের নতুন ধারা ও এগুলিকে নাড়াচাড়া করার নতুন নিয়মকানুন প্রবর্তনের মধ্যে এই সবে আসারই প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

'শক্তিকণাবাদ বা কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এইসব নতুন ধারণার এক ভালো দৃষ্টান্ত।' [**দ্য প্রিন্সিপলস্ অব কোয়ান্টাম মেকানিকস্**, অক্সফোর্ড, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৭, পৃ. ১৪]

এর পরে ডিরাক বেশ সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে এবং কেন এইসব নতুন ধারণার অনেক কিছুই আসলে ধারণা জগতের বিপ্লবের মতো। ধ্রুপদী বলবিদ্যার চোখে জড়জগৎকে আমরা যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম সেই অভ্যাসকে অনেক জায়গায় আমূল বদলে নিতে হচ্ছে। নইলে প্রকৃতির জগতে যা কিছু ঘটছে তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না এবং নিউটনীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে এক মহাসূত্রের চাবিকাঠি আমাদের হাতে এসে গেছে এই নিরাপদ বিশ্বাসে বেশ ধাক্কা লাগল। গ্রহনক্ষত্রের জগৎ আর অণুপরমাণু ও ইলেকট্রন-প্রোটনের জগৎকে কিছুতেই এক সূত্রে মেলানো যাচ্ছিল না। তাই এই শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের অস্বস্তি, গত শতাব্দীর মতো সবকিছু অত নিরুপদ্রব, সুশৃঙ্খল ও সংহত নয়। এই শতাব্দীর বিজ্ঞানে এইভাবে দেখা দিল এক সংকটের বোধ। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'বিজ্ঞানের সংকট' প্রবন্ধে পাই: 'কাজেই আজ বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছে যে, যত স্বতঃসিদ্ধ ও অনুমানের উপর বিজ্ঞানের এতবড় ইমারত খাড়া করা হয়েছে, তার ভিত্তিগুলো ভালো করে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। নিয়মগুলির কতটা বা বৈজ্ঞানিক সত্য, কতটা বা আমাদেরই মনের বৈজ্ঞানিক কাঠামো তৈরি করার ন্যায়সঙ্গত প্রয়াস, সে-বিষয়েও অনুসন্ধান চলছে।' [**বিজ্ঞানের সংকট ও অন্যান্য প্রবন্ধ**, কলিকাতা ১৯৪০, পৃ. ১১-১২] বিশশতকী বিজ্ঞানের এই সংকটের চেহারাও নিশ্চয়ই খুব সরল একমাত্রিক কোনো ব্যাপার নয়। সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বিভিন্ন দিক থেকে এই সংকটের খানিকটা পরিচয় দেবার চেষ্টা আছে। আলোর প্রবাহ এবং আলোর উৎপত্তি ও বিনাশ যে আলোর একই চরিত্রের সাহায্যে আলোচনা করা আর সম্ভব হচ্ছে না এই বোধ ধ্রুপদী মনোভঙ্গির কাছে খুব সহজগ্রাহ্য হবার কথা নয়। প্রবাহের ক্ষেত্রে তরঙ্গধর্মের ব্যবহার আর উৎপত্তি ও বিনাশের ক্ষেত্রে কণা চরিত্রের প্রত্যয় এই দুইই নতুন বিজ্ঞান-চেতনায় যুগপৎ মেনে নিতে হচ্ছে। বিশ শতকের বিজ্ঞানও এমনি নানাভাবে আমাদের মনের দরজাগুলো খুলে নিতে বাধ্য করছে। নতুন ধরনের তত্ত্ব-বিশ্বের সঙ্গে ক্রমশ অভ্যস্ত হতে হচ্ছে।

বিজ্ঞানচিন্তার এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামশির পক্ষে বিজ্ঞানের দোহাই মানা খুব স্বাভাবিক বোধ হয় ছিল না। উনিশশতকী বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্থিরতার বা নিশ্চিতির যে-বোধ তৈরি হয়েছিল বিশ শতকের সংকটের মধ্য দিয়ে সেই বোধ অনেকটাই ভেঙে যাচ্ছিল। জ্ঞানতাত্ত্বিক অর্থে বিজ্ঞান যে প্রশ্নাতীত মর্যাদার আসনে বসেছিল বিশ শতকে এসে সেই অবস্থায় বেশ পরিবর্তন দেখা

দিল। গ্রামশি কতটা সচেতনভাবে সেই সংকটে সাড়া দিয়েছিলেন, তত্ত্ব-দর্শনে তাঁর নিজের প্রস্থানভূমি সেই অনুসারে কতটা তিনি বদলে নিয়েছিলেন প্রশ্নটা ঠিক এভাবে তুলে কোনো লাভ নেই। এটা মূলত কোনো মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নয়। আমরা যেটা বলবার চেষ্টা করছি তা এই যে মার্কসের তত্ত্ব-কাঠামোর প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের কথা ভাবতে গিয়ে এঙ্গেলস যে মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন গ্রামশির মনোভঙ্গি তার থেকে আলাদা। এঙ্গেলস-এর কাছে যা সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, গ্রামশির কাছে তা সমাজরূপান্তর ও কর্মকাণ্ডের দর্শন। এবং এই বিন্দু থেকে যাত্রা করে গ্রামশি এঙ্গেলস-এর ধরন থেকে অনেক দূরে সরে যেতে চাইছেন। বস্তুত, এঙ্গেলস-এর উচ্চারণে আমরা যে 'বিজ্ঞান', 'বৈজ্ঞানিক', 'আবিষ্কার' ইত্যাদি প্রয়োগের উল্লেখ করেছি, সেই প্রসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা ভালো যে এক অর্থে এই ব্যবহারও কিন্তু হেগেলীয় ঐতিহ্যের খুব কাছাকাছি। হেগেলের 'লজিক', তাঁর 'অধিকারের দর্শন' প্রভৃতি আলোচ্য বিষয়গুলিকে তিনি নিজেই চিহ্নিত করেন 'লজিকের বিজ্ঞান', 'অধিকারের বিজ্ঞান' ইত্যাদি নামে। কিন্তু একটু নিবিষ্ট মনে লক্ষ করলে এ রকম মনে করা যেতে পারে যে, 'বিজ্ঞান' এই ধারণা হেগেল ও এঙ্গেলস ঠিক একই অর্থে ব্যবহার করছেন না। হেগেলের হাতে 'বিজ্ঞান'-এর এই ব্যবহার অনেক বেশি সাধারণ অর্থে, প্রণালীবদ্ধ, যুক্তিসিদ্ধ যে-কোনো আলোচনাই এখানে 'বিজ্ঞান' এই অভিধার যোগ্য। এই 'বিজ্ঞান' নিজেকে আর একটা কোনো ধরন থেকে আলাদা করে স্থাপিত করছে না। এঙ্গেলস-এর ব্যবহারের 'বিজ্ঞান' অনেক বেশি দৃষ্টবাদী ধারণায় সম্পৃক্ত। এই 'বিজ্ঞান' বিজ্ঞান নয় এমন কিছু থেকে নিজেকে শুধু আলাদা করে স্থাপিত করে তাই নয়, তার দাবিও কিছু বেশি। তার আসন ঐ অ-বিজ্ঞানের তুলনায় একটু উঁচুতে, সেই অ-বিজ্ঞান কখনো ইউটোপিয়া কখনো বা ভাববাদ। ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রের তুলনায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্থান উঁচুতে, ভাববাদী দর্শনের তুলনায় বস্তুবাদের স্থান উঁচুতে, কারণ তা বৈজ্ঞানিক। এবং তা যে বৈজ্ঞানিক তারই তো প্রমাণ ছড়িয়ে আছে গণিত থেকে জড় জগৎ থেকে জীব জগৎ পর্যন্ত সর্বত্র। মার্কস তত্ত্বের এই বীক্ষায় গ্রামশি আদৌ শরিক নন।

গ্রামশির মার্কস জিজ্ঞাসার পথ যে আলাদা তার মধ্যেঃবাস্তব রাজনীতির মাত্রাও হয়তো লক্ষ করা যেতে পারে। এই দার্শনিক মাত্রার দিকে নজর ফেরানো কিন্তু খুব জরুরি। বস্তুত সেই দৃষ্টিভঙ্গি আগে বুঝতে পারলে তারই আলোতে গ্রামশির বাস্তব রাজনীতির অনেক প্রত্যয় ও অবস্থানকে কিছুটা হয়তো অনুধাবন করা সম্ভব। যে-কোনো বড় মাপের দর্শন ও দার্শনিককে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রকমে পড়া যায়। একই দর্শনকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে দেখার, তার থেকে নানা ধরনের তাৎপর্য আহরণ করবার অনেক নজির আছে চিন্তার ইতিহাসে। গ্রামশির মার্কস পাঠের প্রসঙ্গে এই নানা বৈচিত্র্যের সম্ভাবনার কথা মাথায়

রাখা দরকার। কারণ গ্রামশির মার্কসপাঠ শুধুমাত্র প্রচলিত মার্কসপাঠের সঙ্গে যোগ বিয়োগের ব্যাপার নয়। এমন নয় যে গ্রামশি মার্কসের কোনো একটা প্রসঙ্গের ওপর জোর কিছুটা কমিয়ে দিচ্ছেন বা অন্য কোনো প্রসঙ্গের ওপর জোর একটু বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এ রকম কমানো বাড়ানো নিশ্চয়ই ঘটছে, কিন্তু সে সবই ঘটছে এই কারণে যে গ্রামশির মার্কসপাঠের মধ্য দিয়ে মার্কসতত্ত্বের একটা আলাদা ধরনের আদর্শ তৈরি হচ্ছে। এমনও নয় যে এই আলাদা আদলের সব কিছুই একেবারে আনকোরা নতুন। কোথাও কোনো ঐতিহ্য ছিল না, কোনো পরম্পরা আগত ধারা ছিল না, হঠাৎ ভুঁই-ফোড় একটা চিন্তা তৈরি হল তা তো আর হয় না। তাই বিচার বিবেচনার জন্য এক একটা চিন্তাসূত্রকে বহমান কোনো ধারার মধ্যে স্থাপিত করে দেখতে হয়।

পাশ্চাত্য চিন্তার নানা ক্ষেত্রে আঠারোশতকী আলোকোদ্ভাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আলোকোদ্ভাস পর্বের খুব সফল প্রকাশ আঠারো শতকের ফ্রান্সে। এনলাইটেনমেণ্ট নামে খ্যাত এই কালপর্বে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও তারই সহযোগী হিসেবে সমাজসংগঠনের ক্ষেত্রে এক বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিল। যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই সব রকম জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্ঞানতাত্ত্বিক আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি পেল। প্রকৃতি, সমাজ ও জীবনের নানা অধ্যায়ের শেষ চাবিকাঠি যেন এই পর্বে মানুষের করায়ত্ত হয়ে গেছে। সম্ভাব্য জ্ঞানের একটা চরম পরিণত রূপ যেন হাতে পাওয়া গেছে। শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে সেই স্থির রূপবন্ধ জ্ঞানভাণ্ডারকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। সমাজরূপান্তরের দিশাও এখানে। এই সমাজকল্পনায় উঁচু-নিচু, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন ইত্যাদি ভাগাভাগি খুব স্পষ্ট। রূপান্তরের পন্থাই হবে জ্ঞানের পথে, যুক্তির পথে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পথে, শিক্ষাবিস্তার ও সাক্ষরতা প্রসারের পথে সেই রূপবন্ধ কোনো নির্দিষ্ট আধারে ধৃত জ্ঞানকে আপামর প্রসারিত করা। আঠারো শতকের ফ্রান্সে দিদেরোর বিখ্যাত এনসাইক্লোপিডিয়া আন্দোলন এমনি কোনো আদর্শপ্রাণিত, ঐ এনসাইক্লোপিডিয়া-ই হতে পারে সেই জ্ঞানের আধার। ঐ কোষগ্রন্থ হতে পারে বহুব্যাপী বা এমনকী সর্বব্যাপী, জ্ঞানের রাজ্যের যা কিছু তা সবই ধরা থাকতে পারে ঐ আদর্শ কোষগ্রন্থে। এই মনোভঙ্গিতে প্রচার ও আন্দোলনের ভূমিকা খুব বড়। আর সেই সূত্রে প্রচারক ও আন্দোলনকারীর ভূমিকাও খুব জোরালো। এই আন্দোলন সংগঠন করা, এই প্রচারকার্যকে সংহতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এইসব প্রসঙ্গে কোনো এক অর্থের নায়কের ভূমিকাও বেশ জরুরি হয়ে ওঠে। সেই নায়ক হতে পারেন সমাজের সর্বাপেক্ষা বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিটি, কিংবা সমাজপ্রধানদের কোনো গোষ্ঠী, কিংবা কোনো নায়কোচিত গুণ-সমন্বিত রাজপুরুষ, অথবা কোনো রাজনৈতিক দল। এই দলকে হতে হবে অগ্রগণ্য, অবশ্যই তা হবে যুক্তিসিদ্ধ, হয়তো বা গণতান্ত্রিক; কেন্দ্রীভূত

সর্বব্যাপী ক্ষমতার অধিকারী হওয়া বা করে তোলা ব্যাপারটি হয়তো বিচ্যুতি। ঐ বিচ্যুতির আলোতে আলোকোজ্জ্বলভাসের দর্শনকে দেখে কোনো লাভ হবে না। কারণ, প্রশ্নটা এই যে ক্ষমতা সর্বব্যাপী হোক আর না হোক তথ্য ও তত্ত্ব, জ্ঞান ও প্রযুক্তি এ সবেরই কিন্তু প্রবাহটা হচ্ছে একদিকে। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট আধারে ধৃত রূপবন্ধ জ্ঞান আমারই হাতে আছে যেন- আমারই কর্তব্য সমাজরূপান্তরের স্বার্থে সেই শিক্ষা সংস্কৃতি জ্ঞানকে সবার মধ্যে, জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। গ্রামশির রচনায় 'দিরিজেন্‌তে' শ্রেণীর প্রসঙ্গে কারো মনে হতেই পারে যে এই রকম আলোকো-জ্জ্বলভাসিত ছকের একটা আদল যেন সেখানে কাজ করছে। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে লক্ষ করলে চোখে পড়া উচিত যে, গ্রামশির আদল মূলত এই আলোকোজ্জ্বলভাসিত আদল থেকে আলাদা। বস্তুত গ্রামশির মার্কসপাঠের একটা বৈশিষ্ট্য ঐ আদল ভেঙে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা। এই প্রসঙ্গে মার্কসের নিজের মধ্যে ঐ আদল কতটা দৃঢ়মূল ছিল বা ছিল না সে কথাও তেমন জরুরি নয় ; বেশি জরুরি এই কথাটা যে মার্কসপাঠের এমন কোনো কোনো ঘরানা গড়ে উঠেছিল যেখানে ঐ আলোকোজ্জ্বলভাসিত চিন্তার ধরনটা কাজ করেছিল বেশ নিহিতভাবে। গ্রামশির প্রকল্প এই আদল ভেঙে বেরিয়ে আসা। সেই প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত কোথাও কোথাও পুরনো আদলের কিছু রেশ রয়ে গিয়েছিল কিনা সে তো অন্য বিচার।

আধুনিক চিন্তার ইতিহাসে আলোকোজ্জ্বলভাসিত দর্শন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এরই ঘনিষ্ঠ সহযোগী বিজ্ঞানবাদ ও দৃষ্টবাদী দর্শন। এর প্রতিটির ক্ষেত্রেই নিশ্চয়ই নানা ধারা-উপধারা বর্তমান। কোনো একটা সাদামাটা কথা বলতে গেলেই এক ধরনের সরলীকরণের আশঙ্কা থেকে যায়। তবুও এটুকু বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, এই সব সহযোগী চিন্তা-ধারার মধ্যে এক রকমের একটা সাধারণ মনোভঙ্গি লক্ষ করা যেতে পারে। এই মনোভঙ্গিতে 'যুক্তি', 'সত্য', 'প্রগতি' ইত্যাদি ধারণার অগ্রাধিকার। পদ্ধতি হিসেবে যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ, পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সত্য-নির্ধারণ, মৌলিক কোনো কর্তৃত্বের অস্বীকার ইত্যাদি এই মনোভঙ্গির বিশেষ চরিত্র। চিন্তার এই ধরনে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিকে জড় জগতের বাইরেও, মনুষ্যজীবন, তার নৈতিকতা, তার সমাজ-ইতিহাসের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করবার একটা লক্ষ্য থাকে। এই অর্থে চিন্তার এই ধারায় বিজ্ঞানের কিছুটা দাপট ধরা পড়ে। খুবই স্বাভাবিক যে চিন্তার ইতিহাসে এর বিপরীত ধারাটাও বেশ জোরালোভাবেই গড়ে উঠেছে। বস্তুত যুক্তিভিত্তিক এই চিন্তাধারার পরিপন্থী যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে তারও ভেতরে নানা ধারা-উপধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিকল্প ধারাও যৌক্তিকতাবাদের তুলনায় কিছু কম সমৃদ্ধ নয়। ইসাইয়া বেরলিন-এর 'দ্য কাউন্টার এনলাইটেনমেন্ট' নামের প্রবন্ধ শুরুই হচ্ছে এভাবে : 'Opposition to the central ideas of the French Enlightenment, and of its allies and

disciples in other European countries, is as old as the movement itself.' [**এগেইনস্ট দ্য কারেন্ট**, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪০, পৃ. ১]

একথা তো সুবিদিত যে আলোকোদ্ভাসিত বিজ্ঞানভিত্তিক যৌক্তিকতাবাদী ধ্যানধারণার প্রতিপক্ষ হিসেবে এক সময়ে ধর্ম ও সংগঠিত ধর্মসংঘের ভূমিকা ছিল প্রবল। কিন্তু শুধুমাত্র এইটুকু নয়। আলোকোদ্ভাসিত মনোভঙ্গির সমালোচনাত্মক যে-ধারা তার দিগ্‌দর্শন ও অনুপুঙ্খ আরো অনেক জটিল। ধর্মের দিক থেকে শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বের অস্বীকৃতির যে-কোনো প্রচেষ্টাকে যে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হবে এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু যৌক্তিকতাবাদের বিস্তারের মধ্যে যে আর এক ধরনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা লক্ষ করা যায় তার সমালোচনাও খুব জরুরি। মানুষের নৈতিকতা ও সমাজ-ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক ঐ পদ্ধতির সরাসরি প্রয়োগে এক ধরনের যান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়; এবং এই যান্ত্রিকতার আধিপত্যে মানুষের স্ব ইচ্ছা, স্বাধীনতা, তার নানা সম্ভাব্য বৈচিত্র্য নিতান্ত কোণঠাসা হয়ে পড়তে পারে। এবং এই প্রকরণের সমাজ-ইতিহাস ও তার বিশ্লেষণ অনেক নীরক্ত ও বিবর্ণ। এরকম একটা বোধ থেকে আলোকোদ্ভাসিত দর্শনের যে-সমালোচনা গড়ে উঠেছে তার অন্যতম পুরোধা ইতালির অন্তর্গত নাপোলির দার্শনিক জিয়ামবাত্তিস্তা ভিকো (১৬৬৮—১৭৪৪)। কার্তেজীয় ধারা থেকে পশ্চিমি চিন্তায় যে-ধরনটা গড়ে ওঠে ভিকোর সমালোচনা সেখান থেকেই শুরু। *cogito ergo sum* (আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি) এই সুবিখ্যাত কার্তেজীয় সূত্র ভিকোর সমালোচনার অন্যতম লক্ষ্য। এই সূত্রের মধ্যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগতভাবে আত্মচৈতন্যের প্রতি যে মনোনিবেশ করা হচ্ছে ভিকোর প্রকল্পে তাকে গ্রহণ করা যায় না। সেই সঙ্গে ভিকোর প্রকল্পে জ্ঞানের জন্য পরিচ্ছন্ন ও সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় ও ধারণারও কোনো অগ্রাধিকার নেই। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে এই পরিচ্ছন্ন ও সুনির্দিষ্ট ধারণার ভিত্তিতে বস্তুবিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের যে পদ্ধতি তার অতি প্রাচীন ধারা বর্তমান। অন্তত আরিস্ততল পর্যন্ত প্রসারিত এই ধারা। এই ধারায় বস্তুবিশ্বকে ঐ রকম সুনির্দিষ্ট কাটা কাটা ধারণা ও প্রত্যয়ের সাহায্যে বর্ণনা করা সম্ভব বলে কল্পনা করা হয়। বস্তুত এই পদ্ধতিই গাণিতিক পদ্ধতির দার্শনিক ভিত্তি। ভিকো গণিতের শুদ্ধতা বা তার সত্যতার চরিত্র বর্ণনা করেন কিছুটা অন্যভাবে। তাঁর চিন্তায় গণিতের যা কিছু নির্মাণ তা আমাদেরই, অর্থাৎ মানুষেরই নির্মাণ। আমরা বানিয়েছি বলেই গণিতের সত্যতা নির্ধারণ করতে আমরা সমর্থ। কারণ আমরা যে যা সৃষ্টি করি কেবলমাত্র সে সব সম্বন্ধেই আমাদের কোনোরকম নির্ভরযোগ্য বোধ গড়ে ওঠা সম্ভব। এখান থেকে যাত্রা করে ভিকো এমন কিছু কিছু ধারণাকে তাঁর রচনায় কেন্দ্রীয় গুরুত্বে স্থাপন করেন যাতে পরবর্তীকালে ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের কোনো কোনো ধরন তাঁর সূত্র ব্যবহার করে নতুন এক ধরনের পদ্ধতিগত প্রকল্প গড়ে তুলতে পারে। পরবর্তীকালে

বিশেষত জর্মনিতে বিকাশ লাভ করে যে ইতিহাসবাদী সমাজচিন্তার ধারা তার এক বিশেষ জরুরি ধারণা হল 'অনুধাবন' বা 'ব্যাখ্যা'। এর জন্য ব্যবহৃত জর্মন শব্দ *Verstehen*, যার আক্ষরিক অর্থ হল 'বোঝা'। ইংরেজিতে ইন্‌টারপ্রিটেশন, অর্থাৎ 'ব্যাখ্যা', এই শব্দেরও প্রয়োগ আছে। ইংরেজিতে হিস্টরিসিস্ট বলে পরিচিত যে-ঘরানা তাকেই আমরা এখানে 'ইতিহাসবাদী' বলে বর্ণনা করছি। এই ইতিহাসবাদী পদ্ধতিতে (এরও অবশ্য বিভিন্ন ধারা-উপধারা রয়েছে) মানুষের সমাজজীবনের বিভিন্ন ঘটনা, আন্দোলন ইত্যাদিকে শুধুই বহিরাগতের মতো বিচার, বিশ্লেষণ বা বর্ণনা করাই যথেষ্ট নয়। বস্তুত দৃষ্টবাদী ইতিহাসের এই প্রকল্পের প্রতিক্রিয়ায় ইতিহাসবাদী জিজ্ঞাসা মানুষের সমাজজীবনের মর্মে পেঁছিতে চায়। সেখানেই বুঝে নেবার প্রশ্নটা ওঠে। ব্যাখ্যা করা এই বুঝে নেবার একটা পদ্ধতি। শুধু যৌক্তিকতাবাদী পদ্ধতিতে স্পষ্ট, সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত আরিস্ততলীয় পন্থায় কার্তেজীয় ধাঁচের তত্ত্বনির্মাণ মানববিদ্যার পক্ষে অগ্রাহ্য। বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার চালচলন, ধরনধারণ ও প্রয়োগপদ্ধতি যে আলাদা হওয়া উচিত ভিকোর এই পরামর্শের তাৎপর্য খুব সুদূরপ্রসারী। ভিকোর রচনাবলি অনেকদিন পর্যন্ত অবশ্য খুব ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে নি। কিন্তু নানা খাতে প্রবাহিত আলোকোদ্ভাসিত তত্ত্বদর্শনের বিপরীত ধারা যখন ক্রমশ জরুরি হয়ে দেখা দিল তখন অনেকের নজর এইসব ভিন্ন ধারার লেখকদের দিকে আকৃষ্ট হল। এই যে ভিন্ন ধারা গড়ে উঠল ক্রমে ক্রমে তার অনেক শাখা প্রশাখার সন্ধান পাওয়া গেল। রোমান্টিকতা, হারমেনিউটিক্‌স ইত্যাদি থেকে শুরু করে আধুনিক কালের পদ্ধতিগত নৈরাজ্যবাদ পর্যন্ত এর অনেক রকমফের প্রত্যক্ষ করা যায়।

গ্রামশি তাঁর দর্শনচিন্তার পরিণতির পথে নিশ্চয়ই অনেক উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন, কখনো সচেতন, কখনো বা অন্যমনস্কভাবে। এই গ্রহণ-বর্জনের পুরো ইতিবৃত্ত রচনা আপাতত আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা খুব বড় একটা ঘেরের মধ্যে গ্রামশিকে স্থাপিত করতে চাই। সেই ঘেরটা এমন হওয়া দরকার যে মার্কসচর্চার যান্ত্রিকতা কাটিয়ে তার বস্তুবাদভিত্তিক কর্মকাণ্ডের দর্শনে যেন পেঁছিনো যায়। যৌক্তিকতাবাদী পদ্ধতির বেড়াজালে বেশি আটকে গেলে মানুষের কর্মকাণ্ডের দিকটাই খানিকটা অবহেলিত থেকে যেতে পারে। গ্রামশির দর্শনচর্চায় এই বেড়াজাল কেটে বেরোন খুব জরুরি। জিয়ামবাত্তিস্তা ভিকো সেখানে তাঁর সহায় হয়ে থাকবেন। কিন্তু ইতালীয় দর্শনের ধারায় গ্রামশিকে প্রধানত যাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল তিনি বেনেদেত্তো ক্রোচে (১৮৬৬—১৯৫২)। আধুনিক ইতালীয় দর্শনে খুবই প্রভাবশালী এই দার্শনিক তাঁর দীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন পর্বে নানা বিচিত্র বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। বিশাল তাঁর রচনার পরিমাণ, বিষয় বৈচিত্র্যে তার মধ্যে আছে মার্কসীয় অর্থনীতি ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ থেকে আরম্ভ করে নন্দনতত্ত্ব, ইতালির ইতিহাস, ইয়োরোপের ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র ও

রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি অনেক কিছু। গ্রামশি তাঁর ১০ নম্বর নোটবইয়ে ক্রোচে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'বেনেদেত্তো ক্রোচের দর্শন' নামে ১১১ পৃষ্ঠার এই অংশে ক্রোচের দার্শনিক পদ্ধতি, ক্রোচের সমালোচনা পদ্ধতি, ক্রোচের ইতিহাসবীক্ষা থেকে আরম্ভ করে ধর্মীয় প্রসঙ্গে ক্রোচের অবস্থান ইত্যাদি অনেক বিষয়েই গ্রামশির সমালোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু এই অংশের মধ্যে তুলনায় খুব বিস্তারিতভাবে আছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রসঙ্গে ক্রোচের মতামত নিয়ে গ্রামশির সমালোচনা। এটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। আমরা আগেই বলেছি যে গ্রামশি যখন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা কর্মকাণ্ডের দর্শন বিষয়ে আলোচনা করছেন তখন ইতিমধ্যেই লাব্রিয়োলা ও ক্রোচের আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে ইতালিতে মার্কসবাদ চর্চার একটা জমি তৈরি হয়ে গেছে। বস্তুত ক্রোচের 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও কার্ল মার্কসের অর্থনীতি' অনেকাংশে লাব্রিয়োলার আলোচনা প্রণোদিত। ক্রোচের সমালোচনায় গ্রামশির অবস্থান এখানে আমরা আলোচনা করছি না। এ বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। মরিস এ ফিনোক্কিয়ারো-র **গ্রামশি অ্যান্ড দ্য হিস্ট্রি অব্ ডায়ালেকটিক্যাল থট** (কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৮) গ্রন্থে গ্রামশির ক্রোচে সমালোচনা বিষয়ে দুটো স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। সেখানে গ্রামশির ওপর ক্রোচের প্রভাব এবং গ্রামশির ক্রোচে সমালোচনা কীভাবে এবং কতদূর ক্রোচের পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত এ নিয়ে অনেক দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। সব মন্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত নাও হতে পারি, কিন্তু ক্রোচে ও গ্রামশির দার্শনিক সম্পর্ক বিষয়ে এখান থেকে বেশ একটা ধারণা গড়ে তোলা যায়।

ক্রোচের মার্কস আলোচনা খুঁটিয়ে পড়লে এমন দুটো একটা জিনিস চোখে পড়ে যা হয়তো গ্রামশিকে আকর্ষণ করে থাকতে পারে এবং আলোচনার এই ধরন একদিকে যেমন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অনিবার্যতার ধারণাটাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল তেমনি অন্যদিকে এসবের জন্য ইতালীয় মার্কসচর্চায় এক ধরনের গভীরতা আসছিল। ক্রোচে প্রথমেই ইতিহাসের দর্শন এবং ইতিহাস বিষয়ে কিছু দার্শনিক মন্তব্য এ দুয়ের মধ্যে তফাত করে নিয়ে আলোচনা শুরু করছেন। এর উদ্দেশ্য হল মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করা। ক্রোচের মতে এ বিষয়ে লাব্রিয়োলার অবস্থান হল: 'তথাকথিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কোনো ইতিহাসের দর্শন নয়।' [**ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও কার্ল মার্কসের অর্থনীতি**, ফ্র্যাঙ্ক ক্যাস অ্যান্ড কোং, ১৯৬৬, পৃ. ৩] লাব্রিয়োলার ওপর এই মত আরোপ করা কতটা সমীচীন সে তো অন্য প্রশ্ন। কিন্তু ক্রোচের ক্ষেত্রে এরকমভাবে প্রশ্নটাকে সাজানোর তাৎপর্য এই যে, তিনি একবাদ বা মনিজম এবং পরিণতিবাদ বা টেলিওলজি এ দুইকেই অস্বীকার করে এগোতে চাইছেন। তাঁর যুক্তিপরম্পরায় ক্রোচে একথাটা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কোনো নতুন ইতিহাসের দর্শন তো নয়ই, নতুন

কোনো পদ্ধতিও নয়। প্রকৃতপক্ষে, ক্রোচের মতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল নতুন তথ্য ও নতুন অভিজ্ঞতার এক বিপুল সমারোহ। এই জায়গা থেকে ইতিহাসের সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ চর্চার অসম্ভাব্যতায় পেঁছিচ্ছেন ক্রোচে। ইতিহাসের জন্য তথ্য সংগ্রহের পর্ব পেরোবার পরে যা দরকার তা হল সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে পুনর্গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গীকার, ধারণা, সংবাদ ইত্যাদির কল্পনানির্ভর ব্যবহার। এখানেই তাঁর মতে ঐতিহাসিকের বাহাদুরি। সংগৃহীত তথ্য বস্তুনিষ্ঠভাবে কিছু বলে না, অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার জন্য ঐসব তথ্যকে দিয়ে কথা বলাতে হয়। এখানেই আসে দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতার কথা। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব থেকে কী ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে? এখানেও ক্রোচে মনে করেন তিনি লাব্রিয়োলার সঙ্গে একমত। এখানে ইতিহাসের গতি নির্ধারণে নানা ধরনের ঐতিহাসিক উপাদান বা হিস্টরিকাল ফ্যাক্টর-এর কথা বলা হচ্ছে—প্রাকৃতিক অবস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদি। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এসবগুলোকে একত্রে আলোচনা করে, একই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে। ঠিক এখানেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের প্রশ্নটা তোলেন ক্রোচে এবং আবারও লাব্রিয়োলার সঙ্গে একসুরে তিনি এই সরলীকরণকে বর্জন করেন। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন ওঠে: ঐতিহাসিক বস্তুবাদের গুরুত্ব তবে কোথায়? ক্রোচের লেখা থেকে এখানে আমরা কিছু সন্ধান পাই ঐ অ-পরিচ্ছন্ন ও অ-নির্দিষ্ট ধারণা, মন্তব্য ও প্রত্যয়ের গুরুত্ব বিষয়ে। গ্রামশির প্রসঙ্গে যে-আদল ভেঙে বেরিয়ে আসা জরুরি বলে মনে হচ্ছিল সেই আদল ভাঙায় এসব মন্তব্যের ভূমিকা থাকা অসম্ভব নয়। অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ ও ডারউইনীয় ভাষা-অভ্যাসের প্রসঙ্গে ক্রোচের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য:

> 'একটা ভুলের বিষয়ে লাব্রিয়োলা যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন আমিও তার পুনরাবৃত্তি করেই সন্তুষ্ট থাকব। এই ভুলটা হল যে পুরনো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাকে বর্তমানে যেমন ডারউইনীয় ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে তেমনি তা আবার অর্থনৈতিক ভাষাতেও অনুবাদ করা হয়।' [পৃ. ২১]

এই আলোচনার সূত্রেই ক্রোচে বৌদ্ধিক সত্য ও নৈতিক সত্য ইত্যাদি বিষয়ে এমন কিছু প্রশ্ন তোলেন যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রসঙ্গে অবশ্যই কিছুটা নতুন। প্রচলিত মার্কসবাদের আলোচনায় নৈতিকতার প্রশ্ন ঠিক এরকমভাবে বিশেষ তোলা হয় না। কান্টের সূত্র ধরে মার্কসের প্রসঙ্গে অস্ট্রীয় মার্কসবাদে এই ধরনের যে-প্রশ্ন তোলা হয় সেও তো খানিকটা বিচ্যুতির পর্যায়েই ধরা হয়।

গ্রামশির আলোচনায় মার্কসবাদে সাধারণত অনালোচিত যে অনেক প্রসঙ্গের দেখা মেলে তার কিছু প্রাক্প্রস্তুতি আমরা এইসব ইতালীয় বিচার বিশ্লেষণের

মধ্যে দেখতে পাই। গ্রামশির কর্মকাণ্ডের দর্শন আলোচনা খুব নিবিড়ভাবে বুদ্ধিজীবীর প্রশ্ন, শিক্ষার প্রশ্ন, সংস্কৃতির প্রশ্ন ইত্যাদির বৃত্তে স্থাপিত। ইতিহাসের শুধুমাত্র বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা থেকে গ্রামশির এই প্রেক্ষা অনেক দূরবর্তী এবং এর নতুনত্বও অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রচলিত মার্কসচর্চায় তথাকথিত ভিত্তি ও উপরিকাঠামো বা স্ট্রাকচার ও সুপারস্ট্রাকচার-এর ধারণা দুটিকে এমনভাবে উপস্থিত করা হয় যে তার মধ্যেই এক ধরনের যান্ত্রিকতা এসে পড়ে। এ দুয়ের সম্পর্ক নিয়ে অনেক বাদবিতন্ডা হয়ে গেছে, আপাতত সে সবের মধ্যে না গিয়েও এটুকু বলা চলে যে, উপরিকাঠামো মূলত ভিত্তি দ্বারা নির্ধারিত এই সরল ছকে ভাবতে গেলে ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের কোনো হদিশ পাওয়া যায় না, অথবা হদিশ মেলাতে গেলে খানিকটা গায়ের জোরে জোড়াতালি দিতে হয়। বস্তুত, ঐ যান্ত্রিক আদলে ফেলে দেখতে গেলে গ্রামশির অনেক প্রসঙ্গকে মনে হবে উপরিকাঠামোর আলোচনা। আর সেইজন্যই প্রচলিত মার্কসবাদের ধারায় বারবার তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ওঠে। মনে হতে পারে গ্রামশি যথেষ্ট বস্তুবাদী নন, মনে হতে পারে তিনি ইতালীয় ভাববাদের শরিক এবং অনেকটাই বেশি পরিমাণে ক্রোচের প্রভাবগ্রস্ত। কিন্তু গ্রামশির প্রসঙ্গে আমরা যে-আদল ভেঙে বেরিয়ে আসার কথা বলছিলাম সেটা মাথায় রাখলে আমরা বুঝতে পারি যে ভিত্তি এবং উপরিকাঠামোর সম্পর্ক অত আলগাভাবে না দেখাই ভালো। এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক আরো অনেক জটিলভাবে বিন্যস্ত হতে পারে। নানা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় পরতে পরতে এমনভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে যে কোনোরকম যান্ত্রিক ছকেই সে বিন্যাস স্পর্শ করা যায় না। গ্রামশির চিন্তাকাঠামোয় তাই সেইসব অনালোচিত প্রসঙ্গের ওপরে অত জোর পড়ে। সমাজে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাই গ্রামশিকে বুদ্ধিজীবী এই ধারণাটিকেই নতুন করে ভেবে নিতে হয়। বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে শ্রেণীর প্রশ্ন এবং এ দুয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গ ক্রমশ বড় হয়ে দেখা দেয়। জৈব ও অজৈব বুদ্ধিজীবীর এই ফারাক সমাজ-রূপান্তরের প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নতুন একটা দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমরা ক্রমশ বুঝতে পারি কেন গ্রামশির চিন্তার পরিধিতে সংস্কৃতির প্রশ্ন এত বড়, তখন খুব স্বাভাবিক মনে হয় যে গ্রামশির সংক্ষিপ্ত ও ব্যতিব্যস্ত জীবনের মধ্যেও তিনি সংস্কৃতি প্রাসঙ্গিক এক বিপুল রচনাসম্ভার রেখে যেতে পেরেছেন। এই সংস্কৃতির ক্ষেত্র, শিক্ষার ক্ষেত্র, বুদ্ধিজীবীর আচার আচরণ যে কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে আমরা বেশ বুঝতে পারি। আজকের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যে ভাঙাগড়ার নাটক চলছে, আজকের পৃথিবীতে তথাকথিত ঠান্ডা লড়াইয়ের যে অবসান, আজকের দুনিয়ায় তথাকথিত ধনতন্ত্রের যে চীৎকৃত জয়জয়কার এর অনেক কিছুই আমরা আমাদের চেনাজানা তত্ত্বকাঠামোয় ঠাওর

করতে পারি না। এরকম মনে করাও যান্ত্রিক হবে যে গ্রামশির বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি ও শিক্ষার তত্ত্বের মধ্যে আমরা সেই মোক্ষম চাবিকাঠি হাতে পেয়ে গেলাম, এবার সব বুঝে ফেলা যাবে। তা নয়। কিন্তু অন্য আর কোনদিকে ফেরা যেতে পারে তার কিছু হদিশ পাই আমরা। এই বিকল্প দিক নির্দেশের সূত্রেই গ্রামশির অন্য আরো কিছু বিশিষ্ট ধারণার নাগাল পাওয়া যায়। এজেমোনিয়া বা আধিপত্যের ধারণা, নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের ধারণা, অবস্থানগত লড়াইয়ের ধারণা ইত্যাদি প্রত্যয়ের সাহায্যে চিন্তার যে-ধরনটা তৈরি হয়ে উঠছে তার মধ্যে দিয়ে একটা খুব জরুরি কথা বেরিয়ে আসছে। ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বিস্তারের নানা ক্ষেত্র রয়েছে সমাজে, কাজেই সমাজ-রূপান্তরের প্রসঙ্গেও লড়াইয়ের প্রশ্ন যখন উঠবে তখন ক্ষমতা ও প্রভুত্বের সব ঘাঁটিতেই সেই লড়াইযের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রচলিত শ্রেণীসংগ্রাম, রাষ্ট্র-ক্ষমতার দখল ও শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য ইত্যাদির সমবায়ে গড়ে ওঠা ছকের থেকে গ্রামশির এই ছক আলাদা। আলাদা বলেই জাতিচ্যুত হতে হবে তার কী মানে?

এই যে আলাদা ছকের ইঙ্গিত পাওয়া গেল এই জায়গায় চিন্তার ইতিহাসের দিক থেকে মাকিয়াভেল্লির আলোচনা খুব প্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে নিক্কোলো মাকিয়াভেল্লি (১৪৬৯—১৫২৭)-র গুরুত্ব অপরিসীম। এক অর্থে রাষ্ট্রশাসনের ইতিবৃত্তে মাকিয়াভেল্লি বেশ কুখ্যাত নাম হিসেবেই পরিচিত। আজও আমাদের ভাষা-অভ্যাসে 'মাকিয়াভেল্লি-সুলভ রাজনীতি' বলতে জনজীবনের যাবতীয় খারাপ কাজকেই বোঝায়। মাকিয়াভেল্লির এই বদনাম কীভাবে গড়ে উঠল, তা উচিত কী অনুচিত, এতে করে তাঁর ওপর সুবিচার করা হল কিনা সেসব আলাদা প্রশ্ন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পরবর্তীকালের পক্ষে মাকিয়াভেল্লি থেকে কিছু গ্রহণ করা অসম্ভব নাও হতে পারে। গ্রামশিকে ইতালীয় চিন্তা ঐতিহ্যের পরিধিতে স্থাপিত করার পেছনে কিছু তাৎপর্য আমরা এখানেও পেতে পারি। গ্রামশি যে-অর্থে ক্রোচের সঙ্গে মোকাবিলা করেছিলেন সেই অর্থে তাঁকে মাকিয়াভেল্লির সঙ্গেও মোকাবিলা করতে হযেছিল। **আধুনিক নৃপতি** (ইল মোদের্নো প্রিন্সিপে) যে গ্রামশির এক প্রধান রচনা শুধু সেই অর্থেই বলছি না কথাটা। মাকিয়া-ভেল্লির **দ্য প্রিন্স** এই ইংরেজি নামে পরিচিত ছোট বইটির মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যা গ্রামশিব প্রসঙ্গ মাথায় নিয়ে ভাবতে গেলে চকিতে আমাদের ছুঁয়ে যেতে বাধ্য। **দ্য প্রিন্স** এবং **ডিসকোর্সেস** মাকিয়াভেল্লির এই দুই প্রধান গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন রকম রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। **ডিসকোর্সেস**-এ প্রধানত প্রজাতন্ত্র নিয়ে আলোচনা আর **দ্য প্রিন্স**-এ রাজতন্ত্র বা প্রিন্সিপ্যালিটিজ নিয়ে। সবাই জানেন **দ্য প্রিন্স** খুব ছোট বই, খুব ছোট ছোট ছাব্বিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এ বইয়ে তত্ত্বকথা কম, বাস্তব পরিস্থিতি প্রসঙ্গে মন্তব্য ও পরামর্শই এ বইয়ের বিষয়। কিন্তু চিন্তার ধরনটা তো এসব থেকে টের পাওয়া যায়। রাজ্য

প্রাপ্তি, উদ্ধার, রাজ্য রক্ষা, রাজ্য শাসন ইত্যাদি বিষয়ে মাকিয়াভেল্লির পরামর্শের মধ্যে একটা কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাজ্য প্রাপ্তি বা রাজত্বের নানা ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন মাকিয়াভেল্লি—পুরুষানুক্রমে পাওয়া, ভাগ্যক্রমে পাওয়া, গায়ের জোরে বা টাকার জোরে পাওয়া এই রকমের বিভিন্ন রাজত্বের কথা আছে। রাজত্ব পাওয়া বা অর্জন করা আর তা রক্ষা করা যে এক জিনিস নয় এ কথা খুব স্পষ্ট। তাই মাকিয়াভেল্লি বিশদভাবে রাজ্য-রক্ষার প্রশ্নও আলোচনা করেছেন। মাকিয়াভেল্লির প্রসঙ্গে যে অনৈতিকতার অভিযোগ ওঠে এই প্রসঙ্গে তার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু যেটা বিশেষ করে লক্ষ করার কথা তা এই যে রাজ্যরক্ষার ক্ষেত্রে শাসকের সঙ্গে শাসিতের বা রাজা ও প্রজার সম্পর্কের ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে মাকিয়াভেল্লির রচনায়। এই সম্পর্কের কথা আলোচনা করতে গিয়ে একদিকে যেমন শাসকের চারিত্রিক গুণাবলির প্রসঙ্গ ওঠে, তেমনি অন্যদিকে শাসকের অস্ত্রশস্ত্র, রণকৌশল ইত্যাদি সব কথাই প্রাসঙ্গিক হয়ে দেখা দেয়। এই সঙ্গে মাকিয়াভেল্লির রচনার মধ্যে আমরা এ চিন্তারও সাক্ষাৎ পাই যে রাজত্বের স্থায়িত্বের অনেকটাই নির্ভর করে রাজ্যশাসন প্রজাদের কাছে কতটা গ্রাহ্য হয়ে হয়ে উঠছে তার ওপর। অর্থাৎ, রাজত্বের স্থায়িত্ব শুধু রাজার ক্ষমতা বা তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির ওপর নির্ভর করে না। তাঁর প্রজাদের মধ্যে, অর্থাৎ রাজ্যের খোঁজে খোঁজে কতদূর তাঁর শাসন সিঁধিয়ে যেতে পারল রাজ্য রক্ষার ক্ষেত্রে এটা খুব বড় প্রশ্ন। রাজা তাঁর প্রজার সঙ্গে কতটা মিশ খেয়ে যেতে পারলেন, রাজ্যের আপদে বিপদে প্রজা কতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজার পাশে এসে দাঁড়াবে এসব কথা জরুরি। মাকিয়াভেল্লির রচনার এই দিকটায় নজর দিলে আমরা বুঝতে পারব যে মাকিয়াভেল্লি হয়তো শুধুমাত্র কু-ধর্মের পূজারী ছিলেন না।

জনসমাজের ধারণা নিশ্চয়ই মাকিয়াভেল্লির হাতে তেমন স্পষ্ট চেহারা পায় নি, কিন্তু রাষ্ট্রের স্তর বা শাসকের স্তরের বাইরেও ক্ষমতার সম্ভাব্য ফোকর যে থাকতে পারে এবং তাকে যে প্রজাসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যেই খুঁজে পেতে হবে এই চিন্তার সাক্ষাৎ কিন্তু আমরা মাকিয়াভেল্লিতে পেতে পারি। গ্রামশির দর্শনে রাষ্ট্রীয় স্তরের বাইরে জনসমাজের স্তরটা নিয়ে যে এত কথা বলা হল, গ্রামশির চিন্তা পরিধিতে জনসমাজের জন্য যে এত বড় একটা ভূমিকা নির্দিষ্ট হল এর গুরুত্ব তো অপরিসীম। বিশেষত, ঠিক আজকের এই বর্তমান মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় স্তরের জোর বিষয়ে যখন এত প্রশ্ন উঠছে, রাষ্ট্রীয় স্তরে যখন এত অদল বদল ঘটছে তখন আমাদের নজর তো খুব স্বাভাবিকভাবে সমাজের অন্য কোনো স্তরে ক্ষমতার উৎস খুঁজে পেতে চাইবে। গ্রামশির জনসমাজের ধারণা, সেই জনসমাজের স্তরে শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রশ্ন, বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তার শ্রেণীউৎসের সম্পর্ক এসব বিষয় তাই আজকের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিতে পারে। তাঁর এসব ধারণা গ্রামশি সরাসরি মাকিয়াভেল্লি থেকে পেয়ে গেছেন একথা বলার কোনো

মানে হয় না। কিন্তু ইতালীয় চিন্তা পরিধির মধ্যে স্থাপিত করে গ্রামশির রচনাকে, তাঁর চিন্তার ধরনকে যদি আমরা বুঝে নিতে চেষ্টা করি তাহলে একথা লক্ষ করতেই হয় যে মাকিয়াভেল্লি থেকে আরম্ভ করে ক্রোচে, লাব্রিয়োলা প্রমুখ আধুনিক চিন্তাবিদদের অনেকের সঙ্গেই মোকাবিলা করে তবে এগোতে হচ্ছিল তাঁকে। গ্রামশির ক্ষেত্রে মার্কসীয় বস্তুবাদের দিকে যাত্রা নিশ্চিত-ভাবে এক বিশেষ ধরনের ইতালীয় পথের যাত্রা। তার সঙ্গে অবশ্যই মিশে-ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, ফ্যাক্টরি কাউন্সিল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত, দক্ষিণ ইতালির প্রশ্ন ও সর্বোপরি তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ইতালীয় পার্টির সম্পর্কের জটিলতা। এসবের মধ্য দিয়ে গ্রামশির হাতে কর্মকাণ্ডের দর্শনের যে-চেহারা ফুটে উঠল এবং গ্রামশির তত্ত্বচিন্তার যে-ধাঁচ আমরা পেলাম তা প্রচলিত মার্কসবাদ থেকে অনেক আলাদা। বস্তুবাদের এ এক ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত।

আমরা আগেই লক্ষ করেছি যে মার্কসের দর্শন গ্রামশির কাছে কর্মকাণ্ডের দর্শন, মার্কসই তাঁর কাছে কর্মকাণ্ডের দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। **জেলখানার নোটবই**-তে মার্কসের দর্শনকে 'কর্মকাণ্ডের দর্শন' বলে উল্লেখ করার পেছনে জেলের নজরদারি এড়াবার চেষ্টা হয়তো ছিল কিন্তু সেটাই সম্ভবত সব নয়। মার্কসের দর্শন বিষয়ে ওটা গ্রামশির দৃষ্টিভঙ্গিও বটে। আর ইতালীয় মার্কসচর্চার ধারায় আনতোনিও লাব্রিয়োলা থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গির একটা ইতিহাসও ছিল। কাজেই গ্রামশির কাছে এই ঝোঁক পরম্পরাবাহিত হয়েই পেঁছেছে। এটা খুব অপ্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু গ্রামশির হাতে কর্মকাণ্ডের এই কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনেকখানি বিস্তার পেয়ে যায়। বস্তুত গ্রামশির চিন্তায় কর্মকাণ্ডের দর্শনের এক মৌলিক প্রত্যয় কর্মতত্ত্বৈক্যের ধারণা। কর্মের সঙ্গে তত্ত্বের নিগূঢ় সংযোগের এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই বহু মাত্রায় আলোচ্য। সমাজদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামশি এই ধারণাকে স্থাপিত করেন সমাজ-ইতিহাসের অভ্যন্তরে। কর্মতত্ত্বৈক্যের এই প্রক্রিয়াকে বুঝে নেবার জন্য বৌদ্ধিক শৃঙ্খলা কাণ্ডজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যেকার এমন এক সম্পর্কের অবতারণা করেন গ্রামশি যে তাঁর হাতে মার্কসের কর্মকাণ্ডের দর্শন শুধুমাত্র আর ব্যাখ্যার পর্যায়ে থাকে না। মার্কসীয় তত্ত্বচিন্তার ভূমিতে তা হয়ে ওঠে রীতিমতো সৃষ্টিশীল দর্শন। দর্শনের স্বরূপ হল বৌদ্ধিক শৃঙ্খলা, জনমনের ধর্মচেতনা বা কাণ্ডজ্ঞান কিন্তু সেই অর্থে ঠিক শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়, তা হতেও পারে না। আবার ধর্মচেতনা ও কাণ্ডজ্ঞানও পুরোপুরি এক জিনিস নয়। বরঞ্চ বলা যায় ধর্মচেতনা কাণ্ডজ্ঞানেরই এক ভগ্নাংশ। কাণ্ডজ্ঞান বলতে গ্রামশি বোঝেন সমগ্রের এমন এক বোধ যা খানিকটা অবিশ্লেষিত, অসমালোচিত; এবং এরকম কাণ্ডজ্ঞান যে এক রকমেরই মাত্র আছে তাও নয়। ধর্মচেতনাও তাই। এ সবই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ। ধর্মচেতনা ও কাণ্ডজ্ঞানের স্তরকে উত্তরণের পরেই তবে দর্শনের স্তরে পেঁছনো সম্ভব।

এই সমালোচিত স্তরের মধ্য দিয়েই সমাজের নির্দিষ্ট কোনো স্তর তার শ্রেয়োবোধে উত্তীর্ণ হতে পারে। দর্শন এইভাবে শ্রেয়োবোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট. শুধু কাণ্ডজ্ঞান কিন্তু তা নয়। গ্রামশির কর্মতত্ত্বৈক্যের ধারণায় এই হল পরিপ্রেক্ষিত।

এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে শুরু করে গ্রামশি পৌঁছে যান উঁচু নিচু কিংবা 'সরল' ও বুদ্ধিজীবী এই ধরনের বিপরীতধর্মিতার দ্বন্দ্ব ও ঐক্যে। তাঁর চিন্তায় কর্মকাণ্ডের দর্শন এইসব আপাত বিপরীতধর্মিতার ঐক্যের লক্ষ্যে ধাবিত। ইতিহাসের প্রক্রিয়ার মধ্যে স্তরে স্তরে পর্যায়ক্রমে এই ঐক্য সাধিত হয়। কাণ্ডজ্ঞান ও দর্শনের তথাকথিত উঁচু স্তরের মধ্যেও রাজনীতির মাধ্যমে এক সাযুজ্যসাধন সম্ভব। এই সাযুজ্যের পথেই কিছুটা অসমালোচিত কাণ্ডজ্ঞান, জনসাধারণের আন্দোলন ও নতুন বিশ্ববোধ ক্রমে ক্রমে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যায়। এই পথেই, গ্রামশি মনে করেন, সেণ্ট ডমিনিক ও সেণ্ট ফ্রান্সিস-এর মতো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ মেলে। ইতিহাসের এই পথপরিক্রমা খুব সরল সোজা পথে চলে তা নয়, অনেক ক্ষেত্রেই এই পথ খুবই বন্ধুর, উত্থানপতনের চিহ্নে পরিকীর্ণ। রিফর্মেশন-কাউণ্টার রিফর্মেশন, বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের আঁকাবাঁকা পথে রচিত হয় এই ইতিহাস। কর্মকাণ্ডের দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাসের এই পথে সরল শাদামাটা মানুষজনের কাণ্ডজ্ঞানের উত্তরণ ঘটে এক উচ্চতর জীবনবীক্ষায়। দর্শনের ধরনটাই এতে করে বদলে যায়। উচ্চবর্গের দর্শন ও অন্যতর ইতরজনের ধোঁয়াটে আবছা বিশ্ববোধ ও ঝাড়ফুঁক কুসংস্কারের জগতের ফারাকটা এতে করে কমে আসে। টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন এলীট বুদ্ধিজীবীর কতিপয় গোষ্ঠীর বদলে গড়ে ওঠে এক বৌদ্ধিক-নৈতিক জোট। আর এই পথেই জনমানুষের ব্যাপকতম স্তরে তাদের বৌদ্ধিক বিকাশের রাজনৈতিক সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই প্রক্রিয়ার শরিক যে ব্যক্তিমানুষ, প্রকৃত রূপান্তরকর্মে লিপ্ত যে ব্যক্তি তার যাত্রাপথের পর্বে পর্বে দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হতে হতে এগোতে হয় তাকে। যে-রূপান্তর কর্মে সে লিপ্ত, যা অত্যন্ত বাস্তব ক্রিয়াকর্মের ব্যাপার সেখানে শুরুতে তার নিজেরই মধ্যে সে ধারণ করে এমন এক বিশ্ববোধ যা সব সময়ে তার কর্মময় ভুবনের অন্তর্নিহিত বীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। এই এক দ্বন্দ্ব। বাস্তব রূপান্তরকর্মের সঙ্গে সঙ্গেই রূপান্তর ঘটে এই বিশ্ববোধের স্তরে। এই দুই রূপান্তরই ইতিহাসের অভ্যন্তরে স্থাপিত। এই রূপান্তরের পরিণতি দর্শন, আবার সেই দর্শনের মধ্যেই ধরা থাকে এই রূপান্তরের ইতিহাস। গ্রামশির চিন্তায় কর্মকাণ্ডের দর্শন এই দুই বিন্দুর সমাহার। তত্ত্বচিন্তাকে কর্মের লক্ষ্যসাধনে নিয়োজিত করার যে-প্রকল্প গ্রামশি তাকে যান্ত্রিক বলে আখ্যা দেন। যান্ত্রিক একদেশদর্শী এই ছকের মধ্যে অনেক দমন-পীড়নের বীজ নিহিত থাকতে পারে। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের পরিসরে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরকর্মের যেটুকু অভিজ্ঞতা গ্রামশির ছিল তার মধ্যেই তিনি এই বিপদসংকেত দেখতে পেয়েছিলেন।

গ্রামশির উপস্থাপনায় কর্মকাণ্ডের দর্শনের যে-দিকটা আমরা পাই আমাদের সময়কার অভিজ্ঞতার আলোতে তার বিচার খুব জরুরি। এই কর্মকাণ্ডের দর্শনে কর্মতত্ত্বৈক্যই যে কেন্দ্রীয় ধারণা সে কথাও আমাদের কাছে খুব প্রাসঙ্গিক।

গ্রামশির সৃষ্টিশীল দার্শনিক উপস্থাপনায় যে কর্মকাণ্ডের দর্শনের সাক্ষাৎ আমরা পাই, গ্রামশির স্বীকৃতিতে মার্কস যে-কর্মকাণ্ডের দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা, সেখানে মানুষের আত্মচৈতন্যের ভূমিকা খুব বড়। সমাজ-ইতিহাসের রূপান্তর কর্মে লিপ্ত যে-মানুষ তার সমাজসত্তায় ও ব্যক্তিসত্তায় চৈতন্যের ভূমিকা খুব প্রত্যক্ষ। বস্তুত এই কারণেই মার্কসীয় দর্শনে ব্যক্তির স্বরূপ এবং সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্নটা খুব জরুরি। মার্কসের তত্ত্বের যে-যান্ত্রিক ব্যাখ্যার কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি সেখানে এই চৈতন্যের প্রসঙ্গ কিছুটা অবহেলিত। বস্তুত, সেই অবস্থান থেকে মার্কসীয় অনুষঙ্গে চৈতন্যের প্রশ্নটাকে বরাবরই খুব সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে এবং চৈতন্যকেন্দ্রিক যে-কোনোরকম উপস্থাপনাকে বিচ্যুতির লক্ষণ বলেই মনে করা হয়েছে। গ্রামশির মার্কস-ব্যাখ্যার অন্যতম অভিনবত্ব এখানে যে তিনি এই চৈতন্যের প্রশ্নটাকে অবহেলা না করে কেন্দ্রীয় গুরুত্বে স্থাপিত করেছেন। মার্কসের ব্যক্তিতত্ত্বে সমাজ-ইতিহাসের কিছুটা আভাস আমরা কর্মকাণ্ডের দর্শনের চরিত্রবিচারের মধ্যে পেয়েছি। মার্কসীয় দর্শনের এই ব্যক্তি ইতিহাস-নিরপেক্ষ কোনো নিরালম্ব ব্যক্তি নয়। ইতিহাসের বিকাশের স্তরে স্তরে এই ব্যক্তির ভবনের কথা নিহিত। এই ব্যক্তি চৈতন্যময়, ইতিহাস নামক নির্বিশেষ কোনো যন্ত্রের কিছু কলকব্জা মাত্র নয়, ইতিহাস মানুষেরই হাতে গড়া। প্রকৃতি থেকেই তার যাত্রা শুরু, তবে মানুষেরই হাতে, তার উৎপাদনকর্মে, তার রূপান্তরকর্মে প্রকৃতি থেকে সে ইতিহাস অনেক দূর প্রসারিতও বটে। পরিণত মার্কসের এই ব্যক্তিবীক্ষার বীজ আমরা তাঁর প্রাথমিক গবেষণাকর্মের মধ্যেও খুঁজে পেতে পারি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য মার্কসের গবেষণার বিষয় ছিল প্রাচীন গ্রীক দর্শন। দেমোক্রিতুস ও এপিকুরুস-এর দর্শনের ভেদ নির্ণয় ছিল মার্কসের নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়। সেই প্রসঙ্গে তিনি আরিস্ততলীয় ধারার বাইরে নিজেকে স্থাপিত করেন এবং সেই প্রসঙ্গেই তিনি স্টোয়িক ও স্কেপটিক ধারার বিশেষত্ব সন্ধান করেন। এপিকুরুস-এর দর্শন বিচারে এই হল মার্কসের পরিপ্রেক্ষিত। আরিস্ততলের বিপ্রতীপে স্থাপিত চৈতন্যময় ব্যক্তির এই সন্ধান মার্কসের প্রারম্ভিক দার্শনিক প্রেরণা। পরিণত মার্কস এই প্রথম প্রত্যয় থেকে সরে আসেন নি, সমাজ-ইতিহাসের অন্তরঙ্গ আবহে তিনি তার প্রসার ঘটিয়েছেন। একদিকে ইতিহাসের অমোঘ শাসন ও অন্যদিকে সমাজ-রূপান্তর কর্মে স্বতঃস্ফূর্তি এই দুই বিপদকে এড়াতে গেলে কর্মকাণ্ডের দর্শন ও কর্মতত্ত্বৈক্যের ধারণা আমাদের সহায় হতে পারে। গ্রামশির মার্কসবীক্ষা এই কারণে আমাদের কাছে স্মরণীয়। আমাদের পরিবর্তনের

পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা এই জায়গায় গ্রামশির দিকে ফিরে তাকাতে পারি।

আমাদের প্রসঙ্গে গ্রামশিচর্চার ধরতাই আমরা কীভাবে পাব এ-প্রশ্নের একটা উত্তরে আমরা এখন পৌঁছতে পারি। গ্রামশি আমাদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অনুপস্থিত একথা ঠিক। আমাদের চিন্তাচর্চায় গ্রামশির উপস্থিতি এখনো ক্ষীণ। কিন্তু মার্কসচর্চা ও বস্তুবাদের বিভিন্ন ধারা উপধারার আমাদের আগ্রহের যে ইতিবৃত্ত খানিকটা তৈরি হয়ে আছে সেখানে প্রচলিত মার্কসবীক্ষার যান্ত্রিকতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন দীর্ঘদিন ধরেই উঠছে। আধুনিক পৃথিবীর পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ও আমাদের সমাজ রাজনীতি ও অর্থনীতির নানা সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিভিন্ন তত্ত্বপদ্ধতির যে-সন্ধান চলছে তাই হবে আমাদের গ্রামশিচর্চার প্রস্থানবিন্দু। গ্রামশির বিছু প্রত্যয়ের সরাসরি প্রয়োগ করে আমরা আমাদের সমস্যার মোকাবিলা করে ফেলব এরকম স্নিগ্ধ বিশ্বাসে ভর না করাই ভালো। আধুনিক জগতের নানা দিগ্‌দর্শনের মধ্যে এও এক অন্যতম দিগ্‌দর্শন। কোনো তত্ত্বকাঠামোকে কোথায় কখন কীভাবে আমরা ব্যবহার করব সে তো আমাদের ব্যাপার। গ্রহণে বর্জনে আমরা যত সাহসী হতে পারব ততই আমাদের নিজেদের পরিপ্রেক্ষিত অর্জনে তা সহায় হবে।

সৌরীন ভট্টাচার্য

ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তত্ত্বের অভিমুখে

গ্রামশির চিন্তাজগতে শুধু মার্কস নন, ইতালীয় ও ইয়োরোপীয় দর্শনচিন্তার এক দীর্ঘ পরম্পরা যেমন ছায়াপাত করেছে, যেভাবে তাঁকে পুষ্ট করেছে, ঠিক তেমনই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক কর্মজীবনও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। গ্রামশি যেভাবে তত্ত্ব ও কর্মকে পরস্পর সমন্বিত করতে সচেষ্ট থেকেছেন, একেকে অপরের মাত্রায় বারবার যাচাই করে গেছেন, তাতে তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও জীবন ও তত্ত্বের এই অন্বয় অনিবার্য।

রাজনৈতিকভাবে ইতালির অন্তর্গত হলেও সার্দিনিয়া ভৌগোলিকভাবে ইতালি থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ। এই সার্দিনিয়া দ্বীপেই আলেস নামে একটি গ্রামে আনতোনিও গ্রামশির জন্ম। জন্মতারিখ ২২ জানুয়ারি ১৮৯১। রেজিস্ট্রার-এর আপিসের চাকরিতে বাবা ফ্রানচেস্কো গ্রামশি সোরগোনোয় বদলি হয়ে গেলে এক বছর বয়সে আনতোনিও সোরগোনো চলে আসেন। সাত বছর বয়সে তিনি ফিরে আসেন গিলার্ৎসা গ্রামে—যে-গ্রামে ফ্রানচেস্কো তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং যে-গ্রামের মেয়ে জিউসেপ্পিনা মারচিয়াসকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। আনতোনিও বাবা-মার চতুর্থ সন্তান—

সাত পুত্রকন্যার একজন। ১৯১১ সালে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তির জন্য পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সার্দিনিয়া ছেড়ে ইতালির মূল ভূখণ্ডে তুরিনে পড়তে চলে আসেন। তারপরও সার্দিনিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল কারান্তরালে যাবার আগে পর্যন্ত। যদিও তাঁর রাজনৈতিক কর্মজীবন শিল্পনগরী তুরিন কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

আফ্রিকা মহাদেশ থেকে বয়ে আসা বাতাসের ঝাপটায় তপ্ত শুষ্ক সার্দিনিয়ার মাটিতে প্রায় এগারো শতাব্দী ধরে বিদেশি লুণ্ঠন ও শাসনের নির্মম বাতাবরণে সার্দিনিয়ার কৃষক প্রথমে ভূমিদাসরূপে ও পরে নামমাত্র স্বাধীন সত্তার অধিকারে চাষ করে যে শস্য তুলেছে তার সামান্য অংশই নিজেরা ভোগ করেছে। কায়িক পরিশ্রমের তাড়নায় তারাও যেমন দুর্বল হয়েছে, সেচ-সার-কৃষিপ্রযুক্তির অভাবে তাদের জমিও তেমনই ক্রমশই ঊষর হয়েছে, মুষ্টিমেয় ভূস্বামীকুল কখনও আইনমতে, কখনও বা আইনকে চোখ ঠেরেই তাদের শোষণ করে গেছে। অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের এই অভিশাপের বিরুদ্ধে সার্দিনিয়াবাসীদের প্রতিবাদ তথা প্রতিরোধ দুটি রূপ পরিগ্রহ করেছে; নিষ্পেষণে পর্যুদস্ত অসংখ্য স্থানীয় অভ্যুত্থান এবং দস্যুবৃত্তি। ১৮৩৫-৩৮ সালে সামন্ততন্ত্র আইনত খারিজ হয়ে গেলেও পুরনো ভূস্বামীরা স্থানীয় সরকারি আমলাদের সহায়তায় নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতা অনেকটাই অক্ষুণ্ণ রাখেন। ভূস্বামী ও সরকারি কর্মচারী আমলাদের এই লেনদেন ও যোগসাজসে সার্দিনিয়ার বিভিন্ন গ্রামে ও ছোট শহরে রাজনীতির যে বিশেষ চারিত্র্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তাতে ক্ষমতার নগ্ন কেনাবেচা কখনোই রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সংঘাতকে ওপরে উঠে আসতে দেয় না; আর, ঐ নীতিহীন রাজনীতিচর্চার চোরাগলি ধরেই ফ্যাশিবাদ সার্দিনিয়ায় প্রবেশ করে। সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণামস্বরূপ সার্দিনিয়ার কৃষিজীবী সমাজ যে অনিবার্য অদৃষ্টবাদী ক্লীবতায় নিমজ্জিত হয়, সেই বংশগত আত্মসমর্পণপ্রবণতা সুলচিস-ইগ্লেসিয়েন্তে-র খনিশ্রমিকদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। জীবিকার সুযোগের ঘোরতর অপ্রতুলতায় এই শ্রমিকেরাও মেনে নিয়েছিলেন কার্বনের বিষে, যক্ষ্মায় অবিরাম ক্ষয়িত হতে হতে অপ্রতিরোধ্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবার অদৃষ্ট। ঋণভারে জর্জরিত কৃষকেরা ক্রমেই তাঁদের ছোট ছোট জমি পুরনো ভূস্বামীদের বেচে দিতে থাকলে ১৯০১ সালে দেখা যায়, ছোট্ট দ্বীপ সার্দিনিয়ায় তখন ৭৭৭৫৩ ভূমিহীন কৃষক দিনমজুর। সার্দিনিয়ার পশুপালন ও দুধের ব্যবসায় এই সময়েই ইতালির মূল ভূখণ্ডের বড় ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি পড়ে, এবং অচিরেই এই ব্যবসায়ও সার্দিনিয়াবাসীদের যাবতীয় প্রতিপত্তি হাতছাড়া হয়ে যায়। সামন্ততন্ত্রের আইনত অবলোপের পর, পুরনো জমিদার পরিবারগুলির শরিকি বিভাজন ও অন্যান্য কারণে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে ক্রমশই প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও বিচারবিভাগীয় পদগুলি করায়ত্ত করে, সহায়ক পাতিবুর্জোয়া একটি আমলাশ্রেণী তৈরি করে মূল ভূখণ্ড অর্থাৎ উত্তর ইতালির শাসকচক্রের

বাহুরূপে ইতালির দক্ষিণখণ্ডে কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়। আনতোনিও গ্রামশি-র বাবা ফ্রানচেস্কো ছিলেন এই পাতিবুর্জোয়া আমলা সম্প্রদায়েরই একজন। গ্রামবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের চোখে এই শ্রেণীর ছবি খুব একটা মর্যাদামণ্ডিত ছিল না। ফ্রানচেস্কো গিলাৎ'সায় এসেছিলেন মূল ভূখণ্ড থেকে, আইনের পাঠ অসম্পূর্ণ রেখে; অচিরেই গ্রামের গ্রামীণ পাতি-বুর্জোয়া মহলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সাধারণত যাঁরা খাস ইতালি থেকে সার্দিনিয়ার গ্রামে সরকারি দায়িত্ব নিয়ে আসতেন, তাঁরা এখানে বিবাহ করতেন না, তাতে প্রায় জাতে পড়ে যাবার ভয় থাকত। ফ্রানচেস্কো ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত নিয়ে এই গ্রামেরই মেয়ে জিউসেপ্পিনা মারচিয়াসকে বিবাহ করেন। তাঁর সন্তানসন্ততি জিউসেপ্পিনার কাছেই মানুষ হন; এই মায়ের সঙ্গে আনতোনিও-সহ তাঁদের সকলেরই সম্পর্ক যেমন ঘনিষ্ঠ তেমনই বিশ্বাসভর ছিল।

আনতোনিও গ্রামশি তুরিনে চলে আসার পর ১৯২১ সালে দশ দিনের জন্য সার্দিনিয়ায় ঘুরে ফিরে ডি এ্যচ্ লরেন্স যে অসামান্য ভ্রমণকাহিনী 'সী অ্যান্ড সার্ডিনিয়া' রচনা করেন, তাতেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রকৃতি ও ইতিহাসের যুগপৎ তাড়নায় সার্দিনিয়ার দুর্ভোগ, সঙ্গে সঙ্গেই জাতিচরিত্র আবিষ্কারে সদা আগ্রহী লরেন্স্ ইতালীয় মেজাজ ও জাতিধর্ম থেকে সার্দিনীয়দের দূরত্ব লক্ষ করে আনন্দ পেয়েছেন। নানা স্তরের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে অহরহ দেখাসাক্ষাতে ও সংলাপে তাঁর একদিকে মনে হয়েছে, 'এরা প্রত্যেকে নিজের প্রতি তদ্গতচিত্ত ও আত্মসীমিত। মুক্ত বন্য পশুর মতো। এরা বাইরে তাকিয়ে দেখলে অন্য বস্তু দেখে, এমন-সব বস্তু যা দেখে ওরা তা নিয়ে পরিহাস করতে পারে, অবিশ্বাস করতে পারে বা কৌতূহলে শুঁকে দেখতে পারে। ...যা ওদের সীমার বাইরে তা নিয়ে কোনো মোহ ওদের এতটুকু আকর্ষণ করে না। ওদের কোনো প্রতিবেশী নিতান্তই কোনো বহির্বস্তু। ওদের জীবন কেন্দ্রাভিগ, নিজেরই মধ্যে আবিষ্ট, অন্যদের দিকে বা মানবসমাজের দিকে কখনোই ছুটে যায় না। এখানেই কেউ এই প্রথম সেই যথার্থ আদি মধ্যযুগীয় জীবনের অনুভব লাভ করে যা নিজেরই মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ, বাইরের জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।...বিশ্বচেতনার কোনো অভিঘাতকে ওরা ওদের ওপর এসে পড়তে দেবে না। রুক্ষ, গোঁয়ার, তেজী এই মানুষগুলো তাদের একান্ত নিজস্ব রুক্ষ, ঘোর নির্বুদ্ধিতা আঁকড়েই থেকে যাবে, ওদিকে মহাপৃথিবী তার আলোকোদ্ভাসিত নরকে পৌঁছে যাক। এদের নরক একান্তভাবেই এদের নিজস্ব নরক, এরা তা আলোকোদ্ভাসের স্পর্শবিহীনই ভোগ করতে চায়।' অন্যদিকে তিনি সার্দিনিয়ায় দারিদ্র্যের যে মাত্রা দেখেছেন, তা ইতালির আর কোথাও দেখেননি। গ্রামশি তাঁর বাল্যে বা কৈশোরে যে সার্দিনিয়া দেখেছেন, প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেই সার্দিনিয়ার অবস্থা আরো ভয়াবহ। লরেন্স্ লেখেন: 'সার্দিনিয়া, গোরু-মোষের আবাসভূমি, ভূমধ্যসাগরের ছোট্ট পাহাড়ি

আর্জেন্টিনা, আজ প্রায় প্রাণহীন। ইতালীয়রা বলে, এ সবই যুদ্ধের কারণে এবং যুদ্ধবাজদের বেপরোয়া, পাশব, ইতর অমিতব্যয়িতার কারণে। কেবল-মাত্র যুদ্ধই পৃথিবীকে নিঃশেষ করেনি। নিঃশেষ করেছে যুদ্ধস্রষ্টাদের নিজ নিজ দেশে ইচ্ছাপ্রযুক্ত অন্যায় অপচয়। ইতালিই ধ্বংস করেছে ইতালিকে।' বাকি ইতালির সংস্কৃতিচেতনার পাশে সার্দিনীয়দের প্রত্যক্ষ বাস্তববোধের মধ্যে লরেন্স্ দেখেছেন সমাজতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষের সম্ভাবনা: 'সিসি-লির মানুষ এতই অতি সংস্কৃতিমান, সংবেদনশীল ও প্রাচীন ভাবাপন্ন, তার মনে এত বিচিত্র প্রবণতার খেলা যে স্থির একক কোনো মন বলতে তার কিছুই নেই। তার মন বলতে এক ডজন মন, আর সে-কথা সে জানেও, তা জেনেও সে অস্বস্তিবোধ করে, আর তার মধ্যে যে-কোনো একটা মনের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া আসলে নিজেকেও যেমন ঠকানো, তেমনই প্রতিপক্ষকেও ঠকানো। অন্যদিকে সার্দিনিয়ার মানুষের যেন একেবারেই একক শাদামাটা মন। আমি যেন মুখোমুখি এসে দাঁড়াই সমাজতন্ত্রে শাদামাটা নিঃসংশয় বিশ্বাসের। সিসিলিবাসী আমাদের পুরনো সংস্কৃতিতে এমনই পাকাপোক্ত প্রাচীন যে সে কিছুতেই সমাজতন্ত্রকে পুরোপুরি গিলতে পারবে না; সে এতই প্রাচীন ও চতুর যে যে-কোনো ও প্রত্যেক বিশ্বাসের প্রশ্নেই সে সূক্ষ্ম বিচারের পথে না গিয়ে পারে না। সে একটা হাউই বাজির মতো ফস করে জ্বলে উঠেই নিজের আগুনের বিরুদ্ধেই সংশয়ে তিক্ততায় ফুঁসতে থাকবে। পরে ভাবতে গেলে তার সঙ্গে সহানুভূতি বোধ করা যায়। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে এমনতরো আচরণ অসহনীয়।'

ভূগোল, ইতিহাস ও প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতি মিলিয়ে লরেন্স্ সার্দি-নিয়ার যে জীবনচিত্র রচনা করেছেন তার সারাৎসার আছে কয়েকটি ছত্রে। 'ইয়োরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে পথভ্রষ্ট, কারোরই অংশ নয়। কারোর অংশ নয়, কারোর অংশ ছিল না কোনোদিন। স্পেনের ও আরবদের এবং সবচেয়ে বেশি করে ফীনিশিওদের। কিন্তু কোনোদিনই যেন তার কোনো নিয়তি ছিল না। কোনো নিয়তি নয়। কাল ও ইতিহাসের বাইরে পরিত্যক্ত।'

মূলত বিদেশি শাসককুল ও তাদের দেশি প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ সরাসরি আন্দোলন বা অভ্যুত্থানের রূপ নিয়ে যেমন দমিত হয়, তেমনই আবার দস্যুবাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করে অন্য মাত্রা পায়। পাশাপাশি থেকে যায় স্পেনীয় খ্রিস্টান সংস্কৃতির দানস্বরূপ বছরের বিভিন্ন সময় ধর্মীয় উৎসব-শোভাযাত্রায় বর্ণাঢ্য আচারানুষ্ঠান, 'কার্নিভাল'। 'ব্যান্ডিটর্রি' ও 'কার্নিভাল'—একদিকে পাহাড়ে-জঙ্গলে ডাকাতদের গোপন আস্তানা থেকে সংগঠিত আক্রমণ ধনীদের বারবার বিপর্যস্ত করে, সাধারণ মানুষদের সমর্থনে পুষ্ট ডাকাতরা হয়ে ওঠে এক প্রতিবাদী মানসিকতারই ধারক; অন্যদিকে ধর্মসংঘের প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় আচার লোকসংস্কৃতির সহজাত সৃষ্টিশীলতায় জারিত হয়ে এক আপাত স্বচ্ছন্দ অথচ জটিল চারিত্র্য পরিগ্রহ করে, যাতে সংশয়ী বা প্রতিবাদী চেতনা প্রশমিত হয়, শান্তি পায় ব্যঙ্গ-কৌতুক-আমোদের

সুযোগে। কিন্তু এসবের পরেও শোষণ, অপমান, ব্যর্থতা, বঞ্চনা এবং যথার্থ বলিষ্ঠ কোনো প্রতিবাদে অক্ষমতা পরিবারের মধ্যে ক্ষমতার বিন্যাসে এবং প্রতিদৈনিক মেজাজে ও আচরণে একটা বিশেষ মানসিকতা তৈরি করে যাতে স্বাধীন, সংশয়ী চিন্তার সুযোগ চাপা পড়ে, সময়ে অসময়ে চণ্ডাল ক্রোধের আত্মপ্রকাশ তথা স্ফূর্তিতে বৈপ্লবিক চেতনার সাময়িক মুক্তি ঘটে, তারপর আবার সব মেনে নেওয়া যায়।

আনতোনিও গ্রামশির শৈশবে খানিকটা হয়তো অযত্নই ছিল। সন্তান-বাহুল্যে মা প্রথম দিকে তাঁর প্রতি ততটা দৃষ্টি দিতে পারেননি। আনতোনিওর জন্মের দু-বছর পরই ১৮৯৩ সালে তিনি তাঁর পঞ্চম সন্তান মারিও, ১৮৯৫ ও ১৮৯৭ সালে যথাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম সন্তান তেরেসিনা ও কার্লোর জন্ম দেন। বাড়িতে তরুণী এক পরিচারিকা ছিলেন—পরিচারিকা থাকাটা তখন সার্দিনিয়ার কোনো গ্রামে বা মফঃস্বল শহরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানমর্যাদার পরিচায়ক। সেই পরিচারিকার হেপাজতেই শিশু আনতোনিও বড় হচ্ছিলেন। চার বছর বয়সে এক দুর্ঘটনায় সিঁড়ি গড়িয়ে পড়ে গিয়ে আনতোনিওর মেরুদণ্ড গুরুতরভাবে আহত হয়। পরিচারিকা প্রথম কয়েকদিন ব্যাপারটা গোপন রাখেন। একটু দেরিতেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার পরামর্শ দেন, ইতালির মূল ভূখণ্ডে নিয়ে যাওয়ার। ফ্রানচেস্কো গ্রামশি অতটা গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শিশুর পিঠে ফোলা ও ব্যথার জন্য মা আয়োডিন দিয়ে মালিশ করতে থাকেন; মাসি যিশু-জননীর উদ্দেশে জ্বালানো প্রদীপের তেল শিশুর পায়ে মাখিয়ে দেন। পরে ডাক্তারের পরামর্শেই শিশুকে সীলিং-এর বীম-এর সঙ্গে একটা আংটার এক ফ্রেম লাগিয়ে তার থেকে ঝুলিয়ে রাখা হত। এইসব হাতুড়ে চিকিৎসায় কোনো ফল হয় না। গ্রামশি কুব্জপৃষ্ঠ হয়ে যান, প্রায় বামনই থেকে যান, দৈর্ঘ্যে কখনোই দেড় মীটারের বেশি বাড়েন না। গ্রামশি পরে লিখেছেন: 'আমি যখন চার বছরের শিশু তখন টানা তিনদিন ধরে আমার এমন হেমারেজ হত, যে আমি প্রায় রক্তশূন্য হয়ে পড়তাম। তার সঙ্গে চলত কাঁপুনি। ডাক্তাররা আমাকে খরচের খাতাতেই লিখে দিয়েছিলেন, প্রায় ১৯১৪ সাল পর্যন্ত মা বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন একটি ছোট্ট কাফন আর সেই পোশাক যাতে আমাকে কবরস্থ করা হবে কথা ছিল।' ১৮৯৭ সালে স্পষ্ট হয়ে যায় যে গ্রামশির মেরুদণ্ডের আঘাত আর সারবার নয়, তাতে তাঁর তখনই মৃত্যুভয় নেই, কিন্তু আজীবন তার ক্লেশকর জের তাঁকে টেনে বেড়াতে হবে, তিনি কোনোদিনই পুরোপুরি সুস্থ হবেন না।

ঐ ১৮৯৭ সালেই আরেকটা ঘটনা ঘটে যায় যা গ্রামশির জীবনে ঐ প্রথম শারীরিক আঘাতের মতোই আজীবন তাঁকে 'ক্ষতচিহ্নিত' করে রেখে যায়। স্থানীয় রাজনীতির দলাদলিতে প্রতিবেশী পাতিবুর্জোয়া সমাজের অন্যদের মতোই ফ্রানচেস্কো গ্রামশিও স্বভাবতই বেশ সক্রিয় ছিলেন। ১৮৯৭ সালের জাতীয় নির্বাচনে সোরগোনো যে নির্বাচনী ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল, তার

সংসদীয় আসনে দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে ফ্রানচেস্কো যাঁকে বেছে নিয়ে তাঁর সমর্থনে প্রচারে নেমেছিলেন, নির্বাচনে তাঁরই পরাজয় ঘটে। জয়ী সাংসদ নির্বাচনের পর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলে (যা তখনকার সার্দিনীয় রাজনীতিতে প্রথাগতই ছিল), ফ্রানচেস্কো-কে তাঁর বোকামি বা বেহিসেবিপনার দাম দিতে হয়। এক সরকারি তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপ, দলিল জাল ও জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁকে প্রথমে সঙ্গে সঙ্গেই সাসপেন্ড করা হয়; ১৮৯৮ সালের ৯ অগস্ট তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়; ১৯০০ সালের ২৭ অক্টোবর বিচারান্তে তাঁকে পাঁচ বছর আট মাস বাইশ দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ফ্রানচেস্কো সাসপেন্ড হবার সঙ্গে সঙ্গেই জিউসেপ্পিনা সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। সোরগোনোর পাট তুলে গ্রামশি পরিবার চলে যান গিলার্ৎসায়, যেখানে জিউসেপ্পিনার পিত্রালয়। জিউসেপপিনার বোন গ্রাৎসিয়া দেলোগুর বাড়িতেই তাঁরা প্রথমে ওঠেন। স্বামীর আত্মীয়স্বজন বা নিজের প্রাক্-বৈবাহিক আত্মীয়স্বজনেব কাছেও হাত পাততে জিউসেপ্পিনা প্রস্তুত ছিলেন না। নিজের পৈতৃক সম্পত্তির অন্তর্গত জমি বেচে দিয়ে বাড়িতে ভাড়াটে বসিয়ে, অহরহ সেলাইযের কাজ করে জিউসেপ্পিনা সংসার চালাতে থাকেন, যতদিন না ফ্রানচেস্কোর মামলার নিষ্পত্তি হয়, ততদিন উকিল-আদালতের খরচাও টানেন। পরবর্তী জীবনে আনতোনিও বোনকে লেখা এক চিঠিতে লেখেন : 'মা যদি অন্য রকম হতেন, কে জানে শৈশবে আমাদের কী ভয়ংকর পরিণতি হত? আমরা কেউই হয়তো আজ জীবিত থাকতাম না।'

একা সংসার চালানোর দায়দায়িত্বের সঙ্গেই জিউসেপ্পিনার ওপর চেপেছিল আরেক দায়—পরিবার তথা সন্তানসন্ততির কাছ থেকে ফ্রানচেস্কোর কেলেংকারি গোপন করার দায়। সেই চেষ্টায় অনেক ছোট ছোট মিথ্যাচারে তাঁকে লিপ্ত হতে হয়েছিল। পিতা সম্পর্কে অস্বস্তিকর নীরবতা ও মায়ের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির মধ্যেও আনতোনিও পরবর্তীকালে শ্যালিকা তাতিয়ানাকে এক চিঠিতে কারান্তরাল থেকেই লিখেছিলেন : 'আমি যে কারাগারে আছি তা দেলিও-কে [আনতোনিওর পুত্র—শ.ব.] কেন বলা হয়নি আমি বুঝতে পারছি না; কেন কেউ ভাবেনি যে পরে যদি পরোক্ষ কোনো সূত্রে ও জানতে পারে, শিশুর পক্ষে যা অত্যন্ত অসুখকর হতে পারে, যাতে সে সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে যারা তাকে শিক্ষা দান করছে তাদের সকলের প্রতি, ফলে নিজের মতো করে তা নিয়ে ভাবতে গিয়ে সে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। অন্তত শৈশবে তো আমার সেই অভিজ্ঞতাই হয়েছিল। আমার তা সম্পূর্ণ মনে আছে। ···আমার স্পষ্ট মনে আছে, হয়তো আমার পক্ষে কষ্টকর হতে পারে ভেবেই তথ্য গোপনের জন্য যেসব মিথ্যাচার আশ্রয় করা হয়েছিল, তা আবিষ্কার করে আমি কেমন ক্ষুব্ধ বোধ করেছিলাম এবং সেই অভিজ্ঞতাই আমাকে আমার নিজের মধ্যে

গুটিয়ে গিয়ে সবকিছু থেকে সরে যেতে প্ররোচিত করেছিল। দশ বছর বয়স নাগাদ খোলাখুলি সত্যের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণে, এবং সেই আকর্ষণের তাড়নায় যে-সব ভয়ংকর বিবাদ-বিসংবাদ-কেলেংকারি ঘটত, তাতে আমি মাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলাম।' এই গোপনীয়তার কারণে মায়ের প্রতি একটা ক্ষোভও গড়ে উঠেছিল স্বভাবতই, কিন্তু তাতেও এই মহিলার কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতা কিছুমাত্র কমেনি আনতোনিওর, বরং পরে অন্য একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: 'আমি যা জানতাম মা যদি জানতেন আমি তা সব জানি, আর সেই অভিজ্ঞতা আমায় কীভাবে ক্ষতচিহ্নিত করে গেছে, তাতে তাঁর জীবন বিষময় হয়ে উঠত।' ফ্রানচেস্কো গ্রামশির কেলেংকারির ব্যাপারটা তাঁর সন্তানদের মধ্যে পুরোপুরি জানতেন একমাত্র জেন্নারো যাঁর বয়স তখন পনেরো। তাঁকে স্কুল ছাড়িয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে এনে বলে দেওয়া হয়, কাজ করে সংসার চালানোর দায়ের অংশ তাঁকে কাঁধে তুলে নিতে হবে। স্বভাবতই পরিবারের জীবনযাত্রায় দারিদ্র্যের প্রবল অভিঘাত এসে পড়ে। গ্রামশি-জননী ও তাঁর কন্যারা সেলাইয়ের কাজ করে খানিকটা অর্থ সংগ্রহ করেন। তবে গ্রামশি পরিবার কোনোদিনই অনাহার, অনশন বা দারিদ্র্যের তেমন কোনো ভয়াবহ পরিণামে পতিত হননি, যদিও আনতোনিওর জীবনে এই দারিদ্র্য অন্য একটা যন্ত্রণার কারণ হয়। গ্রামশি পরিবারের পূর্বতন সামাজিক মর্যাদা তথা সম্ভ্রম ভেঙে পড়ায় আনতোনিওর শারীরিক অক্ষমতা তথা বিকৃত আকার তাঁর সমবয়সি কৃষকসন্তানদের কাছে আরো কুৎসিত পরিহাস ও কৌতুকের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। ফ্রানচেস্কো ও তাঁর শ্রেণী অর্থাৎ পাতিবুর্জোয়াদের আচার আচরণ ও ক্রিয়ায় বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকশ্রেণী ফ্রানচেস্কোর পতনে যে আনন্দ পান তারই প্রকাশ ঘটে আনতো-নিওর নিপীড়নে। সাত বছর বয়সে স্কুলে প্রবেশের আগে ও পরে স্কুলেও ব্যঙ্গ পরিহাস অপমানের লক্ষ্য হতে হতে আনতোনিও ক্রমেই বিচ্ছিন্ন একা হয়ে পড়তে থাকেন। অবশ্য কোথাও যেন বা নিজের সামর্থ্য প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করার তাগিদেই স্কুলের পাঠে-পরীক্ষায় তিনি নিরবচ্ছিন্ন প্রথম স্থান লাভ করেন। অন্যদিকে তিনি বোন তেরেসিনা ও ভাই মারিও-র সঙ্গ ও সাহচর্য, এক দঙ্গল পোষা পশুপাখি, ছবি আঁকা, মডেল তৈরি ও বই পড়া, এই নিয়েই জীবন ভরে তোলেন। ছবি আঁকা, মডেল তৈরি ও বই পড়া. তিনটিতেই এক ধরনের রোম্যানটিক কল্পনাবিলাস যেমন ছিল. তেমনই ছিল জনপ্রিয় শিল্পসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতির আদলের আকর্ষণ। গ্রামশি-র ছোটবেলায় পড়া বইয়ের তালিকায় ছিল ডিফো-র 'রবিনসন ক্রুসো', রবার্ট লুই স্টীভেনসন-এর 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড', কিপলিং-এর গল্প, 'আঙ্কল্ টম্স্ ক্যাবিন', 'পিনোচ্চিও', গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় সংগৃহীত রূপকথা, জল-দস্যুদের সম্পর্কে এমিলিও সালগারির উপন্যাসাবলি। পাশাপাশি ছিল আমাদের বটতলা সাহিত্যের সগোত্র ব্যঙ্গ-রচনা বিশেষত ব্যঙ্গকবিতা যা আবার মুখে মুখে প্রচারিত রচনারই মুদ্রিত সংস্করণ। কারান্তরালে বসে গ্রামশি

তাঁর মা-কে লেখা একটি চিঠিতে এমনই একটি পুস্তিকার কপি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে লেখা এই জনপ্রিয় ব্যঙ্গ-কবিতা—'মাস্তুদ্দাস-এর জনগণকে ব্রাদার আনাতওগু ধর্মচ্যুত ঘোষণা করলেন'—অবলম্বন করে গ্রামশি লিখতে চাইছিলেন তাঁর বাল্যকালে দেখা পড়শি প্রতিবেশীদের এক ব্যঙ্গাত্মক চরিত্রমালা। মারিও ও তেরেসিনার সঙ্গে আনতোনিও-র খেলাধুলোর মাঝে মাঝেই তাঁরা রচনা করতেন, অভিনয় করতেন এমনই এক একটি ব্যঙ্গচিত্র। প্রত্যক্ষ গ্রাম-পরিবেশ থেকে যতই এই পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন, পাতিবুর্জোয়া সমাজ ও নিম্নবর্গ শ্রেণী উভয়েরই বিরাগ, অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের শিকার হচ্ছেন, নিজেরা নিজেদের সাহচর্যেই আশ্রয় ও সংহতি খুঁজছেন, ততই একটা প্রতিবাদী ব্যঙ্গের মাত্রা তাঁদের খেলায় ও সৃষ্টিতে তীব্র হয়ে উঠছে। গ্রামশি যে ছবি আঁকছেন তাতেও একটি সমগ্র চিত্রমালা জুড়ে এক প্রবল পরাক্রমী ছাগল বারাবুক্কো তার যাবতীয় শত্রুদের। এবং বিশেষত সেইসব ছেলেদের যারা অহরহ তাকে খেপিয়ে পাগল করে। অঙ্কিত শিঙের গুঁতোয় শূন্যে নিক্ষেপ করে। ক্ষোভ ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্যেও শান্তি ও সুখ ছিল স্কুলের পরীক্ষায় সাফল্যে, পরিবারের সকলেরই তাঁর প্রতি বিশেষ যত্নে ও আদরে। তেরেসিনা পরে স্মরণ করেন: 'আমরা অবিশ্বাস্যভাবে সাশ্রয় করতাম। আমার মনে আছে, গ্রাৎসিয়েত্তা, এমমা ও আমি মোমবাতির গলে ঝরে পড়া মোম বাঁচিয়ে তুলে রাখতাম, তারপর সেই মোম দিয়ে নিনো [অর্থাৎ আনতোনিও]-র জন্য ছোট ছোট মোমবাতি তৈরি করে দিতাম যাতে ও রাত্রে পড়াশোনা করতে পারে।'

এই সবের মধ্যে ও স্কুলে তাঁর কৃতিত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন গ্রামশি পুত্রকে লেখা এক চিঠিতে: 'তোমার বয়সে আমি ছিলাম খুবই উচ্ছৃঙ্খল। গ্রামের মধ্যে ছন্নছাড়াভাবে ঘুরে বেড়িয়েই আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতাম। তবুও পড়াশোনায় ভালোই করতাম, সে আমার চমৎকার, প্রখর স্মৃতিশক্তির গুণে, আর এতই সজাগ ছিলাম আমি যে কোনো-কিছুই আমায় এড়িয়ে যেতে পারত না, যা স্কুলের পক্ষে খুবই জরুরি ছিল। তবে পুরো সত্যটা তোমায় বলতে গেলে আরো একটা কথা যোগ করতে হবে। আমি এতই চালাক-চতুর ছিলাম যে খুবই অল্প পড়েও বিপদে পড়লে তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে বার করে আনার উপায় আমার জানা ছিল। কিন্তু যে স্কুল ব্যবস্থায় আমি প্রবেশ করেছিলাম, তা ছিল অতীব পশ্চাদ্‌পদ। তা ছাড়াও আমার সহপাঠীদের প্রায় সকলেই যে ইতালীয় বলত তা খুবই অপটুভাবে আর তাও বেশ কষ্ট করে। তাতেই আমার সুবিধে হয়ে গিয়েছিল, কারণ আমাদের মাস্টারমশাইকে তো গড়পড়তা ছাত্রের মানটা মাথায় রাখতেই হত। আর, ইতালীয় বলতে জানাটাই অনেক কিছু সহজ করে দিয়েছিল (আমাদের স্কুলটা ছিল গ্রামে, আর ছাত্রদের বড় অংশটাই কৃষক-বংশোদ্ভূত)।' শ্রেণীর ব্যবধান শুধু যে ভাষার স্তরে মূর্ত হচ্ছে, তা-ই

নয়, শ্রেণীর লড়াইয়ে রাজভাষায় দক্ষতা তথা অধিকার কর্তৃত্বব্যঞ্জক হয়ে উঠছে, এ-অভিজ্ঞতা গ্রামশি-র জীবনে এসে পড়ছে এই বালক বয়সেই।

১৯০৪ সালে ফ্রানচেস্কো কারার মেয়াদ পূর্ণ হবার কিছু আগেই ছাড়া পেয়ে ফিরে এলে আনতোনিওর সঙ্গে একটা সংঘর্ষ বেধে যায়। এদিকে জেন্নারো অবশ্যকৃত্য সামরিক প্রশিক্ষণে নিয়োজিত হওয়ায় এবং আরেকটি বাড়তি মুখের খাবার জোগানোর জন্য রোজগার বাড়ানোর প্রয়োজনে ফ্রানচেস্কো আনতোনিও-কে জোর করে স্কুল ছাড়িয়ে কাজে লাগিয়ে দেন। গ্রামশি পরে লেখেন: 'আমি এগারো বছর বয়সে কাজ করতে শুরু করি। রবিবার সকাল সমেত রোজ দশ ঘণ্টা কাজ করে আমি মাসে পুরোপুরি নয় লিরা আয় করতাম, যার থেকে দিনে এক কিলো রুটির জোগান হত। আমার কাজ ছিল রেজিস্টার খাতা বয়ে নিয়ে বেড়ানো, যার এক একটার ওজন ছিল আমার ওজনের চেয়ে বেশি। আমার সারা শরীর যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেত, গোপনে কাঁদতে কাঁদতে আমার অনেক রাত কেটে যেত।' পরে গ্রামশি বলেছেন: 'অনেক দিন পর্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল, আমায় যে কেউ কখনও ভালোবাসবে, তা একেবারেই অসম্ভব, মারাত্মক অসম্ভব।... আমি যখন দশ বছরের বালক তখনই আমার মা-বাবা সম্পর্কেই আমি এই-ভাবে ভাবতে থাকি। আমার শারীরিক অবস্থা এতই ক্ষীণবল, আমায় ক্রমাগত এত আত্মত্যাগ করতে হয় যে আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যায় যে আমি এক বোঝা, আমার নিজের পরিবারেও আমি বহিরাগত। এগুলো এমন সব চিন্তা যা মানুষে সহজে ভোলে না, যা অনেক গভীরে এমন দাগ রেখে যায় যা সহজে কেউ ভাবতেও পারে না।

জমি রেজিস্ট্রি অফিসে কাজ করতে করতেও আনতোনিও যেটুক সময় পান, তা ব্যয় করেন লাতিন ভাষা শিক্ষায়—তাও মাধ্যমিক স্কুল উত্তীর্ণ এংসিও কামেদ্দার কাছে, আনতোনিওর মতোই কুব্জ, যেটুকু নিজে জানেন তা শিখিয়ে দিতে কার্পণ্য করেন না। সঙ্গে সঙ্গেই আনতোনিওর মনের মধ্যে একটা 'প্রতিবাদী প্রবৃত্তি' জাগতে থাকে: 'সব বিষয়ে দশের মধ্যে দশ পেয়েও আমি আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারব না, অথচ কশাইয়ের ছেলে, বৈদ্যর ছেলে, দর্জির ছেলে, সব ধনীর ছেলেই সেই সুযোগ পাবে!'

দু বছর পর ১৯০৬ সালে আনতোনিও আবার পড়াশোনায় ফিরে আসার সুযোগ পেলেন সানতুলুস্সুরজিও শহরের জিন্নাসিও বা মাধ্যমিক স্কুলের তৃতীয় বর্ষের পাঠক্রমে নতুন করে যোগ দিলেন তিনি। ফ্রানচেস্কো ততদিনে গিলার্ৎসায় আবার নিজের জায়গা করে নিয়েছেন—জমি রেজিস্ট্রি অফিসেই তিনি এক ছোটখাটো কেরানির কাজ পেয়ে যান যার মাইনেয় তার বাকি জীবন স্বচ্ছন্দেই কেটে যায়। গিলার্ৎসা থেকে আঠারো কিলোমিটার দূরে সানতুলুস্সুরজিও। সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত স্কুলটির মান যেমন শোচনীয়, তেমনই শোচনীয় গ্রামশির বাস-পরিবেশ, অর্থাৎ যে পরিবারটির সঙ্গে মাসে পাঁচ লিরা ভাড়ার কড়ারে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা

হয়েছিল তার জীবনযাত্রার মান ও ধরন। মাত্র তিনজন শিক্ষক—তাঁদের কেউই যথোপযুক্ত শিক্ষিতও নন—পাঁচটি ক্লাস পড়ান, তাও খুবই অনিয়মিত-ভাবে—এমন ব্যবস্থায় স্বভাবতই গ্রামশির শিক্ষার মানও খুব নিচুই থেকে যায়। প্রতি শনিবার সকালে গ্রামশি তখন গিলার্‌ৎসায় চলে আসেন, হয় ঘোড়ায় টানা কোচগাড়িতে, নয় অনেক সময়ই পায়ে হেঁটে। আবার সোমবার সকালে সানতুলুস্‌সুরিজিওতে ফিরে আসেন। সপ্তাহান্তে ঐ দুটো দিনে বাড়িতে বাবা-মার সঙ্গে ছোটখাটো বাদবিসংবাদ লেগেই থাকে। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য গ্রামশির রাজনৈতিক বিবর্তনে আরেকটা ঘটনা ঘটতে শুরু হয়ে গেছে। জেন্নারো তুরিনে তাঁর অবশ্যকৃত্য সামরিক প্রশিক্ষণ ও চর্চার মধ্যেই শিল্পনগরী তুরিনের সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছেন, ঐ ধ্যানধারণায় পুষ্ট পুস্তিকা ও পত্রপত্রিকা, বিশেষত 'আভান্তি' পত্রিকা নিজে কিনতে শুরু করেছেন, নিজের পড়া হয়ে গেলে ডাকযোগে তা আনতোনিওকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ফ্রানচেস্কো তা পছন্দ করেন না, একবার রাজনীতির কারণেই হেনস্তা হয়ে তিনি আর বাড়িতে কোনো বিপজ্জনক রাজনীতি ঢুকতে দিতে চান না। তাঁর আপত্তিতে কাজ হয় না. ঐ একটা কেলেংকারি তাঁকে নৈতিকভাবে এমন অশক্ত করে রেখে গেছে যে তাকে পরোয়া না করেই আনতোনিও সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় তাঁর প্রথম পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন। সেলাই করে সামান্য বাড়তি উপার্জন থেকে বাঁচিয়ে বোনেরা ও মা আনতোনিওকে মাঝে মাঝে যেটুকু শুকনো খাবার বা তেল জোগান দেন তার অনেকটাই আনতোনিও বেচে দিয়ে বই কেনেন, মা তা ধরেও ফেলেন।

আনতোনিও গ্রামশির অনুসন্ধিৎসা আরো একটি ঐতিহাসিক ঘটনায় তীব্রতা লাভ করে। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মে-জুন মাসের মধ্যে সার্দিনিয়ার রাজধানী কাইলিয়ারি থেকে শুরু করে সমগ্র সার্দিনিয়া জুড়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদী আন্দোলনের এক প্রবাহ উত্তাল হয়ে ওঠে। ডক শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, বেকার শ্রমিক, মহিলা তামাক-শিল্প শ্রমিকেরা সংগঠিত হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র দাবি নিয়ে যে-সব আন্দোলন শুরু করেন, তার ঢেউ বিভিন্ন শিল্পে, বিভিন্ন কারখানায়, বিভিন্ন খামারে আরো স্থানীয়, আরো বিশেষ দাবি কেন্দ্র করে আন্দোলনের ঢেউ তোলে। একই সঙ্গে এতগুলি স্বতন্ত্র আন্দোলন এই যে মিলিত অভ্যুত্থানের রূপ নেয়—যাকে অনেক সময় ১৯০৬ সালের সার্দিনীয় বিপ্লব বলে বর্ণনা করা হয়েছে—তার পিছনে একটা ঐতিহাসিক চাপ যেমন ছিল, তেমনই ছিল উমবের্তো কাও-এর ভূমিকা। 'ইল্ পায়েসে' নামে তাঁর পত্রিকা অবলম্বন করে তিনি বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষোভের এই প্রথম সংগঠিত আত্মপ্রকাশকে একটা বিশেষ দিকে পরিচালিত করতে প্রয়াসী হন।

কাও-এর লক্ষ্য ছিল কাইলিয়ারির মেয়র ওত্তোনে বাকারেদ্দাকে ক্ষমতা-চ্যুত করা। কোনো অর্থেই তিনি কোনো বামপন্থী চেতনার ধারক ছিলেন না, বরং জানা যায়, পরে তিনি ফ্যাশিবাদী চরিত্রই হয়ে গেছেন। কিন্তু বিভিন্ন

স্তর ও ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষের যে দাবিগুলিকে তিনি তুলে ধরেছিলেন, তার মধ্যে কোনো মিথ্যা ছিল না; গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনি যে ঐক্য রচনা করতে পেরেছিলেন তার কৃতিত্বও কিছু কম নয়। ১৯০৬-এর ১৩ মে কাইলিয়ারিতে প্রথম গুলি চলে: বাইশ জন আহত হন, দুজনের প্রাণহানি হয়; তাঁদের মধ্যে সকলেই হয় শ্রমিক নয় জেলে, একজন ছিলেন কেরানি। মে-জুন দু মাস ধরে সারা সার্দিনিয়া জুড়ে বিভিন্ন গ্রামে শহরে সরকারি কর দপ্তরে, কারখানায়, রেলওয়ে স্টেশনে গণবিক্ষোভ অগ্নি সংযোগ ও ধ্বংসকাণ্ডের রূপ নেয়; পুলিশ, সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীও নির্বিচার গুলিচালনায় তার মোকাবিলা করে। জুলাই-এর মধ্যেই আন্দোলন দমিত হয়, শত শত বন্দী শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীর বিচার চলে ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত। কাও মূল ভূখণ্ডস্থিত ইতালীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের দমনমূলক এই ভূমিকার সঙ্গে সার্দিনিয়ায় ইতালির অর্থনৈতিক শোষণের বৃত্তান্তকে যুক্ত করে সার্দিনিয়ার স্বায়ত্ত-শাসনের সপক্ষে এক মনোভাব সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হন। 'সার্দিজুমো' বা সার্দিনিয়াবোধের এই জাতীয়তাবাদী আবেগ ষোলো বছর বয়সি মধ্য-স্কুল পড়ুয়া আনতোনিও গ্রামশিকেও নাড়া দিয়েছিল। তিনি পরে লেখেন: 'আমি তখন মনে করতাম সার্দিনিয়ার জাতীয় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন অতি আবশ্যক। আমি নিজে কতবার উচ্চারণ করেছি: মহাদেশবাসীরা! ফিরে যাও।' ইতালির উত্তর ও দক্ষিণ, গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিরোধ ও বৈষম্যের যে প্রশ্নগুলি গ্রামশির পরবর্তী জীবনের রচনায় অনেকটা স্থান করে নেয়, সেই প্রশ্নগুলি এই সময়েই তাঁর মনে উঠতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গেই ইতালি ও পৃথিবীর ইতিহাসপাঠে তাঁর আগ্রহ বেড়ে যায়। শেষ জীবনে পুত্র দেলিওকে লেখা এক চিঠিতে গ্রামশি লেখেন: 'আমি নিশ্চিত যে ইতিহাস তোমার ভালো লাগবে, যেমন আমার ভালো লাগত যখন আমি তোমার বয়সি ছিলাম; কারণ ইতিহাস মানুষের জীবন বিষয়ে, মানুষ সংক্রান্ত সব-কিছু বিষয়ে, যত মানুষ সম্ভব সবার বিষয়ে—পৃথিবীর সমস্ত মানুষ, সমাজে তাদের সংঘবদ্ধ জীবন, তাদের কাজ, উন্নততর জীবনের জন্য তাদের সংগ্রাম, এইসব বিষয় নিয়ে। অন্য যে-কোনো একক বস্তুর চেয়ে যে এই ব্যাপারটা তোমার বেশি ভালো লাগবে, সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।' ১৯০৮ সালে গ্রামশি যখন মাধ্যমিক স্কুল ব্যবস্থার শেষ পরীক্ষায় বসেন, তাতে ইতিহাসেই তিনি সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সান্তু-লুস্সুরজিও-এর স্কুলের যে হাল, তাতে গ্রামশি যে খুব ভালো একটা ফল করবেন না, তা অবধারিতই ছিল। মোটের উপর কাজ চলা গোছের ফল করেই গ্রামশি এবার সার্দিনিয়ার রাজধানী কাইলিয়ারি-তে চলে এসে জিওভান্নি মারিয়া দেত্তোরি লিচিও-তে ভর্তি হন। এখানে তখন জেন্নারো এক বরফের কারখানায় ক্যাশিয়ারের চাকরি করছেন। তাঁরই সঙ্গে এক বাড়িতে গ্রামশির বাস নির্দিষ্ট হয়। জেন্নারোর মাসিক একশো লিরা মাইনে, তার

সঙ্গে যুক্ত হয় গিলার্ৎসা থেকে অনিয়মিত পাঠানো সামান্য অর্থ, তাতেই প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে দুই ভাই-এর সংসারযাত্রা চলে। চাপটা বেশি পড়ে জেন্নারোর ওপরেই, তাতে অস্বস্তি বোধ করে আনতোনিও সকালের কফি খাওয়া ছেড়ে দেন, দিনে একবার মাত্র খাওয়ার রীতিতে মানিয়ে নেন। সহপাঠীদের সঙ্গে ন্যূনতম সামাজিকতার সংগতি না থাকায় গ্রামশিকে স্বভাবতই কফির আড্ডা বা বিলিয়ার্ড খেলার অবসর যাপন পরিহার করেই চলতে হয়, একা হয়ে যেতে হয়। সান্তুলুস্সুরজিও-র পড়াশোনার হাল থেকে গ্রামশি যতটা পিছিয়ে পড়েছিলেন, তার সামাল দিতেও অনেকটা বাড়তি পরিশ্রম হয়। একদিকে পরিশ্রম, অন্যদিকে অভাবে-দারিদ্র্যে কম খেয়ে বা না খেয়ে সামাল দিতে গিয়ে গ্রামশির শরীর-স্বাস্থ্য আরো ভাঙে। ১৯১০ সালে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল ভালো হতে থাকে। নতুন যে-বিষয়গুলি এই পাঠক্রমের অঙ্গরূপে তাঁকে আকৃষ্ট করতে থাকে এবং যাতে তিনি চমৎকার নম্বর পেতে থাকেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রীক সংস্কৃতি ও ভাষা. লাতিন ভাষা, পদার্থবিদ্যা, প্রাণবিজ্ঞান, দর্শন। ইতিহাসে তাঁর আত্যন্তিক অনুরাগ অব্যাহত থাকে।

কাইলিয়ারির স্কুলে প্রথম দিকে ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকের পদটি খালি ছিল। ১৯১০ সালের মাঝামাঝি রাফ্ফা গার্ৎসিয়া ঐ পদে এসে যোগ দেন। সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে গার্ৎসিয়ার একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল কাইলিয়ারি শহরে। তাঁর বয়স তখন তেত্রিশ, গ্রামশির একুশ। তিনি লেখক হিসেবে সার্দিনীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হয়ে উঠেছেন তখন, তা ছাড়াও সার্দিনিয়া দ্বীপের বহুলপঠিত 'উনিওনে সার্দা' পত্রিকার ম্যানেজারও তিনি। ১৯১০ সালের জুলাই মাসে আনতোনিও তাঁর শিক্ষক গার্ৎসিয়ার কাছে গ্রীষ্মাবকাশের জন্য একটি চাকরি চেয়ে বসলে গার্ৎসিয়া তাঁকে গিলার্ৎসা-র কাছে আইদোমাগ্গিওরে গ্রামে তাঁর পত্রিকার প্রতিবেদকের সঙ্গে গ্রামশিকে লেগে যেতে বলেন। ২৬ জুলাই 'উনিওনে সার্দা' পত্রিকায় গ্রামশির প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। গার্ৎসিয়ার আস্থা ও সামান্য অর্থাগমও গ্রামশিকে অনেকটা মনোবল দেয়।

কাইলিয়ারিতে তিন বছরের স্কুলজীবনে শুধু গার্ৎসিয়া নন, ভিত্তোরিও আমাদেও আরুল্লানি, কোসতান্তে ওন্দোনে বা ফ্রানচেস্কো মাক্কারোনে-র মতো অন্য শিক্ষকেরাও আনতোনিওর মেধার পরিচয় পেয়ে তাঁকে নানাভাবে উৎসাহিত করতে থাকেন। বাড়িতে দারিদ্র্যের চাপ অব্যাহত থাকলেও স্কুলে যে স্বীকৃতির স্বাদ তাঁকে নতুন শক্তি দেয়, তা-ই তাঁর প্রেরণাস্থল হয়ে ওঠে। আনতোনিও গ্রামশির জীবনীকার জিউসেপ্পে ফিওরি-কে আনতোনিও-ভ্রাতা জেন্নারো বলেন : 'ও সব-কিছু পড়ত। আমি তুরিনে আমার সামরিক কর্তব্যকর্মের মেয়াদ শেষ করে ফিরে এসেছিলাম জঙ্গি সমাজবাদী হয়ে। ১৯১১ সালের শুরুতে আমি কামেরা দেল লাভোরো-তে কোষাধ্যক্ষের

দায়িত্ব পাই, স্থানীয় সোশালিস্ট পার্টি'র সম্পাদক নির্বাচিত হই। ফলে সার্দিনিয়ার সোশালিস্ট আন্দোলনের তরুণ নেতা কাভাল্লেরা, বার্তোল্লি ও পেস্কির সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হয়, মাঝে মাঝে নিনো-ও [আনতোনিও গ্রামশি-র ডাক নাম—শ. ব.] আমার সঙ্গে থাকে। বাড়িতে জমে থাকে বিপুল পরিমাণ বই, পত্রপত্রিকা, ইশতেহার, প্রচারসামগ্রী। নিনো বেশির ভাগ সন্ধেই বাড়িতে কাটিয়ে দেয়. চৌকাঠ পেরিয়ে এক পা বেরোয় না। সব বই, পত্রপত্রিকা ও দ্রুত পড়ে ফেলে।' স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ফেডারেশন কামেরা দেল লাভোরো বা চেম্বার অফ লেবর-এর কার্যধারা কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন আনতোনিও. সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে চলেছেন যাবতীয় পত্র-পত্রিকা যাতে প্রতিফলিত হচ্ছে সমকালীন রাজনীতির যাবতীয় প্রশ্ন, তর্ক, লক্ষ্য। রাজনীতি বলতে একদিকে সার্দিজমো বা সার্দিনীয় জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে নানা জাতের নানা ভঙ্গির সমাজবাদ : আর তারই মধ্যে গ্রামশির চোখে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছেন বেনেদেত্তো ক্রোচে (১৮৬৬-১৯৫৪), গায়েতানো সালভেমিনি (১৮৭৩-১৯৫৭), এমিলিও চেক্কি (১৮৮৪-১৯৪৪)—'ইল মাৎ'সোক্কো', 'লা ভোচে দেল পোপোলো' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত এঁদের লেখা কাগজ থেকে সযত্নে কেটে গ্রামশি তাঁর ফাইলে জমিয়ে রাখেন। খাস ইতালির বৈষম্যমূলক প্রশাসনে ও শোষণে সার্দিনিয়ার অবমাননা, দুর্ভোগ ও অর্থনৈতিক অবনমনে যে ক্ষোভ জমা হয় তা স্বভাবতই সার্দিনীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। সঙ্গে সঙ্গেই ইতালির শিল্পোন্নয়নকে পুষ্ট করতেই সার্দিনিয়াকে অবহেলা করা হচ্ছে নয়তো কেবলমাত্র ইতালির জোগানদার হিসেবেই ব্যবহার করা হচ্ছে, এই বোধ থেকেই যন্ত্রশিল্প, শিল্পশ্রমিক, গণতন্ত্র. 'প্রত্যক্ষবাদ, জ্ঞানচর্চা, বাস্তববাদী শিল্প, ঐতিহাসিক তত্ত্বপদ্ধতি, বস্তুবাদ, গণতন্ত্রের বুর্জোয়া সমবায়িক ধারণা···কার্বলিক অ্যাসিডের, তেল আর ঘামের দুর্গন্ধ, যন্ত্রের আওয়াজ, ব্যবসার খেলা', এই সবই 'লা ভোচে' পত্রিকার আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ইতালির দ্রুত শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যপূরণে প্রধানমন্ত্রী জিওভান্নি জিওলিত্তির নেতৃত্বাধীন ইতালীয় সরকার ইতালির উত্তরখণ্ডে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর বহু দাবি সহজেই মেনে নিয়ে বামপন্থী প্রতিপক্ষের পায়ের তলার মাটি নড়িয়ে দেন, ইতালীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষকেও নিজেদের ক্ষমতার আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেন ১৯১১-১২ সালে লিবিয়ার বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তার দাম দিতে হয় সার্দিনিয়ার কৃষকদের। সঙ্গে সঙ্গেই বেকারি ও দ্রব্যমূল্যও ক্রমশই বাড়তে থাকে সার্দিনিয়ায়—সমুদ্রপথে যোগাযোগ. টেলিকমিউনিকেশনও প্রায়ই ভেঙে পড়ে, তখন সার্দিনিয়া ইতালি তথা বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯১০ সালের জুলাই মাসে ইতালীয় সরকারের উদাসীনতা ও অসহযোগিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কাইলিয়ারির মেয়র ও তাঁর কাউনসিলের পদত্যাগ. নভেম্বরে ইতালীয় পার্লামেণ্টের সোশালিস্ট সদস্য গুইদো পোদ্রেক্কার সার্দিনিয়া সফর ও বিভিন্ন

শহরে ভাষণ দান, ডিসেম্বরে মহামারী-রূপে মেনিনজাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাবে চিকিৎসাব্যবস্থার অপ্রতুলতায় প্রচণ্ড মৃত্যুহার, ১১ ডিসেম্বর জিনো পেস্কির আহ্বানে চেম্বার অফ লেবর-এ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমাবেশে ভাড়া ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে অভিযান কমিটি গঠন, এই ঘটনাপরম্পরায় প্রকট হয়ে ওঠে সার্দিনীয় জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদী ভাবনার উত্থানের পৃষ্ঠপট। সালভেমিনির সমাজবাদ-বিরোধিতা ও ক্রোচের কর্মবাদ যুক্ত হয়ে এক ধরনের বিপ্লবী সিন্ডিক্যালইজ্‌ম্‌-এর রূপ পরিগ্রহ করে 'ইল ভিয়ানদানতে' পত্রিকার মতাদর্শ হয়ে ওঠে। ১৯১১ সালে গ্রামশি এই পত্রিকার গ্রাহক হয়ে যান। একদিকে সালভেমিনি সোশালিস্ট পার্লামেণ্টেরিয়ানদের ক্ষমতালিপ্সা (যার তাড়নায় তারা হয়ে উঠেছে 'তাদের ভোটদাতাদের সংকীর্ণ স্বার্থের মুখপাত্র, তাদের সমর্থনের প্রতিদানে পুঁজিবাদী সরকার তাদের কী উচ্ছিষ্ট ছুঁড়ে দেবে তারই প্রত্যাশায় তাদের টেবিলের পাশে কুকুরের মতো অপেক্ষমান'), স্বার্থসন্ধান এবং দক্ষিণ ইতালি ও সার্দিনিয়ার কৃষকদের প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে ১৯১০ সালে সোশালিস্ট পার্টি ত্যাগ করেছেন ; অন্যদিকে ক্রোচে তাঁর 'ফিলোসোফিয়া দেল্লা প্রাতিকা' প্রবন্ধে ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠা করছেন, ঐতিহাসিক বা নৈতিক বিকাশের কোনো পূর্বনির্দিষ্ট ধারা নেই ; এমন কোনো চূড়ান্ত সত্য নেই যা মানুষকে সন্ধান করে যেতে হবে বা অনুসরণ করতে হবে। যা আছে তা হল, যা-কিছু বর্তমান তাকেই পালটে দেবার এক প্রবল অব্যাহত অভীপ্সা। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য ক্রোচে একথাও বলেছেন যে 'মঙ্গলের অভীপ্সায়' পৌঁছতে এবং সেই অভীপ্সাকে কার্যকর করতে গেলে মানুষকে বিচারশক্তি, জ্ঞান ও সর্বোপরি নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে আত্মজ্ঞান আয়ত্ত করে নিজেকে শাসন করতে হবে ; এবং সেই শাসনপ্রয়াস 'কঠোর শ্রমের ব্যাপার, যেমন শ্রমের ব্যাপার জীবনমাত্রই, বিশেষত "মধুর জীবন"।'

গ্রামশির সার্দিজমো বা সার্দিনীয় সংস্কৃতিপ্রেম কখনোই তাই বলে অন্ধ ভক্তি হয়ে ওঠেনি। বরং ভ্যানগার্ড ক্লাবে এক কাব্যপাঠের আসরে রেনাতো ফিগারি যুবসমাজের কাছে সার্দিনীয় লেখকদের তুলে ধরার আবেদন জানালে গ্রামশি প্রতিবাদ করে বলেন : 'সার্দিনীয় লেখকেরা সমকালীন বাস্তব থেকে অতীব বিচ্ছিন্ন। সার্দিনিয়া কেবলমাত্র জলপ্রপাত আর ভেড়ার খোঁয়াড় আর প্রতিহিংসায় হত্যাকাণ্ড আর মৃত সন্তানের শোকে রোরুদ্যমনা জননী নয়। সার্দিনিয়া বলতে বোঝায় সেই খনি মজুরেরা যারা বেলজিয়ামের পুঁজিপতিদের জন্য পরিশ্রম করে চলেছে মাটির কত শো ফুট নিচে, আর তার বিনিময়ে হাসপাতাল, স্কুল, কম্বল পাচ্ছে না, বরং যখনই তারা কিছু চায় তখনই পায় সামরিক হস্তক্ষেপ।'

সার্দিনিয়ায় উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের শেষ বছর ১৯১১ সালে গ্রামশির লেখা যে প্রবন্ধটি (যা তাঁর জীবৎকালে হাতে লেখা অবস্থাতেই থেকে যায়, প্রকাশিত হয়নি) এখন তাঁর প্রথম 'রাজনৈতিক' প্রবন্ধ বলে আমরা বিবেচনা

করে থাকি, তার নাম 'নিপীড়িত ও নিপীড়ক'। এই প্রবন্ধের বিষয় উপনিবেশবাদ—ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি আনুগত্যের পাশাপাশি পররাজ্য গ্রাসের লিপ্সা। গ্রামশি অবশ্য এই রচনায় উপনিবেশবাদের শিকড় খুঁজে পেয়েছেন মানবপ্রকৃতির মধ্যেই—'এই-যে প্রবৃত্তি যা মানুষকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে, প্রকৃতিকে মানুষের চাহিদা পূরণে নিয়োগ করার সংগ্রামে তাদের সমবেত শক্তিকে সংহত করতে দেয় না, বরং একে তাড়িত করে অন্যকে গিলে খেতে, এই প্রবৃত্তি যেন মানবসমাজেরই নির্মম ভবিতব্য। বস্তুত যখনই কোনো জাতি নিজেদের বলিষ্ঠ ও মায়ামমতাহীন বলে বিবেচনা করে, তখনই তারা প্রতিবেশী জাতিদের আক্রমণ করে, মৃগয়া করে নিপীড়ন করতে আর এতটুকু সংকোচ বোধ করে না। যে-কোনো বিজেতাই যে বিজিতকে ধ্বংস করতে চায়, তা খুবই স্পষ্ট। অথচ স্বভাবত ভণ্ড ও মিথ্যাচারী মানুষ কখনোই সরাসরি বলবে না, "আমি ধ্বংস করব বলেই জয় করতে চাই", বরং বলবে, "আমি সভ্য করব বলে জয় করতে চাই।" বাকি মানবজাতি বিজেতাকে ঈর্ষা করবে, তার কথায় আস্থা রাখার ভাণ করবে, তার প্রশস্তি করবে, তারাও কবে ঐ একই কাণ্ড করবার সুযোগ পাবে তার অপেক্ষায় থাকবে। তারই পরিণামস্বরূপ সভ্যতা আজ আর প্রসারিত হচ্ছে না, তার কোনো অগ্রগতি ঘটছে না। মহানুভব ও বুদ্ধিসম্পন্ন এক একটা সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে, নয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পথে। তাদের সভ্যতাদায়ী প্রভুরা তাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে যে মদ আর আফিম বিতরণ করেছে তা-ই সাধন করেছে এই মারণকাণ্ড।

তারপর একদিন উড়ো খবর ছড়িয়ে যায়: ইনডীজ-এর ইংরেজ গভর্নরকে হত্যা করেছে এক ছাত্র; নয়তো ডোগালিতে ইতালীয়রা পরাজিত; নয়তো বক্সার-রা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ইয়োরোপীয় মিশনারিদের। আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই বীভৎসায় ক্ষুব্ধ প্রাচীন ইয়োরোপ বর্বরদের বিরুদ্ধে, অসভ্য জাতিদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে মেতে ওঠে, আর তারই জেরে এই হতভাগ্য জাতিগুলির বিরুদ্ধে আরেক নব ধর্মযুদ্ধ ঘোষিত হয়।

'অথচ এও তো সত্য যে ইয়োরোপের জনগণের ওপর চেপে বসেছে তাদের নির্যাতকেরা, তখন ইয়োরোপের জনগণকেও রক্তাক্ত যুদ্ধ করতে হয়েছে তাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য। আজ তারা তাদের মুক্তিদাতা বীরদের স্মৃতিতে মূর্তি ও স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করে, স্বদেশের জন্য যারা প্রাণদান করেছে তাদের মাহাত্ম্যকে এক জাতীয় ধর্মের মর্যাদায় উন্নীত করে। আজ একবার ইতালীয়দের বলতে যান যে অস্ট্রীয়রা এখানে একদা এসেছিল আমাদের সভ্যতা দান করতে: দেখবেন, শ্বেত পাথরের স্তম্ভগুলো পর্যন্ত প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠবে। অথচ আমরাও তো সমুদ্র পার হয়ে সভ্যতা বহন করে নিয়ে গেছি, আপনারা আজ জানেন যে ঐসব জাতি আমাদের পছন্দ করে, তাদের সৌভাগ্যের জন্য স্বর্গলোককে ধন্যবাদ জানায়। কিন্তু এ কথাও

আমাদের জানা : তোমার পক্ষে যা ভালো, আমার পক্ষে তা ভালো নাও হতে পারে। আসলে যা সত্য তা হল সমস্ত মানুষের মধ্যেই প্রোথিত সেই অপ্রণীয় লোভ যার তাড়নায় সমস্ত মানুষ যাবতীয় অন্য মানুষের বহু-কষ্ট সঞ্চিত সামান্য সম্পদটুকু লুঠ করে নিতে সতত উদ্যত। সভ্যতার স্বার্থে কোনো যুদ্ধ পরিচালিত হয় না, পরিচালিত হয় বাণিজ্যের স্বার্থে। ইংরেজরা চীনের কে জানে কত শহর বোমায় বিধ্বস্ত করেছে, কারণ চীনারা তাদের আফিমের ব্যবসায়ে মদত জোগাতে রাজি ছিল না। এ তো সভ্যতার একেবারেই বিপ্রতীপ। রুশিরা, জাপানিরা পরস্পরকে হত্যা করে চলেছিল, কোরিয়া ও মানচুরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের অধিকারের প্রশ্নে।'

'মানুষ আয়ত্ত করেছে সভ্যতার এক সূক্ষ্ম আস্তরণ মাত্র— তাতে সামান্য আচড়ালেই বেরিয়ে পড়ে তার নিচে নেকড়ের চামড়া। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকে অনেকটা পোষ মানানো গেছে কিন্তু বিনাশ করা যায়নি, তাই শক্তের অধিকারই আজও চূড়ান্ত অধিকার। ফরাসি বিপ্লব অনেক বিশেষ অধিকারের অবসান ঘটিয়েছিল, নির্যাতিতদের অনেককে উপরে তুলেছিল। কিন্তু কার্যত তা কেবল এক শ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে সেখানে আরেক শ্রেণীকে বসিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য তা আমাদের আরেকটা বড় শিক্ষা দিয়েছিল, আমাদের শিখিয়েছিল, সামাজিক বিশেষাধিকার ও বৈষম্য প্রবৃত্তিজাত নয়, সমাজজাত, তাই তাদের অবসান ঘটানো যায়। এমন অনেক অবিচারের অবসান ঘটাতে মানবজাতিকে যেতে হবে আরেক রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে। তখন বড় দেরিতে শাসকশ্রেণী আপশোস করতে বসবে যে তারা এই জনরাশিকে অজ্ঞ ও অমানুষিকতার স্তরে রেখে দিয়ে এতকাল সুখ বোধ করে এসেছেন।'

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ভালো ফল করে তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্লো আলবের্তো কলেজে সার্দিনিয়াবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট উনচল্লিশটি বৃত্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষায় প্রত্যেকটি বিষয়েই ভালো নম্বর পেয়ে গ্রামশি নবম স্থান অধিকার করেন। এই একই পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন পালমিরো তোইলিয়াত্তি। তখনও অবশ্য তাদের পরিচয় হয়নি।

তুরিনের বৃত্তি তুরিনবাসের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না, বিশেষত শীতকালে তো নয়ই (গ্রামশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ১৬ নভেম্বর)। পরবর্তীকালে গ্রামশি স্মরণ করেছেন : '১৯১১ সালে, যখন আমি শীত ও অপুষ্টিতে ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পড়েছি, তখন আমি প্রায়ই এক ভয়ংকর স্বপ্ন দেখতাম যেন এক অতিকায় মাকড়সা প্রতি রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়লেই তার জাল থেকে নেমে এসে আমার মস্তিষ্ক চুষে বার করে নেয়।' তিনি স্মরণ করেন : 'আমি সারা শীত কাটিয়েছিলাম ওভারকোট ছাড়া। আমার ছিল কেবল একটা হালকা কোট যা কাইলিয়ারিতে চলে যেত। ১৯১২ সালের মার্চ মাসে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে অনেক কটা মাস আমি কোনো কথা বলিনি। কথা বলতে গেলেই আমার কথা জড়িয়ে যেত। আমি বাস করছিলাম একে-

বারে দোরা নদীর ধারে, সেখান থেকে উঠে এসে নদীর কনকনে হিম আমাকে জমিয়ে বরফ করে দিত।' বাবার কাছে তখন অর্থ ভিক্ষা করে যে একাধিক চিঠি তিনি লিখেছেন তার একটিতে তিনি লেখেন: 'আমি যদি জানতাম কোনো আকর্ষণেই আমি এখানে এই হিমযুগীয় অস্তিত্ব সহ্য করতে আসতাম না। সবচেয়ে যা খারাপ লাগছে, এই ঠাণ্ডা নিয়ে দুর্ভাবনায় আমি পড়াশোনা করতে পারছি না, কারণ শীতের এই প্রথম প্রকোপের তাড়না সহ্য করতে না পেরে হয় আমি আমার পাদুটো সামান্য গরম রাখতে অনবরত হাঁটছি নয়তো বিছানায় মুড়িশুড়ি হয়ে শুয়ে থাকছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের প্রথম বর্ষে যে-বিষয়গুলি গ্রামশি গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি ছিল: ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, লাতিন ও গ্রীক ব্যাকরণ। তার বাইরেও অবশ্য তিনি আইন, ইতালীয় সাহিত্য ও শিল্পকলার ইতিহাসের পাঠক্রমেও উপস্থিত থাকতেন ও আগ্রহী ছিলেন। ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক মাত্তেও বার্তোলি ও সাহিত্যের অধ্যাপক উমবের্তো কসমো গ্রামশির বিশেষ গুণগ্রাহী হয়ে ওঠেন। বার্তোলির নির্দেশে, তাঁর গবেষণার প্রয়োজনে গ্রামশি তখন বারবার বাড়িতে চিঠি লিখে স্থানীয় উপভাষায় বিভিন্ন শব্দ ও তাদের অর্থ বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন। কসমো ও বার্তোলি দুজনেই সমাজবাদী মহলেও যেমন সক্রিয় ছিলেন, তেমনই আবার ক্রোচে ও ফ্রান্চেস্কো দি সাংকতিস্-এর ভাববাদী নীতিবাদের ধারক ছিলেন। 'প্রায় বিপ্লবী' আরো একজন অধ্যাপক আর্তুরো ফারিনেল্লি নানা বিভাগের ছাত্রদের জড়ো করে জর্মন রোম্যানটিক ধারার চিন্তা ও সাহিত্যের মহাগ্রন্থগুলি নিয়ে আলোচনা করতেন। গ্রামশির বিশিষ্ট সহপাঠী তোইলিয়াত্তি স্মরণ করেন: 'উনি যে নতুন নৈতিকতা আমাদের মনে সঞ্চারিত করেন, তার মূলে ছিল প্রথামাত্রকে অস্বীকার করার প্রবণতা; যে-আদর্শের সঙ্গে কারো অস্তিত্ব একাত্ম হয়ে গেছে তার প্রতি সম্পূর্ণ স্বার্থহীন আনুগত্য; এবং নিজের প্রকৃতির প্রতি চূড়ান্ত সততার অঙ্গীকার।' গ্রামশি নিজে কসমো সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেন: 'আমি যখন কসমোর ছাত্র ছিলাম, তখন আমি স্বভাবতই তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকটি বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতাম, যদিও তখনও আমি আমার অবস্থান স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করতে পারিনি। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে আমি ও কসমো ও সমকালীন (ধরুন এই শতকের প্রথম পনেরো বছর ধরে) অন্য বহু বুদ্ধিজীবীই একটা বিশেষ ভূমি দখল করে ছিলেন: আমরা সকলেই একটা পর্যায় অবধি নৈতিক ও বৌদ্ধিক সংস্কারের সেই আন্দোলনের অংশ ছিলাম ইতালিতে যার সূত্রপাত ঘটেছিল বেনেদেত্তো ক্রোচে-র হাতে; এবং যার প্রথম সূত্রই ছিল যে আধুনিক মানুষ ধর্মের সাহায্য ছাড়াই বাঁচতে পারে এবং সেইভাবেই তার বাঁচা উচিত—ধর্ম বলতে আমি অবশ্যই বোঝাচ্ছি ঈশ্বরের দয়ায় উদ্ঘাটিত ধর্ম, প্রত্যক্ষবাদী ধর্ম, পুরাণাশ্রিত ধর্ম অথবা অন্য যে-কোনো মার্কা মারা ধর্ম।' অন্যদিকে অর্থনীতিবিদ পিয়েরো স্রাফা-কে লেখা এক চিঠিতে কসমো পরে লেখেন যে

'সাহিত্যের শিল্পরূপদিকের চেয়ে তার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সারবস্তুকেই' গ্রামশি তখন বেশি মূল্য দেন। ১৯১৬ সালে একটি লেখায় গ্রামশি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের আরেকটি প্রাপ্তি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন: গবেষণা পদ্ধতির তন্নিষ্ঠ চর্চা ও সাধনার শিক্ষা তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়জীবনেই আয়ত্ত করেছিলেন: 'এই ছিল বিদ্যাচর্চার সবচেয়ে প্রাণদ উপাদান, পুনঃসৃষ্টির সেই প্রণোদনা যার বলে কেউ তথ্যের বিপুল ভার আত্মস্থ করে নিতে পারে, সেই প্রণোদনা যা আমাদের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত করেছিল নতুন বৌদ্ধিক জীবনের দীপ্ত অগ্নিশিখা।'

ছাত্রদের মধ্যে প্রথমে আঞ্জেলো তাসকা ও পরে পালমিরো তোইলিয়াত্তির সঙ্গে গ্রামশির বন্ধুত্ব হয়। তোইলিয়াত্তি তখনও সক্রিয় রাজনীতিতে একেবারেই আগ্রহী নন। তাসকা ১৯০৯ সালে তুরিন-এ তরুণ সমাজবাদী ফেডারেশনের প্রথম গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য রূপে তখন তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কৃষকদের মধ্যে সমাজবাদী মতাদর্শ প্রচার করছেন।

এই সময়েই লিবিয়ায় ইতালির ঔপনিবেশিক আগ্রাসন থেকে ইতালীয় জাতীয়তাবাদের যে নব উন্মেষ ঘটে, তার মধ্যে ফ্যাশিবাদের বীজ গ্রামশি বা তোইলিয়াত্তি কেউই তখনও ঠাহর করতে পারেন নি। কিন্তু এই দুই সার্দিনীয়-ই এটা বুঝতে পারছিলেন যে ইতালির সাম্রাজ্য বিস্তারের সাধ ও সেই সাধকে ইতালির জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার অভিযান সার্দিনিয়ার অর্থনৈতিক অবহেলা ও শোষণকেই পোক্ত করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন অধ্যাপকের সহৃদয়, সস্নেহ পৃষ্ঠপোষণ সত্ত্বেও অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের কারণে গ্রামশির পড়াশোনা ও বিশেষত পরীক্ষাক্রম বারবার ব্যাহত হতে থাকলেও গ্রামশি কিন্তু এই সময়েই পেয়ে যান তাঁর পরবর্তী যাবতীয় অন্বেষার যা মূল লক্ষণ—'ভাষাব্যবহারে কঠোর শৃঙ্খলার অভ্যাস', তন্নিষ্ঠ গবেষণায় প্রতিটি তথ্য ও তত্ত্বকে নির্মমভাবে খুঁটিয়ে যাচাই করে নেবার পদ্ধতি। 'তথ্য সংগ্রহের আগ্রহে তথা সর্ব বিষয়ে অদম্য কৌতূহলের আকর্ষণে গ্রামশি নিজের নির্দিষ্ট পাঠক্রমের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন অধ্যাপকের ক্লাসে বা বক্তৃতামালায় উপস্থিত হন। রোমক আইনের অধ্যাপক জিওভান্নি পাক্কিওনির এমনই একটি ক্লাসে ছাত্রদের মধ্যে আয়োজিত এক বিতর্কসভায় তিনি পালমিরো তোইলিয়াত্তির বক্তৃতা শোনেন; ক্লাস থেকে বেরিয়েই তাঁদের মধ্যে যে-আলোচনা, এবং সেই আলোচনা থেকে যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় তা আজীবন অব্যাহত ছিল। তোইলিয়াত্তি বলেন: 'শুরু হয়ে যায় গ্রামশির সঙ্গে সেই দীর্ঘ বিতর্ক যে-বিতর্কে আমরা কতবার ফিরে আসব, কত বিচিত্র রূপে, আরো বড় অভিজ্ঞতার ভার নিয়ে, কত বিচিত্র পরিস্থিতিতে, যার ক্ষেত্র মানব ইতিহাসের সেই অনন্ত বিষয় যা মানুষ যা-কিছু জানে বা যা-কিছু জানবে তারই কাঠামো।' তোইলিয়াত্তির সঙ্গে গ্রামশির ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হতে

থাকে এর পর থেকেই। তোইলিয়াত্তি বা গ্রামশি কেউই তখনও রাজনীতিকে তেমন গুরুত্ব দেন না। ১৯১৩ সালে তুরিনে মোটরগাড়ি শ্রমিকদের ছিয়ানব্বই দিন ব্যাপী ধর্মঘট ও তার সফল সমাপ্তি তাঁদের নাড়া দেয়নি। বরং তোইলিয়াত্তি যখন সেই সময়কে স্মরণ করেছেন, তাঁর মনে পড়েছে. 'প্রথম দৃষ্টিতে মনে হত, ওরা আমাদের থেকে কত আলাদা—যেন অন্য এক জাত।' গ্রামশিকেও সবচেয়ে বেশি যা তাড়না করছে তা হল মহাদেশান্তর্গত ইতালির শোষণে ও অনাদরে সার্দিনিয়ার দুর্গতি। ১৯১৩ সালে প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি কোনো এক অভিজাত পরিবারের সংগ্রহ থেকে কিনে ফেলেন সার্দিনিয়া বিষয়ক একগুচ্ছ দামি, দুষ্প্রাপ্য, পুরনো বই। ইতালিতে সমাজতন্ত্রী মহলেও গ্রাম-শহর বিভাজনে শহরকেই গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়ার প্রবণতা, এমনকী অপবৈজ্ঞানিক সমাজমনস্তত্ত্ববিলাসে গ্রামবাসী তথা সার্দিনিয়াবাসীদের মস্তিষ্কের গঠনেই তাদের পশ্চাদ্‌পদতার ভিত্তি তথা যুক্তি আবিষ্কার ইত্যাদিই গ্রামশিকে তখন যেন আরো সরিয়ে রাখছে সমাজতন্ত্রী মহল থেকে। যদিও তোইলিয়াত্তি ছাড়া ছাত্রদের মধ্যে যে-আরেকজন বন্ধু তখন গ্রামশি পেয়ে গেছেন, সেই আঞ্জেলো তাস্কা তিন বছর আগেই ১৯০৯ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সেই সোশালিস্ট যুব ফেডারেশনের প্রথম তুরিন 'ফাশিও' বা শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপে সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে সক্রিয়। ১৯১২ সালেই তাস্কা গ্রামশিকে তলস্তয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি'-র ফরাসি অনুবাদ উপহার দিয়ে নামপত্রে লিখে দেন: 'আমার আজকের সহপাঠী ও আশা করি কালকের সহযোদ্ধাকে।' কিন্তু সার্দিনিয়ার মুক্তি, ইতালির নাগপাশ থেকে সার্দিনিয়ার মুক্তি ছাড়া আর কিছু নিয়ে ভাবতে গ্রামশি তখন প্রস্তুত নন।

সমস্ত পুরুষ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম নির্বাচন উপলক্ষে ১৯১৩ সালে সার্দিনিয়ায় গ্রামশির যে-অভিজ্ঞতা হয় তা তাঁকে সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের দিকে নিয়ে আসে। 'লা ভোচে' পত্রিকায় সার্দিনিয়া ও ইতালির মধ্যে আমদানি-রপ্তানিতে অন্যায় শুল্কের চাপে সার্দিনিয়ায় 'ব্যাহত বিকাশ, শ্রমজীবী জনতার ক্রমবর্ধমান দুর্দশা ও বেকারি, জীবিকানির্বাহের ব্যয়বৃদ্ধি, গ্রাম থেকে ক্রমাগত পরিযান ও পরিণামে জনসংখ্যা হ্রাস' চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে জনমত ও আন্দোলন গড়ে তুলবার আবেদন জানিয়ে যে-বিবৃতি প্রকাশিত হয়, পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা পরে তার স্বাক্ষরকারীদের তালিকায় আনতোনিও গ্রামশি তাঁর নাম যুক্ত করেন—এই প্রথম গ্রামশি কোনো রাজনৈতিক অভিযানে এইভাবে প্রকাশ্য অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে যোগ দিলেন। ইতালীয় পার্লামেন্টে সার্দিনিয়ার জন্য নির্দিষ্ট বারোটি আসনের মধ্যে পাঁচটিতে সোশালিস্ট পার্টি প্রার্থী দিয়েছিলেন। নির্বাচনী অভিযান শুরু হতেই গ্রামশি লক্ষ করলেন, সার্দিনিয়ার স্বার্থ ও সার্দিনীয় জাতীয়তাবাদের মুখোশ অবলীলায় খুলে ফেলে সার্দিনিয়ার সম্পত্তিভোগী সম্পন্ন শ্রেণী কেন্দ্রীয় ইতালীয় সরকারের ক্ষমতা, অর্থ ও লোকবল ভরসা

করে সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হলেন। খনিতে, কারখানায় শ্রমিকদের উপর হুমকি, ছাঁটাই, বেতন কাটার অত্যাচার তীব্র হয়ে উঠল। কদিন আগেও যাঁরা শ্রমিকদের এবং সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও দলে টেনেছিলেন ইতালির কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আরো সুযোগ-সুবিধা দাবি ও আদায় করার অভিযানে, তাঁরা শ্রমিকদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হতেই শ্রমিকদের সর্বতোভাবে পরিহার করেই ক্ষান্ত হলেন না, তাঁদের দমিত করে রাখার সচেতন প্রয়াসে ১৯১৩ সালের নির্বাচনকে তাঁদের প্রথম সমরক্ষেত্র নির্ধারণ করলেন। শাসকশ্রেণীর কুক্ষিগত পত্রপত্রিকার জাতীয়তাবাদী সুর পালটে গেল—শোনা গেল ইতালির সাম্রাজ্যলিপ্সার গৌরবগান, শিল্পে উৎপাদনবৃদ্ধি ও উন্নতির স্বার্থে প্রয়োজনে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর নির্বিচারে গুলিচালনার সমর্থন, বেশি মজুরির যে-কোনো দাবির বিরুদ্ধে ধিক্কার, ইতালীয় সরকারের সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির সপক্ষে যুক্তিজাল। রাষ্ট্রযন্ত্র, মালিকশ্রেণী, ধর্মসংঘ, পুলিশ ও সংবাদপত্র একজোট হয়ে সমাজতন্ত্রী নির্বাচনী অভিযানের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত তিনজন সমাজতন্ত্রী প্রার্থী সার্দিনিয়া থেকে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। সার্দিনিয়া থেকে এখানেই গ্রামশি তাস্কাকে যে চিঠি লেখেন, তা-ই ভিত্তি করে তাস্কা পরে লিখেছেন : 'নির্বাচনে কৃষক জনতার যোগদানে (যদিও তাঁরা তখনও তাঁদের নবলব্ধ অস্ত্রের যথাযোগ্য ব্যবহারের শিক্ষা আয়ত্ত করেন নি) যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায় তাতে তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হন। এই অভিজ্ঞতা, এবং এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি নিজে যে বিচার-বিবেচনা করেছেন তা-ই শেষ পর্যন্ত গ্রামশিকে সমাজতন্ত্রী করে তোলে।'

১৯১৩ সালের জুন বা জুলাই মাসেই গ্রামশি ইতালীয় সোশালিস্ট পার্টি বা পার্তিতো সোচয়ালিস্তা ইতালিয়ানোর (পি এস আই) সদস্যপদ প্রার্থনা করে আবেদন করেন। ঐ বছরের শেষদিকে তিনি এই সদস্যপদ লাভ করেন। সদস্যপদ লাভ করা মাত্রই অবশ্য গ্রামশির জীবনের খুব বড় কিছু রূপান্তর ঘটে না। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার চাপ, কোনো পরীক্ষাতেই তিনি ঠিক সময়ে বসতে পারছেন না; ছ-সাত মাস পর পরের বার বসছেন, বসে অবশ্য ভালোই ফল করছেন; স্কলারশিপ বন্ধ হয়ে যাবার ভয় তৈরি হচ্ছে; শেষ পর্যন্ত স্কলারশিপ বন্ধ হয়ে যায়; ১৯১৫ সালের এপ্রিলে তিনি তাঁর শেষ পরীক্ষা দেন; স্নাতক হবার জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষাবলি তিনি শেষ করেন নি। অন্যদিকে ইতালীয় সোশালিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ রাজনীতি লিবিয়ায় ইতালির আগ্রাসী উপনিবেশবাদী অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় যে জটিল দ্বন্দ্ব ও পুনর্বিন্যাসে মথিত হয়, তারই মধ্য দিয়ে বেনিতো মুসোলিনি পার্টির বামপন্থী অংশের সমর্থনে ১৯১২র জাতীয় সম্মেলনে পার্টির নতুন সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে দু বছরের মধ্যে পার্টির সদস্যসংখ্যা দ্বিগুণ হয়, দেশ জুড়ে শ্রমিক ধর্মঘটের জোয়ার বয়ে যায়, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের আহ্বান তাঁকে তরুণদের প্রিয় নেতার সম্মান

এনে দেয়। তোল্লিয়াত্তি ও গ্রামশি দুজনেই মুসোলিনির প্রেরণায় প্রাণিত হন। ১৯১৪ সালের অক্টোবরে সোশ্যালিস্ট পার্টি'র মূল স্রোতের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে প্রথম মহাযুদ্ধে নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ থাকার সমাজতন্ত্রী নীতির প্রতিবাদ করে মুসোলিনি 'আভান্তি' পত্রিকার একাধিক সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'সার্বিক নিরপেক্ষতার' পরিবর্তে 'সক্রিয়, অর্থপূর্ণ নিরপেক্ষতার' যে নীতি প্রস্তাব করেন, তুরিন থেকে প্রকাশিত সমাজতন্ত্রী পত্রিকা 'ইল গ্রিদো দেল পোপোলো'য় আঞ্জেলো তাস্কা তার বিরোধিতা করেন। সাত দিন পর ৩১ অক্টোবর ঐ পত্রিকাতেই গ্রামশি মুসোলিনির পক্ষ সমর্থন করে তাঁর প্রথম প্রকাশিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ' লেখেন। পার্টি'র ঘোষিত নীতির পরিবর্তনের যে-দাবি মুসোলিনি তুলেছিলেন, তা সমর্থন করতে গিয়েও গ্রামশি তাঁর সবল, সুস্পষ্ট বিবৃতির মধ্যেও মুসোলিনি সম্পর্কে সামান্য সংশয়ের রেশও রেখে গেছেন: 'আমি ধরে নিচ্ছি মুসোলিনির কিছুটা অগোছালো কথাগুলি আমি যথার্থভাবেই বুঝেছি এবং তিনি নিজে ঐ কথাগুলিকে যে পথে নিজেই এগিয়ে নিয়ে যেতেন, আমি সেই পথ ধরেই এগিয়েছি।'

তুরিনে এই শতাব্দীর প্রথম দশক জুড়ে যে লক্ষণীয় শিল্পোন্নয়ন ঘটেছে, বিশেষত অটোমোবিল বা মোটরগাড়ি শিল্প ও মেটালিকল শিল্পে, তাতে স্বভাবতই মালিক বা পুঁজিপতির সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত ও বিরোধও উঠে এসেছে; দুপক্ষই নানাভাবে সংগঠিত হয়েছে নানা অ-পসরফা চুক্তি করেছে, ভেঙেছে, সরাসরি সংঘর্ষে মুখোমুখি হয়েছে; কিন্তু ১৯১২ সাল পর্যন্ত প্রতিবারই মালিকপক্ষই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। ১৯১৩ সালের ধাতুশ্রমিকদের ৯৩ দিন স্থায়ী ধর্মঘটে শ্রমিকদের জয়লাভ গ্রামশির চোখে নানা কারণেই শ্রমিক চেতনার নব উন্মেষ রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি এই যুদ্ধের সময়টা জুড়ে শ্রমিকদের নিষ্ক্রিয় রেখে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় শক্তির স্তরে উন্নীত করার একটা দায়বোধও তাঁকে তাড়িত করছে। শাসকশ্রেণীকে তার নিজস্ব পথে চরম বিন্দুর দিকে এগিয়ে যেতে প্ররোচিত করে, বাধ্য করে শ্রমিকশ্রেণী শেষ পর্যন্ত শাসকশ্রেণীর অপদার্থতাকেই উদ্ঘাটন করে তার হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে, এমনই একটা পট গ্রামশি তুলে ধরেন। মুসোলিনি যে স্বতঃস্ফূর্ত জঙ্গিপনাকে লালন করছিলেন, তার মধ্যে যে এধরনের কোনো দূরদৃষ্টি নিহিত ছিল না, তা গ্রামশির কাছে অচিরেই স্পষ্ট হয়। ইতোমধ্যে মুসোলিনি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন, 'ইল পোপোলো দিতালিয়া' নামে তাঁর নতুন পত্রিকায় সরাসরি যুদ্ধোন্মাদনা জাগিয়ে তুলতে থাকেন। কিন্তু গ্রামশির মুসোলিনিভক্তির সাময়িক পর্বটি পার্টি মহলে তাঁর পক্ষে লজ্জার কারণ হয়, প্রায় পুরো একটা বছর তিনি আর কোনো রাজনৈতিক রচনা লেখেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রমের পর্বে ক্ষান্তি দিতে বাধ্য হয়ে, অধ্যাপকের পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করার সাধে

জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়ে যে গ্লানি তাকে আবিষ্ট করে, তাও যুক্ত হয়ে যায় এই রাজনৈতিক 'নির্বুদ্ধিতার' দৃষ্টান্তের সঙ্গে। গিলাৎসায় পরিবার-পরিজনদের কাছে চিঠি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। ১৯১৬ সালের শুরুতে ভগিনী গ্রাৎসিয়েত্তাকে লেখা এক চিঠিতে তিনি লেখেন : 'আমি যেভাবে জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলাম, কখনোই আমার তা করা উচিত হয়নি। আমি দুটো বছর জীবন যাপন করেছি এই পৃথিবীর একেবারে বাইরে। যেন এক দীর্ঘ স্বপ্নের মধ্যে। যে অসংখ্য সূত্র আমাকে মানবসমাজের সঙ্গে বেঁধে রাখত, এক এক করে তার প্রত্যেকটি আমি ছিঁড়ে দিয়েছি। আমি জীবনযাপন করেছি কেবলমাত্র আমার মস্তিষ্ককে অবলম্বন করে, আমার হৃদয়ের তাতে লেশমাত্র ভূমিকা ছিল না। শুধু তোমরাই নও, সমগ্র মানবজাতিরই যেন আমার কাছে কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আমি হয়ে উঠেছিলাম গুহাবাসী নিঃসঙ্গ এক নেকড়ে যেন।'

১৯১৫ সালের ১৩ নভেম্বর 'ইল গ্রিদো দেল পোপোলো' পত্রিকায় আবার তাঁর প্রবন্ধ বেরুল। প্রবন্ধের বিষয় দু মাস আগে সুইটজারল্যান্ড-এর ৎসিমেরভাল্ড্-এ অনুষ্ঠিত যুদ্ধবিরোধী ইয়োরোপীয় সোশালিস্ট পার্টিগুলির প্রতিনিধি-নেতৃবৃন্দের বৈঠকের বিবরণ ও মূল্যায়ন। এই প্রবন্ধে গ্রামশি প্রসঙ্গত স্পেনীয় সোশালিস্ট পার্টির সদ্যানুষ্ঠিত দশম কংগ্রেসকে স্বাগত জানিয়ে লেখেন : 'আমাদের কাছে এই ছোট আন্দোলনগুলি খুব বড় মনে হয়, কারণ আমরা এগুলিকে যুক্ত করতে পারি এমন অন্য সব আন্দোলনের সঙ্গে যা কেবল আমরাই অনুভব করি, কারণ আমরা আমাদের জীবনের মধ্যে সেই আন্দোলনগুলি যাপন করি, আমরাই সেই আন্দোলন। আমাদের মনে হয় আমরা যেন জায়মান এক পৃথিবীর অণুপরমাণু, আমরা অনুভব করতে পারি এক বিপুল জলস্রোত ধীরে ধীরে অনিবার্য-ভাবে প্রবল হচ্ছে; যে গণনাতীত বিন্দুসমূহ তার মধ্যে নিহিত তাদের সংহতি অটুট। এই অনুভবেই আমরা বোধ করি যে আন্তর্জাতিক যথার্থই সজীব।'

পার্টি সদস্যপদপ্রাপ্তির আগে থেকেই এবং বিশেষত ১৯১৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত গ্রামশি সোশালিস্ট ইউথ ফেডারেশনে (ফেদেরাৎসিওনে জিওভানিলি সোচিয়ালিস্তা—এফ জি এস্) নিয়মিত আসাযাওয়া করেছেন, বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকতা তথা বক্তৃতা করেছেন। ১৯১৬ সালে ২৬ অগস্ট তিনি বোরগো সান পাওলো শ্রমিক ক্লাবে রম্যাঁ রলাঁ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন—সোশালিস্ট ইউথ ফেডারেশনের ঘরোয়া বৈঠকের বাইরে তাঁর বক্তৃতার খবর এই প্রথম পাওয়া গেছে। তারপর অনেক ছোটবড় সমাবেশেই বক্তা হিসেবে তাঁর ডাক পড়ে। নির্দিষ্ট বিষয়ে শান্ত, সংযত, প্রত্যয়ঋজু স্বরে তিনি তথ্য ও তত্ত্ব মিলিয়ে রাজনীতি ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯১৬ সালের শুরু থেকেই তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটতে থাকে কাসা দেল পোপোলো নামে ভবনটিতে; এখানেই ছিল সোশালিস্ট পার্টি ও সোশালিস্ট ইউথ

ফেডারেশনের স্থানীয় দফতর, একাধিক বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন, ইউনিয়ন ও চেম্বার অফ লেবরের দফতর, এবং 'ইল গ্রিদো দেল পোপোলো' পত্রিকা ও 'আভান্তি' পত্রিকার পীডমণ্ট সংস্করণের কার্যালয়। দুটি পত্রিকাতেই নিয়মিত লেখকের ভূমিকায় দেখা যায় গ্রামশিকে। তাঁর দুই বন্ধু তাস্কা ও তোইলিয়াত্তি ততদিনে অবশ্যকৃত্য সামরিক কর্তব্যের বিধিবলে যুদ্ধক্ষেত্রে পেঁৗছে গেছেন। স্বাস্থ্যের কারণেই বেঁচে গেছেন গ্রামশি। 'আভান্তি' পত্রিকায় গ্রামশির ওপর ভার পড়ে একটি কলমের—'সোত্তো লা মোলে' (গম্বুজের নিচে)। মোলে আনতোনেল্লিয়ানা নামে যে বিশাল গম্বুজটি তুরিনের প্রায় সর্বত্র থেকে দেখা যায়, সেটি তুরিনেরই দ্যোতক হয়ে উঠেছিল। গ্রামশির কলমটির উপজীব্য ছিল তুরিনের নানা ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত, প্রায়ই ব্যঙ্গাত্মক মূল্যায়ন। 'ইল গ্রিদো'তেও তিনি লিখতে থাকেন নানা বিষয়ে। তাঁর এই পর্বের লেখায় সবচেয়ে বেশি জোর পড়ে বিপ্লবী চেতনার বিকাশের উপর। 'ইল গ্রিদো'র সম্পাদিকা মারিয়া জিউদিচে যখন বলছেন, 'আমরা জানি জনগণ কোনো চিন্তা বা যুক্তি অবলম্বন করে অনুভব করে না, কোনো ক্রিয়ায় লিপ্ত হয় না ; তারা যা অনুভব করে, কেবল তার দ্বারাই চালিত হয়। তারা যখন সমাজতন্ত্রী অনুভবে অভিভূত হবে, তখনই তারা সমাজতন্ত্রীদের মতো আচরণ করবে, এই সমস্ত তত্ত্ব ছাড়াই'—তখনই 'ইল গ্রিদো' পত্রিকার পাতাতেই গ্রামশি লিখছেন : 'সংস্কৃতিকে বিশ্বকোষপ্রতিম জ্ঞান এবং মানুষকে এমন এক আধারমাত্র বিবেচনা করা যা কেবল বস্তুগত তথ্যে ও অসংশ্লিষ্ট আকাঁড়া তথ্যের ভারে এমনভাবে ভরিয়ে তুলতে হবে যেন মস্তিষ্কের মধ্যে সব-কিছু কোনো অভিধানের দুই কলমের মাত্রায় বিন্যস্ত হয়ে যায় এবং যার উপর ভরসা করে সেই মস্তিষ্কের অধিকারী বাইরের পৃথিবীর বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতে সাড়া দিতে সমর্থ হয়—এই অভ্যস্ত ধারণা থেকে আমাদের নিজেদের মুক্ত করতে হবে। এই ধরনের সংস্কৃতি বিশেষত নির্বিত্ত শ্রেণীর পক্ষে সত্যিই বিপজ্জনক। এই সংস্কৃতির প্রভাবে কেবলমাত্র সমাজবিচ্যুত মানুষেরই সৃষ্টি হয়, যে-মানুষেরা কিছু বিশেষ তথ্য ও তারিখ মুখস্থ করে রেখেছেন এবং যে-কোনো সুযোগেই তা আওড়াতে পারেন বলেই নিজেদের বাকি মানবসমাজের চেয়ে উঁচু দরের জীব বিবেচনা করেন, এবং সেই সামর্থ্যকে তাঁদের সঙ্গে বাকি মানুষের ব্যবধানের প্রাচীর-স্বরূপ খাড়া করে তোলেন। এর প্রভাবে সেই নির্জীব, বিবর্ণ বুদ্ধিবিলাসের সৃষ্টি হয় যাকে রম্যাঁ রলাঁ নির্দয় আঘাতে জর্জরিত করেছেন, যা থেকে জন্ম নিয়েছে এক দঙ্গল হামবড়া চালিয়াত যারা সমাজজীবনে যে ক্ষতি সাধন করে তা শরীরের সৌন্দর্য ও দৈহিক স্বাস্থ্যের ওপর যক্ষ্মা বা যৌনরোগের জীবাণুর ক্রিয়ার চেয়েও মারাত্মক।...এটা সংস্কৃতি নয়, পণ্ডিতম্মন্যতা ; বুদ্ধির খেলা নয়, নিতান্তই বুদ্ধিবৃত্তি। এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় প্রতিবাদ করা অতীব সংগত।

'সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। সংস্কৃতি কারো নিজের অন্তর্লীন

সত্তার সংগঠন তথা সুশৃংখল বিন্যাস, নিজের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা ; এমন এক উন্নততর বোধ আয়ত্ত করা যার বলে মানুষ নিজের ঐতিহাসিক মূল্য, জীবনে নিজের ভূমিকা, নিজের অধিকার ও দায়িত্ব অনুধাবন করতে সমর্থ হয়। এর কোনো কিছুই স্বতঃস্ফূর্ত ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে লাভ করা যায় না, নিজের অভীপ্সার প্রভাবরহিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বাধীন ধারার মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় না—যেমন ঘটে পশুজগৎ বা উদ্ভিদ জগতে যেখানে এক ভবিতব্যস্বরূপ প্রাকৃতিক বিধিমতে প্রতিটি স্বতন্ত্র একক নির্বাচিত হয় এবং অচেতনভাবেই নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্ধারণ করে। মানুষ সর্বোপরি মন, অর্থাৎ মানুষ ইতিহাসের পরিণাম, প্রকৃতির নয়। নয়তো চিরকালই শোষণ ও শোষিত, ধনের উৎপাদক ও তার স্বার্থপর ভোগীদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও কেন এত দিনেও সমাজতন্ত্রের পত্তন হল না, তার কী ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে ? আসলে যা ঘটেছে, ক্রমে ক্রমে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে মানবজাতি তার নিজের মূল্যের বোধ আয়ত্ত করেছে, এবং ইতিহাসের কোনো পূর্ববর্তী পর্যায়ে সংখ্যালঘু গোষ্ঠী তার উপর যে সংগঠনবিন্যাস চাপিয়ে দিয়েছে তা ঝেড়ে ফেলবার অধিকার অর্জন করেছে। এই চেতনা শারীরিক তাগিদের জান্তব তাড়নায় গড়ে ওঠেনি ; গড়ে উঠেছে প্রথমে খুবই অল্পসংখ্যক কিছু মানুষের, এবং পরে এক সমগ্র শ্রেণীর বুদ্ধিনির্ভর এক চিন্তাপ্রক্রিয়া থেকে যা বিচার করে দেখেছে কেন বিশেষ কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং কেমন করেই বা দাসত্বের বাস্তবকে বিদ্রোহ ও সামাজিক পুনর্গঠনের দিক্‌নির্দেশে রূপান্তরিত করা যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক বিপ্লবের আগেই ঘটে গেছে সমালোচনার এক সুতীব্র আয়াস, সংস্কৃতির বিস্তার, জনসাধারণের মধ্যে ধ্যানধারণার ব্যাপক সম্প্রচার···।' এনলাইটেনমেণ্ট বা জ্ঞানকাণ্ড থেকে ফরাসি বিপ্লবের উন্মেষের মধ্যে গ্রামশি এই প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত লক্ষ করেছেন ; দি সাংক্‌তিস-কে সাক্ষী মেনে তিনি বলেন : 'এনলাইটেনমেন্ট ইয়োরোপকে দান করেছিল এক ঐক্যবদ্ধ চেতনা যা হয়ে উঠেছিল এমন এক বুর্জোয়া আত্মিক আন্তর্জাতিক যা সাধারণ মানুষের যাবতীয় কষ্ট ও দুর্ভোগ সম্পর্কে সংবেদনশীল ছিল ; এবং ফ্রান্স্‌-এ যে রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটে অনতিকালের মধ্যেই, তারও সবচেয়ে ভালো প্রস্তুতি ছিল এই এনলাইটেনমেণ্ট।···আজও সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে আবার ঘটছে সেই একই প্রক্রিয়া। পুঁজিবাদী সভ্যতার সমালোচনার মধ্য দিয়েই নির্বিত্ত শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ চেতনা গঠিত হয়েছে, এখনও গঠিত হচ্ছে। এই সমালোচনার মূলে নিহিত রয়েছে সংস্কৃতি, কোনো নিতান্তই স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাকৃতিক বিবর্তনের ধারা নয়।' গ্রামশির পরবর্তী জীবনের চিন্তায় কোনো সমগ্র সমাজ বা শ্রেণীর চেতনা তথা সংস্কৃতির স্তরে বৈপ্লবিক রূপান্তরের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করার বৌদ্ধিক প্রয়াস শুরু হয়ে গেছে ১৯১৬র ২৯ জানুয়ারি প্রকাশিত 'সমাজতন্ত্র ও সংস্কৃতি' নামে এই প্রবন্ধে। সোশালিস্ট পার্টি ও সোশালিস্ট ইউথ ফেডারেশনের মধ্যে একদিকে তাস্কা

ও অন্যদিকে আমাদেও বোরদিগার মধ্যে সোশালিস্ট আন্দোলনে সংস্কৃতি ও শিক্ষার ভূমিকা নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল, তাতে বোবদিগার পক্ষেই বেশি সমর্থন ছিল। বোরদিগা তাস্কার সমর্থকদের 'সংস্কৃতিপন্থী' আখ্যা দিয়ে তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু গ্রামশি সোশালিস্ট পার্টি ও সোশালিস্ট সাংবাদিকতায় যখন পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন, তখনই তিনি তাঁর ভূমিকা ও দায়িত্ব স্থির করে নেন নির্বিত্ত শ্রেণীর চেতনা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারের এক প্রকল্পের মধ্যে। তাঁর প্রতিদিনের জীবনযাপন এই প্রকল্পের অন্তর্গত হয়ে গেল।

১৯১৩ সালেই গ্রামশি চোদ্দ নম্বর ভিয়া সান মাসিমোয় এক সহপাঠীর বিধবা মায়ের একেবারের ওপরের তলার ফ্ল্যাটে একটি ঘরে বাস করতে শুরু করেছেন। এই বাড়িরই আরেকটি ফ্ল্যাটে থাকেন তাস্কা। ১৯১৬ সালের শুরু থেকেই করসো সিক্কার্দিতে 'আভান্তি'র দফতর হয়ে ওঠে গ্রামশির দিন-রাতের কর্মক্ষেত্র। একটু বেলা করেই দফতরে আসেন গ্রামশি। সকালে দুপুরে পার্টি কর্মী ও শ্রমিকেরা আসেন খবর নিয়ে, প্রশ্ন নিয়ে ; কেউ জানতে চান, কোনো বিশেষ বিষয়ে কী বই পড়বেন ; কেউ পড়তে গিয়ে কোথাও আটকে গেছেন, একটু বুঝে নিতে চান। ফাঁকে ফাঁকে গ্রামশি নিজেও পড়াশোনা করে যান ; দফতরে স্তূপীকৃত বইয়ের মধ্যে রয়েছে জনপ্রিয় গল্প উপন্যাস, ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ক ভারী বই, নাটক। বিকেলে সন্ধ্যায় গ্রামশি কখনও নাটক বা সিনেমা দেখতে যান, কখনও শ্রমিকদের বৈঠকে বক্তৃতা করতে যান। ১৯১৬-র ২৬ অগস্ট তিনি বোর্গো সান পাওলোয় বক্তৃতা করেছেন রল্যাঁর নতুন উপন্যাস বিষয়ে ; ১৬ ও ১৭ অকটোবর তিনি বোর্গো সান পাওলো ও বারিয়েরা দি মিলানোয় ফরাসি বিপ্লব বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন ; ১৭ ডিসেম্বর তাঁর বক্তৃতার বিষয় পারী কমিউন। বোর্গো কামপিদোইলিয়োয় মহিলাদের এক পাঠচক্রে ১৯১৭-র মার্চ মাসে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল কারীনানো থিয়েটারে সদ্য প্রযোজিত 'এ ডল্‌স্‌ হাউস' নাটক ও পুরুষপ্রধান ইতালীয় সমাজে তার প্রতিক্রিয়া। নাট্যজগতে তখন পিরানদেল্লোর আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর নাটকের অভিনবত্ব ও শক্তি গ্রামশি লক্ষ করেছিলেন। 'আভান্তি' পত্রিকায় গ্রামশির নিয়মিত নাট্যসমালোচনায় ইবসেন, পিরানদেল্লো ও ইতালীয় অপেরা, ইতালীয় অভিনয় সম্পর্কে তাঁর সুগভীর বিচার-বিশ্লেষণ ইতালীয় নাট্য-সমালোচনার আধুনিক পর্বের সূচনা করে। পরবর্তীকালে তাতিয়ানাকে লেখা এক চিঠিতে তিনি লেখেন : 'তুমি কি জানতে যে আদ্রিয়ানো তিলগার-এর অনেক আগেই আমি পিরানদেল্লোকে আবিষ্কার করেছিলাম, তার থিয়েটারকে সাফল্যে পৌঁছতে সাহায্য করেছিলাম? আমি পিরানদেল্লো সম্পর্কে যত লিখেছিলাম... তা জড়ো করলে দুশো পৃষ্ঠার একটা বই হয়ে যেত। তখন আমি যা বলেছিলাম, তাতে নতুনত্ব ছিল, স্বকীয়তা ছিল।

পিরানদেল্লোকে তখন হয় সানুগ্রহ প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখা হত, নয়তো সরাসরি অবজ্ঞা করা হত।'

১৯১৬ সালের শেষ দিকে আরেকটি প্রবন্ধে গ্রামশি লেখেন: 'শিক্ষার ইতিহাসে দেখা যায়, যে-শ্রেণীই কখনও ক্ষমতায় আসতে চেয়েছে, তারা এক স্বায়ত্তাধীন শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার প্রস্তুতি সাধন করেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক দাসত্বের বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ মনকে মুক্ত করা। আমি এই নতুন মত তুলে ধরছি: সাধারণ মানুষের জন্য স্কুলব্যবস্থা বিশাল শ্রমিক ইউনিয়নগুলির পরিচালনার অধীনে নিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার সমস্যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী সমস্যা।' শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রামশির এই অভিযানের তুঙ্গকীর্তি সোশ্যালিস্ট ইউথ ফেডারেশনের জন্য 'লা চিত্তা ফিউচুরা' (ভবিষ্যতের নগরী) নামে পুস্তিকার সম্পাদনা। এক অনিয়মিত পত্রিকা রূপে পরিকল্পিত হলেও এটি এই একবারই প্রকাশিত হয়। ১৯১৭-র ফেবরুয়ারি প্রকাশিত এই পুস্তিকায় ক্রোচে, সালভেমিনি ও কার্লিনির তিনটি প্রবন্ধের পাশাপাশি ছিল গ্রামশির প্রবন্ধ 'তিন শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাস ও তিন নীতি'। যুদ্ধকালীন সেনসরশিপের কাটাছেঁড়া বহন করে এই প্রবন্ধটির যে-ভাষ্য প্রকাশিত হয়, তাতে ফরাসি বিপ্লবের দৃষ্টান্ত টেনে এনে গ্রামশি বলেন যে সমাজতন্ত্রীদের লক্ষ্য একটি সমাজব্যবস্থা বা 'শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাসের' জায়গায় আরেকটি 'শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাস' প্রতিষ্ঠায় সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তাদের লক্ষ্য হবে 'একমাত্র যথার্থ' শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাস সৃষ্টি করা। এই নতুন সমাজব্যবস্থার পরিকল্পনার মূলে নিহিত থাকবে একটি মৌল নীতি; 'প্রত্যেক নাগরিকের সমগ্র মানবিক ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ সার্থকতার সম্ভাবনা নিশ্চিত করা।' আশু ও সীমিত কোনো লক্ষ্য সামনে রেখে এগোতে গেলে সমাজতন্ত্রের আদর্শের কাছাকাছি কোনোদিনই পেঁছনো যাবে না, বরং মানব অভীপ্সা দূরতর অথচ 'বাস্তব কোনো সার্বভৌম' আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে তীব্রতর প্রত্যয় ও আবেগে অনুপ্রাণিত হবে। এই পুস্তিকায় আরেকটি প্রবন্ধে গ্রামশি লেখেন: 'ফ্রেডেরিক হেবেল-এর মতো আমিও মনে করি, "বেঁচে থাকা মানেই পক্ষ বেছে নেওয়া"। আমি ঘৃণা করি উদাসীন মানুষদের।...উদাসীনতা ইতিহাসে এক বলবান শক্তি যা নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে সক্রিয় ও কার্যকর।...আবছায়ার মধ্যে ঘটনাবলি পরিপূর্ণতার দিকে ধাবিত হয়, অল্প কিছু হাত যারা কারো কাছেই দায়বদ্ধ নয়, তারাই সমবায়ের জীবনযাপনের তন্তুজাল বয়ন করে চলে। জনগণ জানতেই পারে না কী ঘটে যায়, কারণ তাদের কিছুতেই কিছু আসে যায় না।...আমি আমার পক্ষ বেছে নিয়েছি, আমার আসে যায়। আমি অনুভব করি, আমার পক্ষের প্রাণময় চেতনা আমার মধ্যে আন্দোলিত হচ্ছে—ভবিষ্যতের সেই নগরী যা আমার পক্ষ গড়ে তুলতে শুরু করেছে, তারই জীবনস্পন্দন।...আমি বেঁচে আছি। আমি পক্ষ বেছে নিই। তাই

স্বভাবতই যে পক্ষ বেছে নেয় না, তাকে আমি ঘৃণা করি। আমি উদাসীনতাকে ঘৃণা করি।'

১৯১৭-র ফেবরুয়ারি মাসে যখন 'লা চিত্তা ফিউতুরা' প্রকাশিত হয়, তখনই শুরু হয়ে গেছে দেশে ও দেশের বাইরে এক রাজনৈতিক টালমাটাল যার অভিঘাতে আনতোনিও গ্রামশি সোশালিস্ট আন্দোলনের অন্তর্গত যুব শাখা বা শিক্ষা অভিযানের প্রত্যন্ত ক্ষেত্র থেকে একেবারে আন্দোলনের নেতৃত্বে এসে দাঁড়ান। ঐ ফেবরুয়ারি মাসেই রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্ব ঘটে যায়; সদ্য ক্ষমতাসীন মেনশেভিকদের একটি প্রতিনিধিদল ১৩ অগস্ট তুরিনে এলে চল্লিশ হাজার শ্রমিকের এক মহতী জনসমাবেশে তাঁরা সম্বর্ধিত হন, অভিনন্দিত হন। সেই সমাবেশে গোলডেনবেগ ও স্মির্নভকে অস্বস্তিতে ফেলে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনি ওঠে: 'লেনিন দীর্ঘজীবী হোন।' শুধু যুদ্ধকালীন সেনসরশিপই নয়, বুর্জোয়া পত্রপত্রিকার স্বভাবজ সতর্কতার কারণেও রুশ বিপ্লবের যে খবরাখবর ইতালিতে এসে পেঁছিচ্ছে, তা খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। তবু তা-ই অবলম্বন করে গ্রামশি প্রথম ২৯ এপ্রিল ও তারপর আবার ২৮ জুলাই 'ইল গ্রিদো' পত্রিকায় ফেবরুয়াবির রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। তাঁর এই বিশ্লেষণে তিনি লেনিনের ভূমিকার তাৎপর্যকে যেভাবে চিহ্নিত করেন, তাতেই ইতালির সোশালিস্ট শ্রমিক জনগণের মনে লেনিনের গুরুত্ব তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। বুর্জোযা পত্রপত্রিকায় যখন রুশ বিপ্লবকে বারবার ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, তখন গ্রামশি জোর দিযে বলতে থাকেন, রুশ বিপ্লবের মধ্যে ফরাসি জাকব্যাঁদের চটজলদি বৈনাশিকতা নেই, বরং রয়েছে এক নব নৈতিকতা যার প্রমাণ তিনি পেয়ে যান কারারুদ্ধ সাধারণ অপবাধীদের মুক্তিদানের সিদ্ধান্তে, এবং এই অপরাধীদের মনে অপরাধস্খালনের দায়বোধে অন্য চেতনা বা মানসিকতার উন্মেষে। ২৮ জুলাই-এব প্রবন্ধে তিনি লক্ষ করেন, অধিকাংশ বিদ্রোহ প্রথম সাফল্যের মুহূর্তে যেভাবে আত্মতৃপ্তির নিশ্চিন্ততায় স্থির হয়ে যায়, রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি, বরং লেনিন ও তাঁর মার্কসবাদী সহযোগীদের নেতৃত্বে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া অব্যাহত, অগ্রসরমান—'বিপ্লব চলেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র যথার্থই বিপ্লবক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এ এক সদাব্যস্ত ক্রিয়াকলাপ, ক্রমাগত বিনিময়, জনতার অতিকায় অসম্বদ্ধ শিলাখণ্ডে অবিরাম খননকর্ম। এই পর্বে বিপ্লব হয়ে উঠেছে যেন এক প্রবল টালমাটাল যা সমস্ত সামাজিক চক্র ও গোষ্ঠীকে অবিরত গলিয়ে দিচ্ছে, নতুন করে গড়ছে, কখনোই দানা বাঁধতে দিচ্ছে না, জীবনকে তাৎক্ষণিক সার্থকতার রৌদ্রালোকে আরাম করতে দেবে না।'

সরকারি নিষেধ অমান্য করেই তুরিনের সোশালিস্টরা যে যুদ্ধবিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন ১৩ অগস্টের সমাবেশে রুশ ও ইতালীয় নেতাদের বক্তৃতায় তা আরেকটু জোরালো হয়; যুদ্ধক্ষেত্রে ইতালীয় সৈন্যদের মৃত্যুর হার ক্রমবর্ধমান; দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও অভাব;

এই সব-কিছু মিলিয়ে যে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল তা ২৩ অগস্ট এক স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। বিক্ষুব্ধ ধর্মঘটী শ্রমিকেরা ব্যারিকেড খাড়া করে পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলায় নেমে পড়েন। ২৪ অগস্ট মেশিনগান ও ট্যাংকের মুখে অন্তত পঞ্চাশজন প্রাণ দেন, দুশোজন আহত হন। ৮২২ জন বন্দী হন, তাঁদের মধ্যে ১৭৭ জনকে সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রণ্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ২৬ অগস্ট সোশালিস্ট পার্টি ও চেম্বার অফ লেবরের নির্দেশে শ্রমিকেরা কাজে ফিরে যান। অপরিকল্পিত এই আন্দোলনের মধ্যে দাঁড়িয়ে এর নেতৃত্ব দানের যে দায়িত্ব সোশালিস্ট পার্টি নেবে বলে অনেকে আশা করেছিলেন, পার্টির নেতৃত্ব তা নিতে পারেন নি। পার্টির মধ্যে ও আশেপাশে এই নেতাদের প্রতি যে অনাস্থা তৈরি হয়, তারই পরিণামে গ্রামশি নতুন নেতৃত্বের অন্যতম হয়ে ওঠেন। সেপটেম্বর মাসে তিনি 'ইল গ্রিদো' পত্রিকার সম্পাদক ও 'একমাত্র প্রতিবেদক' মনোনীত হন ; ৩০ সেপটেম্বর পার্টির আঞ্চলিক কর্মনির্বাহী সমিতির অন্যতম সদস্য ও সম্পাদক মনোনীত হন। ১৮ নভেম্বর ফ্লরেন্‌স্‌এ পার্টির নেতাদের এক বিশেষ বৈঠকে গ্রামশি তুরিনের বিপ্লবী সোশালিস্টদের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। সম্মেলনে পার্টির বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী অংশ যুদ্ধ সম্পর্কে সোশালিস্টদের নীতি বিষয়ে তর্কবিতর্ক চালিয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের সরকারি নীতি—'সমর্থনও নয়, অন্তর্ঘাতও নয়'—আরো একবার ঘোষণা করেন। এই বৈঠকেই গ্রামশি প্রথম আমেদেও বোরদিগাকে দেখেন, তাঁর ব্যক্তিত্বে ও বক্তৃতায় মুগ্ধ হন। যুদ্ধ চলাকালীন পরিস্থিতিতে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থানের যে-সম্ভাবনা বোরদিগা দেখছিলেন, গ্রামশি তার সহমর্মী হয়ে ওঠেন।

ফ্লরেন্‌স্‌-এর গোপন বৈঠকের কদিন আগেই বলশেভিকেরা রাশিয়ায় ক্ষমতায় এসেছেন, নভেম্বর বিপ্লব সমাধা হয়েছে। অথচ ইতালিতে তখনও যথেষ্ট খবর এসে পৌঁছয়নি। যা-কিছু খবর ইতালির পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, তার অধিকাংশই বিকৃত। তারই মধ্যে 'ইল গ্রিদো'য় ২৪ নভেম্বর গ্রামশি লিখলেন : 'রুশ বিপ্লবের সাম্প্রতিকতম পর্ব সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য বিবরণ আমরা এখনও পাইনি। এখনও কিছুদিন আমরা হয়তো তেমন নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাবও না। "ইল গ্রিদো" ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিল—সে-ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে কোনো অসুবিধা ছিল না—যে রুশ বিপ্লব তার কেরেনস্কি পর্বে থামতে পারে না। রুশ বিপ্লব চলছে, আরো বহু দূর এগোবে।' সেইদিনই 'আভান্তি' পত্রিকার জাতীয় সংস্করণে প্রকাশিত হয় গ্রামশির নামে একটি সম্পাদকীয়। তার শিরোনাম '"ক্যাপিটাল"-এর বিরুদ্ধে বিপ্লব'—জাতীয় স্তরে গ্রামশির এই প্রথম আত্মপ্রকাশ। প্রবন্ধের শুরুতেই গ্রামশি বলেন, যেহেতু 'বলশেভিক বিপ্লবে' মতাদর্শেরই প্রাধান্য, ঘটনাবলির নয়, তাই 'আমরা যা জানি তার চেয়ে বেশি জানার সত্যিই কোনো প্রয়োজন নেই।' মার্ক্স-এর 'ক্যাপিটাল'-

এ বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুদয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্‌ঘাটন, 'পশ্চিমি ধাঁচের সভ্যতার প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি ধাপ পেরিয়ে রাশিয়ায় নিবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লবের সম্ভাবনার যে ছক ছিল, বলশেভিকরা তা উলটে দিয়ে প্রমাণ করেছেন, 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়মনীতি যতটা অটল ভেবে আসা হয়েছে বা সত্যিই ছিল, আজ আর তা নয়।' সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামশি বলেন, তাই বলে তাঁরা 'ক্যাপিটাল'-এর 'প্রাণদ, মৌল ভাবনাকে বর্জন করেননি।' 'তাঁরা তাঁদের জীবনে মার্কসীয় চিন্তাকে আত্মস্থ করে নিয়েছেন—সেই চিন্তা যা চিরন্তন, যা জর্মন ও ইতালীয় ভাববাদের উত্তররূপে, যা মার্কস-এর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষবাদের ও স্বাভাবিকবাদের প্রভাবে কলুষিত হয়েছিল। এই চিন্তা আকাঁড়া অর্থনৈতিক তথ্যাবলিকে ইতিহাসের প্রধান নিয়ামক বিবেচনা করে না, বরং মানুষকে সেই মর্যাদা দেয়। মানুষ বলতে সমাজসমূহে অন্তর্গত মানুষ, অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িত মানুষ; যে-মানুষ একে অন্যের সঙ্গে বোঝাপড়ায় পৌঁছয়, এবং সেই সংযোগের সূত্রে এক সমবেত, সামাজিক অভীপ্সা নির্মাণ করে; যে-মানুষ অর্থনৈতিক তথ্যাবলি অনুধাবন করে তাদের বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজেদের অভীপ্সার মধ্যে তাদের এমনভাবে আত্মস্থ করে যাতে এই অভীপ্সাই অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠে বাস্তবকে পালটে অন্য রূপ দেয়; আগ্নেয়গিরির লাভার স্রোতের মতো প্রাণবন্ত ও চলমান এই বাস্তবের লক্ষ্য ও ধারা তখন মানুষের অভীপ্সাই কেবল নির্ধারণ করতে পারে।' গ্রামশি বলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের তিন বছরে যে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ রুশদেশবাসীকে ভোগ করতে হয়েছে, তার আশঙ্কা মার্কসের কল্পনায় দেখা দেয়নি। বস্তুত এই যুদ্ধই রাশিয়ায় সেই 'সমবেত গণ অভীপ্সা' সৃষ্টি করেছে যা বিপ্লবী অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়েছে। 'স্বাভাবিক অবস্থায়' এই সমবেত অভীপ্সা সৃষ্টি হতে সমগ্র সমাজের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও ভাবনার ক্রমবিস্তারের দীর্ঘ, ধীর প্রক্রিয়া প্রয়োজন হত। প্রথম মহাযুদ্ধের ব্যাপ্তি ও স্থায়িত্ব বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনাকে এক 'অস্বাভাবিক' ধাক্কা বা ত্বরণ দান করেই মার্কসের ছক উলটে দিয়েছে বলে গ্রামশির বিশ্বাস: 'রাশিয়ায় যুদ্ধ জনতার অভীপ্সাকে ত্বরিত করেছে।'

যতদিন যুদ্ধ চলছে, সরকারি সেনসরশিপ ও সামরিক আইন বলবৎ রয়েছে, আঞ্চলিক পার্টি সম্পাদক রূপে ততদিন গ্রামশির পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুব বেশি সক্রিয় হওয়া সম্ভব নয়। তারই মধ্যে ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এক সোশালিস্ট বন্ধুর প্রস্তাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দর্শনের ছাত্র আত্তিলিও কারেনা, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারী কার্লো বোক্কার্দো এবং সোশালিস্ট ইউথ ফেডারেশনের প্রতিবেদক আন্দ্রেয়া ভিল্লিয়ংগো, এই তিনজনকে নিয়ে ক্লুব দি ভিতা মোরালে (নৈতিক জীবন সংঘ) নামে একটি ছোট সংগঠন তৈরি করেন। জিউসেপ্পি লোমবার্দো রাদিচে-কে লেখা এক চিঠিতে গ্রামশি লেখেন: 'তুরিনে আমাদের বিশ্বাস, সমাজতান্ত্রিক সভ্যতায় যে-সব নীতি ও নৈতিক সূত্র অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে

সেগুলি কেবলমাত্র প্রচার করে গেলে চলবে না। আমরা এই প্রচারকে একটা সংগঠিত রূপ দেবার চেষ্টা করেছি; কীভাবে একসঙ্গে কাজ করা যায়, ইতালিতে তার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছি। তাই সম্প্রতি এই ক্লুব দি ভিতা মোরালে-র পত্তন হয়েছে। এই সংগঠনের মধ্য দিয়ে আমরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তরুণদের সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা বিষয়ে নিরাবেগ আলোচনার চর্চায় অভ্যস্ত করে তুলতে চাই। আমরা চাই তারা গবেষণায় পোক্ত হয়ে উঠুক, নির্দিষ্ট প্রণালীতে সুশৃঙ্খলভাবে পড়াশোনা করতে এবং সহজ ও শান্তভাবে নিজেদের প্রত্যয় ব্যক্ত করতে পারঙ্গম হয়ে উঠুক।' ষোল-সতেরো বছর বয়সী কয়েকটি উৎসাহী তরুণ কয়েকটি মাস ধরে গ্রামশির নির্দেশে ক্রোচে, সালভেমিনি, মার্কসের নির্দিষ্ট রচনাংশ খুঁটিয়ে পড়ে সে-বিষয়ে তাদের চিন্তাভাবনা লিখে নিয়ে এসেছে, গ্রামশি তা নিয়ে সবিস্তারে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এক এক করে এই তরুণদের যুদ্ধে ডাক পড়ায় শেষ পর্যন্ত ক্লুব উঠে গেছে।

এই পর্বে একদিকে যেমন রুশ বিপ্লব সম্পর্কে যা-কিছু লেখা বা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, রুশ বিপ্লবের নেতাদের যা-কিছু লেখা পাওয়া যাচ্ছে, তা গ্রামশি 'ইল গ্রিদোয়' প্রকাশ করে চলেছেন; তেমনই তিনি নিজেও ক্রোচে. সালভেমিনি, জেনতীল প্রমুখের রচনা (যা তাঁর ভাবনাবৃত্তকে এতদিন পুষ্ট করে এসেছে) ছেড়ে প্রথমে রল্যাঁ ও শার্ল পেগী ও তারপর ফরাসি অনুবাদে মার্কসের রচনাবলি পড়তে শুরু করছেন। ১৯১৮র ১৯ অকটোবর 'ইল গ্রিদো'র শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় তাঁর বিদায়ী বাণীতে গ্রামশি বলেন, 'ইল গ্রিদো' যখন তাঁর হাতে আসে, তখন তা ছিল 'কিছু স্থানীয় সংবাদসহ একটি ইভ্যানজেলিকাল প্রচারধর্মী সাপ্তাহিক'। তার পরিচালনায় তা হয়ে উঠেছে 'বিপ্লবী সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও রণকৌশলের ধারা অনুসরণ করে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি ছোটখাটো সমীক্ষা।' যুদ্ধান্তে তুরিনের সোশালিস্ট প্রধানেরা এক এক করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলে ১৯১৮ র নভেম্বরে পার্টির যে নতুন আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী সমিতি নির্বাচিত হয়, তাতে গ্রামশির পার্টি সম্পাদক পদ থেকে মুক্তি ঘটে। ৫ ডিসেম্বর থেকে তাঁর একমাত্র দায়িত্ব 'আভান্তি' পত্রিকার স্থানীয় সংস্করণের সম্পাদনা। ইতোমধ্যে তিনি যুদ্ধ প্রত্যাগত তাঁর তিন বন্ধু তাস্কা, তোইলিয়াত্তি ও তেরা্রাচিনির সঙ্গে একটি নতুন পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন।

১৯১৯ এর মে মাসে 'ল্যরদিনে নুওভো'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। গ্রামশির নাম ছাপা হল 'সম্পাদকীয় সচিব' রূপে। যে-কর্মসূচি লক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট করে পত্রিকার সূচনা হয় তা কার্যকর করতে বেশ কয়েকটি সংখ্যা লেগে যায়। একটা সময় গ্রামশি তাস্কাকে সরাসরি অভিযুক্ত করেন: 'ইতালীয় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সোভিয়েত ধাঁচের ঐতিহ্য আবিষ্কার করে আমাদের ইতিহাসে নিহিত যথার্থ বৈপ্লবিক প্রবণতা উদ্‌ঘাটন করার প্রয়াসে

আমাদের সমবেত শক্তি নিয়োগের কর্মসূচি কার্যত অবহেলিত তথা বর্জিত হয়েছে। প্রত্যেক কারখানায়, খামারে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত 'ফ্যাকটরি কাউনসিলের' মাধ্যমে সমস্ত উৎপাদনসংস্থা তথা উৎপাদনব্যবস্থার সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে, এই লক্ষ্যাভিমুখে এক ব্যাপক আন্দোলনের মুখপত্র ও তাত্ত্বিক ভিত্তি রূপেই ল্যরদিনে নুওভো' পত্রিকার পরিকল্পনা হয়েছিল।

ইতালীয় সোশালিস্ট পার্টি ও ইতালির শ্রমিক আন্দোলনে বাম, মধ্যপন্থী 'সংস্কারবাদী' দক্ষিণপন্থী, ও এই তিন ধারারই নানা রকমফের দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধকালীন বিধিনিষেধের চাপে খানিকটা চাপা ছিল এবং ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিল তা যুদ্ধান্তে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। রুশ বিপ্লবের সাফল্য, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের উদ্‌ভব, 'নির্বিত্ত শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের' নতুন দাবি এই দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তোলে। ১৯১৮ র সেপটেম্বরে রোম সম্মেলনে ও ডিসেম্বরে পার্টি পরিচালকমণ্ডলীর সভায় এবং ১৯১৯ এর অকটোবরে বোলোনায় ষোড়শ জাতীয় কংগ্রেসে সোশালিস্ট পার্টির মধ্যে ফিলিপ্পো তুরাতির নেতৃত্বে সংস্কারপন্থী গোষ্ঠী, জি এম সেরুরাতির নেতৃত্বে ম্যাক্সিম্যালিস্ট ও আমাদেও বোরদিগার নেতৃত্বে অ্যাবস্টেনশনিস্ট গোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায়। প্রথম পক্ষ গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সম্পূর্ণ আস্থাশীল; দ্বিতীয় পক্ষ বিপ্লবে আস্থাশীল, কিন্তু ব্যাপক ঐক্যের স্বার্থে অপেক্ষা করতে চান; তৃতীয পক্ষ অবিলম্বে সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষপাতী, নির্বাচনকে বিপ্লবের প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত বিবেচনা করেন। বোলোনা কংগ্রেসে ভোটাধিক্যে বিপ্লব ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতি আস্থা, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জায়গায় সোভিয়েত বা শ্রমিক কাউনসিলের শাসন পত্তনের সংকল্প ঘোষণা করে নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯১৯ এর নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে সোশালিস্ট পার্টি শতকরা বত্রিশ ভাগ ভোট পায়, পার্লামেন্টে ১৬৬ জন ডেপুটির আসন লাভ করে। পার্টির তুরিন শাখার কার্যনির্বাহী সমিতিতে ঐ বছরই যখন মে মাসে গ্রামশি পুনর্নির্বাচিত হন, তখন তাঁদের প্যানেলের কর্মসূচিতে আসন্ন নির্বাচনকে 'জনগণের বৈপ্লবিক শিক্ষার' উপলক্ষ রূপে গ্রহণ করবার সংকল্প উচ্চারিত হয়। নির্বাচনী অভিযানকালে বা নির্বাচনের পরেও পার্টির তিন গোষ্ঠীর কোনোটির সঙ্গেই তিনি যথার্থ নৈকট্য অনুভব করেন না। স্বভাবতই 'ল্যরদিনে নুওভো' পত্রিকা ও সেই পত্রিকার মাধ্যমে ফ্যাকটরি কাউনসিল গঠন ও তার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য অভিযান গ্রামশির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'ইল গ্রিদো'র সময় থেকেই গ্রামশি ট্রেড ইউনিয়নের বাইরে বিকল্প শ্রমিক সংহতি বা সংগঠনের দৃষ্টান্ত সন্ধান করতে শুরু করেছেন। এই পত্রিকায় একটি নিয়মিত বিভাগের নামই ছিল 'ওর্গানিৎসাৎসিওনে প্রোলেতারিয়া'—প্রলেতারিয় সংগঠন। 'ইল গ্রিদোর' একাধিক প্রবন্ধে

ইংলণ্ড ও জর্মানির শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখানো হয় কীভাবে দুই দেশেই বড় ট্রেড ইউনিয়নগুলি ক্রমশই প্রায় যেন অনিবার্যভাবেই এক আমলাতান্ত্রিক চরিত্র পরিগ্রহ করে, শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ যোগদানের সুযোগকে খর্ব করে—'জনতা কেবল সম্মতি দেয় ও নিষ্ক্রিয়ভাবে নির্দেশ পালন করে —এবং শেষ পর্যন্ত সরকার ও মালিক পক্ষের স্বার্থরক্ষাতেই বেশি তৎপর হয়। ফলে ইয়োরোপের বহু দেশেই ট্রেড ইউনিয়নের বাইরে অন্য বিকল্প নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে উঠছিল, বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরপরই। ১৯১৮ সালের ১২ অকটোবরের সংখ্যায় 'ইল গ্রিদো'য় এক প্রবন্ধে গ্রামশি লেখেন : 'লীগ ও চেম্বার অফ লেবর-এর নিয়মিত জীবনে সদস্যদের ছোট্ট সংখ্যালঘু একটি অংশমাত্র যোগ দেয়। বৃহত্তর অংশ নিয়মিত অনুপস্থিত থাকে। তাতে অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো মুহূর্তে ভোট দিয়ে হস্তক্ষেপ করতে তাদের বাধে না। এই ভোটদানে যা প্রতিফলিত হয় তা হল এমন এক শ্রেণীর মানুষের চাপল্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা যারা এই সংগঠনের প্রতিদৈনিক কার্যকলাপে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেনি. কোনো সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য তাৎপর্য বা পরিণাম সম্বন্ধে যাদের কোনো ধারণাই নেই, ফলে তাদের এই যোগদানে তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষের মতোই আচরণ করে।' ফলে 'নেতারা এমন এক কর্তৃত্ব ও গুরুত্ব পেয়ে যান যা ঐসব সংগঠনের সাম্যভাবাপন্ন ও মূলত গণতান্ত্রিক চরিত্রের মধ্যে তাঁদের পাওয়ার কথা নয়। বড় বেশি ক্ষেত্রে নেতারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অথচ তাঁদের তো কেবলমাত্র কর্মনির্বাহী ও প্রশাসনিক অফিসারের ভূমিকাতেই থাকবার কথা।'

ইংলণ্ড-এর শপ স্টিওয়ার্ড্স্ কমিটি ও রাশিয়ার সোভিয়েত সংগঠনের সঙ্গে তুলনীয় তৃণমূল স্তরের যে সংগঠনটি ইতালির কারখানায় আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল এবং অন্তত তুরিনের ধাতুশ্রমিকদের মধ্যে ১৯১৮ সালে যা বেশ শক্তিমান হয়ে উঠেছিল তার নাম কোম্মিস্সিওনে ইন্তেরনা। বিভিন্ন কারখানায় এই সংগঠনগুলির মাধ্যমেই বেতন, ফুরন বা ওভারটাইমের পাওনা, কাজের ঘণ্টার হার, কাজের পরিবেশ, ছোটখাটো সুবিধা-অসুবিধা, দাবি-দাওয়ার নিষ্পত্তি হত। গ্রামশি তাঁর কমরেডদের কাছে প্রস্তাব করেন, এই কোম্মিসিওনেগুলিকেই শ্রমিক সোভিয়েতে রূপান্তরের চেষ্টা করা যাক। বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্থানীয় বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানের আদলেই যদি কোনো কারখানার একটি ইউনিটকেই একটি অঞ্চল বলে ধরা হয় এবং কোম্মিস্সিওনেকে সেই অঞ্চলের কর্তৃত্বে স্থাপন করা হয়, তবে ক্রমে ক্রমে কোম্মিস্সিওনে সোভিয়েতের চরিত্র পরিগ্রহ করতে পারে, এবং ক্রমে তৃণমূল স্তরে শ্রমিকশ্রেণী 'তার স্বার্থ রক্ষা করতে উৎপাদনের উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।' ১৯১৮র নভেম্বরে 'ইল গ্রিদোয়' প্রকাশিত এক প্রবন্ধে গ্রামশি লক্ষ করেন, চার বছরের যুদ্ধে যুদ্ধকালীন শৃঙ্খলার নামে শ্রমিকদের যাবতীয় অধিকারকে নির্মমভাবে খর্ব করে, তাদের

ন্যূনতম দাবিদাওয়ার জন্য আন্দোলনের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে সরকার পুঁজিপতিদের যেভাবে উৎপাদনবৃদ্ধি করে বিপুল মুনাফা লুটে নেবার সুযোগ করে দিয়েছে, তাতে শ্রেণীসংগ্রামই তীব্রতর হয়েছে। যুদ্ধকালে যে-দমননীতি কারখানার শ্রমিকদের নিষ্পেষণ করেছে, সেই একই দমননীতি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের নির্যাতন করেছে। যুদ্ধশেষে এই সৈনিকেরা যখন ফিরে এসে ঐ শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে কারখানায় আবার কাজ শুরু করছেন, আর অন্যদিকে যুদ্ধকালীন বিধিনিষেধ শিথিল হচ্ছে, তখন আন্দোলনের নতুন পর্বের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এই আন্দোলনের চরিত্র আগের সব আন্দোলন থেকে পৃথক হবে। ২৫ নভেম্বর প্রকাশিত এই প্রবন্ধে গ্রামশি লেখেন : 'চার বছর ব্যাপী এই যুদ্ধ অর্থনৈতিক ও বৌদ্ধিক আবহাওয়া, দুই-ই দ্রুত পালটে দিয়েছে। বিশাল শ্রমজীবী জনতার সৃষ্টি হয়েছে, বেতনভোগী ও অঁত্রপ্রেনরদের মধ্যে সম্পর্কে যে গভীরে প্রোথিত হিংস্রতা দেখা দিয়েছে তা নির্বোধতম দর্শকের কাছেও আজ স্পষ্ট। বুর্জোয়া রাষ্ট্র তার সমূহ ক্ষমতা ও লোকবল নিয়ে যেরকম খোলাখুলি আজ এই হিংস্রতার বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাও কিছু কম দৃশ্যমান নয়।' সরকার বা রাষ্ট্রযন্ত্র পুলিশ বাহিনী, সশস্ত্র কারাবিনিয়েরি, কারারক্ষী থেকে শুরু করে বিচার ব্যবস্থা ('যা গণতান্ত্রিক মন্ত্রীদের সহায় হয়ে আইনলংঘনে মদৎ জোগায়') ও নির্বাচিত পার্লামেণ্ট ('যা তার গা-এলিয়ে-দেওয়া আলস্যে সবচেয়ে মৌলিক অধিকারগুলিকে পদদলিত হতে দেয়') পর্যন্ত তার সমূহ প্রাতি-ষ্ঠানিক অঙ্গগুলিকেই যখন শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে, তখন শ্রেণীবিরোধ তথা 'শ্রেণী হিংস্রতা'ও তুঙ্গে উঠেছে। গ্রামশি বলেন : 'শোষিত জনগণকে এইভাবেই বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবী সমাজবাদে এক ভয়ংকর কার্যকর শিক্ষা না দিয়ে পারেনি। এক নতুন শ্রেণীচেতনার উদ্ভব হয়েছে। শুধু কারখানাতেই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চেও, যেখানে জীবনধারণের পরিবেশ ছিল কারখানার মতোই। এই চেতনা রয়েছে একেবারেই প্রাথমিক স্তরে—কোনো মতাদর্শগত মাত্রা এখনও তাকে স্পর্শ করেনি। এখনও এ একেবারে কাঁচা আকর যাকে আমাদের দুমড়ে মুচড়ে রূপ দিতে হবে। আমাদের মতাদর্শই এই রূপায়ণ ঘটাবে। প্রলেতারিয় আন্দোলনের কাজ হবে এই জনতাকে তার নিজের মধ্যে টেনে নেওয়া, এদের শৃঙ্খলাবোধ দেওয়া, এদের বস্তুগত ও বৌদ্ধিক প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে সাহায্য করা। তার দায়িত্ব হবে, ব্যক্তিক স্তরে তাদের এমনভাবে শিক্ষিত করা যাতে তারা পরস্পরের সঙ্গে সৌভ্রাত্রের স্থায়ী ও অঙ্গাঙ্গী বন্ধন তৈরি করে নিতে পারে। তার দায়িত্ব হবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই স্পষ্ট, নির্দিষ্ট, যুক্তিনির্ভর প্রত্যয়ে পৌঁছে দেওয়া যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক হিতসাধনের একমাত্র বাস্তব পথ রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে।' ১৯১৮ সালের শেষেও 'রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সংগঠন' বলতে গ্রামশি বোঝান সোশালিস্ট পার্টি ও কনফেডারেশন অফ লেবর। কিন্তু ১৯১৯ সালে শুধু গ্রামশির মনেই নয়, আরো অনেকের

মনেই সংশয় দেখা দিচ্ছে, প্রাতিষ্ঠানিক আপসনীতির অনিবার্যতায় এই দুটি সংগঠনই ক্রমশই নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে, অবান্তর হয়ে যাচ্ছে। ১৯১৯ এর ১৩ মার্চ সোশালিস্ট পার্টির তুরিন শাখার তৎকালীন সম্পাদক জিওভান্নি বোয়েরো 'আভান্তি' পত্রিকায় এক চিঠিতে লেখেন, ডিসেম্বরে সোশালিস্ট পার্টি বিপ্লব ঘটাবার যে অঙ্গীকার করেছে, তা সাধন করতে চাইলে নির্বাচনী অভিযানে অর্থের অপব্যয় না করে তাদের সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে হবে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের কাউনসিল গঠনের কাজে। কিন্তু তাই বলে পার্টি নেতৃত্ব যে এই বিকল্প তৃণমূল সংগঠনের পরিকল্পনা খোলা মনে মেনে নেবেন, এমন মনে করার কোনো কারণ ছিল না। 'ল্যর্দিনে নুওভো' গোষ্ঠীর মধ্যেও তাস্কা ফ্যাকটরি কাউনসিলের সপক্ষে প্রচার ও আন্দোলনকে পত্রিকার মুখ্য কর্মসূচি বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাস্কা 'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি'র মুখপত্র রূপে যে পত্রিকার কথা ভেবেছিলেন, যার জন্য প্রাথমিক অর্থও সংগ্রহ করেছিলেন, তার লক্ষ্য হবে স্থির করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সমীক্ষা। গ্রামশি অনুযোগ করেন, তাস্কার প্রভাবে ও চাপে 'ল্যর্দিনে নুওভো'র প্রথম ছটি সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় 'এলোমেলো বস্তুতে ভরা এক সংকলন মাত্র—নির্বস্তুক কিছু সাংস্কৃতিক ব্যাপারের সমাবেশ, বিশ্রী গল্পের প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ এবং সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত কিছু কাঠখোদাই।' গ্রামশি, তোইলিয়াত্তি ও তেররাচিনি শেষ পর্যন্ত একজোট হয়ে তাস্কার অজানতে পত্রিকার ২১ জুন তারিখের সপ্তম সংখ্যায় 'শ্রমিক-দের গণতন্ত্র' নামে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশ করে দেন। প্রবন্ধটি গ্রামশির লেখা, তবে তোইলিয়াত্তির সহযোগিতায়। এই ঘটনায় স্বভাবতই তাস্কার সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব বেড়ে যায়; তাস্কা বছরের শেষের দিকে 'ল্যর্দিনে নুওভো' থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নেন।

'শ্রমিকদের গণতন্ত্র' প্রবন্ধে গ্রামশি লেখেন: 'শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক জীবনের স্বভাবলক্ষণস্বরূপ যে-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছে সেগুলির মধ্যেই বীজস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এখনই বর্তমান। এই প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্রের প্রতি যথোচিত মর্যাদা দিয়ে এগুলিকে একটা সম্পর্কের মধ্যে এনে দক্ষতা ও ক্ষমতার মাত্রানুসারে এগুলিকে এক প্রবলভাবে কেন্দ্রিত স্তরমাত্রাবিন্যাসের মধ্যে বিন্যস্ত করতে পারলে এখনই এখানেই যথার্থ শ্রমিক গণতন্ত্রের পত্তন হতে পারে। এই শ্রমিক গণতন্ত্র দাঁড়াবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও কার্যকর বিরোধিতার অবস্থানে, এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণে ঐ রাষ্ট্রের যে মূল ভূমিকা তা এখনই তুলে নিতে প্রস্তুত থাকবে।' পার্টি বা ট্রেড ইউনিয়নকে খারিজ করে ফ্যাকটরি কাউনসিলকে সব ভূমিকা দিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব গ্রামশি করছেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় শ্রেণীসংগ্রামের যে তীব্রতর বিকাশ গ্রামশি লক্ষ করেছেন, তারই প্রভাবে ১৯১৯-২০ সালে সোশালিস্ট পার্টি ও কনফেডারেশন অফ লেবর-এর বিপুল সদস্যবৃদ্ধি ঘটে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে

ইতালীয় সোশালিস্ট পার্টি'র সদস্য সংখ্যা ৫০,০০০ থেকে বেড়ে ২০০,০০০ হয়। বিভিন্ন ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা ৩২১,০০০ থেকে বেড়ে ২,৩০০,০০০ হয়। ১৯১৯-এ তুরিনে সোশালিস্ট পার্টি'র সদস্যসংখ্যা তিন গুণ বেড়ে যায়। তবুও শ্রমিকশ্রেণীর বৃহত্তর অংশই এখনও সারা ইতালিতে ও স্থানীয়ভাবে তুরিনেও কোনো সংগঠনের মধ্যে সংগঠিত নন। সংগঠিত ও অসংগঠিত, দুই শ্রেণীর শ্রমিকদেরই সংঘবদ্ধ করে সমাজতন্ত্রের জন্য বৃহত্তর আন্দোলনে গ্রামশি চালিত করতে চাইছেন। এই আন্দোলনে পার্টি'র ভূমিকাও তিনি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন: 'পার্টি' তার ভূমিকায় অবিচল থাকবে কমিউনিস্ট শিক্ষার বাহন রূপে, বিশ্বাসের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড রূপে, মতাদর্শের সমাবেশ ও উৎস রূপে, এবং সেই শীর্ষশক্তি রূপে যা শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত ও শৃঙ্খলাপরায়ণ বাহিনীকে কৃষকসম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে চরম লক্ষ্যের দিকে তাদের চালিত করবে। এই কর্তব্য তাকে কঠোরভাবে পালন করে যেতে হবে বলেই পার্টি তার দরজা হাট করে খুলে দিতে পারবে না। খুলে দিলে তার মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে এক দঙ্গল নতুন সদস্য যারা দায়িত্ব ও শৃঙ্খলার ধার ধারে না।' প্রলেতারিয় জীবনের যে-প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্রামশি শ্রমিক গণতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্র বলে বেছে নেন তার মধ্যে অন্যতম কারখানার বিভিন্ন বিভাগে ও অংশে সক্রিয় কোমুমিসিওনে ইনতের্না, সোশালিস্ট ক্লাবগুলি ও গ্রামীণ কৃষক সমাজ। এই সংগঠনগুলির মধ্যেও কী সম্পর্ক থাকবে, কী লেনদেন হবে, গ্রামশি তারও পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন, স্থানীয় বা আঞ্চলিক স্তরে আরো ঐরকম সংগঠন নির্মাণের সম্ভাবনার ইংগিত দেন। প্রবন্ধের শেষে তিনি বলেন, রাশিয়ায় ১৯০৫ সালেই সোভিয়েত সংগঠন পত্তন ও তাদের মধ্যে সম্পর্কের বিন্যাস তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল বলেই ১৯১৭-র বিপ্লব সমাধা হতেই সমাজগঠনের পরবর্তী পদক্ষেপ তখনই করা সম্ভব হয়। 'নির্বিত্তশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের সূত্রটি একটি কথার কথা বা বিপ্লবী অলংকারের চটকমাত্র ধরে রাখলে চলবে না। যে ঐ লক্ষ্যের অভীপ্সা উচ্চারণ করবে, তাকেই ঐ লক্ষ্যসাধনের পথও অভীপ্সায় ধারণ করতে হবে। নির্বিত্তশ্রেণীর একনায়কতন্ত্র এক নতুন প্রলেতারিয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সমর্থক—এমন এক রাষ্ট্র যা শোষিত শ্রেণীর যাবতীয় প্রতিষ্ঠানগত অভিজ্ঞতাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করবে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে এক ব্যাপক ও বলিষ্ঠভাবে সংগঠিত প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করবে।'

'ল্যাদির্নে নুওভো'র পাতায় ফ্যাকটরি কাউনসিল-এর বিকাশ ও বলবৃদ্ধির সপক্ষে গ্রামশি ও তোইলিয়াত্তি যে প্রচার শুরু করে দেন, তাতে সোশালিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন ও ফ্যাকটরি কাউনসিলের মধ্যে সম্পর্কের বিন্যাস তাঁরা যথেষ্ট যত্ন সহকারেই নির্দেশ করেছিলেন। ক্ষমতা ও নেতৃত্বের ধাপে ধাপে যে বিন্যাস তাঁরা কল্পনা করেছিলেন, তাতে পার্টি'র নেতৃত্বকে তাঁরা কোনোভাবেই খর্ব না করে তৃণমূল স্তরে শ্রমিকদের সংগঠিত করে তাঁদের শ্রেণীচেতনা

ও উদ্যোগকে শাণিত করতে চেয়েছিলেন। ফ্যাকটরি কাউনসিল প্রকল্পে বিপ্লবের প্রস্তুতিস্বরূপ শ্রমিকশ্রেণীর শিক্ষার যে গুরুত্ব নিহিত ছিল, তার মধ্যে গড়ে উঠছিল গ্রামশির পরবর্তী চিন্তার এজেমোনিয়া বা আধিপত্যের ধারণা। তৃণমূল স্তরে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে ফ্যাকটরি কাউনসিলের সভায় যে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে, তাতে 'শ্রমিকশ্রেণীর মানসিকতার আমূল রূপান্তর ঘটবে, ক্ষমতা প্রয়োগে শ্রমিকশ্রেণী আরো ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাত সামূহিক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কমরেডদের ও শ্রমিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে চেতনার প্রসার ঘটবে।' সোশালিস্ট পার্টির তুরিন শাখার এক সভায় গ্রামশি বলেন : 'বিপ্লবের যে শিক্ষা ও মানসিকতার যে পরিবর্তন মার্কস-এর মতে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে আশাপ্রদ পূর্বসংকেত বলে বিবেচনা করা যায়, ইংরেজ ও মার্কিন শ্রমজীবী জনগণ ফ্যাকটরি কাউনসিলের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতায় তারই সূত্রপাত করেছে।' ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টিকে গ্রামশি বারবারই এই সূত্রে 'শিক্ষক' বা 'বিশ্বাসের লক্ষ্যবিন্দু' বা তত্ত্বের আকর বলে নির্দেশ করলেও ট্রেড ইউনিয়ন ও সোশালিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ ফ্যাকটরি কাউনসিলের বিকাশকে তাঁদের ক্ষমতা সংকোচের চক্রান্ত বিবেচনা করে গ্রামশির বিরোধিতা করতে থাকেন। ইতালীয় সোশালিস্ট পার্টির প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ তখন শিল্পে শান্তি ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের নামে সরকার ও মালিকশ্রেণীর সঙ্গে আপস সমঝোতার যে-সম্পর্ক রক্ষায় যত্নবান হয়ে উঠেছেন, তার বিরুদ্ধে পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের যে-অংশ প্রতিবাদী হয়ে উঠছিলেন, পার্লামেণ্টারি পথের বাইরে গণ-আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখছিলেন, তাঁদেরই মদতে ফ্যাকটরি কাউনসিল গঠন ও বিকাশের উদ্যোগ প্রথম ফলপ্রসূ হয় ফিয়্যাট কম্পানির ব্রেভেত্তি কারখানায়। সেপটেম্বরে এই কারখানায় দু হাজার শ্রমিক একত্র হয়ে বত্রিশ জন কমিসার সম্বলিত যে ফ্যাকটরি কাউনসিল নির্বাচিত করে, তারই আদলে এক মাসের মধ্যেই ফিয়্যাট-এর বিয়াল্লিশটি শাখায় অনুরূপ কাউনসিল নির্বাচিত হয়। অকটোবরের মাঝামাঝিই এই কাউনসিলগুলির কার্যনির্বাহী প্রতিনিধিবর্গের যে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মোট ত্রিশ হাজার শ্রমিকের ভোটে নির্বাচিত মুখপাত্ররা যোগ দিয়েছিলেন। পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের সক্রিয় বিরোধিতা ও অপপ্রচার সত্ত্বেও ফ্যাকটরি কাউনসিলের প্রসার ঘটতে থাকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ১৬,০০০ শ্রমিকের ধর্মঘট ঘটিয়ে দিয়ে ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে ফ্যাকটরি কাউনসিল আন্দোলন তার শক্তির প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ রাখে। তাতে ফিয়্যাট-এর মালিকপক্ষ এই আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দিতে কৃতসংকল্প হয়; ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব ক্ষমতা হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে মালিকদের কাছাকাছি এসে দাঁড়ান। ১৯২০ সালের ফেবরুয়ারি-এপ্রিলে তুরিনে শ্রমিকদের কাজের চাপ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের মুখে মালিকপক্ষ ছাঁটাই-লক-আউটের আঘাত হানলে শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘটের যে-আহ্বান জানান, তাকে

ব্যর্থ করে দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন তুরিনের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি চরম বিশ্বাস-ঘাতকতা করে। ব্যক্তিগতভাবে গ্রামশিও প্রবল ধাক্কা খান। তাঁর আশা ছিল শ্রমিকশ্রেণীর প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত এই অভ্যুত্থানে সামিল হয়ে পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকশ্রেণীর কাছে নিজেদের মর্যাদাকেই প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু তা আর হল না। ধর্মঘট প্রত্যাহার করে শ্রমিকদের কাজে যোগদান গ্রামশির কাছে পরাজয় বই আর কিছুই নয়। তাই স্বভাবতই আবার নতুন করে জোর দিতে হল শ্রমিকদের শিক্ষার ওপর। ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত 'সংস্কৃতি ও সোশ্যালিস্ট প্রচারের পাঠকেন্দ্র'-এ গ্রামশি, তোইলিয়াত্তি, তাস্কা ও তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক অধ্যাপক তাঁদের নিয়মিত ভাষণে, 'ল্যার্দিনে নুওভো' পত্রিকায় প্রকাশিত নানা বিষয়ে প্রবন্ধাবলিতে গ্রামশি যে লক্ষ্য সাধন করতে চাইছিলেন তা হল শ্রমিকশ্রেণীকে 'সংস্কৃতির এক স্থায়ী শৃঙ্খলায়' নিয়োজিত করা যাতে তাঁরা পৃথিবী সম্পর্কে এক বোধে এবং অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে জটিল বিন্যাস পৃথিবীর সামাজিক জীবনের সার, তা সম্পর্কে এক বোধে উপনীত হতে পারেন।' এই শিক্ষাক্রমে মানবিকী বিদ্যার পাশাপাশি 'বুর্জোয়া উৎপাদন-পদ্ধতি' সম্পর্কে এবং সেই পদ্ধতির মধ্যেই কাজের ভার লাঘব করে উৎপাদনী ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কেও শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তোলার উদ্যোগ ছিল। কারণ, কেবলমাত্র ঐ দিকেই উৎসাহী হলে শ্রমিক-শ্রেণী ক্রমে নিতান্ত বেতনভোগী থেকে নিজেদের যথার্থ উৎপাদক রূপে উন্নীত করতে সক্ষম হবেন। এইভাবেই শ্রমিকদের নতুন সাংস্কৃতিক উন্মেষের মধ্যে প্রলেতারিয় রাষ্ট্রের বীজ উপ্ত হবে।

১৯১৮ সালের শেষ দিক থেকেই পি এস আই অর্থাৎ সোশ্যালিস্ট পার্টির জাতীয় নেতৃত্ব থেকে তুরিনের শ্রমিক আন্দোলনের যে-বিচ্ছেদ শুরু হয়েছিল, ১৯২০-র সাধারণ ধর্মঘটে পার্টির ভূমিকায় তা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এই বিরোধের মধ্যেও ১৯১৯-এর শেষ দিক পর্যন্ত সমগ্র আন্দোলনের ঐক্যের স্বার্থে গ্রামশি বারবার তাঁর বিভিন্ন রচনায় দুই পক্ষকেই একটা বোঝাবুঝির জায়গায় আনবার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। অকটোবরে বোলোনায় পি এস আই-এর ষোড়শ জাতীয় কংগ্রেসে পার্টির বিপক্ষীয় অন্তর্বিরোধে জি এম সেরুরাতির নেতৃত্বে তথাকথিত 'নির্বাচনপন্থী ম্যাকসিম্যালিস্ট'দের ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নভেম্বরে জাতীয় নির্বাচনে শতকরা ৩২ ভাগ ভোট লাভ ও ১৫৬ জন সাংসদের নির্বাচন পার্টিকে তথা পার্টি নেতৃত্বকে ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার যে স্বাদ ও আশ্বাস দেয় তাতে পি এস আই নেতৃত্ব স্বভাবতই অন্য মত ও যাবতীয় সংশয়কেই অবজ্ঞা করতে আরোই বদ্ধপরিকর হয়। বোলোনা কংগ্রেসের পর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবাবলির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৯-এর ২৯ অকটোবর সেরুরাতিকে লেনিন যে সপ্রশংস চিঠি লেখেন, তার প্রতিবাদ করে গ্রামশি বলেন যে তৃণমূল স্তরে সোভিয়েত বা কাউনসিল গঠনের মধ্য দিয়ে ও এই প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তিবৃদ্ধি দ্বারা প্রতিদৈনিক অর্থনৈতিক স্তরে কমিউ-

নিম্ট শক্তির প্রতিষ্ঠার যে-সম্ভাবনা তৃতীয় আন্তর্জাতিক লক্ষ করেছেন, পি এস আই সেদিকে এতটুকু দৃষ্টি না দিয়ে তার নিজস্ব 'ট্রেড ইউনিয়ন ঘোঁট ও পার্টিগত একদর্শিতার' মধ্যেই নিমজ্জিত। লেনিন তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ইতালীয় কমিউনিস্টদের চমৎকার কাজ থেকেই এই নিশ্চিত গ্যারান্টি পাওয়া যায় যে তাঁরা শিল্পে ও কৃষিতে নিয়োজিত সমুদায় নির্বিত্ত শ্রেণীকেই এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট মালিকদেরও কমিউনিজম-এর পক্ষে নিয়ে আসতে সমর্থ হবেন।' গ্রামশি বলেন, পি এস আই-এর কর্মনীতিতে তিনি কোথাও 'কৃষিতে নিয়োজিত নির্বিত্ত শ্রেণীকে ··· কমিউনিজম-এর পক্ষে নিয়ে আসার' কোনো তাগিদ লক্ষ করেননি। সেরুরাতি ও তাঁর নেতৃত্বে পি এস আই-এর কাছে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া বলতে তখন বোঝায়, পার্টিকে রাজনীতি, প্রচার, প্রশাসন ও ট্রেড ইউনিয়নইজম-এর প্রয়োগে সিদ্ধ প্রযুক্তিবিদদের এক সুসংগঠিত সমবায়ে পরিণত করে, তার প্রভাব খাটিয়ে শ্রমিক জনসাধারণকে টেনে এনে ময়দানে নামিয়ে দেওয়া। এই মনোভাবকে 'ব্লাংকিজমো' বা ফরাসি বিপ্লবী আউগুস্ত ব্লাংকি-র চিন্তার কাছাকাছি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'প্রথমেই পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করুন' এই নামে পরবর্তীকালে পুনর্মুদ্রিত (দ্র. 'গ্রামশি : সিলেকশন্স্ ফ্রম পোলিটিকাল রাইটিংস, ১৯১০-২০', লণ্ডন ১৯৭৭) এক প্রবন্ধে 'ল্যর্দিনে নুওভো' পত্রিকায় ২৪-৩১ জানুয়ারি, ১৯২০ সংখ্যায় গ্রামশি লেখেন, 'উদারনৈতিক গণতন্ত্রের কাঠামো' (অর্থাৎ 'রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে, যা আবার পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়ারই পরিণাম')-র মধ্যে ইতালীয় সোশালিস্ট পার্টি যথেষ্ট সাফল্য ও অগ্রগতি লাভ করলেও 'প্রলেতারিয় গণতন্ত্রের' উন্মোচনে, পার্টির 'ঐতিহাসিক ভূমিকার মৌল পরিপ্রেক্ষিতে' এই পার্টি 'এতটুকু সফল হননি।' 'জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ আন্দোলন দ্বারা যে যন্ত্রতন্ত্র তাঁরা নির্মাণ করেছেন তাকে তাঁরা কোনো স্থায়ী ও পাকাপোক্ত রূপ দিতে পারেননি। তাঁদের কোনো অগ্রগমন তো ঘটেইনি, বরং তাঁরা শেষ পর্যন্ত উচ্ছৃংখলা ও শৈথিল্যে এক সংকটে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছেন। ক্ষমতা দখল করবার লক্ষ্য সামনে রেখে গঠিত, সংগ্রামে সামিল হতে কৃতসংকল্প জঙ্গি শক্তিবর্গের সংহতি রূপে গঠিত সোশালিস্ট পার্টির সরকারি যন্ত্রতন্ত্র টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে, ধ্বসে পড়ছে। প্রতি দিনই দেখা যাচ্ছে পার্টি সংগ্রামরত ব্যাপক জনগণের সঙ্গে তার সংযোগ ক্রমশই হারিয়ে চলেছে। ঘটনা ঘটে যায়, পার্টি সেখানে অনুপস্থিত। উদ্ভ্রান্ত কাঁপুনিতে দেশ বারবার কেঁপে ওঠে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদী শাসনের ক্ষয়সাধনে নিয়োজিত শক্তিগুলির ক্রিয়া অপ্রতিরোধ্য নির্মমতায় অব্যাহত, অথচ পার্টির তাতে কোনো ভূমিকা নেই ; শ্রমিক-কৃষকদের বিপুল জনতাকে পার্টি কোনোভাবে আলোকিত করতে চেষ্টা করে না ; তার সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তার কোনো যুক্তি দেয় না ; অধৈর্য শান্ত করতে, হতাশা প্রতিহত করতে, শ্রমিক-কৃষক বাহিনীর সংহতি ও শক্তি অক্ষুণ্ন রাখতে কোনো নতুন স্লোগান দেয় না। যে-পার্টি

এক সময় ইতালীয় জাতির মহত্তম ঐতিহাসিক শক্তি হয়ে উঠেছিল, আজ তা রাজনৈতিক ছেলেমানুষির শিকার, ইতালীয় জাতির সামাজিক দুর্বলতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষতিসাধক। স্বভাবতই এই শুভযোগে বিপ্লবী সংহতির ভাঙনের বীজস্বরূপ সুবিধাবাদী ও সংস্কারবাদী নেতিবাদ এবং নৈরাজ্যবাদীদের বিপ্লবী ভাণসর্বস্ব বুলি (যা একই পাতি-বুর্জোয়া প্রবণতার দুই প্রকাশ) এমন দ্রুততায় পুষ্ট হচ্ছে, ব্যাপ্ত হচ্ছে।

'প্রতিদিনই প্রলেতারিয় বিপ্লবের পক্ষে অনুকূল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ আরো সুস্পষ্ট দৃশ্যমান হয়ে উঠছে,…আর সেই মুহূর্তেই, ইতালিতে যখন প্রলেতারিয় বিপ্লবের মুখ্য অস্ত্র সোশালিস্ট পার্টির ভূমিকা নিয়ামক হয়ে উঠতে পারত, তখনই সেই পার্টি বিস্রস্ত, পার্লামেণ্টারিয় রাজনীতিক ও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের আক্রমণে ও চক্রজালে বিপর্যস্ত, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে এমন ব্যক্তিরা যারা কেবলমাত্র গোঁজামিল দিয়ে, কোনো যথার্থ ও বাস্তব ভিত্তি ছাড়াই প্রতিনিধিস্থানীয় কর্তৃত্ব দাবি করেছে; এদিকে রয়েছে কোনো কার্যক্রমে ক্রমান্বয়তার সেই অভাব ও মানসিক আলস্য যা শ্রমিকদের তথা সব ইতালীয়দেরই স্বভাবজ। পার্টির কমিউনিস্ট তথা বৈপ্লবিক শাখা এবং বৈপ্লবিক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে নেতৃকুল মনোনীত করেছে তাঁরাও এই ক্ষয় রোধে কোনো সংহত কর্মসূচি গ্রহণ করেন নি; পার্টিকে সংক্রমণমুক্ত করে তাকে নিশ্ছিদ্র ঐক্যে সংগঠিত করে, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অঙ্গ রূপে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে, বিপ্লবী শক্তিবর্গের যে বিশ্বব্যবস্থা কমিউনিস্ট কর্মসূচিকে জয়যুক্ত করতে প্রচণ্ড আগ্রহে সক্রিয়, তার সঙ্গে পার্টিকে সবলে যুক্ত করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি।'

গ্রামশি লক্ষ করছেন, 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতার কারণে ও রুশী প্রলেতারিয়ত-এর প্রবল আঘাতে আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লবী ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। বুর্জোয়া ইতালীয় রাষ্ট্র জনপরিষেবা ব্যবস্থায় বিপুলায়ত ধর্মঘট ও তার নিজস্ব বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতিসমূহের হাস্যকর বিপর্যয়ের অভিঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, উভয় স্তরেই প্রলেতারিয় বিপ্লবের উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত পরিবেশ বর্তমান। অথচ এই ব্রাহ্ম মুহূর্তে সোশালিস্ট পার্টি তার দায়িত্বপালনে পরাঙ্মুখ।…এই পার্টি তার নিজস্ব আভ্যন্তর ঐক্য সংগঠিত করতে পারেনি। যে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শৃঙ্খলা তাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়ত শ্রেণীর পরিস্থিতির সেই ঘনিষ্ঠ বোধ এনে দিতে পারত যার বলে তার দ্বারা অভিভূত ও পর্যুদস্ত হয়ে না পড়ে বরং তার ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে ঘটনাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, সেই শৃঙ্খলা এই পার্টির আয়ত্ত নয়। বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষক সাধারণের পার্টি বিপ্লবের স্থায়ী সৈন্যবাহিনী শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে রেখে দিয়েছে এমন সব সুবিধাবাদীদের হেপাজতে যারা নিজেদের মর্জিমতো ইউনিয়নের লক্ষ্যসাধনের কর্মকৌশলকে সাময়িকভাবে অবরুদ্ধ করে দিতে পারে, প্রতিটি বৈপ্লবিক

ক্রিয়াকে ঠাণ্ডা মাথায় অন্তর্ঘাতে বিনষ্ট করে, যারা পার্টির মধ্যেই তৈরি করে বসে আরেক পার্টি, বস্তুত পার্টির চেয়েও শক্তিশালী এক পার্টি, কারণ এই পার্টি নিয়ন্ত্রণ করে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীশরীরের চলচ্ছক্তিনিয়ন্ত্রক নার্ভ-গ্রন্থি। দু-দুটো ধর্মঘট যা রাষ্ট্রের পক্ষে যথার্থই মারাত্মক হতে পারত, ঘটে গেল, অথচ তা নিয়ে পার্টির কিছুই বলার রইল না, কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধর্মঘটের মধ্যেকার সেই "পার্থক্য"-এর তত্ত্ব ছাড়া যা সেই জীর্ণতর, খারিজ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের জীর্ণ ও খারিজ তত্ত্বমাত্র।… ফলে শ্রমিকশ্রেণী আবিষ্কার করল, তারা সর্বতোভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন প্রকোষ্ঠে বিন্যস্ত এক ব্যবস্থার ফাঁদের মধ্যে বাঁধা পড়েছে, তারা অবরুদ্ধ, বিমূঢ়, হতোদ্যম, যাবতীয় নৈরাজ্যবাদী ত্যাগিদের হাতছানির শিকার।'

'ল্যর্দিনে নুওভো'র এই সংখ্যাতেই (২৪-৩১ জানুয়ারি ১৯২০) আরেকটি অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধে ইতালীয় সোশালিস্ট পার্টির ব্যর্থতায় ও পার্টির ম্যাক্সিম্যালিস্ট নেতৃত্বের অপদার্থতায় উদ্বিগ্ন গ্রামশি শেষ পর্যন্ত তুরিনের সোশালিস্টদের পথ নির্দেশ করেন, পার্টির ভিতর থেকে পার্টি সংস্কারের উদ্যোগ নিতে ; ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলির 'শক্ত ভিত থেকে পুরো শহরের জন্য একটি শ্রমিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করতে।' এই শ্রমিক কাউন্সিলের ভূমিকা হবে 'পার্লামেন্ট ও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্রমাগত সমালোচনার' ও 'মিউনিসিপ্যালিটিগুলির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের' দায় গ্রহণ। গ্রামশির কাছে ফ্যাশিবাদের অভ্যুদয়ের অবশ্যম্ভাবিতা তখন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে ঃ 'আমরা বিশ্বাস করি, যে-অদৃষ্ট বুর্জোয়া শ্রেণীর সামনে আজ ছায়াপাত করেছে তাকে এড়াতে তার একমাত্র পথ হল এক প্রতিক্রিয়াশীল, সামরিক একনায়কতন্ত্রের পত্তন করা। দ্রুত হোক, দেরিতে হোক, এই পথই তারা নেবে।'

এই সংকটের বোধ থেকেই গ্রামশি প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন সোশালিস্ট পার্টিকে তার যথাযোগ্য ভূমিকায় এনে দাঁড় করাতে। একদিকে তখন মুদ্রাস্ফীতি ক্রমবর্ধমান (১৯১৯-এর জুলাই মাসে মিলানের কোনো সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের গড়পড়তা সাপ্তাহিক ব্যয় হত ১০৯.২৪ লিরা, ১৯২০-র ডিসেম্বরে তা দাঁড়ায় ১৮৯.৭৬ লিরা), বেকারিও ক্রমবর্ধমান ; ধর্মঘটের প্রবাহ বয়ে চলেছে ইয়োরোপ জুড়ে (১৯২০-র জানুয়ারিতে ইতালিতে ঘটে ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘট ও রেলকর্মীদের ধর্মঘট—এই দুটি ধর্মঘটকেই পূর্বোদ্ধৃত এক রচনায় গ্রামশি 'রাষ্ট্রের পক্ষে যথার্থই মারাত্মক হতে পারত' বলে বর্ণনা করেন) ; অন্যদিকে রাষ্ট্রযন্ত্র ও পুঁজিবাদ সংগঠিত হচ্ছে শ্রমিক-শ্রেণীকে শায়েস্তা করতে—১৯১৯-এর শরৎকালেই সরকার পুলিশবাহিনীকে পুনঃসংগঠিত করে ৩৭৭ জন অফিসার ও ২৫,০০০ জন আরক্ষী নিয়ে নতুন রয়াল গার্ড বাহিনী গঠন করেন, সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকধারী কারাবিনিয়েরি বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এক লক্ষ ষাট হাজারে তুলে দেন (এই সম্মিলিত শক্তি কেবলমাত্র ১৯১৯-এর অকটোবর ও ১৯২০-র মে মাসের মধ্যে অন্তত একশো-

জন শ্রমিক-কৃষককে হত্যা করে); ১৯২০-র ৭ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় সমস্ত বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও মাঝারি ও ছোট উৎপাদকদের তিন-চতুর্থাংশের প্রতিনিধিত্বমূলক শক্তিশালী সমবায় কনফিনদুস্ত্রিয়া বা জেনেরাল কনফেডেরেশন অফ ইনডাসট্রি। কনফিনদুস্ত্রিয়ার দক্ষ সম্পাদক জিনো ওলিভেত্তি সংগঠনের এক সভায় উপস্থাপিত তাঁর প্রতিবেদনে ফ্যাকটরি কাউনসিলগুলির আশু বিনাশের সুপারিশ করেন। ১৮ অগস্ট জমির বড় মালিকেরাও সংগঠিত হন জেনেরাল কনফেডেরেশন অফ এগ্রিকালচার নামে সংগঠনে। নির্বাচনী সাফল্যের মোহে আবিষ্ট সোশালিস্ট পার্টি এই ঘোর সংঘর্ষ ও তারই মধ্য দিয়ে ফ্যাশিবাদের উন্মেষের লক্ষণ লক্ষই করছেন না। পি এস আই-এর সমালোচনায় গ্রামশিও আরো তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছেন।

ইতালীয় সোশালিস্ট পার্টির সঙ্গে গ্রামশি ও পার্টির তুরিন শাখার বিরোধ তুঙ্গে ওঠে ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে তুরিনের সাধারণ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে। এই ধর্মঘটের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে গ্রামশি পরে বলেন, 'ইতিহাসে এই প্রথম নির্বিত্ত শ্রেণী এক আন্দোলনে সামিল হল, ক্ষুধা বা বেকারির তাড়নায় নয়, উৎপাদনের উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার তাগিদে।' মালিক পক্ষের প্রতিরোধের মূল লক্ষ্যই ছিল ফ্যাকটরি কাউনসিলগুলিকে চিরতরে অশক্ত করে দেওয়া। জাতীয় স্তরে সোশালিস্ট পার্টি কোনোভাবেই তুরিনের আন্দোলনকে সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ধর্মঘটের ব্যর্থতা ও শ্রমিকদের আত্মসমর্পণের পর পার্টি সম্পাদক সেররাতি পার্টির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: 'শত্রুপক্ষ যখনই শক্তিমান ও প্রস্তুত বোধ করে আমাদের সংঘর্ষে প্ররোচিত করবে, তখনই সে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে আমরা বাধ্য নই। এই বিষয়ে তুরিনের আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ অন্য মত পোষণ করেন বলে মনে হয়। আক্রমণের মুখে পড়ে তারা আক্রমণের মোকাবিলা না করে তাঁদের যাবতীয় প্রতিরোধই প্রত্যাহার করে নেন। কোণঠাসা হয়ে পড়ে শেষ মুহূর্তে তাঁরা তাদের চেয়ে কম শক্তিমান ও কম প্রস্তুত শক্তিবর্গের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে ছুটলেন।' এই বিরোধ ধর্মঘট চলাকালীনই পার্টির মুখপত্রগুলিতেও প্রকট হয়ে পড়ে। 'আভান্তি' পত্রিকার মিলান থেকে প্রকাশিত সংস্করণ তুরিন শাখার ধর্মঘট বিষয়ক ইশতেহার পর্যন্ত প্রকাশ করতে অস্বীকার করে। অন্যদিকে সাময়িকভাবে 'ল্যর্দিনে নুওভো' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে পীডমন্ট থেকে প্রকাশিত 'আভান্তি' পত্রিকার সংস্করণটিকে 'সাধারণ ধর্মঘটের দৈনিক বুলেটিন' রূপে গ্রহণ করা হয়। ধর্মঘটের মধ্যেই ১৯-২১ এপ্রিল মিলান-এ সোশালিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কথা ছিল, তুরিনেই এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। শেষ মুহূর্তে হঠাৎ সম্মেলনের স্থান পরিবর্তন করা হয়। গ্রামশি ব্যঙ্গভরে পরে মন্তব্য করেন, 'ধর্মঘটে সামিল এক শহর ঠিক সোশালিস্ট আলাপ-আলোচনার পক্ষে অনুকূল ছিল না।' তুরিন শাখার পক্ষ থেকে তোইলিয়াত্তি সম্মেলনে যোগ দেন। তুরিন শাখায় সর্বসম্মতিক্রমে অনু-

মোদিত গ্রামশির একটি প্রবন্ধ 'সোশ্যালিস্ট পার্টির পুনরুজ্জীবনের জন্য' মিলান অধিবেশনে তুরিন শাখার প্রতিবেদন রূপে উপস্থাপিত হয়। মিলান অধিবেশনে এই দলিলটিকে কোনোই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি : কিন্তু জুলাই-আগস্ট মাসেই মস্কোয় তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিন তাঁর মূল অভিভাষণে বলেন : 'ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টি সম্পর্কে যে-সমালোচনা ও কার্যকর প্রস্তাব পার্টির তুরিন শাখা ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের কাছে পেশ করেছিলেন এবং যা "ল্যর্দিনে নুওভো" পত্রিকায় ১৯২০-র ৮ মে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের এই দ্বিতীয় কংগ্রেস তা মুখ্যত যথার্থ ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের যাবতীয় মূল নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করে। এই কারণেই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস এই প্রস্তাবগুলি এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দুই কংগ্রেসেরই যাবতীয় সিদ্ধান্ত আলোচনা করে পার্টির কর্মনীতির সংশোধন এবং পার্টি থেকে ও তার পার্লামেণ্টারি গোষ্ঠী থেকে অ-কমিউনিস্টদের বর্জন করার জন্য ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টিকে পার্টির একটি বিশেষ কংগ্রেস আহ্বান করতে অনুরোধ জানাচ্ছে।' ৩০ জুলাই আরেকটি ভাষণে লেনিন বলেন : 'ইতালীয় কমরেডদের আমাদের সোজা কথায় বলতেই হবে যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের গতিধারা "ল্যর্দিনে নুওভো"-র ধারার সঙ্গেই সংগতিপূর্ণ, সোশ্যালিস্ট নেতাদের বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ও তাঁদের পার্লামেণ্টারি গোষ্ঠীর কর্মধারার সঙ্গে নয়।'

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ইতালীয় প্রতিনিধিদল লেনিনের এই মূল্যায়নের বিরোধিতা করলেও আন্তর্জাতিকের নতুন কর্ম-নির্বাহী সমিতিতে নির্বাচিত সেরাতি কংগ্রেসের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন যে তাঁরা পি এস আই-এর এক বিশেষ কংগ্রেস আহ্বান করে তাতে আন্তর্জাতিকের মতাদর্শ ও কর্মনীতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করবেন—ও পার্টির অন্তর্গত সংস্কারপন্থীদের পার্টি থেকে বিতাড়িত করবেন। এই প্রতিশ্রুতি পালনে পরবর্তী কালে সেরাতির বিন্দুমাত্র উদ্যোগ দেখা যায়নি।

নয়টি সূত্র ও অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত গ্রামশির এই ঐতিহাসিক গুরুত্বমণ্ডিত রচনাটির শুরুতেই তিনি পুঁজিবাদের সংকট ও উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে 'নতুন জমানার' সম্ভাবনা লক্ষ করেছেন; 'শিল্প ও কৃষির শ্রমজীবীরা পুঁজিপতি ও জমিমালিকদের হাত থেকে উৎপাদনের উদ্যোগের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারবেন', এমন এক সম্ভাবনা কল্পনা করেছেন। এই সংকট ও সম্ভাবনার মুখে 'শিল্পপতি ও জমিমালিকেরা শ্রেণীগত শৃঙ্খলা ও ক্ষমতার চরম সমাবেশ আয়ত্ত করেছে; কনফিনদুস্ত্রিয়ার যে-কোনো নির্দেশ আজ দেশের প্রত্যেকটি কারখানায় সঙ্গে সঙ্গে পালিত হয়। পাশাপাশি বুর্জোয়া রাষ্ট্র গঠন করেছে ভাড়াটে এক সশস্ত্র বাহিনী যারা সম্পত্তিবানদের এই নতুন, শক্তিমান সংগঠনের যে-কোনো ইচ্ছাপূরণে কর্মনির্বাহী রূপে

সক্রিয় হতে সদা প্রস্তুত। এদের লক্ষ্য লক-আউট ও সন্ত্রাসের ব্যাপক প্রয়োগে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর পুঁজিবাদী অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে আরো বেশি পরিমাণে বেগারি দিতে শ্রমিক ও কৃষকদের বাধ্য করা। শ্রমিকশ্রেণীকে পদদলিত করার এই-যে সংকল্প শিল্পপতিরা গ্রহণ করেছেন, তুরিনের এনজিনীয়ারিং সংস্থাগুলিতে সাম্প্রতিক লক-আউট তারই দৃষ্টান্ত। ইতালীয় শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক সংহতি ও একাগ্রতার অভাবের সুযোগ নিয়ে তাঁরা তুরিনের প্রলেতারিয়ত শ্রেণীর সৌভ্রাত্র্য ভেঙে চুরমার করে দিয়ে কারখানাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির (ফ্যাকটরি কাউন্সিল ও শপফ্লোর প্রতিনিধিদের) মর্যাদা ও কর্তৃত্বকে শ্রমিকদের মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে দেবার চেষ্টা করেছেন।' প্রথম দুটি ধারায় বা সূত্রে শ্রেণীসংগ্রামের দুই পক্ষের অবস্থান নির্দিষ্ট করে তৃতীয় ধারায় গ্রামশি বলেন, 'ইতালিতে শ্রেণীসংগ্রাম যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে পরবর্তী পর্যায়ে হয় বিপ্লবী নির্বিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে উৎপাদন ও বন্টনের নতুন পদ্ধতির দিকে এমন এক উত্তরণ ঘটাবে যাতে উৎপাদনের উন্নতির সূচনা ঘটবে; নয়তো সম্পত্তিবান শ্রেণী ও শাসকশ্রেণীর দিক থেকে এক ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। শিল্পে ও কৃষিতে কর্মরত নির্বিত্ত শ্রেণীকে ক্রীতদাসোপম শ্রমে বাধ্য করতে যে-কোনো হিংস্রতার প্রয়োগ ঘটবে। রাজনৈতিক সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর বাহুস্বরূপ সোশালিস্ট পার্টিকে চিরতরে বিনাশ করবার চেষ্টা হবে; অর্থনৈতিক প্রতিরোধে তার বাহুস্বরূপ ট্রেড ইউনিয়ন ও কো-অপারেটিভগুলিকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের যন্ত্রের মধ্যে আত্মসাৎ করে নেবার চেষ্টা হবে।' ফ্যাশিবাদের আশংকা যতই গ্রামশির চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ততই সোশালিস্ট পার্টির আত্মতৃপ্ত নির্জীবতা তাঁকে বিচলিত করে তুলছে। এই দলিলে সোশালিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ: 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসে যে-পর্ব উন্মোচিত হয়েছে তা সম্পর্কে কোনো বোধ বা বিপ্লবী প্রলেতারিয়তের সংগ্রামী বাহুগুলির উপর যে দায়িত্ব এসে পড়েছে তা সম্পর্কে সোশালিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় অঙ্গগুলির এতটুকু বোধের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। সোশালিস্ট পার্টি কেবল দর্শকের মতো ঘটনার প্রবাহ লক্ষ করে চলেছে। মার্কসবাদ ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্তাবলি ভিত্তি করে নিজস্ব কোনো মত প্রকাশের মতো মতই তার নেই। তারা কখনো এমন কোনো স্লোগান তোলে না যা জনগণ তুলে নিতে পারে, বা এমন একটা সাধারণ মূলনীতি নির্দেশ করতে পারে যা বৈপ্লবিক কর্মপন্থাকে সংহত করতে পারে, একমুখী করতে পায়।' তাঁর অভিযোগ, 'শ্রেণীসংগ্রামের যে বাস্তবে শিল্পক্ষেত্রে ও কৃষিক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত সংগ্রামরত' সেই 'বাস্তবে নিমজ্জিত হয়ে 'সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলনের যথার্থ নেতৃত্বদানের অবস্থানে' নিজেকে প্রতিষ্ঠিত না করে পার্টি কেবলমাত্র এক পার্লামেণ্টারিয় পার্টিই থেকে গেছে, 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিজেকে স্থাবর করে ফেলেছে।' তাঁর আরো অভিযোগ, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে ভাব ও মতের যে প্রবল

প্রাণবন্ত সংলাপ চলেছে, ইতালির সোশালিস্ট পার্টি'র মধ্যে তার সামান্যতম অনুরণন নেই। 'প্রলেতারিয় বিপ্লব যে একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনা এবং প্রতিটি একক ঘটনাকেই আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে হবে, এই বোধে ইতালির শ্রমজীবী জনতাকে শিক্ষিত করে তুলতে কোনো সর্বাত্মক শিক্ষা অভিযানের কোনো উদ্যোগ পার্টি গ্রহণ করেনি।' তৃতীয় আন্তর্জাতিকের মূল নীতিকে অনুসরণ করে পার্টি'কে বৈপ্লবিক ভূমিকায় উন্নীত করা তো দূরের কথা, পার্লামেণ্টারিয় ভূমিকাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে এই পার্টি মতাদর্শকে সযত্নে শিকেয় তুলে রেখে সংস্কারপন্থীদের অবাধ ক্ষমতা দিয়েছে; সংস্কারপন্থী ও সুবিধাবাদীরা ট্রেড ইউনিয়ন ও গণসংগঠনগুলির নেতৃত্বে মৌরসি পাট্টা গেড়ে বসেছে; 'বিভিন্ন শাখাগুলির জীবন ও ক্রিয়াকর্ম, সংগঠনগুলি ও ব্যক্তি কমরেডদের সঙ্গে পার্টি নেতৃত্বের কিছুমাত্র সংযোগ নেই।' পার্টি পত্রিকা 'আভান্তি' ও পার্টি'র প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাগুলিতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও সুবিধাবাদীদের 'প্রতিবিপ্লবী' তত্ত্বধারণার প্রতিফলন লক্ষ করেন গ্রামশি: 'তদুপরি যে পুস্তিকাগুলি অনুবাদিত সেগুলির অনুবাদকর্ম এতই কাঁচা যে তা প্রায়ই অবোধ্য, তাছাড়া ব্যাকরণগত দোষ ও সাধারণ বোধের ব্যত্যয় তো আছেই।' 'পার্টি'র পুনরুজ্জীবন' বলতে গ্রামশি যা বোঝেন, তা হল: 'পাতিবুর্জোয়া পার্টি থেকে তাকে হতে হবে শ্রমিক রাষ্ট্রের পত্তনের পথ ধরে কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত বিপ্লবী নির্বিত্ত শ্রেণীর পার্টি —নিজস্ব মতাদর্শ ও কর্মপন্থা এবং কঠোর ও দুর্ভেদ্য শৃংখলায় পোক্ত এক সমঞ্জস, সমন্বিত পার্টি।' সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামশি উচ্চারণ করেন এক অমোঘ সতর্কবাণী যার যাথার্থ্য প্রমাণ হতে বেশি সময় লাগেনি: 'শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি'র অস্তিত্বের যৌক্তিকতা তখনই যখন তা প্রলেতারিয়তের সক্রিয় ভূমিকাকে বলিষ্ঠভাবে কেন্দ্রীভূত ও সমন্বিত করে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আইনি ক্ষমতার পরিপন্থী কার্যত এক বৈপ্লবিক ক্ষমতাকে তুলে ধরে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উদ্যোগ গ্রহণ ও কৌশলে স্বার্থসিদ্ধির ক্ষমতাকে খর্ব করে। পার্টি যদি [নির্বিত্ত শ্রেণীর] প্রয়াসকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ও সমন্বিত করতে অপারগ হয়, এবং নিরাবেগ ও উদাসীন এক আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানমাত্র রূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করে, তবে শ্রমিকশ্রেণী স্বভাবতই অন্য পার্টি গঠন করতে বাধ্য হবে, নৈরাজ্য-প্রবণতার দিকে ধাবিত হবে।'

১৯১৯-এর অক্টোবরে বোলোনায় পি এস আই-এর ষোড়শ জাতীয় কংগ্রেসেই পার্টি'র অভ্যন্তরীণ ত্রিধাবিভাজন স্পষ্ট হয়ে গেছল। তার মধ্যে সংস্কারপন্থীরা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পদ্ধতি-প্রণালীতে পরিপূর্ণ আস্থায় অটল; পার্লামেণ্ট-সদস্য সোশালিস্টদের মধ্যে, শ্রমিক ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বে ও সি জি এল (কনফেদেরাৎসিওনে জেনেরালে দেল লাভোরো—ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক সমবায়গুলির জাতীয় সংস্থা)-এর কেন্দ্রীয় দফতরে এবং যেখানেই স্থানীয় পৌরশাসনে সোশালিস্টরা ক্ষমতাধিষ্ঠিত, সেখানেই সং-

স্কারপন্থীদের প্রতিষ্ঠা। অন্য কোটিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমাদেও বোর্দিগার নেতৃত্বে 'অ্যাবস্টেনশনিস্ট' বা নিবৃত্তিবাদী গোষ্ঠী। 'অ্যাবস্টেনশন' বা নিবৃত্তি বলতে নির্বাচন থেকে নিবৃত্ত থাকা। বোর্দিগাও বিপ্লবের সম্ভাবনা ও আবশ্যকতায় তাঁর বিশ্বাস থেকেই নির্বাচনের হুজুগ থেকে পার্টিকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান: নিবৃত্তিবাদীরা মনে করেন, বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতির আশু কর্তব্য থেকে নির্বাচনী অভিযান বিচ্যুতি তথা কর্তব্যে অবহেলা বই আর কিছুই নয়। নেপল্‌স্‌-এ নিবৃত্তিবাদীদের মূল কেন্দ্র হলেও সারা ইতালি জুড়েই তাঁদের ছোট ছোট গোষ্ঠী ছিল। নিবৃত্তিবাদীরা নির্বিত্ত শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাস করেন; হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বনে বা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কর্মনীতি সম্পর্কে কোনোভাবে দ্বিধান্বিত বা সংশয়াপন্ন যাবতীয় সদস্য ও সংস্কারপন্থীদের অবিলম্বে পার্টি থেকে বহিষ্কারের দাবি জানাচ্ছিলেন তাঁরা। সের্রাতির নেতৃত্বে ম্যাকসিম্যালিস্টরা কার্যত মধ্যপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করে পার্লামেন্টারি কর্মসূচিকে বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব বলে বর্ণনা করছিলেন, প্রয়োজনে সহিংস বিপ্লবের পথ গ্রহণ করতেও তাঁরা প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেছিলেন। পার্টির প্রশাসনিক পরিচালকমণ্ডলী, পার্টির দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের দফতরগুলি ও পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'আভান্তি'র উপর ম্যাকসিম্যালিস্টদের কর্তৃত্ব তাঁদের পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন এনে দিয়েছিল। গ্রামশির নেতৃত্বে 'ল্যর্দিনে নুওভো' ঘিরে তুরিনে যে সোশালিস্ট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল—যাঁদের অনেক সময় 'অর্দিনোভিস্তি' বলে বর্ণনা করা হত—জাতীয় স্তরে পার্টির মধ্যে তাঁদের কোনো যথার্থ স্বীকৃতি জোটেনি, তিনটি মূল গোষ্ঠীর কোনোটির সঙ্গেই তাদের তেমন মতৈক্য ছিল না। তোইলিয়াত্তি পরে বলেছেন, 'গ্রামশির মধ্যে বৌদ্ধিক নিষ্ঠা, যে-কোনো ধরনের বক্তৃতাবাজির প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা ও প্রগাঢ় বিনয়ের যে সমাবেশ ঘটেছিল তাতে সঙ্গে সঙ্গেই নেতৃত্ব গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া তিনি সমীচীন বোধ করেননি, যদিও তা-ই করা তাঁর পক্ষে সংগত হত।' ফলে 'সোশালিস্ট পার্টির মধ্যে একটি জাতীয় ফ্যাকশন তৈরি করার গুরুত্বের সম্মুখীন হয়নি "ল্যর্দিনে নুওভো"।' তুরিনের সোশালিস্ট পার্টি শাখার মধ্যেও নিবৃত্তিবাদীদের বেশ কিছুটা শক্তি ছিল। জাতীয় স্তরেও এফ জি এস বা সোশালিস্ট যুব ফেডারেশনের মধ্যে নিবৃত্তিবাদীদের সমর্থন বেশ পাকাপোক্ত ছিল। ১৯২৪ সালে গ্রামশি লেখেন: '১৯১৯-২০ সালে আমরা যে-সব গুরুতর ভুল করেছিলাম, আজ আমরা কার্যত তারই খেসারত দিচ্ছি। পাছে লোকে আমাদের ক্ষমতালোভী সুযোগসন্ধানী ভাবে, সেই ভয়ে আমরা এমন কোনো নির্দিষ্ট উপদল গড়ে তোলবার চেষ্টা করিনি যা সমগ্র ইতালি জুড়ে সংগঠিত হতে পারে। তুরিনের ফ্যাক্টরি কাউন্সিলগুলিকে একটি স্বয়ংশাসিত নেতৃগোষ্ঠী জোগাতে পারলে তা হয়তো সারা দেশকে প্রভাবিত করতে পারত। আমরা কিন্তু তাও করতে যাইনি, কারণ আমাদের ভয় ছিল তাতে ইউনিয়নগুলিতে ভাঙন ঘ

যেতে পারে, আর আমরাও সোশালিস্ট পার্টি থেকে সাত তাড়াতাড়ি বিতাড়িত হতে পারি।'

বরং নিবৃত্তিবাদীদের অবস্থানের সঙ্গেই গ্রামশির কিছুটা নৈকট্য ছিল। গ্রামশির ফ্যাকটরি কাউনসিল-এর তত্ত্ব সম্পর্কে বোরদিগার সংশয় থাকলেও ('রাষ্ট্রের মাধ্যমে পুঁজিবাদ যখন রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তখন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি অর্জন করে প্রলেতারিয়েত নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারবে, এমন কোনো ধারণা, মেনে নিতে বোরদিগা প্রস্তুত ছিলেন না ; তাঁর স্থির মত, 'প্রলেতারিয়তের হাতে ক্ষমতা চলে এলে তবেই উৎপাদনের উপর অধিকারের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে') গ্রামশি পর্যবেক্ষক রূপে ফ্লরেন্স্ শহরে 'কমিউনিস্ট নিবৃত্তিবাদী' উপদলের জাতীয় সম্মেলনে যোগ দেন।

গ্রামশি ও তাঁর অনুগামীরা যে শুধু জাতীয় ক্ষেত্রে পার্টির ধারা-উপধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তা-ই নয় ; 'অর্দিনোভিস্ত' অর্থাৎ 'ল্যর্দিনে নুওভো' পত্রিকার অন্তরঙ্গ কর্মীগোষ্ঠীর মধ্যেও মতাদর্শগত বিরোধ তীব্র হয়ে উঠছিল। ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টি থেকে কতটা স্বাধীনতা ফ্যাকটরি কাউনসিলকে দেওয়া যেতে পারে, সেই প্রশ্নে তাস্কা ও গ্রামশির বিরোধ তুঙ্গে ওঠে ১৯২০-র মে মাসে। তুরিন চেম্বার অফ লেবর-এর এক কংগ্রেসে ৩০ মে তাস্কা এক বক্তৃতায় ফ্যাকটরি কাউনসিলের জন্য আন্দোলনকে ট্রেড ইউনিয়ন ও চেম্বার অফ লেবর-এর অধীনে ও পরিচালনায় চালন করবার প্রস্তাব করলে 'ল্যর্দিনে নুওভো' পত্রিকার পাতায় গ্রামশি তীব্র ভাষায় তাস্কাকে ও তাঁর প্রস্তাবকে আক্রমণ করেন। সোশালিস্ট পার্টির তুরিন শাখার মধ্যেও নানা প্রশ্নে যে অন্তহীন বিরোধ-সংঘর্ষ চলছিল তার ধাক্কায় গ্রামশি, তোইলিয়াত্তি ও নিবৃত্তিবাদী বোয়েরো ও পারোদি সহ শাখার সমগ্র কর্মনির্বাহী সমিতি ১০ জুলাই পদত্যাগ করেন। জাতীয় স্তরেও যেমন, তুরিন শাখাতেও তেমনই উপদলীয় বিভাজন ও বিবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই এই পদত্যাগ ও নতুন কর্ম-নির্বাহী সমিতি নির্বাচনের প্রস্তুতি ও উদ্যোগ। পদত্যাগের পর প্রতিটি উপদলই তার নিজস্ব মতাদর্শগত অবস্থান ও লক্ষ্য আরো স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করে নেতৃত্ব অধিকারের চেষ্টা করুক, তোইলিয়াত্তিসহ অনেকেই সেদিন যখন এই দাবি তোলেন, তখন তুরিনে পার্টির মধ্যে তিনটি উপদলের অস্তিত্ব প্রকট হয়ে ওঠে। তোইলিয়াত্তি, তাস্কা ও তেররাচিনির নেতৃত্বে সংগঠিত হলেন ম্যাকসিম্যালিস্ট নির্বাচনপন্থীরা। এঁরা তুরিনের শ্রমিক আন্দোলনে নৈরাজ্য-বাদী ও সিনডিক্যালিস্টদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রতিরোধে যেমন একমত, তেমনই নির্বাচনে যোগ দিয়ে জয়লাভে সচেষ্ট হওয়া এবং 'সংস্কারপন্থী ও সুবিধাবাদী'দের বর্জন তথা বহিষ্কারের গুরুত্বে প্রত্যয়ী। 'কমিউনিস্ট নিবৃত্তিবাদী'রা নির্বাচনী ক্রিয়াকলাপ তথা অভিযানের ঘোর বিরোধী। গ্রামশির নেতৃত্বে তৈরি হয়ে যায় 'কমিউনিস্ট শিক্ষা গোষ্ঠী'। এই তিন উপদলীয় গোষ্ঠীর সরাসরি সংঘর্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বে যোগ দিতে গ্রামশি ও

তাঁর গোষ্ঠী প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা স্থির করেন, নতুন কর্মসমিতি নির্বাচনে তাঁরা কোনো গোষ্ঠীকেই সমর্থন করবেন না, নিজেরাও কোনো গোষ্ঠী হিসেবে প্রার্থী দাঁড় করাবেন না; কারণ নির্বাচনের মাধ্যমে বিপ্লব না কি নির্বাচনের বাইরে বিপ্লব, এমন তর্ক পার্টিকে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে দাঁড় করিয়ে দেয় আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির পন্থা নির্ধারণের সীমিত ক্ষেত্রে। জনগণের সমবেত অভিযানে পার্টিকে নেতৃত্ব দিতে হবে, সেই দায় অবহেলা করে পার্টি যেন তেন প্রকারে ক্ষমতার লড়াই মাত্র চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, এই বোধে বিরক্ত গ্রামশি তখন ঝুঁকছেন নিবৃত্তিবাদীদের দিকে; যদিও ফ্লরেন্স-এ নিবৃত্তিবাদীদের সম্মেলনে তিনি বলে এসেছেন, 'এমন একটিমাত্র নীতি ভিত্তি করে কোনো রাজনৈতিক দল তৈরি হতে পারে না। তার প্রয়োজন জনগণের সঙ্গে ব্যাপ্ত যোগ যা আয়ত্ত হতে পারে কেবলমাত্র নতুন ধরনের সংগঠনের মধ্য দিয়ে।'

'নতুন ধরনের সংগঠন' বলতে গ্রামশি ফ্যাকটরি কাউনসিল-এর মতো সংগঠনকেই বোঝাচ্ছেন, একথা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে বোরদিগা তাঁর 'ইল সোভিয়েত' পত্রিকায় লিখছেন যে 'কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তির প্রশ্ন না তুলে কারখানার মধ্যে শক্তির প্রশ্ন তোলা'র অর্থ সমাজতান্ত্রিক শক্তি অর্জন না করেই সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণে অহেতুক কালক্ষেপ। ১৯২০-র ফেবরুয়ারি থেকে 'ইল সোভিয়েত' খোলাখুলি লিখতে শুরু করেছেন, পার্টি ভেঙে একাধিক টুকরোয় বিভক্ত হয়ে যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয়, কারণ তখনই 'বোঝা যাবে কে যথার্থই কমিউনিস্ট, কে নয়; তখন আর এই প্রশ্নে কোনো বিভ্রান্তি থাকবে না।... একটা ভালো রকম ভাঙনে বাতাস হাল্কা হয়ে যায়। তখন কমিউনিস্টরা একদিকে, আর সর্ব স্তরের সর্ব ধ্যানধারণার সংস্কারপন্থীরা অন্যদিকে।' সংসদীয় রাজনীতির মধ্যে পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের নিমজ্জন মানতে পারছেন না গ্রামশি, 'সাচ্চা' কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পার্টির ভাঙন ঘটানোও তাই বলে তিনি গ্রহণ করতে পারেন না; 'ল্যর্দিনে নুওভো' পত্রিকায় তিনি বলেন, 'জনগণের মধ্যে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার লক্ষ্যপূরণে কাজ করে যেতে হবে যাতে কমিউনিস্ট বিপ্লবের জৈব বিকাশের অঙ্গরূপেই এই সমস্ত বিশেষ সমস্যাগুলির সমাধান ঘটবে।'

১৯২০-র ২৪ জুলাই সোশালিস্ট পার্টির তুরিন শাখার নতুন কর্মনির্বাহী সমিতি নির্বাচনে তোইলিয়াত্তি-তেররাচিনির নির্বাচনপন্থী উপদল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হন। তাঁরা পান ৪৬৬ ভোট, নিবৃত্তিবাদীরা পান ১৮৬ ভোট। গ্রামশি ও তাঁর 'কমিউনিস্ট শিক্ষা গোষ্ঠী' স্থির করেছিলেন তাঁরা ভোটার স্লিপ-এ কোনো নামে চিহ্ন না দিয়ে সাদা স্লিপ জমা দেবেন; এইরকম স্লিপ জমা পড়ে মাত্র একত্রিশটি। অগস্ট মাসে তোইলিয়াত্তি তুরিন শাখার সম্পাদক পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

তোইলিয়াত্তি বা তাস্কার মতো সহযোগী বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদে গ্রামশি

যখন একা হয়ে পড়েছেন, তখনই তিনি ফিরে পান পুরনো আরেকটি সম্পর্ক—কাইলিয়ারি থেকে দাদা জেন্নারো তুরিনে চলে আসেন 'ল্যর্দিনে নুওভো' পত্রিকার ব্যবস্থাপনা ও হিসাবরক্ষায় হাত লাগাতে। রাজনৈতিক মতাবিরোধের সংকটের মধ্যে নিজের দ্বিধা সংশয় নিয়ে যখন বাইরের কারো সঙ্গে কথা বলাও সহজ ও সংগত নয়, তখন জেন্নারোর সঙ্গে মন খুলে কথা বলার সুযোগটাও গ্রামশির পক্ষে মহামূল্য হয়ে ওঠে। পরে কারাগার থেকে লেখা এক চিঠিতে গ্রামশি লেখেন : 'আবার তুরিনে আমার দাদার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হবে, আমি ভাবতেও পারিনি। আমার বড় আনন্দ হয়েছিল, কারণ আমি চিরদিনই আমার বাকি পরিবারের চাইতে জেন্নারোর সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলাম।'

১৯২০-র অগস্ট-সেপটেম্বরে ঘটনাপ্রবাহ ইতালিতে বামপন্থী আন্দোলনে একটা বড় রকমের পালাবদল অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ২১ অগস্ট তারিখের 'ল্যর্দিনে নুওভো' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গ্রামশি যখন তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কর্মনির্বাহী সমিতি কর্তৃক ৮ মে-র প্রতিবেদনের স্বীকৃতি ও সমর্থনে যেন একটা চূড়ান্ত 'রায়' পেয়েছেন জেনে শ্লাঘা বোধ করেছেন, তখনই শুরু হয়ে গেছে প্রাক-ফ্যাশিস্ত পর্বে ইতালীয় শ্রমিকশ্রেণীর শেষ উল্লেখযোগ্য আন্দোলন।

ধাতুশ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সংগঠন ফিয়োম (ফেদেরাৎসিওনে ইম্‌পিয়েগাতি ওপেরাই মেতাল্লুর্জিচি—এফ আই ও এম) জুলাই-অগস্ট মাস ধরে ধাতুশিল্পপতিদের কেন্দ্রীয় সংগঠন এ এম এম এ-র সঙ্গে বেতনবৃদ্ধির দাবি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শিল্পে সংকট, বিদেশি প্রতিযোগিতা এবং উচ্চ করচাপের অজুহাতে মালিক পক্ষ ১০ অগস্ট শ্রমিকদের সমস্ত দাবি নাকচ করে দিলে ফিওম এক বিশেষ কংগ্রেস আহ্বান করে সমস্ত ধাতুশিল্প কারখানায় 'ধীরে কাজ করার' সিদ্ধান্ত নেন। ফিওম কোনো বড় রকমের সংঘর্ষ এড়াতে চাইছিলেন বলেই ধর্মঘটের ডাক দেন নি ; মালিক পক্ষও বেশ কয়েক দিন 'ধীরে চলার' পরিণামকে খুব একটা গুরুত্ব দেন না। কিন্তু কোনো কোনো কারখানায় উৎপাদনের হার পুরনো হারের শতকরা ষাট ভাগ মাত্রে নেমে এলে মালিকেরা নড়েচড়ে বসেন। ৩০ অগস্ট মিলানের আলফা-রোমিও কারখানার কর্তৃপক্ষ লক-আউট ঘোষণা করেন। ফিওম নেতৃত্ব প্রস্তুত ছিলেন। তাঁদের আহ্বানে লক-আউটের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে শ্রমিকেরা আলফা-রোমিও কারখানা দখল করে নেন ; সঙ্গে সঙ্গেই মিলান ও তার আশপাশের ২৮০টি কারখানা শ্রমিকদের দখলে চলে যায়। ১ সেপটেম্বর আন্দোলনের ঢেউ তুরিনে এসে পৌঁছয় : শ্রমিকেরা তুরিনের ধাতুশিল্প কারখানাগুলি দখল করে নেন। অচিরেই ইতালির সমুদায় ভারী শিল্প শ্রমিকদের দখলে চলে যায়। শ্রমিকদের কর্তৃত্বে ও চালনায় কারখানা ও উৎপাদন সক্রিয় রাখার প্রয়াসে স্বভাবতই ফ্যাকটরি কাউনসিলগুলির ভূমিকা বড় হয়ে ওঠে। ২ সেপ্টেম্বর 'আভান্তি' পত্রিকার পীডমণ্ট সংস্করণের এক অস্বাক্ষরিত

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গ্রামশি লেখেন: 'মিলান, রোম, নেপল্‌স্‌, ফ্লরেন্স, তুরিন ও অন্য বহু কেন্দ্রে ধাতুশিল্পের কারখানাগুলি মালিকশ্রেণী বা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রায় কোনো বাধা ছাড়াই শ্রমিকেরা অধিকার করে নিয়েছেন। নতুন এক যৌথ কনট্র্যাক্ট-এর দাবিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যথাবিহিত চলছে, কিন্তু তার ভিত সম্পূর্ণ পালটে গেছে। এতাবৎ যা ছিল শ্রমিকদের ফেডারেশনের নেতাদের সঙ্গে মালিকদের সংগঠনের নেতাদের বক্তৃতাসর্বস্ব ও পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ প্রতিবেদনে সীমিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ মাত্র, আজ তা ব্যাপক জনসাধারণের এক বিপুল অভিযানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে; সঙ্গে সঙ্গেই এই জনগণের উদ্যোগ গ্রহণের সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে, এবার তাদের নিজেদের পরিচালনা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কারখানা দখলের এই ঘটনাটিই, শ্রমিকশ্রেণীর এই কর্তৃত্বপ্রতিষ্ঠাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার পবিত্র নীতিকে লঙ্ঘন করেছে, সামাজিক উচ্চ-নীচমাত্রার প্রথাগত ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিচেতনায় ও জনগণের সমবেত চেতনায় নতুন অনুভূতি ও নতুন আবেগের উৎস ও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে অগ্রণী, তাঁদের মাথা ঠাণ্ডা রাখার প্রয়োজন এই মুহূর্তে সর্বাধিক। তাঁদেরই দায়িত্ব, কোনোরকম বক্তৃতাবাজি আশ্রয় না করে কী ঘটছে তার এক যথার্থ ধারণা তাঁদের কমরেডদের কাছে স্পষ্ট করে তোলা, তাঁদের প্রত্যেকের ওপর কী বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে তা সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করে তোলা। তাঁদেরই দায়িত্ব, প্রত্যেক শ্রমিককে বুঝিয়ে দেওয়া যে আজ তাঁরা প্রত্যেকে সৈনিক, প্রত্যেককেই আদেশ তথা দায়িত্ব মেনে চলতে হবে; প্রত্যেককেই হতে হবে প্রলেতারিয় বাহিনীর অভিন্ন অঙ্গ; যে-কোনো বিচ্যুতি, যে-কোনো দৌর্বল্য, যে-কোনো ঝোঁকের মাথায় করে ফেলা কাণ্ডই বিবেচিত হবে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়া রূপে।'

এই প্রবন্ধে গ্রামশি যেমন একদিকে কারখানায় শ্রমিকদের নতুন দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনে উৎসাহিত করছেন, উৎপাদনের উপায়-উপকরণ-প্রক্রিয়ার উপর শ্রমিকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনে তাঁর যোগ্যতার পরীক্ষা দেবার এই সুযোগ গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছেন; অন্যদিকে তিনি শ্রমিকদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে যতক্ষণ তাঁদের হাতে উৎপাদনের কাঁচা মালের জোগান নেই, পুঁজি নেই, বেতন দেবার সংগতি নেই, উৎপন্ন পণ্য বেচবার সুযোগ নেই, ততক্ষণ কেবলমাত্র কারখানা দখল করে বিপ্লব সাধন করা যাবে না: 'শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক কারখানা দখলের ঘটনা নির্বিত্ত শ্রেণীর ক্ষমতার পরিচায়ক হলেও তাতে কোনো নতুন নিয়ামক অবস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। ক্ষমতা থেকেই যাচ্ছে পুঁজিপতিদের হাতে; সেনাবাহিনী থেকে যাচ্ছে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সম্পত্তি; প্রশাসন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বণ্টন, ঋণদায়ী যাবতীয় সংস্থা, সমগ্র বাণিজ্যিক যন্ত্রতন্ত্র, সবই রয়ে গেছে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। নির্বিত্ত শ্রেণীর হাতে এমন কোনো বশকারী শক্তি নেই যার বলে তাঁরা প্রযুক্তিবিদ ও সাদা-কলারধারী শ্রমিকদের অন্তর্ঘাতকে ব্যর্থ করতে পারেন; তাঁরা

প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল জোগাড় করতে পারবেন না, তাঁরা যা উৎপাদন করবেন, তা বেচতে পারবেন না।' কারখানা দখলের এই পরিণতি সম্পর্কে সচেতন বুর্জোয়া রাষ্ট্র জেনেশুনেই যেন শ্রমিক জনগণের লাগামের রাশটা একটু শিথিল করেছে যাতে 'প্রলেতারিয় ঘোড়া খেপে ছুটে যায় যতক্ষণ অর্ধভুক্ত, ক্ষীণপ্রাণ দশায় দিশাহারা হয়ে সে মুখ থুবড়ে পড়ে, তারপর এক গোছা খড়ের দাক্ষিণ্যেই সে তার পালক সহিসকে অনুসরণ করে আস্তাবলে গিয়ে ঢোকে।'

একদিকে গ্রামশি যতই বলুন না কেন যে 'শ্রমিক জনসাধারণকে সত্যি কথাটা বলতেই হবে, এক মুহূর্তের জন্যও যেন শ্রমিকেরা না ভেবে বসেন যে কমিউনিস্ট বিপ্লব একটি অরক্ষিত কারখানা অধিকারের মতনই সহজসাধ্য ব্যাপার', তবুও তুরিনে কারখানা দখল আন্দোলনের প্রথম রবিবার দিনটিকে 'লাল রবিবার' আখ্যায় ভূষিত করে 'আভান্তি' পত্রিকার ৫ সেপটেম্বর সংখ্যায় এক অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধে তিনি শ্রমিকদের কাছে এই মর্মে আবেদন জানান যে তাঁরা যেন এই দিনটিতে কারখানার মধ্যে শ্রমিকসাধারণের সমাবেশে (যাকে গ্রামশি বর্ণনা করেন 'কারখানার মধ্যে ভূমিষ্ঠ প্রলেতারিয় প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব যে-অঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়', এই বলে) এই 'কারখানা প্রজাতন্ত্রের' স্বরূপ বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করে ভবিষ্যতের প্রলে-তারিয় বিপ্লবের প্রথম ঐতিহাসিক বীজকোষ' গঠন করেন। আসলে আন্দোলন যে রূপ নেয়, তাতে অবধারিত রূপেই পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের গুরুত্বকে অতিক্রম করে ফ্যাকটরি কাউনসিল বড় হয়ে ওঠে। ইতালিতে তৎকালীন সমাজবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতের পরিপন্থী যে ধারার মূল প্রবক্তা ছিলেন গ্রামশি, সেই ধারাই অবশেষে ঘটনা পরম্পরায় পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের সমর্থন ও স্বীকৃতি পেয়ে গেছে, এই ঘটনা স্বভাবতই গ্রামশিকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি ও তাঁর অনুগামী সহকর্মীরা কয়েকদিনের জন্য 'আভান্তি'র প্রকাশ বন্ধ করে কারখানায় কারখানায় ফ্যাকটরি কাউনসিলগুলির সুষ্ঠু, দায়িত্বশীল ভূমিকা নিশ্চিত করতে অবিরাম প্রচারকার্য ও রাজনৈতিক শিক্ষাদানের কাজে নেমে পড়েন। গ্রামশি জানেন, ক দিনের মধ্যেই এই আন্দোলন ভেঙে পড়বে, তবুও কমিউনিস্ট শিক্ষার একটা অভিযান ও শেষ পর্যন্ত তার এক পরীক্ষার এই সুযোগ ছাড়তে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই এই সময়ের একাধিক প্রবন্ধে তিনি আগের চেয়ে আরো বেশি জোর দিয়ে বলছেন, একটি কারখানার মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ফ্যাকটরি কাউনসিলের সাফল্য বিপ্লবকে কোনোভাবেই কাছে এনে ফেলে না। বস্তুত কারখানা দখল আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই গ্রামশির চিন্তাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল। আগে রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপান্তর না আগে তৃণমূল স্তরে শ্রমিকদের উৎপাদন ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব অধিকার, এই নিয়ে বোরদিগার সঙ্গে গ্রামশির যে তর্ক চলছিল, তাতে গ্রামশি এবার বোরদি-গারই আরো কাছাকাছি চলে এসেছেন। 'নৈরাজ্যবাদীরা যে-অর্থ আরোপ

করছেন তারই আলোকে যদি এই কারখানা দখলের দিকে আমরা তাকাই, তাহলেই প্রশ্ন উঠবে এই দখলে কী লাভ হবে যদি না এমন-কোনো রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কেন্দ্র থাকে (অর্থাৎ এক শ্রমিক রাষ্ট্র)—বা কেউ যদি তা বলিষ্ঠ প্রয়াসে সংগঠিত না করে—যা এক কারখানার সঙ্গে আরেক কারখানাকে যুক্ত করবে, ব্যাংকগুলির রূপান্তর ঘটাবে যাতে তারা শ্রমিকশ্রেণীর প্রশাসনকে মদত দেয়, এবং হয় প্রত্যক্ষ বিধিনিষেধ প্রয়োগ করে নয়তো রেশনিং ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যা প্রতিবিপ্লবী শক্তির অন্তর্ঘাতকে ব্যর্থ করে দেবে?'

প্রতি কারখানার মধ্যে ফ্যাকটরি কাউনসিলের নেতৃত্বে উৎপাদন পরিচালনার কর্মকাণ্ডে গ্রামশি দেখছেন, 'প্রতিটি কারখানা হয়ে উঠেছে এক একটি বেআইনি রাষ্ট্র, এক একটি প্রলেতারিয় প্রজাতন্ত্র।' কিন্তু যাকে তিনি বলেন 'ঐতিহাসিক বিকাশের অন্তরীণ দ্বান্দ্বিকতা', তারই তাড়নায় আরো একটি প্রশ্ন এবার বড় হয়ে ওঠে : এই প্রলেতারিয় প্রজাতন্ত্রগুলি কেমন করে একটি ঐক্যবদ্ধ ফেডারেশন গঠন করে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কেন্দ্রিত শক্তির বিরুদ্ধে তাদের সংহত, কেন্দ্রিত শক্তিকে খাড়া করবে? এই প্রশ্নের সঙ্গেই আবার জড়িয়ে রয়েছে 'প্রলেতারিয় প্রজাতন্ত্রের' আত্মরক্ষা তথা সামরিক প্রতিরক্ষার প্রশ্ন। স্বভাবতই বুর্জোয়া রাষ্ট্র যখন একদিকে দুর্বল হচ্ছে, আবার অন্য দিকে ফ্যাশিবাদী শক্তির জন্ম দিচ্ছে, তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে প্রলেতারিয় রাষ্ট্রকে সশস্ত্র, সংগঠিত প্রতিরোধের যন্ত্রতন্ত্র ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করে নিতে হবে। 'লাল রবিবারের' জন্য এই প্রশ্নগুলিকেই গ্রামশি শ্রমিকদের আলোচ্যসূচির শীর্ষে স্থাপন করেছিলেন। বস্তুত আন্দোলন যখন অনিবার্য আপসের দিকে এগোচ্ছে, তখন গ্রামশির কাছে সমস্ত ঘটনাটি 'পঠনমূলক' হয়ে উঠছে। ১৪ সেপটেম্বরের প্রবন্ধে তিনি এপ্রিলের আন্দোলন থেকে 'পাঁচ মাস পর' সেপটেম্বরের আন্দোলনের অগ্রগতি লক্ষ করছেন, ফ্যাকটরি কাউনসিলের কার্যকরতা ও সম্ভাবনার প্রথম স্বীকৃতি লক্ষ করছেন, কিন্তু উৎপাদনব্যবস্থার উপর কারখানা স্তরে শ্রমিকদের 'কর্তৃত্ব' যে যথেষ্ট নয়, তা যে কেবল অন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যন্ত্রতন্ত্র তথা এক বিবর্তমান জোটের সংগঠনের পথে প্রথম পদক্ষেপমাত্র, এই সূত্র মাথায় রেখে তিনি এই আন্দোলনের নৈতিক তাৎপর্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখতে বলছেন, এই আন্দোলন থেকে শ্রমিকদের শিক্ষা গ্রহণ করতে বলছেন।

মালিকদের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় পৌঁছে ফিওম ২৪ সেপটেম্বর কারখানা দখল আন্দোলন প্রত্যাহারের প্রস্তাব শ্রমিকদের গণভোটে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন। সেইদিন সকালের 'আভান্তি' পত্রিকায় গ্রামশি লেখেন : 'কারখানায় শ্রমিকদের এই মত প্রার্থনার কী পরিণাম হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। গণভোট একান্তভাবেই গণতান্ত্রিক ও প্রতিবিপ্লবী একটি পদ্ধতি। এর দ্বারা কোনো-জনসাধারণের নিরবয়ব গণপিণ্ডকে মহিমান্বিত করে যে-অগ্রণীরা সেই জনসাধারণকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের রাজনৈতিক চেতনায় সঞ্জীবিত করছেন, তাঁদেরই গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।'

গণভোটের অনুমোদনে আন্দোলন প্রত্যাহারে গ্রামশি পরাজয়ই দেখছেন। কিন্তু কারখানা দখল চলাকালীন কারখানার মধ্যে চমৎকার শৃঙ্খলা, বাইরে থেকে আক্রমণের আশঙ্কায় প্রতিরোধ-ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ঘোর প্রতিকূলতার মধ্যেও উৎপাদন অব্যাহত রাখার যে দৃষ্টান্ত তুরিনের ধাতুশ্রমিকেরা রেখেছেন এবং মুখ্যত অভ্যন্তরীণ ফ্যাকটরি কাউনসিলের নেতৃত্বেই, তাতে গ্রামশি পরবর্তী পদক্ষেপের অন্য সম্ভাবনা দেখতে পান। সোশালিস্ট পার্টি ও কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সি জি এল ১০ সেপটেম্বর এক যুক্ত বৈঠকে বসে কোনো মতৈক্যে পৌছতে না পেরে যখন ভোটাধিক্যেই এই আন্দোলনের কোনো বৈপ্লবিক বিস্তারের বিপক্ষেই সিদ্ধান্ত নেন, তখন পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে গ্রামশির অনাস্থা ও সংশয় তুঙ্গে ওঠে। ১৪ সেপটেম্বর তিনি 'আভান্তি' পত্রিকায় লেখেন : 'বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সামনে শিল্পক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের পথ খুলে গেছে, উৎপাদনক্ষেত্র থেকে মালিক শ্রেণীর চূড়ান্ত নির্বাসনের সম্ভাবনা এসে গেছে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এমন জনগণপ্রিয় অর্থনৈতিক অঙ্গসংগঠন সৃষ্টি করতে হবে যা সরাসরি কারখানা থেকে, কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই এবং কেবলমাত্র তাদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হবে।' এই 'অঙ্গসংগঠন' এক অর্থে ফ্যাকটরি কাউনসিলেরই জটিলতর ও সমৃদ্ধতর রূপ : এগুলি হবে এমন সংগঠন যা 'জীবন্ত থাকবে, যা যে-কোনো মুহূর্তে ঢেলে সাজানো যাবে, যা সর্বদাই জনগণের চেতনা ও অভীপ্সার আন্তরিক প্রকাশ' হবে। এই 'অঙ্গসংগঠনের' সংজ্ঞা : 'বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও পার্লামেণ্টের প্রভাবমুক্ত এমন সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত সংগঠন যা বিপ্লবী নির্বিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষমতার ঐতিহাসিক রূপ হবে (ট্রেড ইউনিয়ন বা সমবায়ী ক্রিয়ার যে ইতালীয় অর্থে 'অর্থনৈতিক' কথাটি ব্যবহৃত হয়, অবশ্যই সেই অর্থে নয়, বরং অর্থনৈতিক পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া চালু করা ও চালিয়ে যাবার সামর্থ্য অর্থে)।' 'কিন্তু শ্রমিকদের এই নিয়ন্ত্রণক্ষমতাসম্পন্ন সংগঠনগুলির রাজনৈতিক অস্তিত্ব যথার্থভাবে নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকেরা যেন তাঁদের সংগঠনগুলিকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করতে পারেন।' ফ্যাকটরি কাউনসিলগুলির সার্থক পরিণতিস্বরূপ বিপ্লব ঘটবে না, তার মধ্য থেকে গ্রামশির পরবর্তী চিন্তার 'এজেমোনিয়া' বা আধিপত্য পত্তনের প্রক্রিয়া শুরু হবে, অন্যদিকে পার্টির রাজনৈতিক ভূমিকা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হবে, এই দুই প্রক্রিয়ার দ্বান্দ্বিক সংযোগে বিপ্লব সম্পন্ন হবে, এই ধারণা গ্রামশির চিন্তায় যতই স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করছে, ততই সোশালিস্ট পার্টির অবান্তরতাও তাঁর চোখে প্রকট হয়ে উঠছে।

বস্তুত পার্টির 'সংস্কারপন্থী' মহল (যার পুরোভাগে ছিলেন আলবের্তিনি, তুরাতি, ত্রেভেস ও দারাগোনার মতো নেতৃবৃন্দ) আন্দোলনের শুরু থেকেই মালিকপক্ষ ও সরকারের সঙ্গে যেভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন, 'শান্তিপূর্ণ ও আইনি' পথে নিষ্পত্তির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন,

জেনোয়া থেকে প্রকাশিত 'ইল লাভোরো' পত্রিকায় যেভাবে বেতনবৃদ্ধির অর্থনৈতিক আন্দোলনকে কোনোভাবেই রাজনৈতিক মাত্রা না দিতে শ্রমিকদের কাছে আবেদন জানিয়ে যাচ্ছিলেন, এমনকী ত্রেভেস যখন সরকারকে কারখানার দখলদার শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের উপদেশ দিতেও দ্বিধাবোধ করছেন না, তখন স্বভাবতই কারখানায় আন্দোলন রত শ্রমিকদের মধ্যে পার্টি'র মধ্যে ভাঙনের দাবি উঠতে থাকে, পার্টি থেকে একযোগে বেরিয়ে এসে নতুন পার্টি গঠনের তাগিদ তৈরি হতে থাকে। স্পা কারখানায় ১১ সেপটেম্বর এক আলোচনায় সহকর্মী বাত্তিস্তা সানতিযাকে গ্রামশি প্রশ্ন করেন : 'শুনেছেন, ফিয়াট-সেনট্রো কারখানায় সোশ্যালিস্ট পার্টি'র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে এক কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়ে গেছে ?' এরপর যে আলোচনা চলে, তাতে দেখা যায় (সানতিয়া পরে এই সংলাপের বিবরণী প্রকাশ করেন) যে ইতালীয় সোশ্যালিস্ট পার্টি যে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কর্মনীতি অনুসরণ করে ইতালিতে শ্রমিকশ্রেণীকে যথার্থ নেতৃত্ব দেবে, এমন আশা তারা দুজনেই আর পোষণ করেন না। কিন্তু তবুও তাঁরা ঠিকমতো প্রস্তুতি ছাড়া, জাতীয় স্তরে এক 'কমিউনিস্ট' উপদলের পত্তন না করে এক বিক্ষুব্ধ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীমাত্র রূপে পার্টি ছাড়তে তখনও প্রস্তুত নন। অর্থাৎ তখনও তাঁরা সোশালিস্ট পার্টি'র মধ্যে থেকেই আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান। সোশ্যালিস্ট পার্টি'র নিবৃত্তিবাদী মহলের মধ্যেও তখন মতানৈক্য। ২০ সেপটেম্বর তুরিনের ফিযাট-সেনট্রো কারখানায় নিবৃত্তিবাদীরা সমবেত হয়ে 'সংস্কারপন্থী'দের আপসনীতির প্রতিবাদে সি এস আই ও সি জি এল-এর সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করেন, তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ইতালীয় শাখা রূপে এক নতুন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের লক্ষ্য সামনে রেখে নিবৃত্তিবাদীদের জাতীয় উপদলীয় কমিটিকে তখনই এক জাতীয় কংগ্রেস আহ্বানের জন্য অনুরোধ জানান। বোরদিগা নিজে তখনও অতদূর এগিয়ে যেতে প্রস্তুত নন। তিনি পার্টি'র আসন্ন জাতীয় কংগ্রেস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান। স্বভাবতই নিবৃত্তিবাদীদের জাতীয় কমিটি তুরিন শাখার প্রস্তাব খারিজ করে দেন। ২২ সেপটেম্বর গ্রামশির 'আভান্তি' পত্রিকাও তুরিনের নিবৃত্তিবাদীদের তিরস্কার করে লেখে : 'কে আগে লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে, এটা তাই নিয়ে কোনো খেলা নয়। কমিউনিস্ট পার্টি যাতে নির্বিত্ত শ্রেণীর একক মহান বিশ্বাসভাজন বাহন রূপে, বিপ্লবের সমুদায় শক্তিবর্গকে সংহত করতে পারঙ্গম এক সংগঠন রূপে তার জীবন শুরু করতে পারে, সেটাই নিশ্চিত করতে হবে।' ২৫ থেকে ৩০ সেপটেম্বরের মধ্যে এক এক করে কারখানাগুলি যখন শ্রমিকদের দখলমুক্ত হয়ে মালিকদের হাতে ফিরে আসে, গ্রামশি তখনও পি এস আই ভেঙে নতুন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ নিতে প্রস্তুত নন। অথচ তাঁর লেখায় বারবারই যে 'প্রলেতারিয় অগ্রবাহিনী'র ভূমিকার কথা আসছে, তাতে আবছা মূর্ত হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি'র এক নতুন রূপ যা গ্রামশির

পরবর্তী ভাবনায় নির্বিত্ত শ্রেণীর নিজস্ব জৈব বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ধারণার সগোত্র। তিনি ২৪ সেপটেম্বর লেখেন : 'কোনো বিপ্লবী আন্দোলন কেবলমাত্র প্রলেতারিয় অগ্রবাহিনীর উপর ভিত্তি করেই চালিত হতে পারে ; কোনো সলাপরামর্শ বা প্রতিনিধিস্থানীয় পরিষদের যন্ত্রতন্ত্র ছাড়াই তাকে চালনা করতে হবে। বিপ্লব যুদ্ধের মতো। সামরিক বাহিনীর জেনেরাল স্টাফ যেভাবে পুঙখানুপুঙখ মনঃসন্নিবেশে যুদ্ধের ধারা নির্ধারণ করে, সেইভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর এক জেনেরাল স্টাফ এই বিপ্লবকে পরিচালিত করবে। যা হয়ে গেছে, কোনো প্রতিনিধি-পরিষদ কেবল তারই বিচার করতে পারে, সফল কর্মীদের মহিমা দান করতে পারে, অসফলদের নির্মম শাস্তিদান করতে পারে। প্রলেতারিয় অগ্রবাহিনীর দায়িত্ব, জনগণের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা সদা জাগরূক রাখা, এমন পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা যাতে নির্বিত্ত শ্রেণী অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকেন. বিপ্লবের আহ্বান আসা মাত্রই তাতে সাড়া দিতে পারেন ; ঠিক যেভাবে জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রমাগত স্বাদেশিক দম্ভ ও বিদেশিদের প্রতি বিদ্বেষের উন্মত্ত প্রচারে এমন এক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চাইছে যাতে সামরিক বাহিনীর জেনেরাল স্টাফ ও কূটনৈতিক বিভাগ যে যুদ্ধের ব্যাপারে ইতিমধ্যে একমত হয়ে গেছেন, জনসাধারণ সেই যুদ্ধের সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করবেন। যুদ্ধের সিদ্ধান্ত অটল জেনেই পার্লামেণ্ট সেই যুদ্ধকে অনুমোদন দান করে, কারণ পার্লামেণ্ট জানে, যুদ্ধের বিরোধিতা করলে পার্লামেণ্ট খারিজ হয়ে যাবে। শ্রমিকদের কোনো জাতীয় সংসদে বিপ্লবী অভিযানের আসল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এমন কোনো সংসদের অধিবেশন আহ্বান করার অর্থই হল আগে থেকেই বিপ্লবে নিজেদের অবিশ্বাস স্বীকার করে রাখা, কার্যত বিপ্লবের বিরুদ্ধেই দ্বিধাসংশয়ের একটা চাপ সৃষ্টি করা।'

তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে আন্তর্জাতিকের অনুমোদন লাভের শর্ত হিসেবে কোনো কমিউনিস্ট পার্টির জন্য যে একুশ ধারা নির্দেশিত হয়, তা ইতালিতে প্রথম প্রকাশিত হয় ২১ সেপটেম্বর। ২৮ সেপটেম্বর পি এস আই-এর ডাইরেকটরেট যে সভায় ৭-৫ ভোটে এই একুশ ধারা পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেই সভাতেই পার্টির মধ্যে বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ ও সংঘাত খুব খোলাখুলিভাবেই ধরা পড়ে যায়। অবশ্য একুশটি ধারা নিয়ে বিরোধ ততটা নয় যতটা পার্টির 'শুদ্ধীকরণের' প্রশ্নে ; কারণ, কমিনটার্ন তখন জোর দিচ্ছেন পার্টি থেকে যাবতীয় দ্বিধাগ্রস্ত 'সংস্কারপন্থী'কে বহিষ্কৃত করে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অভিন্ন অঙ্গরূপে পার্টিকে অন্য চারিত্র্য দেওয়ার ওপর। পি এস আই-এর মধ্যে বোর্দিগার অনুসারী উপদল নিবৃত্তিবাদীরা একুশ ধারার নির্দেশের আগে থেকেই এই দাবি তুলছিলেন। ম্যাকসিম্যালিস্টদের নেতা সেরুরাতি এই প্রস্তাব মানতে চাইছিলেন না। তিনি দাবি তুলেছিলেন, ইতালীয় ইতিহাস ও ইতালীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইতালীয় পার্টিকে তার নিজস্ব পথ বেছে নিতে দেওয়া

হোক ; অন্য দেশে কী হয়েছে তার দৃষ্টান্ত টেনে এনে কমিনটার্ন ইতালীয় পার্টির কর্মনীতি স্থির করে দেবে, এটা চলতে পারে না। একুশ ধারার অন্য একটি ধারায় পার্লামেণ্ট বর্জনের নীতিকেও অযৌক্তিক ঘোষণা করায় নিবৃত্তিবাদীরা এই ধারা মেনে নিয়ে নির্বাচনের প্রশ্নে খানিকটা নরম হন। ওদিকে লেনিন ও সেররাতির মধ্যে বিতর্ক চলতে থাকে। 'স্বাধীনতার প্রশ্নে মিথ্যা তর্কালোচনা' নামে নভেম্বর মাসে লেখা এক প্রবন্ধে যখন লেনিন লিখছেন, 'সেররাতির ভয় পার্টি ভাগ হয়ে গেলে ইউনিয়নে, কো-অপারেটিভে ও পৌর স্থানীয় শাসনে পার্টি দুর্বল হয়ে যেতে পারে। অন্য-দিকে কমিউনিস্টদের ভয়, সংস্কারপন্থীরা বিপ্লবকে অন্তর্ঘাতে ব্যর্থ করে দেবে। দলের মধ্যে সংস্কারপন্থীরা থাকলে কোনো প্রলেতারিয় বিপ্লব জেতা যায় না, জিতলেও তাকে বাঁচানো যায় না। তাই সেররাতি মিলানের পৌর পরিষদকে চটাবেন না বলে বিপ্লবের ভবিষ্যৎকে সংকটাপন্ন করেছেন।' —তখন পি এস আই সাগ্রহে ইতালি ব্যাপী স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে ব্যস্ত।

আদর্শগত ও কর্মনীতিগত প্রশ্নে পার্টির মধ্যে বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব যখন তুঙ্গে, নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে ও নির্বাচনী অভিযানে যে তার প্রভাব পড়বে, তা খুবই স্বাভাবিক। তাই সোশালিস্ট পার্টির তুরিন শাখার সাধারণ সভায় নির্বাচনে প্রার্থীরূপে গ্রামশির নাম প্রস্তাবিত হলে প্রবল প্রতিবাদধ্বনিতে সেই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। তুরিন শাখার তৎকালীন সম্পাদক তোইলিয়াত্তি ও পরবর্তীকালে গ্রামশির সহযোগী তেররাচিনিও গ্রামশির সপক্ষে কোনো কথা বলেন না।

অকটোবরের মাঝামাঝি থেকে ঘটনা অন্যদিকে দ্রুত আবর্তিত হতে থাকে। মিলানে এক বৈঠকে গ্রামশি ও তেররাচিনি এবং বোরদিগা ও তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহযোগী রুজ্জিয়েরো গ্রীকো এবং তিনজন 'অতি বাম' সোশা-লিস্ট রোম্বাচ্চি, লুইজি রেপোস্সি ও ব্রুনো ফোর্তিকিয়ারি মিলিত হয়ে সোশালিস্ট পার্টির মধ্যেই জাতীয় স্তরে এক কমিউনিস্ট উপদল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই মিলান বৈঠকে গৃহীত ইশতেহার ও কর্মনীতি ২৮-২৯ নভেম্বর ইমোলায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অনুমোদিত হয়, কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলির একটি সংহত সংগঠনের মতাদর্শগত ভিত্তি জোগায়। এই নতুন সাংগঠনিক বিন্যাসে বোরদিগা ও গ্রামশির যে মতাদর্শগত তথা কর্ম-কৌশলগত বিরোধ—একজন চাইছেন, জনগণভিত্তির অতটা পরোয়া না করেই এক কমিউনিস্ট অগ্রবাহিনী তথা নেতৃবাহিনীরূপে এক নতুন কমি-উনিস্ট পার্টির পত্তন ; অন্যজন চাইছেন, সোশালিস্ট পার্টির একেবারে নিচের স্তর থেকে সাধারণ শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবী চেতনাকে সংগঠিত করে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত করে পার্টির মধ্যেই এক প্রতিবাদী শক্তি সৃষ্টি করে সেই শক্তির জোরেই পার্টির নেতৃত্বকে প্রভাবিত করতে বা এমনকী দখল করতে—তার একটা সাময়িক নিষ্পত্তি ঘটল ; গ্রামশি মেনে নিলেন বোরদিগার পার্টি ভেঙে বেরিয়ে আসার লক্ষ্য। ইমোলায় উপস্থিত কমিনটার্ন-এর

প্রতিনিধিও গ্রামশি ও বোরদিগা-কে মতৈক্যে পৌঁছতে প্রভাবিত করেছিলেন বলে মনে হয়। অর্থাৎ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকও তখন চাইছেন যে ইতালিতে এক স্বতন্ত্র কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হোক; দ্বিধাদীর্ণ সোশালিস্ট পার্টির মধ্যে থেকে, 'সংস্কারপন্থীদের' সঙ্গে অহরহ লড়াই করে কমিউনিস্ট-দের শক্তিক্ষয়ের আর কোনো প্রয়োজন নেই। আন্তর্জাতিকের এই মূল্যায়ন কোনো মনগড়া তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিণাম নয়, বরং ইতালিসহ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের তৎকালীন জাতীয় জীবনের প্রবণতার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। কোনো চাপে পড়ে নয়, বরং আশেপাশে যা ঘটছে তা লক্ষ করে তারই প্রভাবে গ্রামশি তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান খানিকটা বদলাচ্ছেন। পি এস আই তখনও নির্বাচনী সাফল্যের মায়ায় আচ্ছন্ন, ম্যাকসিম্যালিস্ট উপদল ও সংস্কারপন্থীরা তখনও আশা রাখেন যে নির্বাচন থেকে নির্বাচনে শক্তিবৃদ্ধি করতে করতেই তাঁরা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা আয়ত্ত করে রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্রের পথে চালিত করতে পারবেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নিরাপদ স্বাভাবিক আবর্তনেই ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের পত্তন হবে। ১৯২০-র অকটোবর-নভেম্বরেও পৌর ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থায় দেশব্যাপী নির্বাচনে পি এস আই-এর শক্তিবৃদ্ধি (৮,০০০ কমিউনের মধ্যে ২,১৬২-টিতে পি এস আই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে) তাঁদের সেই মোহকেই যখন আরো পোক্ত করছে, তখন কিন্তু ফ্যাশিবাদের অভ্যুদয়ও প্রকট হয়ে উঠছে। ২১ নভেম্বর বোলোনার নবনির্বাচিত সোশালিস্ট নগরপাল যখন টাউন হলের ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে জনসাধারণের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন, তখন হঠাৎ এক ফ্যাশিস্তবাহিনী ঐ বাড়িরই ভিতর থেকে ও চারপাশ থেকে সমবেত জনতাকে আক্রমণ করে; তাদের গুলি ও গ্রেনেডের আঘাতে দশজন সাধারণ মানুষ নিহত হন, আটান্নজন আহত হন। এই ধরনের আক্রমণ ও সংঘর্ষ বিভিন্ন শহরে প্রায়ই ঘটতে থাকে। 'প্রতিক্রিয়ার' এই আবির্ভাব ম্যাকসিম্যা-লিস্টরাও লক্ষ করেন, কমিউনিস্টরাও লক্ষ করেন। কিন্তু এই 'প্রতিক্রিয়ার' মুখে তাঁদের প্রতিক্রিয়া বিপরীতমুখী থেকে যায়। ১৬ ডিসেম্বর সেরাতি লেনিনকে লেখেন: 'আমরা সংস্কারপন্থীদের পক্ষ নিচ্ছি না, আমরা ধ্বংস ও বিনাশের এক উন্মত্ত মারণলীলা থেকে পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী ও বিপ্লবকে বাঁচাতে চাইছি। আমরা ইতালীয় সোশালিস্ট আন্দোলনের ঐক্যকে রক্ষা করতে চাইছি যাতে পুনর্গঠনের পথে তার আগামী অগ্রগতির মুখে যে-সব বাধা ও আত্মত্যাগের দায় তার সামনে এসে পড়বে, তার সঙ্গে তারা মোকাবিলা করতে পারে। ইতালীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তার প্রতিক্রিয়াত্মক অভিযান শুরু করে দিয়েছে। যুদ্ধবিরতি দিবস থেকে আজ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণী যে আক্রমণ অব্যাহত রেখে গেছে, আজ আমরা তার প্রত্যাক্রমণের মুখোমুখি। ইতালীয় পুঁজিবাদী শক্তিকে মদত দিচ্ছে রাষ্ট্রশক্তি, পুলিশ ও বিচারব্যবস্থা, এমন এক সামরিক বাহিনী যার ওপর তারা ভরসা রাখতে পারে; তারা স্বভাবতই লড়াইয়ে বিরতি দেবে না; তারা সযত্নে আরো সংঘবদ্ধ হচ্ছে,

ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয়নি। কোনো সোশালিস্ট সংবাদপত্রের কার্যালয় জ্বালিয়ে দেওয়া কি অপরাধ? মোটেই না, কারণ এই কাজ যারা করেছে তাদের সকলেই চেনে, তারা তাদের এই অনাচার স্বীকারও করেছে, তবুও তাদের তো গ্রেফতার করা হয়ই নি, বরং অনুরূপ আরো অনাচার ঘটাবার সুযোগ তাদের করে দেওয়া হয়েছে।' এমনই আরো দৃষ্টান্ত তুলে ধরে গ্রামশি বলেন, দু' বছর ধরে ইতালীয় জনগণ 'নগ্ন সন্ত্রাস, নগ্ন প্রতিক্রিয়ার' যে রাজনৈতিক আবহের মধ্যে বাস করছেন, তাতে 'সন্ত্রাস ব্যক্তিগত ক্ষেত্র থেকে সরকারি ক্ষেত্রে' উঠে আসছে। রাষ্ট্রীয় ফ্যাশিবাদ থেকে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী উন্মেষের এক ঐতিহাসিক ছক তুলে ধরেন গ্রামশি: 'প্রতিক্রিয়া আজ এমনই শক্তিমান হয়ে উঠেছে যে আইনানুগ রাষ্ট্রের মুখোশ আর তার কাজে লাগছে না। প্রতিক্রিয়া আজ রাষ্ট্রের যাবতীয় সম্পদ তার নিজ লক্ষ্যসাধনে ব্যবহার করতে চায়। অর্থাৎ ইতালি আজ এগিয়ে চলেছে এমন এক নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দিকে যার লক্ষ্যই হবে কোনো প্রতিবেশী সম্পন্ন জাতির উপর সশস্ত্র লুঠতরাজ।' ফ্যাশিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের এই গতিধারার কারণ গ্রামশি খুঁজে পেয়েছেন ইতালির প্রতিকারহীন অর্থনৈতিক সংকটে: 'প্রলেতারিয়েত শ্রেণী দিনে ষোল ঘণ্টা পরিশ্রম করলেও এই বুর্জোয়া সরকার রাষ্ট্রীয় বাজেটের ঘাটতি পূরণ করতে পারবে না, জাতীয় উৎপাদনকে পুনঃসংগঠিত করতে পারবে না। বিদেশে পুঁজি পাচার সরকার রোধ করতে পারেনি। যে পাঁচ লক্ষ মানুষ গত যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, তাঁদের ফিরিয়ে এনে সরকার আবার কাজে লাগাতে পারবে না। যে পাঁচ লক্ষ মানুষ গত যুদ্ধে আহত পঙ্গু হয়ে ফিরে এসেছে সরকার তাদের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে পারবে না। যে হাজার হাজার পরিবার তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হারিয়ে আজ দয়ার দাক্ষিণ্যে কোনোক্রমে বেঁচে আছে, কোনো-কিছু উৎপাদন না করে ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছে, পরজীবী জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছে, সরকার তাদের সেই অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ফিরিয়ে দিতে পারবে না। যে বিদেশি পর্যটক-দের আসা-যাওয়ায় যুদ্ধের আগে এ দেশে প্রতি বছর পঞ্চাশ কোটি লিরা মূল্যের সোনা উপার্জন হত, সেই বিদেশি পর্যটকদের আসা-যাওয়া সরকার চালু করতে পারেনি। যে আড়াই লক্ষ উদ্যমী মানুষ প্রতি বছর দেশত্যাগ করে বিদেশে বসতি করত, ইতালীয় বাজেটে সত্তর কোটি লিরা মূল্যের সোনার জোগান দিত, তাদের পরিযানের ধারা সরকার পুনঃসংগঠিত করতে পারেনি। ইস্পাত শিল্পের সংকট সরকার সমাধান করতে পারছে না; ফলে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লিরা মূল্যের সোনা নষ্ট হচ্ছে, ঋণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, কৃষকেরা শস্তায় কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ পাচ্ছেন না, ফলে খাদ্য-শস্যের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ছে না। যুদ্ধের অভিঘাতে ইতালি আজ এক বিষাক্ত ক্ষত, তার নিষ্পিষ্ট দেহ থেকে আজও ক্রমাগত রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রতিক্রিয়ার উৎস।... আবার এরই

মধ্যে নিহিত প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর জবাব কমিউনিজম-এরও উৎস।'

ফ্যাশিবাদের বাস্তব অভ্যুদয় ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে কমিউনিজম-এর উন্মেষের সম্ভাবনা দুইই লক্ষ করছেন গ্রামশি, কিন্তু কমিউনিজম-এর পথে পদক্ষেপের যে-সম্ভাবনা, তার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে সোশালিস্ট পার্টি। ১১-১৮ ডিসেম্বরের 'লার্দিনে নুওভো' পত্রিকায় গ্রামশি লেখেন: 'আসল কথা হল, সোশালিস্ট পার্টি কোনো জৈব শরীর হয়ে ওঠেনি, থেকে গেছে এক ব্যক্তিসমষ্টি যাদের ঐটুকুই শ্রেণী চেতনা ছিল যার বলে তারা নিজেদের এক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের রূপ দিতে পারে; কিন্ত তাদের অধিকাংশেরই সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রস্তুতি ছিল না যার দ্বারা তারা বর্তমান এই ঐতিহাসিক পর্বে যে-ধরনের বিপ্লবী পার্টির প্রয়োজন সেই পার্টির রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।' সোশালিস্ট পার্টির এই ব্যর্থতা পার্টি নেতৃত্বের ব্যর্থতা বলে গ্রামশি সমস্যাটিকে অতিসরল করে দেন না। ইতালির নির্বিত্ত শ্রেণীই 'তার নিজস্ব সত্তা ও তার ঐতিহাসিক দায়' সম্পর্কে 'সচেতনতা অর্জন করেনি'; নির্বিত্ত শ্রেণীর এই ব্যর্থতার সুযোগ নিয়েই 'এক নতুন পাতিবুর্জোয়া শ্রেণী' তার নেতৃত্বে এসে বসে গেছে। 'পুঁজিবাদের যেমন, তেমনই নির্বিত্ত শ্রেণীর সঙ্গেও থাকে এক পাতিবুর্জোয়া শ্রেণী; শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যে পাতিবুর্জোয়ারা সেঁটে থাকে আর যে-পাতিবুর্জোয়ারা পুঁজিবাদের প্রতি অনুগত তাদের মতাদর্শের ধাঁচে খুব একটা তফাৎ করা যায় না। সেই একই সীমাহীন দম্ভ ("প্রলেতারিয়তই সবচেয়ে শক্তিমান শ্রেণী! প্রলেতারিয়ত অজেয়! কেউ তার অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতিকে টলাতে পারবে না।"), সেই একই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার লোভ; অথচ যে ঐতিহাসিক শক্তিসমূহ আজ পৃথিবীর জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে তা সম্পর্কে কোনো যথার্থ বোধ নেই: বিশ্ব ব্যবস্থায় নিজেদের স্থান ও ভূমিকা বুঝে নেবার সাধ্য নেই।' ফলে প্রতিক্রিয়ার উন্মেষ ঘটতেই এই পাতিবুর্জোয়া নেতৃত্ব যেই দেখে যে শ্রেণীসংগ্রাম তার কল্পনা-নির্ধারিত পথে আবর্তিত হয়ে আশু জয়ের দিকে এগোচ্ছে না, তখনই তারা 'প্রতিক্রিয়ার মনস্তত্ত্বে' নিমজ্জিত হয়ে কার্যত শ্রেণীসংগ্রামকেই খারিজ করে দিয়ে সমাজের পরিস্থিতিকে এক ইতিহাসবিচ্ছিন্ন টিঁকে থাকার লড়াই হিসেবেই দেখতে থাকে যাতে মানুষের লোভ, ভয়, অপরাধপ্রবণতা, স্বার্থপর নির্মমতাই চূড়ান্ত নিয়ামক। এই 'প্রতিক্রিয়ার মনস্তত্ত্ব' থেকেই বামপন্থী কোনো দলও অবলীলায় প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে; প্রতিক্রিয়ার সহজাত ক্ষমতা দখলের রণনীতি যখন সোশালিস্ট পার্টিরও রণনীতি হয়ে ওঠে, তখন শ্রেণীসংগ্রাম মুখ থুবড়ে পড়ে। অন্যদিকে প্রতিক্রিয়া 'উচ্চতম সামরিক স্তর, ফ্যাশিবাদ ও জাতীয়তাবাদ'কে মদত দিয়ে ক্রমেই 'জাতীয় সামরিক বাহিনী, প্রশাসক বাহিনী, বিচার বিভাগ ও কর্মনির্বাহী শক্তির স্রাবতীয় শাখাকে' তথা রাষ্ট্রশক্তিকেই তার 'প্রত্যক্ষ ব্যবসায়িক দালাল' তথা

'তার টি'কে থাকা ও বিকাশের প্রত্যক্ষ সহায়ের' ভূমিকায় নিয়ে আসে। এইভাবে যে প্রক্রিযায় রাষ্ট্রই ফ্যাশিবাদের ধারক হয়ে উঠছে, সেই প্রক্রিয়ায় ফ্যাশিবাদী হিংস্রতার প্রয়োগে বামপন্থীদের উৎসাহে ঐ প্রক্রিয়াই ত্বরান্বিত হয়, এক ধরনের ব্যাপক, সর্বজনীন সম্মতির জোরও পেয়ে যায়। ২৪ নভেম্বরের 'আভান্তি'তে গ্রামশি লেখেন: 'ফ্যাশিবাদ পুঁজিবাদী হিংস্রতার বেআইনি দিক মাত্র: রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এই হিংস্রতাই আইনানুগ হয়ে যায় (যা অভ্যাসের মধ্যে পড়ে যায়, তা-ই যে পরে আইন হয়ে যায়, এ তো ইতিহাসের সুবিদিত সূত্র)। ইতালীয় ফ্যাশিবাদ মিলান ও রোমে "আভান্তি" পত্রিকার কার্যালয়ে, পুলায় "প্রলেতারিও" পত্রিকার দফতরে ও ত্রিয়েস্ত-এ "লাভোরাতোরে" পত্রিকার দফতরে আগুন লাগিয়েছে; সেই অপরাধে কোনো ফ্যাশিস্ত-এর শাস্তি হয়নি। পুনঃপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্র আর দফতরে আগুন লাগাতে যাবে না: তারা "আইনসম্মত" উপায়ে দফতরে তালা লাগাবে। ফ্যাশিবাদ চেম্বার অফ লেবর ও সোশালিস্ট পরিচালনাধীন পৌর সংসদগুলিকে আক্রমণ করেছে; যে-সব চেম্বার অফ লেবর ও সমাজতন্ত্রী পৌর সংসদ সোশালিস্ট থাকতে বদ্ধপরিকর, পুনঃপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্র "আইনসম্মত" ভাবেই তাদের খারিজ করে দেবে। ফ্যাশিবাদ শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গী কর্মীদের হত্যা করে; পুনঃপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্র তাদের "আইনসম্মত" ভাবেই কারারুদ্ধ করবে,⋯ জল্লাদ নামে সরকারি কর্মীর হাতে তাদের "আইনসম্মত" ভাবে হত্যা করাবার ব্যবস্থা করবে।'

সোশালিস্ট পার্টির এই ব্যর্থতায় গ্রামশি আর পার্টিকে কোনোমতে জোড়াতালি দিয়ে বেঁধে রাখতে প্রস্তুত নন। 'ল্যার্দিনে নুওভো'র ১১-১৮ ডিসেম্বর সংখ্যায় 'ঐক্যবাদী সামাজিক-কমিউনিস্টদের' প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ধারে বিবেকী রোষের রূপ পরিগ্রহ করে—যে-রোষে তিনি সোশালিস্ট পার্টির 'মহিমান্বিত অজ্ঞতা, রাজনৈতিক তর্কে তার মহিমান্বিত সর্ববিবেকবোধরহিত নীতিহীনতা, জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে তার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, তার মহিমান্বিত খেলো বক্তৃতাবাজি, তার মহিমান্বিত দম্ভ, তার মহিমান্বিত লোক-ঠকানোকেই' 'মহান ও পরম মহিমান্বিত ইতালীয় সোশালিস্ট পার্টির মহিমান্বিত ঐতিহ্য' বলে চিহ্নিত করেছেন। পার্টি ভেঙে দু টুকরো করার লক্ষ্যে গ্রামশি পৌঁছচ্ছেন এই পবিত্র রোষের বশে।

যে নতুন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে গ্রামশি এবার উদ্যোগী হবেন, তারও একটা আদর্শ ১৯ অকটোবরের 'আভান্তি' পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধে ধরা পড়ছে। এই নতুন পার্টি সোশালিস্ট পার্টির মতো ঢিলেঢালা, বহুমতাবলম্বী, বহু ধরনের মানুষের কোনো সমাবেশ হবে না। এই পার্টি হবে 'স্পষ্ট, দ্বিধাহীন লক্ষ্যে নিয়োজিত, কঠোর শৃঙ্খলায় সংগঠিত এক কমিউনিস্ট পার্টি⋯ যা আমাদের দেশে বর্তমান সজীব শক্তিসমূহকে চেতনা দান করে ও সংহত, স্বায়ত্তশাসিত আন্দোলনের পথ ধরিয়ে দিয়ে তাদের চূড়ান্ত বিনাশের সম্ভাবনা থেকে বাঁচাবে।' 'ল্যার্দিনে নুওভো'র ১১-১৮ ডিসেম্বর

সংখ্যার নিবন্ধে গ্রামশি লিখলেন : 'কী ঘটে গেছে এবং তার কতটা আবার প্রতিকারহীন তা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করা হাস্যকর। কমিউনিস্টরা শীতল ও শান্ত যুক্তিবাদী। আজ যদি সব-কিছুই ধ্বংসস্তূপেই পরিণত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সব-কিছুই আবার নতুন করে তৈরি করে নিতে হবে। পার্টিকে পুনর্গঠিত করতে হবে, এখন থেকে কমিউনিস্ট উপদলকেই একটি স্বতন্ত্র পার্টি বিবেচনা করে তাকে সেই মর্যাদা দিতে হবে, তাকে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির দৃঢ় কাঠামো হিসেবে মূল্য দিতে হবে। তার কাজ হবে অনুগামী সংগ্রহ করা, তাদের এক পাকাপোক্ত ভিত্তিতে সংগঠিত করা, তাদের শিক্ষিত করে এক নতুন জৈবশরীরের সক্রিয় কোষে পরিণত করা। সেই জৈবশরীর আজ বিকাশমান এবং তা ক্রমশই বিকশিত হয়ে চলবে যতদিন না তা সমগ্র শ্রমজীবী শ্রেণীকে ধারণ করে তার আন্তর সত্তা ও অভীপ্সা হয়ে উঠতে পারে।'

গ্রামশি ও সোশালিস্ট পার্টির তুরিন শাখার 'কমিউনিস্ট' অংশ জাতীয় স্তরে কমিউনিস্ট উপদলের সঙ্গে যুক্ত হতে তখন প্রস্তুত। ২৮ নভেম্বর ইমোলায় এই জাতীয় উপদলের সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য তুরিনে সমবেত বোরদিগাপন্থী, গ্রামশিপন্থী ও তাস্কা-তোইলিয়াত্তি-তের্‌রাচিনি-অনুগামী 'দক্ষিণপন্থী'রা একমত হয়ে উপদলের জাতীয় কমিটির সদস্যরূপে গ্রামশি-তের্‌রাচিনি ও পারোদি-কে নির্বাচিত করেন। ইমোলায় উপদলের যে কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয় তাতে বোরদিগার সঙ্গে গ্রামশি ও তের্‌রাচিনিও স্থান পান। তবে ইমোলা সম্মেলনে উপদলের নেতৃত্ব প্রায় পুরোপুরিই বোরদিগার হাতে চলে এসেছে, যদিও তখনও এই উপদলের গণভিত্তি তথা গণসমর্থন কেবলমাত্র তুরিন ও তার আশেপাশেই সীমিত। ইতোমধ্যে উপদলের তুরিন শাখা 'আভান্তি' পত্রিকার পীডমণ্ট সংস্করণ ও 'ল্যর্দিনে নুওভো' পত্রিকা দুটি একত্র করে ১৯২১-এর ১ জানুয়ারি থেকে 'ল্যর্দিনে নুওভো' নামে একটি নতুন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই নতুন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত হন গ্রামশি। সাপ্তাহিক 'ল্যর্দিনে নুওভো'র ২৪ ডিসেম্বর সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে গ্রামশি এতাবৎ প্রকাশিত 'ল্যর্দিনে নুওভো'র সঙ্গে নতুন 'ল্যর্দিনে নুওভো' পত্রিকার পার্থক্য নির্দেশ করে দেখান, আগে যা ছিল 'সোশালিস্ট সংস্কৃতির বীক্ষণ' এখন তা 'ঐ বীক্ষণকেই তার রাজনৈতিক মূল নীতি তথা তার নির্দেশক চেতনার' স্তরে নিয়ে যাবে—অর্থাৎ কিছুটা অতিসরলীকরণের দিকে গেলে হয়তো বলা যাবে, তীব্রতর সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্রিকা এবার সংস্কৃতি ও মতাদর্শের বৃহত্তর বিতর্কসংকুল ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সাময়িকভাবে সরিয়ে নিয়ে সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হবে : 'তাই এই দৈনিক পত্রিকা [কমিউনিস্ট] আন্তর্জাতিকের কংগ্রেস ও ইতালীয় কমিউনিস্টদের সম্মেলনে গৃহীত রাজনৈতিক মূল নীতি অনুসারে ও তুরিনের শ্রমিকশ্রেণী ও সোশালিস্ট পার্টির তুরিন শাখার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ঐতিহ্যানুসারে

হবে কমিউনিস্ট। তার বিষয়বস্তুর অন্তর্গত হবে ইতালি ও পৃথিবীর শ্রমিক-শ্রেণীর জীবনে যে যাবতীয় বাস্তব সমস্যা ছায়াপাত করছে, সেইগুলি ; তার একপ্রান্তে থাকবে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষতম ও সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নটি, যে-প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখতে হবে তার সেই একেবারে নিচের তল থেকে যেখানে গঠিত হবে কমিউনিস্ট ফ্যাকটরি ও ইউনিয়ন শাখাগুলি ; অন্য প্রান্তে থাকবে পার্টি ও ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্কের সমস্যা : কিংবা যে বর্তমান ঐতিহাসিক পর্বে শ্রমিকদের রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে, সংগ্রামী জনমণ্ডলীর পুরোভাগে বিপ্লবী অগ্রবাহিনী রূপে শ্রমিকশ্রেণীকে প্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্যসাধনে আন্তর্জাতিক কমিউনিজম্ বিপুল ও প্রবল সাংগঠনিক ও প্রচারমূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, সেই পর্বে শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলি।' গ্রামশির জীবনীকাররা লক্ষ করেছেন, বোর্দিগার সঙ্গে গ্রামশির বিরোধ থেকেই গেছে, অথচ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রশ্নে বোর্দিগার সঙ্গে মতৈক্য থেকে গ্রামশি বাধ্য হয়েছেন বোর্দিগার নেতৃত্ব মেনে নিতে। ১৯২১-এর ১৫ জানুয়ারি থেকে লিভোর্নোয় অনুষ্ঠিত পি এস আই-এর যে সপ্তদশ সম্মেলন থেকে বেরিয়ে এসে 'কমিউনিস্ট' সোশ্যালিস্টরা নতুন পার্টি গঠন করেন, সেই সম্মেলনে বক্তৃতাকালেও বোর্দিগা সরাসরি বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকতে পারে। গ্রামশি হয়তো ভুল পথেই চলেছেন, হয়তো ভুল নীতি অনুসরণ করে চলেছেন, যখন আমিই হয়তো ঠিক পথে আছি, তবুও আমরা সকলেই একই পরিণতির জন্য একই সংগ্রাম করছি, সেই একই সমবেত প্রয়াসে তৈরি হয়ে উঠছে একটা কর্মসূচি, একটা পদ্ধতি।'

লিভোর্নোয় ইতালীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির কংগ্রেসে কমিনটার্ন-এর প্রতিনিধি কাবাকচিয়েভ ইতালিতে পৌঁছেই গ্রামশির সঙ্গে দেখা করেন। অ্যালেস্টেয়ার ডেভিডসন ইংগিত করেন যে গ্রামশির সঙ্গে পরামর্শ করেই কাবাকচিয়েভ এই কংগ্রেসে তাঁর অভিভাষণ রচনা করেন এবং এই যোগাযোগ-নির্ভরতার পিছনে ছিল লেনিনের দৃঢ় প্রত্যয় যে, গ্রামশিই খুঁজে পেয়েছেন ইতালিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা কমিউনিস্ট বিপ্লবের যথার্থ কর্মনীতির এক আদল।

ইতালির সোশালিস্ট পার্টির সপ্তদশতম কংগ্রেসের অধিবেশন ১৯২০-র ডিসেম্বরে ফ্লরেন্স্ শহরে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছিল। কিন্তু ফ্লরেন্স্ শহরে ফ্যাশিস্তদের শক্তিবৃদ্ধি ও দৌরাত্ম্যের প্রাদুর্ভাবে পার্টি নেতৃত্ব শেষ মুহূর্তে অধিবেশনের স্থান ও কাল দুইই পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। ১৯২১-এর ১৫-২১ জানুয়ারি লিভোর্নোয় এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের দুদিন আগে 'ল্যার্দিনে নুওভো' দৈনিক পত্রিকায় জিনোভিয়েভ ও বুখারিন স্বাক্ষরিত কমিনটার্ন-এর কর্মনির্বাহী সমিতির একটি তারবার্তার বয়ান প্রকাশিত হয়। এই বার্তায় খুব জোর দিয়েই বলা হয় যে, সংস্কার-পন্থীদের পার্টি থেকে বহিষ্কার না করলে আন্তর্জাতিকই পার্টিকে বহিষ্কার

করতে বাধ্য হবে। কংগ্রেসের প্রথম দিনই এই তারবার্তাটি আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠ করা হয়; বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বাণীতেও দক্ষিণ-পন্থী বা সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের সুপারিশ করা হয়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কমিনটার্ন-এর প্রতিনিধি খ্রিসটো কাবাকচিয়েভ সরাসরি সেররাতিকে সংস্কারপন্থী বলে চিহ্নিত করে ঐ একই দাবি তুললে সমাবেশে বিক্ষোভধ্বনি ও সমর্থনধ্বনির দ্বন্দ্ব চলে; শেষ পর্যন্ত কাবাক-চিয়েভ ও সেররাতির যৌথ আবেদনে সভায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের পরবর্তী দিনগুলি জুড়েও প্রায়ই প্রবল বাদবিসম্বাদের বিস্ফোরণ ঘটে। নানা যুক্তিতর্কের মধ্যে তেররাচিনি বোরদিগা প্রমুখ কমিউনিস্ট উপদলের প্রবক্তারা কমিন্টার্ন-এর গ[illegible]র উপর জোর দেন, আন্তর্জাতিকের সমর্থন ছাড়া এককভাবে ইতালিতে কমিউনিস্ট আদর্শের কোনো অভিযান সার্থক হতে পারে না, এই অবস্থানে অটল থাকেন। অন্যদিকে সেররাতির যুক্তি হয়, কমিউনিস্ট উপদল সোশ্যালিস্ট পার্টির কোনো বিকল্প হতে পারে না কারণ এই উপদল প্রথম থেকেই বহু মতপার্থক্যে বিদীর্ণ: 'গ্রামশি ও তোল্যাত্তির মধ্যে, গ্রামশি ও বোরদিগার মধ্যে ঘোর মতবিরোধ' বা [illegible] লিভোর্নোয় তর্কবিতর্কের মধ্যে গ্রামশি সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। ২০ জানু-য়ারি ভোটগ্রহণ হলে দেখা যায় ঐক্যপন্থীরা ৯৮,০২৮ ভোট পেয়েছেন কমিউনিস্টরা ৫৮,৭৮৩, সংস্কারপন্থীরা ১৪,৬৯৫। ২১ জানুয়ারি সকালে কংগ্রেসের শেষ অধিবেশনে বোরদিগা ঘোষণা করেন, 'কংগ্রেসে এই ভোটদানের মধ্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের নিজেদের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বাইরে এনে ফেলেছেন। যে-প্রতিনিধিরা কমিউনিস্ট প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন তাঁরা দল ত্যাগ করবেন। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ইতালীয় শাখা রূপে কমি-উনিস্ট পার্টির সংবিধান রচনার জন্যে তাঁরা এগারোটায় তেয়াত্রো সান মার্কোয় সমবেত হবেন।' সমস্ত কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের কক্ষত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সূচনা হয়।

তেয়াত্রো সান মার্কোয় ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি বা পার্তিতো কমু-নিস্তা ইতালিয়ানো (পি সি আই) সারাদিন ব্যাপী এক কংগ্রেসে তার [illegible]-সূচি ও কর্মনীতি গ্রহণ করে। পার্টির কেন্দ্রীয় দফতর প্রতিষ্ঠিত হয় মিলান এ। 'ল্যর্দিনে নুওভো' পত্রিকাটি নতুন পার্টি 'পরিবেষণ ও রক্ষণ' করতে সম্মত হলেও তাকে পার্টির মুখপত্রের মর্যাদা দেয় না। মিলান থেকে পার্টির মুখপত্র রূপে 'ইল কমুনিস্তা' নামে একটি অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গ্রামশি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বা-চিত হলেও (তাও একাংশের চিৎকৃত আপত্তি সত্ত্বেও) কর্মনির্বাহী সমিতিতে স্থান পাননি। পাঁচজনের যে কর্মনির্বাহী সমিতি নির্বাচিত হয়, তাতে কেবল বোরদিগার অনুসারীরাই স্থান পান। একমাত্র ব্যতিক্রম তেররাচিনি। লিভোর্নোর কংগ্রেসের পর প্রায় পুরো এক বছর গ্রামশি জনসমাবেশে বক্তৃতা-দান থেকে বিরত থাকেন: উমবের্তো তেররাচিনিই গ্রামশির মুখপাত্র হয়ে

ওঠেন। লিভোর্নো কংগ্রেসের কিছুকাল পর ইতালিতে যে-তিনটি কমিউনিস্ট দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে তার সবকটিরই সম্পাদনা করছিলেন 'অর্দিনোভিস্তি'রা। তুরিন-এ 'ল্যর্দিনে নুওভো'র সম্পাদক রয়ে যান গ্রামশি। রোম-এ 'ইল কমুনিস্তা'র সম্পাদনা করেন তোইলিয়াত্তি। ত্রিয়েস্ত-এ 'ইল লাভোরাতোরে'-র সম্পাদক হন ওত্তাভিও পাস্তোরে। পার্টির পত্রিকাগুলির উপর এই অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ, পত্রিকাগুলির মধ্য দিয়ে তাঁদের মতাদর্শ ও অবস্থান ক্রমাগত প্রচার করবার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্রমে অর্দিনোভিস্তিরা পি সি আই-এর নেতৃত্বে উন্নীত হন। কিন্তু অর্দিনোভিস্তিরা যতদিন নেতৃত্বে আসতে পারেননি, ততদিন বোরদিগা ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে বিরোধ তাঁদের কার্যক্ষেত্রে অনেকটাই অশক্ত করে রেখেছিল। ১৯২৪ সালে গ্রামশি লেখেন যে, ইমোলা থেকে লিভোর্নো পর্যন্ত কমিউনিস্ট গোষ্ঠী নিজেদের সীমিত রেখেছে কেবলমাত্র 'ফর্মাল প্রশ্নের মধ্যে, শুদ্ধ সংগতির প্রশ্নে এবং পরে নতুন পার্টি গঠন করে ফেলে তাঁরা আর জানেন না কী করে তাঁরা নির্বিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে তাঁদের পক্ষে আনবেন।'

লিভোর্নোয় সোশ্যালিস্ট পার্টির ভাঙনকে সমর্থন করেও গ্রামশি পরে এই ভাঙনকে 'প্রতিক্রিয়ার শক্তিবর্গের প্রবলতম একক জয়' বলে বর্ণনা করেন কারণ লিভোর্নোর ভাঙনের 'ফলে ইতালীয় নির্বিত্ত শ্রেণীর বৃহত্তর অংশই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।' অন্তর্বিরোধে জীর্ণ সোশ্যালিস্ট পার্টি, জোড়াতালি দিয়ে নামমাত্র সংহতি রক্ষায় সফল সোশ্যালিস্ট পার্টি, একমাত্র পার্লামেন্টারি ক্ষমতাবৃদ্ধিতেই আগ্রহী সোশ্যালিস্ট পার্টি যেভাবে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে বারবার বিপত্তি ঘটিয়েছে, তাতে সোশ্যালিস্ট পার্টিই বামপন্থী আন্দোলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে পরোক্ষে ফ্যাশিবাদকে মদত দিচ্ছে, একথাও যেমন সত্য তেমনই পার্টির ভাঙনে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে বিভাজন ঘটে গেল, তাতেও বামপন্থী আন্দোলন দুর্বল হল, এ কথাও সমানই সত্য। এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব খানিকটা যেন বা নিজের মধ্যে মেনে নিয়েই গ্রামশি নতুন কমিউনিস্ট পার্টির জন্য কাজে নেমে পড়েন। ১৯২১-২২ সালের অনেকটা সময়ই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির নীতিগত বিরোধে গ্রামশি বোরদিগার অনুগামীর ভূমিকাতেই থেকে যান। লেনিন তখন দেশে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছেন। ১৯২১ সালের জুন-জুলাই মাসে মস্কোয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে 'যুক্তফ্রন্টের' নীতি উপস্থাপিত হলে কংগ্রেসে উপস্থিত পি এস আই-এর প্রতিনিধিরা তার সুযোগ নিয়ে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে পুনঃপ্রবেশের সুযোগ খোঁজে। পি সি আই-এর প্রতিনিধিরূপে তেররাচিনি তাঁর ভাষণে যুক্তফ্রন্টের সপক্ষে রাদেক-এর 'থীসিস'-এর বিরোধিতা করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনের যে দুর্বিপাক ও সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট

আন্তর্জাতিক দ্বিতীয় কংগ্রেসের ‘সংকীর্ণতর’ অবস্থান থেকে তৃতীয় কংগ্রেসে আরো ‘উদার’ অবস্থানে সরে আসেন, তার ছায়া ইতালিতেও ততদিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৯২১-এর মার্চে ফিয়্যাট চোদ্দ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করে কারখানায় সশস্ত্র সৈনিকদের প্রহরায় বসিয়ে দেয়; বরখাস্ত শ্রমিকদের তালিকায় বিভিন্ন আন্দোলনে পুরোগামী শ্রমিকনেতারা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান; কর্মে বহাল শ্রমিকেরা এই অন্যায় বিনা প্রতিবাদে মেনে নেন। ২৫ এপ্রিল ফ্যাশিস্তরা তুরিনে কাসা দেল পোপোলো পুড়িয়ে দেয়; এই বাড়িতেই ছিল তুরিনের প্রধান বামপন্থী সংগঠনগুলির দফতর। মে মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িয়ে গ্রামশি পরাস্ত হন (জাতীয় স্তরেও সেবার পি এস আই পায় ১,৬০০,০০০ ভোট ও ১২৩টি আসন, পি সি আই পায় ৩০০,০০০ ভোট ও মাত্র পনেরোটি আসন)। গ্রামশি ও ‘ল্যর্দিনে নুওভো’ কার্যালয়, দুইয়ের জন্যই যথাক্রমে দেহরক্ষী ও প্রহরীর ব্যবস্থা করতে হয়। পত্রিকার পাতায় সোশালিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে গ্রামশির আক্রমণ যতই ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে সেররাতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ ততই নির্মম হয়। গ্রামশির চারপাশে যেন সব-কিছু ভেঙে পড়ছে। তাঁর ছোট ভাই মারিও ফ্যাশিস্ত দলে যোগ দেন এই সময়ে। সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়ে ‘ল্যর্দিনে নুওভো’ পত্রিকা তার পূর্বের মান রক্ষা করতে অপারগ হয়; সহকর্মীদের স্মৃতিকথায় জানা যায়, কোনো কোনো দিন বিরক্ত হয়ে গ্রামশি চেঁচিয়ে ওঠেন; ‘এটা একটা খবরের কাগজ, না আলুর বস্তা! কালকেই আইনিয়েলি তার শ্রমিকদের জড়ো করে বলতে পারে, দেখ, ওরা একটা খবরের কাগজই বার করতে পারে না, আবার সাধ হয়েছে রাষ্ট্র চালাবে!’ পত্রিকায় দক্ষ কর্মীর অভাব তো ছিলই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পত্রিকার ভূমিকার নবরূপ। বামপন্থী রাজনীতির চরিত্রায়নে যে অন্তর্ভেদী বিচার ও সমালোচনায় গ্রামশি তাঁর স্থান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নতুন কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র রূপে ‘ল্যর্দিনে নুওভো’ আর সেই ভূমিকা নিতে পারে না। ১৯২৪ সালে গ্রামশি লেখেন: ‘লিভোর্নোয় পার্টির ভাঙনের পর আমরা প্রবেশ করি এক আপৎকালীন অবস্থায়। লিভোর্নোর পর আমাদের যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও ক্রিয়ার এটাই হতে পারে একমাত্র যুক্তি।...আমাদের তখন দায়িত্ব গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতির তাড়নার মধ্যে নিজেদের এক পার্টি সংগঠনে সংগঠিত করা।’ সমস্ত দ্বিধাসংশয় সংবরণ করে নতুন পার্টির পক্ষে শ্রমিকসাধারণকে টেনে আনার দায়ের বাইরে অন্য কোনো বৃহত্তর দায়ের ঝুঁকি নিতে গ্রামশি বা তাঁর সম্পাদনাধীন ‘ল্যর্দিনে নুওভো’ তখন প্রস্তুত নন। আর নতুন পার্টির ভিত্তিস্থাপনের সেই তৎপরতায় সোশালিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে মনোভাব সবল রাখার দায়ও জরুরি; যদিও লেনিন ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক তখন বিশ্ব পরিস্থিতি বিবেচনা করে জোর দিচ্ছেন বামপন্থী ঐক্য ও যুক্তফ্রণ্টের ওপর। কিন্তু বোরদিগা, গ্রামশি, তোইলিয়াত্তি, তেররাচিনি সকলেই তখন ভাবছেন লিভোর্নোর ভাঙনের কয়েক মাসের মধ্যে সোশালিস্ট পার্টির সঙ্গে আঁতাত

করতে গেলে সোশালিস্ট পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে আসার আর কোনো যুক্তিই থাকবে না।

মস্কোয় ১৯২১-এর জুন-জুলাইএ আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে রাদেক-এর নামে যে যুক্তফ্রন্ট বিষয়ক থীসিস উপস্থাপিত হয়, ইতালীয় পার্টির পক্ষ থেকে তেরুরাচিনি তার বিরোধিতা করলে লেনিনের কড়া সমালোচনার সম্মুখীন হন। পরে ১৯২২-এর ২১ ফেবব্রুয়ারি—৪ মার্চ অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মনির্বাহী সমিতির প্রথম বর্ধিত প্লেনারি অধিবেশনে ইতালীয়, ফরাসি ও স্পেনীয় প্রতিনিধিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ৪৬-১০ ভোটে যুক্তফ্রন্ট-এব সপক্ষে থীসিসটি গৃহীত হয়। এই অধিবেশনের অনতিকাল পরেই ২০-২৪ মার্চ রোমে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে যুক্ত ফ্রন্ট-এর কর্মসূচির বিরুদ্ধে যে কট্টর মনোভাব বোরদিগার তথাকথিত 'রোম থীসীজ'-এ নথিবদ্ধ হয়, তা ৩১,০৮৯-৪,১৫১ ভোটে গৃহীত হয়। অনেক পরে ১৯২৪-এ ৯ ফেবরুয়ারি তোইলিয়াত্তি ও তেরুবাচিনিকে লেখা একটি চিঠিতে গ্রামশি বলেন: 'রোম কংগ্রেসের কিছুকাল আগেই তুরিন শাখায় আমার এক বক্তৃতায় আমি বেশ স্পষ্টভাবেই বলি যে পার্টি সংগঠন রক্ষার তাৎক্ষণিক স্বার্থেই আমি কর্মকৌশলের ক্ষেত্রে রোম থীসীজ মেনে নিয়েছিলাম; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমি একথাও বলেছিলাম যে, শ্রমিকসাধারণের সরকার গঠনের লক্ষ্যে আমি যুক্ত ফ্রন্ট-এর পক্ষপাতী।' পি সি আই-এর রোম কংগ্রেসে কমিনটার্ন-এর নতুন সম্পাদক জুল হুমবার্ট ড্রোজ-এর মুখ্য দায়িত্বই ছিল ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে যুক্ত ফ্রন্ট-এর সারবত্তা ও যৌক্তিকতা বোঝানো। সে-কাজে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। কমিনটার্ন-এর সঙ্গে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির মতপার্থক্য কংগ্রেসে ধরা পড়লেও রোম থীসীজ-এর সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতালীয় পার্টি সদস্যেরা দ্বিধাবোধ করেননি। তাস্কা ও গ্রাৎসিয়াদেই একটি প্রস্তাবে কমিনটার্ন ও ইতালীয় পার্টির ভিন্নমুখী চিন্তার মধ্যে একটা সমঝোতা আনার চেষ্টা করলে প্রস্তাবটি পরাস্ত হয়। গ্রামশি বোর্দিগা ও তেররাচিনি প্রস্তাবিত রোম থীসীজ-এর পক্ষে বক্তৃতা করতে উঠে বলেন যে জর্মানির মতো উন্নত পুঁজিবাদী দেশে যুক্ত ফ্রন্ট-এর নীতির সারবত্তা থাকতে পারে, পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পশ্চাদ্‌পদ শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় ফলপ্রসূ হতে পারে; কিন্তু ইতালির মতো দেশে যুক্ত ফ্রন্ট-এর কোনো কার্যকর ভূমিকা থাকতে পারে না। তুরিনে ফিরে এসে পার্টির তুরিন শাখায় বক্তৃতাকালে গ্রামশি পার্টি সদস্যদের কাছে রোম থীসীজ-এর সপক্ষে তাঁদের মত প্রকাশের আবেদন জানান।

রোম থীসীজ সম্পর্কে তাঁর যে দ্বিধা-সংশয়ের কথা গ্রামশি পরে প্রকাশ করেছেন, সেই দ্বিধা-সংশয়ের কথা তখনই তাঁর আশপাশের মানুষ-জনের কাছে জানা ছিল, এমন অনুমান বোধ হয় অমূলক হবে না; নয়তো কেন কমিনটার্ন-এর প্রতিনিধি শিয়ারিনি ১৯২১-এর শেষদিকে তাঁর কাছে প্রস্তাব

আনবেন, গ্রামশিকে কমিনটার্ন বোরদিগার জায়গায় বসাতে চান। গ্রামশি জানিয়ে দেন, 'আমি এই ধরনের চক্রান্তে কোনোভাবেই নামতে চাই না, যদি তাঁরা সত্যিই অন্য এক নেতৃত্ব চান, তবে তাঁদের তার মোকাবিলা করতে হবে রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসেবেই।' বোরদিগা ও তাঁর অনুগামীরা তখন জানেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ ও দূরত্ব বেড়েই চলেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই পি সি আই ও কমিনটার্ন, উভয় পক্ষই মস্কোয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মনির্বাহী সমিতিতে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির স্থায়ী প্রতিনিধিরূপে গ্রামশিকে মনোনয়ন দানে একমত হন। ১৯২২-এর মে মাসের শেষ দিকে 'ল্যর্দিনে নুওভো' পত্রিকার সম্পাদনাভার ত্যাগ করে গ্রামশি মস্কো যাত্রা করেন। রাজনৈতিক টালমাটাল, যাত্রার ধকল, নতুন দেশে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার দায় ইত্যাদি নানা চাপে গ্রামশি মস্কোয় এসে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, স্নায়ুবৈকল্যের নানা লক্ষণ দেখা দেয়। তাই নিয়েই তিনি ই সি সি আই অর্থাৎ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মনির্বাহী সমিতির দ্বিতীয় প্লেনামের অধিবেশনে (৭-১১ জুন) যোগ দেন।

তারপরই আন্তর্জাতিকের সভাপতি জিনোভিয়েভ-এর পরামর্শে গ্রামশিকে ছ মাসের জন্য মস্কোর উপকণ্ঠে সেরেব্রোনি বোর স্বাস্থ্যনিবাসে ভর্তি হতে হয়। এই স্বাস্থ্যনিবাসেই গ্রামশির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যায় ইউজীনী শুখৎ-এর। ইউজীনী বয়সে গ্রামশির চেয়ে কিছুটা বড়, গুরুতর স্নায়ুবৈকল্যের শিকার, হাঁটতে পারেন না। বাবার সঙ্গে ইউজীনী অনেক দিন বিদেশে কাটিয়েছেন—রোমে, মঁপেলিয়ার-এ, জেনীভায়—নিজে শিল্পকলায় পাঠ নিয়েছেন, ভাইবোনেরাও উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন। বেশির ভাগ সময়টাই তাঁদের কেটেছে রোমে। এক বোন তাতিয়ানা থেকে গেছেন ইতালিতে। ইউজীনী তাঁর আরো দুই বোন আন্না ও জুলিয়া ও তাদের মায়ের সঙ্গে মস্কো থেকে একশো কিলোমিটার দূরে ইভানোভো ভস্নিয়েসেনস্ক নামে এক মফঃস্বল শহরে বাস করেন। সেখান থেকেই ইউজীনীর বোনেরা তাঁকে স্বাস্থ্যনিবাসে দেখতে আসেন। ১৯২২-এর জুলাই মাসে স্বাস্থ্যনিবাসেই গ্রামশির সঙ্গে জুলিয়া শুখৎ-এর প্রথম পরিচয় হয়। তাঁর বয়স তখন ছাব্বিশ, গ্রামশির চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। সাত বছর আগে ইতালি ছেড়ে এসেও জুলিয়ার ইতালি-প্রেম এতটুকু ফিকে হয়নি। জুলিয়া তখন ইভানোভোয় এক লিসে-তে সংগীত-শিক্ষিকার চাকরি করেন। জুলিয়া যখন স্বাস্থ্যনিবাসে ইউজীনীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন গ্রামশি ও জুলিয়া অনেকক্ষণ সময় একত্র কাটান। গ্রামশি নিজেই বলেছেন, 'অনেক অনেক দিন ধরে আমি বিশ্বাস করেছি, আমাকে যে কেউ কখনও ভালোবাসতে পারে তা একেবারেই মর্মান্তিকভাবে অসম্ভব।' জুলিয়ার সঙ্গে ধীরে ধীরে তাঁর যে-সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে, তাতে এই ধারণাটাই এবার ভাঙতে থাকে। অগস্ট মাসেই জুলিয়াকে লেখা এক চিঠিতে গ্রামশি লেখেন : 'তুমি আমায় যা-কিছু বল তা-ই আমার ভালো করে, আমাকে শক্তি দেয়।'

পরবর্তীকালে জুলিয়াকে লেখা একটি চিঠিতে গ্রামশি লেখেন : 'আমি কতবার ভেবেছি, কারো প্রতি বা এমনকী নিজের মা-বাবার প্রতিও যদি কারো গভীর টান না থাকে, তবে কি তার পক্ষে এক জনমণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্ক শক্ত করে বাঁধা সত্যিই সম্ভব হতে পারে? কাউকে ব্যক্তি মানুষ যদি কোনো দিন গভীরভাবে না ভালোবেসে থাকে, তবে কি তার পক্ষে কোনো গোষ্ঠীকে ভালোবাসা সম্ভব? জঙ্গি কর্মী হিসেবে আমার জীবনকে কি এই ব্যাপারটা প্রভাবিত করেনি? এর প্রভাবেই কি আমি অনুৎপাদী হয়ে পড়িনি, সবকিছুকেই শুদ্ধ মননের মাত্রায় বা কেবলমাত্র গাণিতিক হিসেবের মাত্রায় নামিয়ে এনে আমি কি আমার বিপ্লবী সত্তাকেই অবনমিত করিনি? আমি এইসব নিয়ে অনেক ভেবেছি; আর এই গত কয়েকটা দিন ধরে তোমার কথা ভাবছিলাম বলেই, তুমি কেমন করে আমার জীবনে এলে, আমায় প্রেম দিলে, আমি চিরদিন যার অভাব বোধ করেছি, আমাকে তা-ই দিলে, তা-ই নিয়ে ভাবছিলাম বলেই এটা আমার মনে এল। এই অভাব বোধ থেকেই আমি হয়ে উঠেছিলাম কাঠগোঁয়ার বিদ্বেষপরায়ণ।' অন্যত্র আবার তিনি বলেন যে, তিনি তখন আবিষ্কার করছেন যে 'নিজেকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে কেবলমাত্র একটি খণ্ডকে কার্যকর রাখা যায় না; জীবন অখণ্ড, তার প্রতিটি ক্রিয়া অন্য যাবতীয় ক্রিয়া দ্বারা বলান্বিত হয়। প্রেম ব্যক্তিমানুষের সমগ্র সত্তাকে বলীয়ান করে নতুন এক ভারসাম্য রচনা করে, অন্য যাবতীয় অনুভূতি ও আবেগকে তীব্রতর করে।' এই যে নতুন আবেগ ও নতুন সম্পর্ক গ্রামশির জীবনে অন্য একটা মাত্রা নিয়ে আসছে, এটাও খুব সহজ, স্বচ্ছন্দ পথ ধরে চলতে পারে না। স্বাস্থ্যনিবাসে ছুটির দিনে দেখা-সাক্ষাৎ থেকে যে-সম্পর্কের শুরু হয়, রাজনৈতিক টানাপোড়েনের তাড়নায় তাতে বারবারই বিচ্ছেদ ও দূরত্বের ছায়াপাত ঘটে শেষ পর্যন্ত গ্রামশির দীর্ঘ কারাবাসে প্রত্যক্ষ সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থেকে যায় কেবল পত্রবিনিময়ে উভয়ের ক্রমাগত উষ্ণ আত্মসমীক্ষণ।

ওদিকে ইতালিতে ১৯২১-২২ সাল জুড়ে বামপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ফাশিস্ত গুণ্ডাদের হামলাবাজি, চোরাগোপ্তা খুন বেড়েই চলেছে। ফ্যাশিস্তরা একের পর একটি হানার পর বামপন্থী কর্মীদের গ্রেফতার করে তাঁদের উপর বর্বর নির্যাতন চালিয়ে তাঁদের হত্যা করছে, এমন ঘটনাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। কারখানা দখল আন্দোলনের সময় জিওলিত্তি সরকার স্কোয়াদ্রে দাংসিওনে নামে যে বেসরকারি সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে শ্রমিকদের দমন করেছিলেন, সরকারি সৈন্যবাহিনীর প্রাক্তন সেনানী ও অফিসারদের সেই সংগঠন এতদিনে ফ্যাশিস্ত শক্তির ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্কোয়াদ্রে দাংসিওনের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতায় সন্ত্রস্ত জিওলিত্তি সরকার ১৯২১-এর ডিসেম্বরে এক ডিক্রি জারি করে পুলিশ বাহিনীর অঞ্চলপ্রধানদের নির্দেশ দেন, যাবতীয় বেসরকারি সশস্ত্র সংগঠনকে দমন করা হোক। ফ্যাশিস্ত নেতা বেনিতো মুসোলিনি সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করেন, সমস্ত ফ্যাশিস্ত-ই স্কোয়াদ্রের

সদস্য। ঐ বছরের মে মাসের সাধারণ নির্বাচনে জিওলিত্তির মনোনয়ন তালিকায় যে ফ্যাশিস্ত প্রার্থীরা স্থান পেয়ে গিয়েছিলেন, এতদিনে তাঁরা সংসদে সুপ্রতিষ্ঠিত। জিওলিত্তি আজ কেমন করে তাঁদের মোকাবিলা করবেন? ফলে ডিক্রির নির্দেশ পালনে কেউই তৎপর হলেন না। ফ্যাশিস্ত গুণ্ডামি অব্যাহত রইল। মুসোলিনি সদর্পে ঘোষণা করলেন, 'সরকার আমাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না।' ১৯২২-এর ১ জানুয়ারি মুসোলিনি তাঁর দিনপঞ্জিতে লিখলেন: 'আমরা যে কেবল আমাদের শত্রুদের প্রতিরোধ ভেঙে দিয়েছি তা-ই নয়, আমরা আজ দখল করে নিয়েছি যাবতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র। ফ্যাশিস্তদের নামে আমি আজ যা আদেশ দেব, তা পুলিশের সমস্ত অঞ্চলপ্রধান পালন করতে বাধ্য।' পাশব শক্তির প্রয়োগে সেপটেম্বরের মধ্যে উত্তর ইতালির অধিকাংশ নগর পরিষদ দখল করে নিয়ে ফ্যাশিস্ত দল ক্ষমতার যে অবস্থানে পৌঁছে যায় সেই ক্ষমতার জোরেই মুসোলিনি 'রোম অভিযানের' আহ্বান জানান। রোম অভিযান বলতে সারা ইতালি থেকে ফ্যাশিস্তরা রোমে এসে জমায়েত হয়ে রোম অচল করে দেবেন। ২৪ অকটোবর মুসোলিনি তাঁর অনুগামীদের বলেন: 'হয় সরকার আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক নয়তো আমরা রোমে গিয়ে রোমের দখল নেব।' এতদিন ফ্যাশিস্তদের প্রশ্রয় দিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ২৯ অকটোবর ইতালীয় মন্ত্রীসভা রাজা ভিকতর ইম্মানুয়েলকে সুপারিশ করলেন, সামরিক আইন জারি করে সৈন্যবাহিনী নামিয়ে ফ্যাশিস্ত অভিযানের গতিরোধ করা হোক। সংবিধানমতে রাজার এই সুপারিশ মেনে নেওয়ার কথা। তিনি এই সুপারিশ মেনে নিলে ফ্যাশিস্তরা যে ধাক্কা খেত তা থেকে সামলে উঠে দাঁড়ানো তাদের পক্ষে কঠিন হত বলেই ঐতিহাসিকদের অনুমান। কিন্তু রাজা ভিকতর ইম্মানুয়েল সেই সুপারিশ অগ্রাহ্য করে মুসোলিনিকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন। মুসোলিনি নিজে রোম অভিযানে যোগ দেননি, মিলান-এ বসে ছিলেন; রাজার আহ্বানে তিনি ট্রেনে রোম-এ চলে এসে প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসলেন। ফ্যাশিস্তদের মহামিছিল ৩০ অকটোবর যখন রোম-এ প্রবেশ করল, তখন মুসোলিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে সমাসীন। প্রধানমন্ত্রী রূপে প্রথম আঠারো মাস মুসোলিনি এক কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার অধিনায়ক রূপেই কাজ চালিয়ে যান। ফলে আরো প্রায় দু বছর ফ্যাশিবাদের সংকীর্ণ চারিত্র্য কিছুটা আড়ালে থেকে যায়; সেই সুযোগে ফ্যাশিস্তরা শান্তভাবে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে যায়। রোম অভিযানের আগেই মুসোলিনি শিল্পপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন, 'আসন্ন ফ্যাশিস্ত অভিযানের লক্ষ্যই হল—বিশেষত কারখানায় কারখানায়—শৃংখলার পুনঃপ্রবর্তন।'

১৯২২-এর ৫ নভেম্বর মস্কোয় যখন কমিনটার্নের চতুর্থ কংগ্রেস শুরু হয়, তখন ইতালিতে ফ্যাশিবাদ তথা ফ্যাশিস্ত দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত; অকটোবরেই ইতালির সোশালিস্ট পার্টি শেষ পর্যন্ত তার সংস্কারপন্থী অংশকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পুরনো

দাবি মেনে নিয়েছে। ফ্যাশিবাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন জিনোভিয়েভ-বুখারিন প্রমুখ কমিনটার্ন নেতৃবৃন্দ স্বভাবতই তখন জোর দিচ্ছেন শ্রমিক-শ্রেণীর সমস্ত পার্টির মধ্যে ঐক্যের ওপর। কিন্তু পি সি আই নেতৃবৃন্দ ফ্যাশিবাদকে তখনও কোনো গুরুত্ব দিচ্ছেন না। মন্ত্রীসভার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে, গণতন্ত্রের ভাণটুকুও অস্বীকার করে রাজা মুসোলিনিকে সরকার গঠন করতে আমন্ত্রণ জানালেও তেররাচিনি তার মধ্যে 'বড়ই গভীর এক মন্ত্রী-সভা-সংকট' ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না। গ্রামশি কিন্তু ১৯২১-এর এপ্রিল থেকেই ফ্যাশিবাদের মধ্যে অন্য একটা মাত্রার ছায়া দেখতে পাচ্ছেন; তিনি দেখছেন, 'বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার ভেতর থেকে এমন এক রূঢ়ক শক্তিপুঞ্জ যেন জ্যামুক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়েছে যে তাদের আর সংযত করা যাবে না; ফ্যাশিবাদ ইতালীয় সমাজের গভীর অবক্ষয়ের আরেক নাম, যা রাষ্ট্রের অবক্ষয়ের অনিবার্য অনুষঙ্গ; এবং যার কারণ পাওয়া যাবে কেবলমাত্র সংস্কৃতির সেই অধঃস্থ মানে যেখানে ইতালীয় জাতি নেমে গেছে ষাট বছরের একমাত্রিক প্রশাসনে।'

ইতিমধ্যে কমিনটার্ন তার পুরনো 'যুক্তফ্রণ্ট'-এর নীতি থেকে এগিয়ে গিয়ে 'শ্রমিকদের সরকার' বা 'শ্রমিক-কৃষকদের সরকার' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেছে; অর্থাৎ যেখানেই অনুকূল পরিস্থিতি বর্তমান, সেখানেই কমিউনিস্টরা ঘোষণা করবেন যে তাঁরা 'অ-কমিউনিস্ট শ্রমিক দল ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের সঙ্গে একত্র হয়ে শ্রমিক সরকার গঠন করতে প্রস্তুত।' মস্কো কংগ্রেসের প্রস্তুতিপর্বে ও কংগ্রেস চলাকালীন কমিনটার্ন-এর সঙ্গে বোর্দিগার বিরোধ অব্যাহত থাকে। কমিনটার্ন চাপ দিচ্ছেন, ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও সোশালিস্ট পার্টি এক হয়ে যাক; বোর্দিগা কোনোমতেই তা মানতে চান না; গ্রামশি থেকে যান এক মধ্যপন্থী অবস্থানে, আপসের নানা পথ ও সম্ভাবনা খোঁজেন। কমিনটার্ন-এর পক্ষ থেকে মাতিয়াশ রাকোসি গ্রামশির কাছে প্রস্তাব আনেন, কমিনটার্ন তাঁকে বোর্দিগা-কে হটিয়ে পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণে মদত দিতে প্রস্তুত। গ্রামশি সে-প্রস্তাব গ্রহণ করেন না। ওদিকে মস্কোয় যে ইতালীয় প্রতিনিধিদল আসেন, তার মধ্যেও বোর্দিগার বিপক্ষ কমিনটার্নপন্থী শক্তি দেখা দিয়েছে তাস্কার নেতৃত্বে। গ্রামশির আচরণে বিরক্ত জিনোভিয়েভ মন্তব্য করেন, গ্রামশি 'অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেন; যখন তিনি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন, তখন তার পরিণাম প্রত্যাশিত পরিণামের পরিপন্থী হয়।'

গ্রামশির নিজের ব্যাখ্যা: 'এই প্রশ্নে আমার মনোভাব তখন আমার নিজের নয়, বরং আমি বিরুদ্ধে গেলে আমাদেও কী করতে পারে সেই ভাবনার দ্বারা সর্বদাই প্রভাবিত। বোর্দিগা নিজেকে সরিয়ে নিয়ে একটা সংকট সৃষ্টি করতে পারে, সে কখনোই কোনো আপসে আসবে না।...আমি যদি তার বিরোধী পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করতাম, আন্তর্জাতিক আমাকে সাহায্য করত। কিন্তু পার্টি যখন একটা গৃহযুদ্ধের মধ্যে অনেক কষ্টের মধ্যে

কোনো রকমে একতাবদ্ধ, যখন প্রতিদিন "আভান্তি" পত্রিকা তাকে আক্রমণ করে চলেছে, যখন আমাদের ভেঙে ছত্রখান করে দেবার মতলবে আমাদের মতান্তরের প্রতিটি চিহ্নকে ভাঙাচ্ছে, তখন কী পরিণাম হত সেই ঘটনার?' রাকোসির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে গ্রামশি বলেন: 'আমি বললাম, ইতালীয় সমস্যা সমাধান করতে আমি আন্তর্জাতিককে আমার যথাসাধ্য সাহায্য করব, কিন্তু পার্টির মধ্যে যথেষ্ট প্রস্তুতিকার্য না করে আমাদেও-র জায়গায় অ... ক উকে বসানো সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি না। ইতালীয় পরিস্থিতিতে আমাদেও-র জায়গায় কাউকে বসানো একজন কর্মীর জায়গায় আরেকজনকে বসানো নয়, কারণ বোরদিগা একাই তিনজনের সমান।'

কমিনটার্ন কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক ও ইতালীয় পার্টির এই বিরোধ বা মতপার্থক্যের একটা পর্বে ত্রৎস্কি বলেন: 'পি সি আই-এর সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মতান্তর চরম বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এগোলেই আমাদের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে যাবে।' শেষ পর্যন্ত কমিনটার্ন-এর প্রবল চাপ ও শাসানি, এবং সি পি এস ইউ-এর পক্ষ থেকে লেনিন, ত্রৎস্কি, জিনোভিয়েভ, বুখারিন ও রাদেক-এর স্বাক্ষরিত একটি পত্রের প্রভাবে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি পি এস আই-এর সঙ্গে ঐক্য আলোচনা শুরু করতে সম্মত হন। বোরদিগা সভায় বলেন: 'আপনাদের অনুরোধ ও সৌভ্রাত্রমূলক পরামর্শের পর আমরা আপনাদের জানাচ্ছি যে, পি সি আই-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নীরব থাকবেন। তাঁদের যে-মতামত সম্পর্কে আপনারা অবহিত আছেন এবং যার যাথার্থ্য সম্পর্কে তাঁরা এখনও পুরোপুরি প্রত্যয়ী, তা তাঁরা এখানে উপস্থাপন করবেন না।' মস্কোতেই কমিনটার্ন-এর উদ্যোগে ও চাপে পি এস আই ও পি সি আই-এর প্রতিনিধিদের মধ্যে যে ঐক্য আলোচনা শুরু হয়, তাতে যোগ দিতে বোরদিগা-কে রাজি করানো যায় নি। পি এস আই-এর সেররাতি, মাফ্‌ফি ও তোনেত্তি-র সঙ্গে আলোচনায় বসেন পি সি আই-এর পক্ষ থেকে গ্রামশি, স্কোকিমাররো ও তাস্কা।

ঐক্য আলোচনায় গ্রামশিই ছিলেন পি সি আই-এর প্রধান প্রবক্তা; কমিনটার্ন-এর যে প্রতিনিধিরা এই আলোচনায় মধ্যস্থতা করছিলেন (বিশেষত কমিনটার্ন সম্পাদক ড্রোজ), তাঁদের প্রথম থেকেই মনে হতে থাকে, গ্রামশি এই ঐক্য আলোচনা বানচাল করতেই সচেষ্ট। বস্তুত তিনি এমন সব শর্ত আরোপ করতে থাকেন যা সোশালিস্ট পার্টির পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। তবুও শেষ পর্যন্ত—তাও কমিনটার্ন-এর চাপেই—পি এস আই-কে এমন অনেকগুলি শর্তই মেনে নিতে হয়। এইভাবে গ্রামশির চাপে গৃহীত শর্তাবলির মধ্যে একটি ছিল, নতুন জমানায় পার্টির মুখপত্র যুগ্মভাবে সম্পাদনা করবেন গ্রামশি ও সেররাতি। সোশালিস্ট ও কমিউনিস্টদের এই বৈঠকের শেষে স্থির হয়, যে-সব প্রশ্নে মতৈক্যে পৌঁছনো যায় নি, ইতালিতে

ফিরে গিয়ে সেগুলির নিষ্পত্তি হবে দুজন কমিউনিস্ট ও দুজন সোশালিস্টকে নিয়ে গঠিত যুক্ত কমিটিতে।

সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টি নামে নতুন ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের স্বপ্ন অচিরেই ধূলিসাৎ হয়। কমিনটার্ন কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তের খবর ইতালিতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সোশালিস্ট পার্টির কমিউনিস্ট-বিরোধী অংশকে সংগঠিত করে পিয়েত্রো নেন্নি ও আর্তুরো ভেল্লা 'সোশালিজম্-এর প্রতিরক্ষার্থে জাতীয় কমিটি' গঠন করে, 'আভান্তি' পত্রিকাকে তাঁদের প্রচার-বাহন রূপে ব্যবহার করে পার্টির মধ্যেই যে প্রতিরোধী শক্তি গড়ে তোলেন, মিলান-এ কমিনটার্ন-এর প্রতিনিধি ড্রোজ-এর উপস্থিতিতে পি এস আই-এর সম্মেলনে তারাই ৫৩৬১—৩৯৬৮ ভোটে ঐক্য প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। নেন্নি-ভেল্লার ঐক্যবিরোধী অভিযানকে সেরুরাতি হয়তো খানিকটা সামলাতে পারতেন, কিন্তু কমিনটার্ন কংগ্রেসের পর সেরুরাতি আরো কিছুদিন মস্কোয় থেকে গেলেন। ড্রোজ সন্দেহ করেন, সংযুক্তি বানচাল করার জন্যই পি সি আই সেরুরাতিকে মস্কোয় আটকে রাখেন। মস্কোয় দুই দলের প্রতিনিধিদের বৈঠকে স্থির হয়েছিল, সোশালিস্ট পার্টির কংগ্রেসে ঐক্য প্রস্তাব খারিজ হয়ে গেলে ঐক্যপন্থী সংখ্যালঘু অংশ সঙ্গে সঙ্গেই সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবেন। কিন্তু পি এস আই কংগ্রেসের পর ড্রোজ-ই পরামর্শ দিলেন, সংখ্যালঘু ঐক্যপন্থীরা পার্টির মধ্যে থেকে গিয়ে পরের কংগ্রেসে ঐক্য প্রস্তাব গ্রহণ করাবার জন্য চেষ্টা শুরু করে দিন। তাতে পি সি আই-এর সঙ্গে কমিনটার্ন-এর বিরোধ তীব্রতর হল। ড্রোজ কমিনটার্ন-কে জানালেন, 'আমাদের সঙ্গে একমত অন্তত কিছু কমরেডকে নেতৃত্বের স্তরে বসাবার জন্য কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিককে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হবে।'

ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কমিনটার্ন-এর বিরোধ আর বেশি দূর এগোতে পারল না। ফ্যাশিবাদের আঘাতেই তার সাময়িক নিষ্পত্তি ঘটল। ১৯২৩-এর ফেবরুয়ারি মাসের শুরুতেই এক সপ্তাহের মধ্যেই ফ্যাশিস্ত-পরিচালিত সরকার পি সি আই-এর পাঁচ হাজারেরও বেশি সদস্যকে গ্রেফতার করে, পার্টির সমস্ত তহবিল ছিনিয়ে নেয়। বোর্‌দিগা ও গ্রীকোসহ পি সি আই নেতৃত্বের বৃহদংশই কারান্তরালে চলে যেতে কমিনটার্ন সঙ্গে সঙ্গেই হস্তক্ষেপ করে স্কোক্কিমাররো, তোইলিয়াত্তি, তাস্কা, গ্রাৎসিয়াদেই ও বাভেরা-কে নিয়ে এক অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে ফেলেন। এপ্রিলে কারান্তরাল থেকেই বোর্‌দিগা কমিনটার্ন-এর সঙ্গে বিরোধে পার্টির সদস্যদের সমর্থন প্রার্থনা করে একটি 'আবেদন' বা দলিল প্রচার করলেন। ১ মে তোইলিয়াত্তি বোর্‌দিগার দলিলে গ্রামশিকে সই করতে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখলেন। গ্রামশি রাজি হলেন না। এই দলিল, যুক্তফ্রণ্ট-এর লক্ষ্য, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কমিনটার্ন-এর সম্পর্ক, বিশেষত তার খবরদারি, ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে 'ল্যর্দিনে নুওভো' গোষ্ঠীর

কমিউনিস্টদের মধ্যে এক পত্রবিতর্ক শুরু হয়ে যায় এই সময় থেকেই। ১৯২৪-এর মার্চে তোইলিয়াত্তি, স্কোক্কিমার্রো ও তের্রাচিনি গ্রামশির দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার মেনে নেন।

ইতিমধ্যে ১৯২৩-এর ১২-২৩ জুন মস্কোয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মনির্বাহী সমিতির তৃতীয় প্লেনাম অধিবেশন পি সি আই-এর এক নতুন কর্মনির্বাহী সমিতি মনোনয়ন করে। নতুন কর্মনির্বাহী সমিতিতে স্থান পান তোইলিয়াত্তি, স্কোক্কিমার্রো, তাস্কা, ভোতা ও জেন্নারি (ফোরতিকিয়ারি মনোনীত হয়েও অসম্মতি জানালে জেন্নারি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন)। ২১ সেপটেম্বর মিলান-এর উপকণ্ঠে এক শ্রমিকের বাড়িতে ফ্যাশিস্ত পুলিশের অতর্কিত হানায় এই নতুন কর্মনির্বাহী সমিতির সকলেই একই সঙ্গে গ্রেফতার হয়ে যান। তার আগেই তোইলিয়াত্তি কমিনটার্ন-এর কাছে আবেদন জানিয়েছেন, গ্রামশিকে ইতালির কাছাকাছি কোথাও রাখা হোক, যাতে তিনি সেখান থেকে পার্টিকে যথার্থ নেতৃত্ব দিতে পারেন। কমিনটার্ন গ্রামশিকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নতুন ভিয়েনা দফতরের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে মস্কো থেকে ভিয়েনায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। ভিয়েনা থেকে ইতালির হদিশ রাখা গ্রামশির পক্ষে সহজ হবে, এ-বিবেচনাও অবশ্যই তাঁদের মাথায় ছিল।

১৯২৩-এর নভেম্বরে গ্রামশি ভিয়েনা শহরের এক প্রান্তে যে ঘরে এসে উঠলেন, তাতে বাসের ন্যূনতম সুখ ছিল না; মস্কোর তুলনায় পুরো শহরটাই তাঁর 'বড় বিষণ্ণ' লাগে, তাঁকে বড় 'মনমরা' করে দেয়: 'জীবন বয়ে চলে, বিষাদভারে পীড়িত, একঘেঁয়ে।' তিনি বারবার জুলিয়াকে চিঠি লেখেন, ভিয়েনায় চলে এসে তাঁর সঙ্গে থাকবার জন্য অনুনয়-বিনয় করেন: 'তোমার অভাব আমি আমার শরীরের মধ্যে উপলব্ধি করি, আমার চারধারে এক বিপুল শূন্যতার আবেশের মতো।··· তুমি কবে আমার কাছে এসে আমার সঙ্গে থাকতে পারবে, কাজ করতে পারবে?' আরেক চিঠিতে তিনি জুলিয়াকে লেখেন: 'আমি ভেবে দেখেছি, আমি বড় বেশি নিঃসঙ্গ বলেই হয়তো, আর এই একাকীত্ব আমায় এমন মনমরা করে দিয়েছে বলেই তোমাকে আমার কাছে পেতে চাইছি।·· প্রিয়া আমার, তোমাকে আসতেই হবে। তোমাকে আমার প্রয়োজন। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারছি না।· এ যেন বাস্তবের স্পর্শ হারিয়ে বাতাসের মধ্যে ঝুলে থাকা।' ১৯২৪-এর ২৪ ফেবরুয়ারি লেখা চিঠিতে জুলিয়া গ্রামশিকে জানান, তিনি অন্তঃস্বত্তা। তারপর অনেকদিন আর কোনো খবর না পেয়ে ২৯ মার্চ গ্রামশি লেখেন: '২৪ ফেবরুয়ারি তুমি লিখেছিলে তুমি মা হতে চলেছ। কথাটা আমায় আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল এর চেয়ে বেশি আর-কী আমি চাইতে পারি! আমার মনে হয়েছিল, এতে তুমিও শক্তি পাবে; তোমার অতীত, তোমার শৈশব, তোমার সমগ্র বৌদ্ধিক বিকাশ থেকে তোমার গভীরে যে সংকট দানা পাকিয়ে উঠেছে বলে আমার মনে

হয়েছে, তা কাটিয়ে উঠতেও তুমি শক্তি পাবে। আমার মনে হয়েছিল, এবার হয়তো তুমি আমাকে আরো সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসতে পারবে।··· তোমার প্রেম আমাকে শক্তি দিয়েছে, আমি সত্যিই মানুষ হয়ে উঠেছি ; অন্তত মানুষ বলতে কী বোঝায়, সেই উপলব্ধি ঘটেছে আমার, আমি একটা ব্যক্তিত্ব লাভ করেছি। আমি জানি না আমার প্রেম তোমাকে অনুরূপ প্রভাবিত করেছে কিনা। আমার অন্তত তা-ই বিশ্বাস, কারণ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমার মধ্যে যেমন একটা সৃষ্টিশীল শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে তোমার মধ্যেও তা তেমনই সক্রিয়। যে স্বল্প সময়টুকু আমরা তীব্র সুখী ছিলাম, তখনই আমি খুবই নির্দিষ্ট করে ভেবেছিলাম যে আমাদের এক সন্তান হলে আমাদের সুখ সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু তুমি অন্য কথার ফাঁকে ঐ ইংগিতটুকু দিয়ে ঐ বিষয়ে আর-কিছুই জানাওনি।'

ভিয়েনায় বসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইতালিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি স্পষ্ট বুঝতে পারেন না গ্রামশি। লেনিনের মৃত্যুর আট দিন আগে গ্রামশি লেখেন : 'রুশ পার্টির মধ্যে যে-বিতর্ক চলেছে তার যথার্থ সূত্রাবলি আমি এখনও জানি না। আমি যা দেখেছি তা হল পার্টি গণতন্ত্র সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব। অন্য আর-কিছুই আমি দেখিনি। ত্রৎস্কির প্রবন্ধ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না, স্তালিনের প্রবন্ধ সম্পর্কেও নয়। দ্বিতীয় জনের আক্রমণের তাৎপর্য আমি বুঝতে পারছি না, আমার কাছে তা অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বিপজ্জনক বোধ হচ্ছে। কিন্তু উৎসে কী রয়েছে তা সম্পর্কে আমার অজ্ঞতাব কারণেই হয়তো আমি বিভ্রান্ত।'

ইতালিতেও পার্টির মধ্যেও বিভাজন-বিরোধ তিক্ততার পর্যায়ে। একদিকে তোইলিয়াত্তি, স্কোক্কিমাররো, তেররাচিনির নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কমিনটার্ন-এর বাম ঐক্য নীতির বিরোধিতা করছে, অন্যদিকে তাস্কা, ভোতা, গ্রাৎসিয়াদেই-এর নেতৃত্বে সংখ্যালঘু অংশ আন্তর্জাতিকের নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। দু পক্ষই অন্য পক্ষের গোপন চিঠি, দলিল ইত্যাদি আত্মসাৎ করে অভিযোগ, পালটা অভিযোগে বাতাস ভারী করে তুলেছেন। এই সময়ে একটি চিঠিতে তোইলিয়াত্তি লেখেন : 'বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের-কে অনুসরণ করার মানে দাঁড়াবে কমিনটার্ন-এর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে নামা ; আমরা কমিনটার্ন-এর বাইরে পড়ে গেলে তার অত্যন্ত সারবান বস্তুগত ও নৈতিক সমর্থন থেকে আমরা বঞ্চিত হব ; শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সম্পর্কের বন্ধনেই আবদ্ধ এক অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে পরিণত হব। অচিরেই আমরা ইতালির রাজনৈতিক সংগ্রামে আমাদের সমূহ যথার্থ প্রভাব হারিয়ে হয়তো সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।' ভিয়েনা থেকে গ্রামশি ক্রমাগত তার ইতালীয় সহকর্মীদের সঙ্গে পত্রবিনিময় করে চলেছেন, ফ্যাশিবাদের প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির এক নতুন ভূমিকা বা সত্তার আদল আবিষ্কারের তাগিদেই। এই তাগিদেই দুটি পত্রপত্রিকার প্রকাশও শুরু হয়—পার্টির ভিতরে ও বাইরে আন্দোলনের চিন্তা ও লক্ষ্য স্বচ্ছ ও

স্পষ্ট করে তুলতে। ১৯২৪-এর ১২ ফেব্রুয়ারি 'ল্যুনিতা' নামে দৈনিক পত্রের প্রথম সংখ্যা বেরুল। মার্চ থেকে প্রকাশিত হতে থাকল গ্রামশির সম্পাদনায় নব পর্যায়ে পাক্ষিক 'ল্যর্দিনে নুওভো'।

১৯২৩-এর ১২ সেপ্টেম্বর গ্রামশি পি সি আই-এর কর্মনির্বাহী সমিতিকে লেখা একটি চিঠিতে 'ল্যুনিতা'-র যে প্রথম পরিকল্পনা দেন, তাতে তাঁর প্রস্তাব ছিল, পি এস আই থেকে (কমিনটার্ন-এর সমর্থক, এই অভিযোগে) সদ্য বহিষ্কৃত সেরাতি প্রমুখ নির্দল বামপন্থীদের সঙ্গে কমিউনিস্টরা এই পত্রিকা পরিচালনায় 'রাজনৈতিকভাবে যুক্ত' হবেন। কমিনটার্ন-এর কর্ম-নির্বাহী সমিতির নির্দেশেই লিখিত এই চিঠিতে, গ্রামশি লেখেন : 'ইতালির বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার কাছে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা এমনকী অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে হয়, তা হল এই যে, এই পত্রিকাকে এমন একটা রূপ দিতে হবে যাতে এটি যতদিন সম্ভব আইনি ভাবে প্রকাশিত হতে পারে। সুতরাং পত্রিকায় পার্টির সঙ্গে তার সরাসরি সম্পর্কের কোনো পরিচয় তো থাকবেই না ; তার সমগ্র সম্পাদনাও এমনভাবেই করা হবে যাতে আমাদের পার্টির উপর তার প্রকৃত নির্ভরতাও তেমন স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে না। এটি হবে বামপন্থীদের সংবাদপত্র, সেই শ্রমজীবী বামপন্থীদের যারা শ্রেণী-সংগ্রামের কর্মসূচি ও রণনীতির প্রতি আজও অনুগত রয়েছে। এই পত্রিকা আমাদের পার্টির বিভিন্ন অধিবেশনের বিবরণী ও আলোচনা প্রকাশ করবে, সম্ভব হলে নৈরাজ্যবাদী, রিপাবলিকান ও সিন্ডিক্যালিস্টদেরও। [এই পত্রিকা] তার যাবতীয় বিচার প্রকাশ করবে নিরাবেগ ভঙ্গিতে, যাতে মনে হয় যে তার অবস্থান সংগ্রামের ঊর্ধ্বে এবং তার রয়েছে এক ''বৈজ্ঞানিক'' দৃষ্টিভঙ্গি। আমি জানি যে এই সব-কিছু কোনো লিখিত কর্মসূচিতে অন্তর্গত করা যায় না। তবে আসল কথা হল, কোনো লিখিত কর্মসূচি অত-কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং যে-পার্টি শ্রমজীবী বামপন্থী পক্ষের জগতে এক প্রধান ভূমিকায় ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তার একটা আইনানুগ মঞ্চ থাকা চাই যেখান থেকে পার্টি অব্যাহতভাবে ও সুসমন্বিতভাবে জনগণের বৃহত্তম অংশের কাছে পৌঁছতে পারবে।' গ্রামশি প্রস্তাব করেন, এই পত্রিকায় কমিউনিস্টরা ও সেরাতি-অনুগামীরা স্বনামে, স্বপরিচয়ে ও স্বদায়িত্বে লিখবেন : কিন্তু তাঁদের লেখার ভিত্তিরূপে থাকবে 'একটা রাজনৈতিক পরিকল্পনা' বা কাঠামো যাতে প্রতিফলিত হবে 'প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে দেশের সাধারণ পরিস্থিতি এবং ইতালীয় সামাজিক শক্তিগুলির মধ্যে বিবর্ত-মান সম্পর্কবিন্যাস।' এই পত্রিকায় মতাদর্শগত বিতর্কের সুযোগ থাকবে, কিন্তু 'সেক্টেরিয়ান মেজাজে নয়, রাজনৈতিক মেজাজে।' এই পত্রে গ্রামশি সংযুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সেরাতি-অনুগামী সোশালিস্টদের উপ-স্থিতি মেনে নিয়েও তাঁদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন, এমনকী 'তাঁদের বিরুদ্ধে নীতিসম্মত প্রচার' চালিয়ে যাওয়ার কথাও বলেন ; 'তাতে জনসাধারণের কমিউনিস্ট চেতনা বলিষ্ঠতর হবে ; পার্টির যে ঐক্য ও

অখণ্ডতা সংযুক্তির পর বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে (যদি না আমরা আবার ফিরে যেতে চাই ১৯২০-র বিশৃঙ্খলায়), তারও প্রস্তুতি হবে এর মধ্যে।' এই চিঠিতেই গ্রামশি 'ল্যুনিতা' নামটি প্রস্তাব করেন।

১৯২৪-এর জানুয়ারিতে বোর্দিগার ইশতেহারে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে গ্রামশি স্কোক্কিমারুরো (৫ জানুয়ারি) ও তেরুরাচিনিকে (১২ জানুয়ারি) যে দুটি চিঠি লেখেন, তাতে নিজের অবস্থান যথেষ্ট স্পষ্ট করেও তিনি শেষ পর্যন্ত জোর দেন পত্রিকার পাতায় তত্ত্বগত গভীরতার স্তরে বিতর্কটি চালিয়ে যাবার উপর। স্কোক্কিমারো-কে তিনি লেখেন: 'তোমার সঙ্গে যে-সব কমরেডদের যোগাযোগ আছে তাদের তাড়া লাগাও যাতে তারা আমার ফরমায়েশ করা প্রবন্ধগুলি দ্রুত আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। পালমি-কে [পালমিরো তোইলিয়াত্তি] বল, এখনই অন্তত তিন কলম জুড়ে (পুরো পিছনের পৃষ্ঠা) "চিন্তার সংঘাত" নিয়ে একটা লেখা তৈরি করে দিতে। আমি জানি না কী বই বা অন্য প্রকাশনার কথা ওর কাছে প্রস্তাব করতে পারি। গোবেত্তির "রিভোলুৎসিওনে লিবেরালে"-র দৃষ্টিভঙ্গি সমালোচনা করে ও দেখাতে পারে, বাস্তবে ইতালিতে ফ্যাশিবাদ আজ কী বিশ্রী তীব্র এক উভয় সংকট সৃষ্টি করেছে; যাতে একদিকে বিপ্লব এক স্থায়ী ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্য দিকে সশস্ত্র শক্তির প্রয়োগ ছাড়া রাষ্ট্রের কাঠামো তো দূরের কথা সরকার পালটানোও অসম্ভব হয়ে গেছে। "ইতালিয়া লিবেরা" সংগঠন ঘিরে প্রাক্তন সেনানী ও সেনাধ্যক্ষদের যে চিন্তাধারা দানা বেঁধেছে তাও ও পরীক্ষা করে দেখতে পারে। আমার তো মনে হয়, যুদ্ধাভিজ্ঞদের এই আন্দোলন সাধারণভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কারণ বাস্তবিক এই প্রথম বিশেষত মধ্য ও দক্ষিণ ইতালিতে কৃষকশ্রেণীর এক ধর্মনিরপেক্ষ দল গড়ে উঠেছে। তার ফলেই ইতালির পুরনো রাজনৈতিক কাঠামো উলটে পড়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর পার্লামেনটারিও আধিপত্যকে চূড়ান্তরকম দুর্বল করে দিয়েছে; সঙ্গে সঙ্গেই ঘটেছে ফ্যাশিস্ত পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিজয়াভিযান, যা প্রতিক্রিয়াশীল ও অসম্পূর্ণ, কিন্তু ইউটোপিয় আকাঙ্ক্ষা ও পুনর্জন্মের স্বপ্নে পরিকীর্ণ। এই সমগ্র পরিস্থিতিতে ইতালিয়া লিবেরা আন্দোলনের সূত্রপাতের যথার্থ তাৎপর্য কী? এটা আমিও বুঝতে পারছি না, পালমি যদি এবিষয়ে আমার জ্ঞানকে আলোকিত করতে পারে তাতে আমি সত্যিই আনন্দিত হব। স্বভাবতই পালমি-কে হতে হবে এই পত্রিকার অন্যতম স্তম্ভ, ওকে পাঠাতে হবে প্রবন্ধ যাতে সাবেক "অর্দিনে নুওভো"-র পুনর্জন্ম যথার্থই সম্ভব হয়।' তেরুরাচিনিকে লেখা চিঠিতে তিনি 'ক্রিতিকা প্রলেতারিয়া' নামে আড়াইশো-তিনশো পৃষ্ঠার যে ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রস্তাব করেছেন, তার প্রথম সংখ্যার একটি সূচিপত্রও তিনি তৈরি করে ফেলেছেন। সেই প্রস্তাবিত সূচিপত্রের অন্তর্গত গ্রামশির লেখা একটি প্রাথমিক কর্মসূচি সংক্রান্ত ইশতেহার; প্রলেতারিও কর্মকৌশল বিষয়ে বোর্দিগা, রোজা লুকসেমবুর্গ-এর পুঁজির সঞ্চয় বিষয়ে তত্ত্বালোচনা সম্পর্কে

গ্রাংসিয়াদেই, বিদ্যালয় ব্যবস্থা ও জেনতীল-এর সংস্কার বিষয়ে তাস্কা, ইতালিতে শ্রমিক-কৃষকদের সরকারের সম্ভাবনা বিষয়ে স্কোক্‌কিমার্‌রো, ইতালীয় শিল্প-ব্যবস্থার কাঠামো বিষয়ে লোংগোবার্দি বা পাল্তোরে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মসূচি বিষয়ে তের্‌রাচিনি, ভ্যাটিকান সমস্যা বিষয়ে তোইলিয়াত্তির প্রবন্ধ; খবরাখবর, গ্রন্থ-সমালোচনা, রাজনৈতিক দিনলিপি, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ-সংবাদাদির নির্ঘণ্ট ইত্যাদি। তের্‌রাচিনিকে তিনি যখন নির্দেশ দেন, প্রবন্ধের আয়তন হবে 'নুওভা আন্তোলোজিয়া'-র মতো ভারী প্রবন্ধ পত্রিকার 'অন্তত কুড়ি পৃষ্ঠার মতো', তখন তাঁর পরিকল্পিত পত্রিকার চারিত্র্যেরও একটা আন্দাজ পাওয়া যায়; আন্দাজ পাওয়া যায় যখন 'গ্রন্থ-সমালোচনা' কথাটি তালিকাভুক্ত করেই গ্রামশি বন্ধনী মধ্যে লেখেন: 'প্রবন্ধ লেখকেরা তাঁদের আলোচ্য বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রকাশিত অন্য যাবতীয় রচনার একটি সমালোচনাত্মক ও গ্রন্থপঞ্জিস্বরূপ সমীক্ষাও তাঁদের লেখার সঙ্গে পাঠাবেন।' যথার্থ সম্পাদকের মতোই তিনি তের্‌রাচিনির প্রবন্ধের লক্ষ্য ও সীমা নির্দেশ করে বলেন: 'যে খসড়া কর্মসূচিগুলি উপস্থাপিত হয়েছে এবং তা থেকে যে আলোচনাগুলির সূত্রপাত হয়েছে, তোমাকে তা বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে। আমি তোমায় বলতে পারি, বিশেষত রাশিয়ায় বেশ বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বুখারিন-এর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় উৎস-তালিকা সংগ্রহ করে রুশ ভাষায় প্রকাশিত যা-কিছু প্রেস দপ্তরকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নিতে পারো। অনুবাদগুলির বেশ কয়েকটি কপি করিয়ে যদি সেগুলি পাঠিয়ে দিতে পারো সেই সব পার্টি-গুলির কাছে যারা কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য কমিশন বসিয়েছে, অথচ যাদের আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক উপাদানগুলিরই অভাব রয়ে গেছে—তবে বেশ হয়।' এই লেখাটির জন্য তের্‌রাচিনিকে দুমাস সময় দিয়ে ঐ চিঠিরই শেষে, 'পুনশ্চ' অংশে তিনি 'ল্যর্দিনে নুওভো' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার জন্য 'জর্মনির পরিস্থিতি' বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে আরেকটি প্রবন্ধ প্রার্থনা করেন। ১৯২৪-এর ২৭ জানুয়ারি তোইলিয়াত্তিকে লেখা আরেকটি চিঠিতে গ্রামশি অনুযোগ করেন, ল্যর্দিনে নুওভো'-র জন্য 'অনেক কমরেডকে চিঠি লিখেও কোনো লেখা পান নি।' তিনি তখন স্থির করে ফেলেছেন, প্রথম কয়েকটি সংখ্যা তিনি নিজে একাই পুরোপুরি গুছিয়ে নেবেন, প্রথম সংখ্যাটি হবে মুখ্যত লেনিন বিষয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তোইলিয়াত্তিকে দায়িত্ব দেন, একটি বিশেষ বিভাগে সমকালীন মতাদর্শগত ও চিন্তাগত যাবতীয় 'সংগ্রামের' দলিল, মুখ্য নিবন্ধাবলির সমীক্ষা করবার: 'আমি রুজ্জেরো-কে জানিয়ে দেব, এই বিভাগটি তৈরি করার দায়িত্ব স্থায়ীভাবে তোমারই, আর তোমার তৈরি করা লেখাগুলি ওখানে সরাসরি প্রেসে দিয়ে দিলেই চলবে, ইতালি থেকে এখানে পাঠিয়ে আবার ফেরত যাবার কোনো প্রয়োজন নেই।'

১৯২৪-এর মার্চে 'ল্যর্দিনে নুওভো' পত্রিকার নব পর্যায়ের প্রথম সংখ্যার

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গ্রামশি লিখলেন : '১৯১৯-এর ১ মে "ল্যাদি'নে নুওভো" যখন প্রথম তুরিন থেকে প্রকাশিত হয়, তখন তার যে আকার ও যে উদ্দেশ্য ছিল, তা-ই নিয়েই তার পুনঃপ্রকাশ ঘটছে। ১৯১৯-২০ সালে সাপ্তাহিক রূপে ও ১৯২১-২২ সালে দৈনিক রূপে তার ক্রিয়াকলাপ ইতালীয় শ্রমিক-শ্রেণীর ইতিহাসে সুবিস্তীর্ণ ও গভীর ছাপ রেখে গেছে। এটা বিশেষভাবে সত্য তুরিনের নির্বিত্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে, কারণ এরাই তাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আরো প্রত্যক্ষভাবে এই পত্রিকাকে সাহায্য করেছিল, এর প্রচার আরো গভীরভাবে অনুধাবন করেছিল, এর নির্দেশাবলি পালন করেছিল। ঐ বছরগুলির সময় থেকে পরিস্থিতি অনেক পালটে গেছে বলে মনে হচ্ছে ; কিন্তু আসলে বাইরে থেকে যতটা পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে, গভীরে ততটা নয়। যে-সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে, সেগুলো একই রয়ে গেছে, যদিও সেগুলো আরো কঠিন ও জটিল হয়ে উঠেছে।

'তখন সামনে সমস্যা ছিল, বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর একটা স্বাধীন পার্টি গঠন করতে হবে ; সঙ্গে সঙ্গেই খুবই দরকার ছিল বিপুল জনতাকে এমন একটা আন্দোলনে সংগঠিত করা যার মধ্য দিয়ে তারা বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন উলটে দিয়ে নতুন এক রাষ্ট্রের পত্তন করতে পারে—যে-রাষ্ট্র হবে প্রলেতারিয়ত শ্রেণী ও গ্রামাঞ্চলের মেহনতি মানুষের একনায়কতন্ত্র। ১৯১৯-২০ সালে "ল্যাদি'নে নুওভো" পত্রিকা এই দুটি সমস্যাকে গভীরভাবে পরস্পর-সম্পৃক্ত বিবেচনা করেছিল। "ল্যাদি'নে নুওভো" যখন জনতাকে বিপ্লবের দিকে চালিত করেছে, ফ্যাকটরি কাউনসিল ও ক্রাফ্‌ট্‌ ইউনিয়নগুলির মধ্যে যখন সংস্কারপন্থী ও সুবিধাবাদীদের থেকে বিচ্ছেদের উপর জোর দিয়েছে, সব-চেয়ে গভীরভাবে প্রলেতারিয় যে-সমস্যাবলি তারই উপর সোশালিস্ট পার্টির মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত করেছে, যাতে সাধারণ শ্রমিকেরা আইনজীবী ও সংস্কারবাদ ও ম্যাকসিম্যালিজ্‌ম্‌-এর বুকনিবাজদের উপর তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে, ও এইভাবে সোশালিস্ট পার্টির জীবনেই নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে, তখন "ল্যাদি'নে নুওভো" বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যা অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল, বিপ্লবের সেই পার্টি সৃষ্টির লক্ষ্যও পূরণ করেছিল।

'কিন্তু সেই বিপুল দায়িত্বের পক্ষে আমাদের শক্তি ছিল যৎসামান্য। একথাও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে কখনও কখনও এমনও হয়েছে যে আমাদের কাজ গন্তব্যের শেষ বিন্দু পর্যন্ত নিয়ে যাবার সাহস হয়নি আমাদের। যখন চারিদিক থেকে অভিযোগ উঠেছে যে আমরা নাকি ভুঁই-ফোড় প্রতিপত্তিসন্ধানী, তখন সেই দুরভিসন্ধিপ্রসূত অভিযোগ ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করবার মতো শক্তি আমাদের ছিল না। আমাদের বয়স তখন বড় কম, আমাদের রাজনৈতিক অর্বাচীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধও প্রবল। তাই সারা দেশে ছড়িয়ে থাকবে এমন এক উপদল গঠন করার সাহস আমাদের ১৯১৯-এ হয়নি। ১৯২০-তেও আমরা সাহস পাইনি ফ্যাকটরি কাউনসিল-

গুলির এমন এক নগরভিত্তিক ও আঞ্চলিক কেন্দ্র গড়বার যা প্রয়োজন পড়লে জেনারেল কনফেডারেশন অফ লেবর ও সোশালিস্ট পার্টিকে ডিঙিয়ে বা এমনকী তার নির্দেশের বিরুদ্ধেই পীডমণ্ট জেলার সমগ্র শ্রমিকসাধারণের সংগঠনরূপে ইতালীয় শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক সমাজের কাছে সরাসরি তার বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারত।

'আজ পরিস্থিতি আলাদা। আজ বিপ্লবী প্রলেতারিয়তের পার্টি বর্তমান। লিভোর্নো কংগ্রেসের পর থেকে এই পার্টি বিপুল কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে, তার সবচেয়ে অনুগত ও নিবেদিতপ্রাণ জঙ্গি কর্মীদের রক্তে দেশের প্রতিটি শহর ও গ্রামকে সিক্ত করেছে। আজ শ্রমিকশ্রেণীর সামনে যে-সংগ্রাম এসে পড়েছে তার চরিত্র ১৯১৯-২০ সালের সংগ্রাম থেকে স্বতন্ত্র। শ্রমিকশ্রেণীকে আজ ছড়ানো-ছিটনো ও অসংগঠিত মনে হলেও তার যে-শক্তি আজ রয়েছে, তা হয়তো ঐ সময়কালের চেয়ে বেশিই হবে—বিশেষত যদি কেউ তার রাজনৈতিক শিক্ষা, তার ধ্যানধারণার স্পষ্টতা ও তার সমৃদ্ধতর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা লক্ষ করে দেখে।

'এই শিক্ষাকে আরো গভীর করবার জন্য, এই অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত ও পুনঃপ্রাণিত করার জন্য "ল্যর্দিনে নুওভো" তার সংগ্রাম পুনরারম্ভ করছে। পুনঃপ্রকাশের এই মুহূর্তে পত্রিকা সেইসব কমরেডদের সম্মান জানাচ্ছে যাঁরা ইতালির বিভিন্ন জায়গায় প্রাণ দিয়েছেন, এবং বিশেষ করে সম্মান জানাচ্ছে কমরেড ফেররেরো ও বেররুতিকে যারা পত্রিকার প্রথম, সুকঠিন মুহূর্তগুলিতে পত্রিকার সবচেয়ে হৃদয়বান বন্ধু ও সমর্থক ছিলেন, তারপর ১৯২২-এর ডিসেম্বরে তুরিনে নিহত হন।'

৬ এপ্রিল ইতালিতে যে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ভেনেতো অঞ্চল থেকে গ্রামশি ইতালীয় পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৪-এর ১২ মে গ্রামশি ভিয়েনা ছেড়ে ইতালি যাত্রা করেন। পার্লামেণ্ট সদস্যরূপে তার তখন আর গ্রেফতার হবার ভয় নেই। ইতালিতে ফিরে গ্রামশি দেখেন একদিকে ফ্যাশিবাদের উন্মত্ত তাণ্ডব; অন্যদিকে পার্টির মধ্যে বোর্দিগার যুক্তফ্রণ্ট-বিরোধী অবস্থানের সঙ্গে কমিনটার্ন-এর চাপিয়ে দেওয়া নতুন নেতৃত্বের সরাসরি বিরোধ, যাতে পার্টির তৃণমূল স্তরের সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি সদস্যেরা বোর্দিগার অনুগামী। গ্রামশি জুলিয়াকে একটি চিঠিতে লেখেন: 'ইতালিতে ফিরে এসে যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে তা বড়ই বেদনাদায়ক।... এসেই শুনি, আমি তুরিনে এসেছি এই গুজব শুনে ফ্যাশিস্তরা কীভাবে সেখানে আমার ভূত খুঁজে বেড়িয়েছে; শেষে আমায় না পেয়ে ওরা যখন আমার দাদাকে পেয়েছে তখন আমার প্রাপ্য মার ও বেয়নেটের খোঁচা ওরা তারই উপর বর্ষণ করেছে, যাতে সে হারিয়েছে তার একটা আঙুল আর শরীরের অর্ধেক রক্ত।'

ইতালিতে প্রত্যাবর্তনের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কোমো শহরের কাছে নতুন কমিউনিস্ট পার্টির যে প্রথম জাতীয় সম্মেলন হয়, তাতে গ্রামশি পার্টির

অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও বিভেদ স্পষ্ট দেখতে পান, বোরদিগার পক্ষে সমর্থন তখনও যে কী পোক্ত, তাও দেখতে পান। কিন্তু ভিয়েনা থেকে ক্রমাগত চিঠিতে তর্কালোচনা চালিয়ে যাওয়ার ফলস্বরূপ অন্তত তোইলিয়াত্তি ও তেরুরাচিনি ততদিনে পুরোপুরি গ্রামশির দিকে চলে এসেছেন। কোমো সম্মেলনের পর রোম-এ চলে এসে গ্রামশি নবনির্বাচিত পার্লামেন্টে উনিশজন কমিউনিস্ট ডেপুটি বা পার্লামেন্ট সদস্যের গোষ্ঠীটির নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। পাশাপাশি তারই উদ্যোগে রোমে গড়ে ওঠে ছোট ছোট 'ল্যদি'নে নুওভো' সংঘ—বছর আঠারো-উনিশ-কুড়ির জনা কুড়ির এই এক একটি গোষ্ঠী কিছুদিন অন্তর অন্তরই গ্রামশিকে নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে বৈঠক করেন। এই তরুণদের মধ্যে একজন আলোচনার সূত্রপাত করেন। এইরকম একটি সংঘের একজন সদস্য পরে স্মরণ করেন : 'পিয়াৎসা ভেনেৎসিয়াব একটি পুরনো গুদোমঘরে আমরা জমায়েত হতাম। সেখানে একটি টেবিল আর তিন-চারটি মাত্র চেয়ার ছিল। সেরা চেয়ারটিই আমরা গ্রামশিকে দিতাম, তারপরের ভালো চেয়ারটি পেত যে সেদিন আলোচনার সূত্রপাত করবে, সে। বাকি সকলে আমরা সচরাচর দাঁড়িয়েই থাকতাম। আমরা সব সময়ই চাইতাম গ্রামশি বক্তৃতা করুন, আর তিনি চাইতেন আমাদের কথা শুনতে।'

ফ্যাশিস্ত স্বৈরাচারের নগ্ন প্রকাশ ঘটে জুন মাসেই। নবনির্বাচিত পার্লামেন্টের সংস্কারপন্থী সোশালিস্ট পার্টি সদস্য জিয়াকোমো মাত্তেওত্তি পার্লামেন্টের অধিবেশনে মুসোলিনি ও ফ্যাশিস্ত বর্বরতার কঠোর সমালোচনা করার কদিনের মধ্যেই মুসোলিনির জনসংযোগ-সচিব সেজারে রোস্সি-র বেতনভোগী গুণ্ডা আমেরিগো দুমিনি-র নেতৃত্বে একদল স্কোয়াদারিস্তি মাত্তেওত্তিকে পিটিয়ে ছোরা মেরে হত্যা করে, তাঁর মৃতদেহ রোম থেকে পনেরো মাইল দূরে এক জঙ্গলে পুঁতে ফেলে; দুমাস পর সেই মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। মাত্তেওত্তিকে 'অদৃশ্য' করে দিয়ে ফ্যাশিস্তরা ত্রাস সৃষ্টি করার যে-চেষ্টা করে, সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেই চেষ্টা ব্যর্থ করার প্রথম উদ্যোগ নেন গ্রামশি। মিলান থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'ল্যুনিতা' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক জিউসেপ্পে আমোরেত্তির সাক্ষ্যে জানা যায়, তাঁদের পত্রিকার দফতরে উপস্থিত হয়ে পুলিশেরই একটি লোক মাত্তেওত্তির উধাও হয়ে যাবার খবর দিয়ে তাঁদের সতর্ক করে দেন, ঐ তথ্যটুকুর বাইরে বেশি কিছু লিখলে তাঁরা বিপদে পড়বেন। 'তার কূটনৈতিক ভাষার আড়াল থেকে যা বেরিয়ে আসে তা স্পষ্টতই শাসানি ছাড়া আর-কিছুই নয়।' আমরা যে কী করব তা তখন বুঝতে পারছি না। দমনের সমগ্র যন্ত্রতন্ত্র যেন তখন আমাদের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে। এমনিতেই আমাদের দরজার বাইরেই সবসময়ই এক দঙ্গল ফ্যাশিস্ত গুণ্ডা দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা আমাদের খবরের কাগজের উপর হামলা করতে পারে, আমরা আবার মার খেতে পারি। ...ঠিক এই মুহূর্তেই রোম থেকে কমরেড গ্রামশির ফোন এল। তিনি

বললেন, আক্রমণ হানতে হবে, আর আমাদেরই নেতৃত্ব নিতে হবে সেই আক্রমণের। আমাদেরই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, এক জাগর জনরাশিকে তাদের নিজেদের স্বার্থে সক্রিয় হতে উদ্দীপিত করতে হবে।' গ্রামশির ঐ নির্দেশেই সাহস পেয়ে 'ল্যুনিতা' পরের দিন প্রথম পৃষ্ঠার সারা প্রস্থ জুড়ে শিরোলেখ দিল: 'এই ঘাতক সরকারের পতন হোক'। 'ল্যুনিতা'র এই সাহসিক ভূমিকাই জমাট-বাধা ভয়ের পরিবেশে প্রথম চিড় ধরাল, ফ্যাশি-বিরোধী জনমত বাঙ্ময় হয়ে উঠল; বিভিন্ন দলমতে বিভক্ত সংসদীয় বিরোধী পক্ষ মাত্তেওত্তির হত্যার প্রতিবাদে পার্লামেণ্ট বয়কটের সিদ্ধান্তে একমত হলেন (প্রাচীন রোমে অনভিজাত জনপ্রতিনিধিরা একদা অভিজাতদের স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদে শহর ছেড়ে যে আভেনতিন পাহাড়ে সমবেত হয়েছিলেন, তারই স্মৃতিতে এঁরাও এই পার্লামেণ্ট বয়কটের নাম দেন 'আভেনতিন')। মাত্তেওত্তি হত্যার দু সপ্তাহ পর গ্রামশি জুলিযাকে লেখেন: 'অবিস্মরণীয় কটা দিন কাটিয়েছি, এখনও কাটাচ্ছি। আমরা হাঁটছিলাম আশু অগ্ন্যুৎ-পাতের পূর্বমুহূর্তে এক আগ্নেয়গিরির ধার ঘেঁসে। তারপর হঠাৎ কেউ যখন অমন কিছু ভাবছেও না, বিশেষত ফ্যাশিস্তরা তো নয়ই, ঠিক তখনই সেই আগ্নেয় পাহাড় অগ্ন্যুৎপাতে ফেটে পড়ল, তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জ্বলন্ত লাভার এক বিশাল স্রোত। সেই স্রোত আজ ফ্যাশিস্ত-দের ভাসিয়ে নিয়ে সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।' গ্রামশির মনে হয়, ফ্যাশিবাদই বিপদাপন্ন, স্বতঃস্ফূর্ত এক ফ্যাশিবিরোধী আবেগ 'কুল ছাপিযে' ফ্যাশিবাদকে এমন ধাক্কা দিয়েছে যে 'সমগ্র রাষ্ট্রীয় যন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে' এবং জনসাধারণের 'অবিশ্বাস্য খণ্ডিতদশা ও বিভ্রান্তির' সুযোগ নিয়ে ফ্যাশিবাদ 'কোনোমতে তার শক্তিকে সংহত কবতে চেষ্টা করছে।' পাশাপাশি 'আমাদের আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে; পত্রিকার ['ল্যুনিতা'] বিক্রি তিনগুণ বেড়ে গেছে, অনেক জায়গাতেই আমাদের কমরেডরা গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। আমার বিশ্বাস, এই অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের পার্টি যথার্থই গণপার্টি হয়ে উঠেছে।'

এই বিশ্বাস, এই উৎসাহ অবশ্য বেশিদিন টেঁকেনি গ্রামশির। জুলাই-অগস্টে তিনি জুলিয়াকে লেখেন: 'প্রিয় জুলকা, তোমার আদরের স্মৃতি আমার শরীরে জ্বর এনে দেয়, এখানে আমার বেদনাকর নৈঃসঙ্গ্যের বোধ আমাকে তখন আরো তীব্রভাবে নাড়া দেয়। আমি আর তখন রোমের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি না। আমার কী যে ভালো লাগত যদি আমরা দুজনে একসঙ্গে বেড়াতে বেরোতে পারতাম, সব-কিছু একসঙ্গে দেখতে পারতাম, মনে করতে পারতাম।··· আমি ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্ধ করে রাখি। আমি আবার সেই গুহাবন্দী ভালুক হয়ে গেছি।··· চিন্তা করলেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কাজ করতে গেলেই কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ভিজে ন্যাকড়ার মতো চুপসে যাই। আমার কত-কী করার কথা, কিন্তু কিছুতেই করতে পারছি না। আমি তোমার কথা ভাবি, তোমাকে

ভালোবাসা কী মধুর, তুমি যতই দূরে থাক তবু তুমি আমার অত্যন্ত কাছে রয়েছ, সে কথা জানাও কী মধুর। প্রিয়তমা জুলিয়া, এত দূর থেকেও তোমার কথা ভাবলেই আমি শক্তিমান হয়ে উঠি। কিন্তু এভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে আমার জীবন কোনোদিনই স্বাভাবিক হবে না। তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা এমনভাবেই আমার ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে গেছে যে তোমার উপস্থিতি ছাড়া আমি আর কোনোদিনই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বোধ করতে পারব না। পার্টিকে পুনঃসংগঠিত করতে হবে। পার্টি দুর্বল, তার কাজকর্মের ধারাও সুবিধের নয়। আমি কেন্দ্রীয় কমিটিতে আছি, সাধারণ সম্পাদক, পার্টি পত্রিকার সম্পাদকও আমারই হওয়া উচিত কিন্তু এই সব-কিছু ভালোভাবে করবার মতো বল আমার নেই। আমি এখনও বেশি কাজ করতে পারি না। আমার দায়িত্ব, সব-কিছু লক্ষ করা, যা-কিছু ঘটে তার খোঁজখবর রাখা।... নির্ভরযোগ্য পার্টিকর্মী আমাদের বেশি নেই, বিশেষত রোমে। যে-সব সভায় যাই, সেখানে অনেক কমরেডের আন্তরিকতা ও উৎসাহ দেখে এক ধরনের তৃপ্তি পাই; আবার সাধারণভাবে প্রস্তুতির অভাব দেখে আমার হতাশা আসে। পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে এর চেয়ে আর অনুকূল হতে পারত না। ফ্যাশিবাদ ধ্বসে পড়েছে, ফ্যাশিবাদ খেপে গেছে, তার বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। সব-কিছুই ওর বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। তবুও এই পরিস্থিতির সুযোগ নেবার ব্যাপারে আমরা এত পিছিয়ে পড়ে আছি, কারণ আমরা সংখ্যায় এত কম, আমাদের সংগঠন এত দুর্বল।'

যেখানে কোনো পক্ষেই যুক্তফ্রন্ট-এর তত্ত্বে সম্পূর্ণ আস্থা নেই, সেখানে আভেনতিনো ফ্রন্ট কোনো যথার্থ ফ্যাশিবিরোধী সমবায় হয়ে ওঠে না। বিরোধী দলসমূহের যৌথ কর্মনির্বাহী সমিতির সভায় গ্রামশি প্রস্তাব করেন পার্লামেন্ট বয়কটের বিলাসী ভঙ্গিতে সীমিত না রেখে ফ্যাশিবিরোধী আন্দোলনকে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে তুলে দেওয়া হোক, এক ব্যাপক দেশজোড়া সাধারণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে সেই নতুন স্তরে উত্তীর্ণ করা হোক। ষোলজনের কর্মনির্বাহী কমিটি সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ২২ জুন গ্রামশি মন্তব্য করেন: 'বড় বড় কথাই শুধু, কোনো-কিছু করবার মতলবই নেই: আমরা যদি নেতৃত্বে পৌঁছে যাই সেই অবিশ্বাস্য ভয়ে আতঙ্কিত, তাই আমরা যাতে সভা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হই সেই প্যাঁচ কষে।' তবে বিরোধী পক্ষের অন্তর্গত পার্টিগুলির মধ্যে যে-অবিশ্বাস ও সন্দেহ ও পারস্পরিক বিষোদ্গার, এমনকী প্রায়ই ব্যক্তিগত কুৎসার ছড়াছড়ি, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও তা-ই চলছিল পার্টি নেতৃত্ব ও বোর্দিগা-অনুগামী উপদলের মধ্যে। তবুও ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত ও সমবেত প্রতিবাদের উন্মেষে কিছুটা অপ্রস্তুত ফ্যাশিস্ত সরকার সাময়িকভাবে স্কোয়াদারিস্ত্রির গুণ্ডামিকে খানিকটা সংযত করে, পুলিশি দমননীতিও শিথিল হয়। তাতে রোমে গ্রামশি-র পক্ষে চলাফেরা কিছুটা

সহজ হয়, সেই সুযোগে পার্টি কর্মী ও নেতৃত্বের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সভা-বৈঠক আলোচনার এক অন্তহীন কর্মসূচি গ্রামশির জীবনযাত্রা অধিকার করে নেয়।

এরই মধ্যে ১০ অগস্ট গ্রামশির প্রথম সন্তান দেলিও-র জন্ম হয়। চিঠিতে খবর পেতে ৩ সেপটেম্বর হয়ে যায়। খবর পাবার আগে ও ঠিক পর পর জুলিয়াকে ও মা-কে লেখা একাধিক চিঠিতে হর্ষ-বিষাদের অদ্ভুত টানাপোড়েন। ১৮ অগস্ট জুলিয়াকে লেখেন: 'এই যে আমি লিখছি, এতদিনে হয়তো শিশুর জন্ম হয়ে গেছে, সে শুয়ে আছে তোমারই পাশে। তাকে পৃথিবীতে আনতে তুমি যে কষ্ট পেয়েছ তারপর তুমি এখন তাকে আদর করতে পার। তাতে আমার সুখই যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। কত কী যে আছে যা আমি জানতে চাই অথচ জানতে পারব না। কিন্তু তোমার সঙ্গে তোমার কষ্টই যদি না পেলাম, তবে সোনার কী মূল্য?··· আমার সুখ মুখ ভার করে বসে আছে, তার মন খুব খারাপ।' পুত্রজন্মের খবর পেয়েই ৩ সেপটেম্বর গ্রামশি জুলিয়াকে লেখেন: 'আসলে কী নাম হবে ওর, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি শুধু জানি, ও একটা জীবন্ত শিশু, আমাদের সন্তান, আর আমরা যতই ওর মধ্যে আমাদের নিজেদের দেখব, ভালো এবং আরো সুখী রূপে দেখব, ততই আমরা প্রতিদিন পরস্পরকে আরো ভালোবাসব।··· একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব কীভাবে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয় তার বিভিন্ন পর্ব দেখবার যে আনন্দ, সেই আনন্দ তোমার সঙ্গে ভাগ করে নেবার সাধে আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস শিশু যেদিন তার পা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, সেই দিনটার গুরুত্ব অপারসীম। সেই ঘটনাটা যেদিন ঘটবে, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিতে ভুলো না। কারণ সেই ঘটনাটা জাতীয় ভৌগোলিক ক্ষেত্রের দূরতম সীমারেখার উপর সরকারিভাবে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্যোতক।'

ফ্যাশিবিরোধী অভিযানের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিতে ফ্যাশিস্ত শাসক-শ্রেণীর বেশি সময় লাগেনি। আভেন্তিনো ফ্রন্ট-এর ভিতরেই বিভেদের ছবি তাদের কাছে অচিরেই ধরা পড়ে যায়। ৩১ অগস্ট মনতে আমিয়াতায় খনি-শ্রমিকদের এক সমাবেশে মুসোলিনি বলেন, '[আভেন্তিন সাংসদেরা] যেদিন তাদের তারস্বরে প্যানপ্যানানি বন্ধ করে কিছু কাজের কাজ করবার চেষ্টা করবে সেইদিনই ওদের আমরা পিটিয়ে বিচালি বানিয়ে দেব, তারপর আমাদের ব্ল্যাকশার্টদের [সংগঠিত জঙ্গি ফ্যাশিস্ত বাহিনীর গুণ্ডাদের] শিবিরে সে বিচালি পাঠিয়ে দেব ওদের শয্যার গদি বানাতে।' সেপটেম্বর থেকেই ফ্যাশিস্ত গুণ্ডামি ও দমননীতি আবার আগের মতোই বর্বর হয়ে ওঠে, মারণলীলাও আবার শুরু হয়ে যায়। গ্রামশির পিছনেও ফেউ লাগে। ফ্যাশিস্ত গুপ্তচরদের কাটাতে গ্রামশিকে কোনো গোপন সভায় যেতে 'ট্রামে না চড়ে বেশি পয়সা খরচ করে ট্যাক্সি চড়তে হয়।' দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পার্টির আঞ্চলিক কংগ্রেসগুলিতে গ্রামশি যেতে থাকেন। ১৯২৪-এর ২৬-২৭ অকটোবর ঝোপঝাড়ের আড়ালে এক মাঠের মধ্যে পার্টির সার্দিনিয়া

শাখার আঞ্চলিক কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ফেরার পথে সুদীর্ঘ ব্যবধানের পর গ্রামশি গিলাৎ'সায় তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান। বাবা-মা ছাড়াও দলমত নির্বিশেষে গিলাৎ'সার বহু মানুষই গ্রামশি-কে বহু প্রশ্নে, বহু তর্কে, বহু সংশয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। গ্রামশি পরম ধৈর্যেই মফঃস্বল শহরের সাধারণ মানুষের কাছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পট যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার মধ্যেই মায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা বলার সময় ছিনিয়ে নেন তিনি ; জেন্নারো-র ছোট্ট মেয়ে এদমেয়াকে হাঁটুর উপর বসিয়ে দোলা দিতে দিতে তার সঙ্গে খেলবার অবকাশও পেয়ে যান তিনি ; কাঁকড়া দেখে ভীত চার বছরের ভাইঝিকে আশ্বস্ত করতে তিনি ফেঁদে বসেন স্বকপোলকল্পিত এক এলাহি রূপকথা, যাতে এদমেয়া-ও একটা সময় যোগ করতে থাকা নতুন নতুন ঘটনা ; গ্রামশি 'যেন নতুন করে আবার নিজের ছেলেবেলায়' খানিকটা সময় কাটিয়ে আসেন।

মায়ের সঙ্গে গ্রামশির এই শেষ দেখা, গিলাৎ'সায় পরিবারের সঙ্গে এই শেষ ছুটি যাপন—২৭ অকটোবর থেকে ৬ নভেম্বরের মধ্যে কাটিয়ে ফিরে আসবার কিছুদিনের মধ্যেই কমিউনিস্টরা আভেনতিনোদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে পার্লামেন্টে ফিরে এলেন, তাঁদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে আরো সবল-ভাবে শোনাবার জন্যই। আভেনতিনোর অন্তর্গত অন্য দলগুলি তখনও নিজেদের বোঝাচ্ছেন, দেশবাসীদের বোঝাচ্ছেন, ফ্যাশিস্তবাহিনীর গুণ্ডামি নিতান্তই গুণ্ডামি, ফ্যাশিস্ত নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণের শৈথিল্যের পরিণাম মাত্র ; শেষ পর্যন্ত ফ্যাশিবাদ, এবং একদা সোশালিস্ট নেতা মুসোলিনি গণতন্ত্র ও আইনের বিধান মেনে নেবেন। তাঁদের সেই আত্মপ্রবঞ্চনা চুরমার করে দিয়ে ১৯২৫-এর ৩ জানুয়ারি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে মুসোলিনি সদর্পে ঘোষণা করলেন, 'এই মুহূর্তে এইখানে দাঁড়িয়ে, এই বিধানমণ্ডলী ও সমগ্র ইতালীয় জনগণের কাছে আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে যা-কিছু ঘটেছে, তার প্রত্যেকটি ঘটনার জন্য আমি এবং একা আমিই যাবতীয় রাজনৈতিক, নৈতিক ও ঐতি-হাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করছি। ফ্যাশিবাদ যদি এক অপরাধী ষড়যন্ত্র হয়, তবে আমিই প্রধান ষড়যন্ত্রকারী।' পরের তিন দিনের মধ্যেই ৯৫টি সংঘ-সংস্থা বন্ধ করে দেওয়া হল, ২৫টি 'অন্তর্ঘাতী' সংগঠন ও 'স্বাধীন ইতালি' আন্দোলনের ১২০টি শাখা আইনমতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল, ৬৫৫টি বাড়িতে ভাঙচুর-লুঠতরাজ হল, ১১১ জন 'অন্তর্ঘাতক'কে গ্রেফতার করা হল। বিরোধী সংবাদপত্রগুলি রোজই বাজেয়াপ্ত করা হতে লাগল। ১২ জানুয়ারি গ্রামশি জুলিয়াকে লিখলেন : 'আমার বিশ্বাস, আমরা ইতালিতে এমন এক ঐতিহাসিক পর্বের মধ্য দিয়ে চলেছি যা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এতাবৎ উপস্থিত হয় নি। ...কারণ ফ্যাশিবাদ এখানে তার লক্ষ্যসাধন করেছে ; যত সংগঠনের মধ্য দিয়ে যত পথে জনসাধারণ তার সাধ প্রকাশ করতে পারে, তার সব কটিকেই তারা বিনাশ করেছে।'

তবুও অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেন গ্রামশি—ইতালির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অসংখ্য সভায় তিনি পার্টিকর্মীদের কাছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বেড়ান, প্রবন্ধ লেখেন, এমনকী অনেক রাতে যখন বাড়ি ফেরেন তখনও তরুণ পার্টিকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে রাস্তায় হাঁটেন। ভেলিও স্পানো পরে স্মরণ করেন: 'আমরা দু-তিনজন সবসময়ই রাতে ওঁর সঙ্গী হতাম, শহরের কেন্দ্র থেকে ভিয়া নোমেন্তানা পর্যন্ত। এই অসাধারণ সংস্কৃতিবান মানুষটির কথায় কখনও নিবস্তুক কেতাবি কিছু থাকত না। চলতে চলতে আস্তে আস্তে কথা বলতেন তিনি, একটা যুক্তিবিন্যাস গড়ে তুলতেন তিল তিল করে, একটা কোনো অন্তর্দৃষ্টির উদ্ভাস আসত এক এক বার, কিন্তু আরো বেশি করে যা আসত তা হল ওঁরই কোনো প্রশ্নের উত্তরে কোনো কমরেডের একটা উত্তর।' অ্যানিমিয়া, নিউর‍্যালজিয়া, অনিদ্রা তাঁকে কুরে খাচ্ছে তখন।

জুলিয়ার যে বোন তাতিয়ানা রাশিয়ায় ফিরে না গিয়ে রোমে থেকে গেছলেন, তাঁর সঙ্গে শুখুখট্ পরিবারের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে ছিল বহুদিন। ভিয়েনা থেকে রোমে ফিরে এসে অবধি গ্রামশি তাঁকে খুঁজছিলেন। ১৯২৫-এর জানুয়ারির শেষ দিকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের দেখা হয়। ভিয়া সাভোইয়ার ক্যানডন ইনস্টিটিউটে বিজ্ঞান শিক্ষিকা তাতিয়ানার বয়স তখনও চল্লিশ হয়নি, কিন্তু অদ্ভুত এক ভয়ে অনিশ্চয়তায়-নিরাপত্তাহীনতায় অসম্ভব বুড়িয়ে গেছেন, প্রায় কিছু খান না। প্রথম আলাপেই একদিন বেলা চারটে থেকে প্রায় মধ্যরাত্র পর্যন্ত গ্রামশি তাতিয়ানার সঙ্গে কথা বলে তাঁর অনেক সংশয় ও সংকোচ ভেঙে দিয়ে একটা বন্ধুত্বের ভিত তৈরি করে ফেলেন। গ্রামশি জুলিয়াকে সেই খবর দিয়ে এক চিঠিতে লিখে জানান: 'ওর সঙ্গে আলাপ করে আমি খুব সুখ পেয়েছি, কারণ ও খুবই তোমার মতন, আর রাজনীতিগতভাবে আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি কাছাকাছি আমাদের।'

১৯২৫-এর ২১ মার্চ মস্কোয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মনির্বাহী সমিতির বৈঠকের দিন স্থির হয়েছে। মস্কোয় যাবার প্রস্তুতির মধ্যেই ৭ ফেব্রুয়ারি গ্রামশি জুলিয়াকে লেখেন: 'মার্চের শেষে এপ্রিলের শুরুতে কি আবার আমরা কদিন একসঙ্গে বেড়াতে বেরোবার সময় পাব?...তুমি জানো, তোমার বোন তাতিয়ানা যেন তোমারই পূর্বাভাস; ওর মুখের আদল, চলাফেরায় ও অনেকটা তোমারই মতো, ওর কণ্ঠস্বরের সংগীত যেন তোমারই প্রতিধ্বনি।' ফেব্রুয়ারির শেষ দিকেই গ্রামশি মস্কোয় এসে পৌঁছলেন, পুত্র দেলিওকে প্রথম দেখলেন। হুপিং কাশিতে পীড়িত দেলিও-কে প্র্যামে নিয়ে গ্রামশি প্রায়ই ৎভের্স্কাইয়া ইয়ামস্কাইয়ার বাগানে বেড়াতে বেরোন। কমিনটার্ন-এর কর্মনির্বাহী সমিতির বৈঠকে ইতালীয় পার্টির বক্তব্য উপস্থাপন করেন স্কোক্কিমারো।

এপ্রিলেই ইতালিতে ফিরে এসে গ্রামশি আহ্বান জানান এক পার্টি

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। তিনি বলেন, 'তাত্ত্বিক চেতনার অস্ত্র ছাড়া কোনো পার্টি'র অস্তিত্ব থাকতে পারে না'—'আর পার্টি' ছাড়া আমাদের জয় হবে না।' ইতিমধ্যে ফ্যাশিস্ত সরকার ফ্রীমেসনদের দমন করার জন্য এক নতুন আইন পার্লামেণ্টে প্রস্তাব করলে ১৬ মে গ্রামশি তার বিরোধিতা করে পার্লামেণ্টে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন। প্রধানমন্ত্রী মুসোলিনি নিজে ও ফ্যাশিস্ত পার্টি'র সম্পাদক ফারিনাচ্চি ক্রমাগত তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে প্রশ্ন করেন মন্তব্য করেন, গ্রামশি সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দিয়ে চলেন। ফ্রীমেসনদের উপলক্ষ করে তৈরি এই আইনের লক্ষ্য ছিল কার্যত সমস্ত গণসংগঠন। পার্লামেণ্টে তাঁর সেই প্রথম ও শেষ ঐতিহাসিক ভাষণে গ্রামশি বলেন : 'আপনাদের আসল উদ্দেশ্য এই আইনের বলে ব্যাপক স্তরে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলির বিকাশ অবরুদ্ধ করা। এইটেই এই আইনের আসল লক্ষ্য আসল তাৎপর্য। ফ্যাশিস্ত আন্দোলনের মধ্যে একজন কারো মনে এখনও রয়ে গেছে তার আদি নেতাদের শিক্ষার একটা অস্পষ্ট স্মৃতি, সেই সময়ের স্মৃতি যখন সে নিজেও ছিল বিপ্লবী, ছিল সোশ্যালিস্ট। সে জানে, কোনো শ্রেণী একটা পার্টি' তৈরি করতে না পারলে, তার অন্তগত শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সচেতন অংশকে নিয়ে এক সংগঠন তৈরি করতে না পারলে সেই শ্রেণী কোনোদিনই ক্ষমতা দখলের বিন্দুতে এসে পৌঁছতে পারবে না। মার্কসের শিক্ষার এই বিভ্রান্ত, প্রতিক্রিয়াশীল বিকৃতির মধ্যে রয়েছে সত্যের এই একটি কণা।' আইন পাশ হয়ে যায়, কমিউনিস্টদের উপর হামলা বাড়তেই থাকে।

সেপটেম্বরে কয়েকদিনের জন্য গ্রামশি তোইলিয়াত্তির বাড়িতে গিয়ে বাস করেন, এখানে বসেই তাঁরা রচনা করেন 'লিয়ন্‌স্‌ থীসীজ'—য ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি'র তৃতীয় কংগ্রেসে আলোচনার মূল ভিত্তি হবে। অকটোবরে স্কোয়াদ্রিস্তি ফ্লরেন্‌স্‌-এ প্রাক্তন সোশ্যালিস্ট সাংসদ গায়েতানো পিলাতি ও আইনজীবী গায়েতানো কনসোলো-কে প্রকাশ্যে হত্যা করে; ২৪ অকটোবর তল্লাশির নামে পুলিশ গ্রামশির ঘরে দৌরাত্ম্য করে। ঐ মাসেই রোমের সোভিয়েত দূতাবাসে চাকরি নিয়ে জুলিয়া ইতালিতে চলে আসেন, সঙ্গে দেলিও ও ইউজীনী। জুলিয়া ও দেলিও-র নিরাপত্তার কথা ভেবেই গ্রামশি তাঁদের অন্যত্র বাসের ব্যবস্থা করেন। দেলিও-র সঙ্গে প্রায়ই খেলাধুলো করতে এলেও গ্রামশি কখনোই জুলিয়ার সঙ্গে রাস্তায় বেরোন না।

১৯২৬-এর জানুয়ারি মাসে ফরাসি সীমান্ত পেরিয়ে গ্রামশি লিয়ন্‌স্‌-এ পৌঁছে যান, পার্টি'র গোপন কংগ্রেসে যোগ দিতে। ২০ জানুয়ারি কংগ্রেসে তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেন : 'এমন কোনো দেশই নেই যেখানে প্রলেতারিয়েত কেবলমাত্র নিজ বলে ক্ষমতা দখল করে তা আয়ত্তে রাখতে পারে। তাকে তাই মিত্রশক্তি সন্ধান করতেই হবে। তাদের এমন একটা নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে পুঁজিবাদ-বিরোধী স্বার্থে উদ্‌বুদ্ধ অন্য যাবতীয় শ্রেণীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে তারা বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদের লক্ষ্যে সংগ্রামে তাদের

পথ দেখাতে পারে। এই প্রশ্নটি ইতালিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে প্রলেতারিয়েত শ্রমজীবী জনসমষ্টির সংখ্যালঘু অংশ মাত্র এবং ভৌগোলিকভাবে এমনই ছড়ানো যে কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের স্পষ্ট একটা সমাধান না করে তারা ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে জয়যুক্ত হবার আশাই করতে পারে না। নিকটতম ভবিষ্যতে এই সমস্যার চরিত্র নির্দেশ ও তার সমাধানেই পার্টিকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।' প্রতিনিধি নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে বোর্‌দিগা কমিনটার্ন-এর কাছে যে নালিশ করেন, কমিনটার্ন তা অগ্রাহ্য করে। কংগ্রেসে গ্রামশি-তোইলিয়াত্তির থীসীজ শতকরা ৯০'৮ ভাগ ভোট পেয়ে গৃহীত হয়।

ইতিমধ্যে মুসোলিনি ১৯২৬ সালটিকেই ফ্যাশিস্ত বিপ্লবের 'নেপোলিয়নীয় বর্ষ'' বলে ঘোষণা করে সর্বতোভাবে ফ্যাশিবিরোধী প্রতিরোধ দমনে নেমে পড়েন। আভেনতিনো-র বয়কট নীতি ত্যাগ করে পার্লামেণ্টের অধিবেশনে যোগ দিতে এসে বিরোধী পক্ষীয় সাংসদেরা ফ্যাশিস্ত সাংসদদের হাতে প্রচণ্ড মার খান; বিভিন্ন পার্টি ও পত্রপত্রিকা এক এক করে বেআইনি ঘোষিত হতে থাকে; বিভিন্ন ব্যক্তির নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়, যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ১৬-২৪ মার্চ মাত্তেওত্তি মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যায়; ফ্যাশিস্ত পার্টির সম্পাদক রোবের্তো ফারিনাচ্চি নিজে আততায়ীদের পক্ষ সমর্থন করতে এসে বিচারকদের দ্বারা সম্বর্ধিত ও আপ্যায়িত হন। আততায়ীদের ছ বছরের চেয়ে একটু কম সময়ের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে তা থেকে আবার চার বছর মকুব করে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে জুলিয়া, দেলিও ও ইউজীনীর রোম বাস আর নিরাপদ বোধ হয় না। তা ছাড়া জুলিয়া তখন আবার অন্তঃস্বত্তা। জুলাই মাসেই জুলিয়া, তাতিয়ানা, ইউজীনী ও দেলিও রোম ছেড়ে চলে যান। ৩০ অগস্ট আনতোনিও ও জুলিয়ার দ্বিতীয় সন্তান জিউলিয়ানোর জন্ম হয়।

১৯২৬-এর শরৎকালে 'দক্ষিণী প্রশ্ন' অর্থাৎ সার্দিনিয়াসহ ইতালির দক্ষিণ খণ্ডের সমস্যা নিয়ে গ্রামশি যে প্রবন্ধ লিখতে বসেন, তা তাঁর এতদিনকার যাবতীয় রচনা থেকে ভিন্ন জাতের; তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মনীতির দায় থেকে সরে গিয়ে বৃহত্তর ঐতিহাসিক পটের পরিপ্রেক্ষিতে গভীর তত্ত্বনির্ভর সমাজ-বিশ্লেষণের এই প্রবণতাই গ্রামশির 'জেলখানার নোটবই'-এর অধিকাংশ রচনার চরিত্র হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিচলিত গ্রামশি ইতালীয় পার্টির কর্মনির্বাহী সমিতির পক্ষ থেকে সি পি এস ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে ১৪ অকটোবর একটি দীর্ঘ চিঠি পাঠান। তোইলিয়াত্তি তখন মস্কোয় কমিনটার্ন-এ ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি। তাঁর কাছেই চিঠিটি পাঠিয়ে গ্রামশি লেখেন: 'এতই তাড়াহুড়োর মধ্যে চিঠিটি লেখা হয়েছে যে তুমি নিজে এটি পড়ে এর ধরন বা খুঁটিনাটিতে দরকার-মতো পরিবর্তন করতে পারো। কিন্তু এর মূলবস্তু

অটুট রাখতে হবে। আমরা যেহেতু কেন্দ্রীয় কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে সাহায্যই করতে চাই, তুমি তাঁদের মধ্যে যাঁরা বেশি দায়িত্বশীল এমন কারো কারো সঙ্গে কথা বলেই এই পরিবর্তন করে নিতে পারো। চূড়ান্ত ভাষ্যটির একটি কপি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠাবে। পুরো ব্যাপারটায় আমরা বেশ নৈরাশ্যবাদী; সেইজন্যই এই চিঠিটা লেখা জরুরি মনে করেছি।'

চিঠির শুরুতেই গ্রামশি বলেন যে এতদিন সোভিয়েত পার্টির অভ্যন্তরীণ তর্কবিতর্ক 'গভীর অভিনিবেশসহকারে' অনুধাবন করেও রুশ পার্টির সংহতির প্রশ্নে 'ইতালীয় কমিউনিস্টদের ও আমাদের দেশের সমস্ত সচেতন শ্রমিকের মনে' কোনোদিন কোনো সংশয় দেখা যায়নি। কিন্তু 'আজ, আপনাদের পঞ্চদশ সম্মেলনের এই পূর্বাহ্নে আমাদের আর সেই অতীতের আস্থা নেই। আমরা কিছুতেই এক গভীর যাতনা বোধ থেকে মুক্ত হতে পারছি না।' গ্রামশি দেখতে পাচ্ছেন, বোলশেভিক পার্টি ভাঙনের দিকে এগোচ্ছে, তাতে 'সবচেয়ে শক্তিমান সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলি এবং আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্রনেতারা' এই ভাঙনের সম্ভাবনায় দেখতে পাচ্ছেন 'প্রলেতারিয় একনায়কতন্ত্রের বিলম্বিত ক্ষয় ও বিলোপের সম্ভাবনা।' গ্রামশি লক্ষ করেছেন, ইতালিসহ ইয়োরোপের যে-সব দেশে 'সংগঠনে সংহত হবার অধিকার নেই, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ করা হয়েছে নয়তো অভূতপূর্ব প্রতিবন্ধক দ্বারা সংকুচিত করা হয়েছে, বা ইতালিতে যেমন ত্রত্স্কি, লেনিন, স্তালিন, জিনোভিয়েভের যাবতীয় বই ও খুবই সম্প্রতি ''কমিউনিস্ট ইশতেহার'' বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ও এই-সব বইয়ের পুনঃপ্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে', শুধু সেই-সব দেশেই নয় 'যে-সব দেশে আমাদের পার্টিগুলি তাদের সদস্যদের কাছে ও জনসাধারণের কাছে যথেষ্ট দলিলপত্র পেঁছে দিতে পারে, সেই-সব দেশেও বৃহত্তর জনসাধারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে আলোচনা চলছে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবেন না, বিশেষত সেই আলোচনা যদি এমন হিংস্র হয়, এবং খুঁটিনাটির প্রশ্নে সীমিত না থেকে পার্টির সার্বিক রাজনৈতিক কর্মনীতি জড়িয়েই চলতে থাকে।' চিঠির একটি অংশে গ্রামশি সরাসরি অভিযোগ করেন, 'আজ আপনারা আপনাদের নিজেদের কাজ নিজেরাই ধ্বংস করছেন। লেনিনের অবদানের মধ্য দিয়ে সি পি এস ইউ যে অগ্রণী ভূমিকা লাভ করেছিল আজ আপনারা তা টেনে নিচে নামিয়ে এনেছেন, সেই ভূমিকা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাবারও আশংকা রয়েছে। আমাদের মনে হচ্ছে রুশী ঘটনাবর্ত থেকে যে হিংস্র আবেগ উৎসারিত তাতেই রুশ ঘটনাবলির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সম্পর্কে আপনারা অন্ধ হয়ে পড়েছেন, আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে রুশী জঙ্গি হিসেবে আপনাদের কর্তব্য আপনারা পালন করতে পারেন, এবং পালন করা উচিত কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক প্রলেতারিয়ত শ্রেণীর স্বার্থের কাঠামোর মধ্যে।'

সোভিয়েত পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতি তাঁদের

সমর্থন জানিয়েও ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে গ্রামশি লেখেন : 'কমরেড জিনোভিয়েভ, ত্রত্স্কি ও কামেনেভ বিপ্লবের জন্য আমাদের শিক্ষিত করে তোলার কাজে মূল্যবান অবদান রেখেছেন ; তাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিপুল শক্তিতে কঠোর হস্তে আমাদের শুধরে দিয়েছেন ; তাঁরা আমাদের শিক্ষক-প্রতিম। আমরা বিশেষ করে তাঁদের উদ্দেশ করেই এই কথাগুলি লিখছি, কারণ তাঁরাই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মুখ্যত দায়ী ; আর আমরাও এবিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইব যে সি পি এস ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটি এই সংগ্রামে অন্য পক্ষকে পিষে মেরে জয়লাভ করতে চান না এবং চরম কোনো আঘাত হানতেও আদৌ আগ্রহী নন। রাশিয়ায় আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির সংহতি বিশ্বের বিপ্লবী শক্তিবর্গের বিকাশ ও সাফল্যের স্বার্থেই অতি প্রয়োজন। এই প্রয়োজনবোধেই প্রত্যেক কমিউনিস্ট ও আন্তর্জাতিকতাবাদীকে মহত্তম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। কোনো ঐক্যবদ্ধ পার্টির একটা ভুল থেকে যা ক্ষতি হয় তা সহজেই শুধরে নেওয়া যায় ; কিন্তু একটা ভাঙন বা অন্তর্নিহিত বা চাপা ভাঙনের একটা প্রলম্বিত দশা সহজেই সর্বনাশা ও মারাত্মক হতে পারে।' তোইলিয়াত্তি কোনোক্রমেই সোভিয়েত পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কোনো সমালোচনা করতেই বা সমালোচনাকে প্রশ্রয় দিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চিঠিটি সোভিয়েত পার্টি নেতৃত্বের হাতে তুলে না দিয়ে তার সবিস্তারে সমালোচনা করে গ্রামশিকে চিঠি দেন। গ্রামশি পরম ধৈর্য সহকারে তাঁর সমালোচনার জবাব দিয়ে চিঠিটি সোভিয়েত পার্টিকে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দেন। গ্রামশির জীবৎকালে তোইলিয়াত্তির সঙ্গে তাঁর এই শেষ যোগাযোগ।

ঐ অকটোবর মাসেই ত্রত্স্কি ও কামেনেভ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো থেকে বহিষ্কৃত হন, জিনোভিয়েভ কমিনটার্ন-এর সভাপতি-পদ থেকে অপসারিত হন। গ্রামশির চিঠির জবাব দেবার জন্য কমিনটার্ন-এর সম্পাদকমণ্ডলী আবার ড্রোজ-কে ইতালিতে পাঠান। জেনোয়ার কাছে ভালপোলচেভেরায় ইতালীয় পার্টির কর্মনির্বাহী সমিতির যে গোপন বৈঠকের আয়োজন হয়, তাতে আসবার পথে মিলান-এ গ্রামশি পুলিশের কাছে বাধা পেয়ে রোমে ফিরে যেতে বাধ্য হন। বোরদিগা, গ্রামশি, তাস্কা, কেউই সভায় উপস্থিত না হওয়ায় ড্রোজ-এর বক্তৃতায় কোনো কাজই হয় না।

৫ নভেম্বর ফ্যাশিস্ত মন্ত্রীসভা যে নতুন বিধিনিষেধ প্রস্তাব করেন, তাতে যাবতীয় গণতান্ত্রিক অধিকার দমিত করে সমস্ত ছাড়পত্র বাতিল, সীমান্ত পার হযে দেশত্যাগ করার চেষ্টা করলেই গুলি করে হত্যা, সরকারের বিরুদ্ধতা করছে এমন সমস্ত দলের উপর নিষেধাজ্ঞা, সমস্ত ফ্যাশিবাদ-বিরোধী পত্র-পত্রিকা নিষেধ, বিশেষ আদালত ও মৃত্যুদণ্ডের পুনঃপ্রবর্তন বিধিসম্মত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ৮ নভেম্বর কমিউনিস্ট সাংসদদের এক বৈঠক ডেকে ৯ নভেম্বরের পার্লামেণ্ট অধিবেশনে পার্টির ভূমিকা নির্দেশ করে বাড়ি ফিরেই রাত সাড়ে দশটায় গ্রামশি গ্রেফতার হন।

প্রথমেই তাঁকে চালান করা হয় উস্তিকা দ্বীপের বন্দীশিবিরে। সেখানেই বন্দী হয়ে ছিলেন বোরদিগাও। গ্রামশির পুরনো বন্ধু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পিয়েরো স্রাফা মিলানের একটি বইয়ের দোকানে অর্থ জমা দিয়ে ব্যবস্থা করে দেন যাতে গ্রামশি ইচ্ছেমতো যে-কোনো বই আনিয়ে নিতে পারেন। উস্তিকা থেকে লেখা এক চিঠিতে তিনি তাতিয়ানাকে জানান, তিনি সেই বন্দীশিবিরেই নিজের জন্য একটা ছোটোখাটো গ্রন্থাগার তৈরি করতে শুরু করেছেন। ১৯২৬-এর ৯ ডিসেম্বর লেখা এই চিঠিতে গ্রামশি লেখেন: 'এখানে উস্তিকায় আমার পরিকল্পনা হল (১) স্বাস্থ্য ঠিক রাখা, বস্তুত স্বাস্থ্যের উন্নতি করা; (২) যথোচিত পদ্ধতিমতে জর্মন ও রুশ ভাষা শিক্ষা করা এবং (৩) অর্থনীতি ও ইতিহাস বিষয়ে পড়াশোনা করা।' উস্তিকায় রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য গ্রামশি ও বোরদিগা একটি স্কুল চালু করে দেন। এই স্কুলে গ্রামশি পড়ান ইতিহাস ও ভূগোল, বোরদিগা পড়ান বিজ্ঞানের বহু বিষয়। গ্রামশি নিজেও পেয়ে যান জর্মন ভাষা শেখানোর শিক্ষক। উস্তিকার দৃষ্টান্তেই ইতালির বহু কারাগারে এই ধরনের 'কারা স্কুলের' পত্তন হয়।

২০ জানুয়ারি ১৯২৭ হঠাৎ গ্রামশিকে উস্তিকা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়; ১২ ফেবরুয়ারি 'আমার প্রিয়জনদের' লেখা এক চিঠিতে গ্রামশি ১৯ দিনের এই দীর্ঘ যাত্রা বর্ণনা করেছেন: পথে ন'টি কারাগারে থাকতে হয়েছে তাঁকে, তারপর এসে পৌঁছেছেন মিলানের সান ভিত্তোরে কারাগারে। সারাদিন হাতে পায়ে বেড়ি টানতে টানতে, নিজের মোটের ভারে অবনত হয়ে এই কণ্টকর যাত্রাও তাঁর মনে হয়েছে 'যেন এক অন্তহীন চলচ্চিত্র: আমি যে অসংখ্য চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি তাদের কেউ কদর্য ও ঘৃণ্য, কেউ অত্যন্ত কৌতূহলের পাত্র হয়ে উঠেছে।' একজন যাবজ্জীবন মেয়াদিকে দেখে তো তাঁর দান্তের 'ইনফেরনোর' দশম সর্গের ফারিনাতার কথা মনে হয়েছে।

সান ভিত্তোরে কারাগারে তখন তেরুরাচিনি স্কোকার্কিমারুরো-ও বন্দী হয়ে আছেন। কিন্তু তিন কমিউনিস্ট বন্দীকেই নির্জন একক কারাকক্ষে আটকে রাখা হয়। তাতিয়ানা মে মাসে মিলানে চলে আসেন, তাঁর ভগিনীপতির কাছাকাছি থাকবেন বলে। ৩ অকটোবর মা-কে লেখা এক চিঠিতে গ্রামশি লেখেন: 'আমার শ্যালিকা রোজ কারাগারে আসে, আমাকে কিছু না কিছু লোভনীয় বস্তু পাঠিয়ে দেয়: ফল, চকোলেট, নয়তো টাটকা দুধ বা চীজ। বেচারা! আমি ওকে কিছুতেই বোঝাতেই পারি না যে আমাকে নিয়ে অত না ভেবে ওর এখন উচিত ওর নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভাবা। এমন আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে আমি নিজেই যেন কোথাও ছোট হয়ে যাই। আসল বোনের কাছেও এমন ত্যাগের দৃষ্টান্ত সবসময় পাওয়া যায় না।'

গ্রামশির বিচারের জন্য প্রাথমিক তদন্ত ও সাক্ষ্যসংগ্রহের কাজে এই সময় পুলিশ তাঁর কাছে নানা রকম লোক পাঠাতে থাকে; বন্ধুত্বের বা এমনকী ফ্যাশিবিরোধী চক্রান্তকারীর ভান করে এরা গ্রামশির বিশ্বাস অর্জন করে গোপন তথ্য বার করে নেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

১৯২৮-এর ১১ মে গ্রামশিকে মিলান থেকে রোমে নিয়ে আসা হয়। ২৮ মে থেকে ৪ জুন রোমে 'রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গ্রামশি, তেরুরাচিনি, স্কোক্‌কিমারুরো, রোভেদা, ফেরুরারি সহ বাইশজন কমিউনিস্ট নেতার বিচারে বসেন। ট্রাইবুনালের সভাপতি একজন সৈন্যাধিনায়ক, জুরি বলতে ফ্যাশিস্ত মিলিশিয়ার পাঁচজন কর্নেল। কালো হেলমেট, ছোরা, বেয়নেটসহ রাইফেলে সজ্জিত মিলিশিয়ার দুই সারি পাহারায় ঘেরা অভিযুক্তদের বিচারে বিদেশি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও অভিযুক্তদের আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতির অনুমতি ছিল। ট্রাইবুনালের ৩০ মে-র অধিবেশনে গ্রামশির জেরা হয়। প্রথমেই ট্রাইবুনাল সভাপতি তাঁকে বলেন: 'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, গৃহযুদ্ধের প্ররোচনা জুগিয়েছেন, অপরাধমূলক দুষ্কৃতির সমর্থন করেছেন, শ্রেণীবিদ্বেষ বাড়িয়ে তুলেছেন। আপনার আত্মসমর্থনে কী বলবার আছে?'

গ্রামশি তাঁর জবাবে বলেন,' আমি একজন কমিউনিস্ট, আমার যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ সুবিদিত। সাংসদরূপে ও "ল্যুনিতা" পত্রিকায় আমার লেখায় আমি তার তাৎপর্য পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি। আমি কখনো কোনো রকমের গোপন কার্যকলাপে লিপ্ত হইনি, তেমন কোনো ইচ্ছে থাকলেও তা করা সম্ভব হত না, কারণ অনেক বছর ধরেই ছ জন পুলিশ এজেন্ট ঘরে-বাইরে আমার উপর নজরদারি করেছেন, সর্বত্র আমার পিছু পিছু ঘুরেছেন।... কমিউনিস্ট হওয়া মানে যা-কিছু বর্তায়, তার সমুদায় দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি।' ট্রাইবুনাল-সভাপতির পরের প্রশ্ন: 'আমরা আপনার যে-সব লেখা সংগ্রহ করেছি, তাতে যুদ্ধের কথা রয়েছে প্রচুর, আর রয়েছে প্রলেতারিয়তের ক্ষমতা দখলের কথা। এসব কথা লেখার মানে কী?' গ্রামশি জবাব দেন, 'জেনারেল সাহেব, আমি বিশ্বাস করি, সামরিক ধাঁচের যাবতীয় একনায়কতন্ত্রই একটা সময়—সে আগেই হোক আর পরেই হোক—যুদ্ধের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। সেটা যখন ঘটবে, তখন যে প্রলেতারিয়তই শাসকশ্রেণীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ক্ষমতার রাশ হাতে তুলে নিয়ে জাতিকে আবার নতুন করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করবে, তা আমার কাছে খুবই স্পষ্ট বোধ হয়।' শান্তভাবেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে জেরার একেবারে শেষদিকে একবারই কেবল প্রসিকিউটরের প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে গ্রামশি বিচারকদের দিকে লক্ষ করে প্রবল ক্রোধে উত্তেজিত স্বরে বলেন: 'আপনারা ইতালিকে সর্বনাশের মধ্যে ফেলে দেবেন, তখন আমাদের, কমিউনিস্টদেরই কাজ হবে তাকে বাঁচানো।' ২ জুন প্রসিকিউটর গ্রামশির কেস তুলে আবার বলেন, 'এই মস্তিষ্ক যাতে কুড়ি বছর কাজ করতে না পারে, সেই ব্যবস্থাই আমাদের নিতে হবে।' গ্রামশির শেষ পর্যন্ত কুড়ি বছর চার মাস পাঁচ দিন কারাদণ্ড হয়; রোভেদা ও স্কোক্‌কিমারুরো-রও একই দণ্ড হয়, তেরুরাচিনির মেয়াদ হয় বাইশ বছর ন'মাস পাঁচ দিন।

ভগিনী তেরেসিনা ৮ জুন মুসোলিনিকে একটি চিটি লিখে তাঁর

ভাইয়ের ডাক্তারি পরীক্ষার অনুরোধ জানালে সেই পরীক্ষায় জানা যায় যে তিনি দীর্ঘস্থায়ী ইউরিসিমিয়া রোগে আক্রান্ত। অসুস্থ বন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট তুরি শহরের কারাগারে তাঁকে পাঠানো হয়। রোম থেকে বারো দিনের দীর্ঘ যাত্রা অন্তে ১৯ জুলাই গ্রামশি যখন তুরি কারাগারে পৌঁছন তখন তিনি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, সারা শরীরে চামড়ায় স্ফোটক দেখা দিয়েছে, কারো সাহায্য ছাড়া এক পায়ের বেশি চলতে পারছেন না। তুরি-তে কারা প্রশাসন অমানুষিক হৃদয়হীন। কারাগারের সরকারি ডাক্তার ডক্টর চিস্তেরনিনো একদিন গ্রামশিকে বলেই দেন যে, একজন নিষ্ঠাবান ফ্যাশিস্ত হিসেবে গ্রামশির মৃত্যু হলেই তিনি সবচেয়ে খুশি হবেন।

তুরিতে প্রথমে তাঁকে একই ঘরে চার-পাঁচজনের সঙ্গে রাখা হয়. সেই বন্দী-দের মধ্যে কয়েকজন ব্রংকাইটিস ও ফুসফুসের রোগের রোগী। ১৯২৮-এর ১৩ অগস্ট তিনি তাতিয়ানাকে লেখেন, 'এদের সঙ্গে ক্রমাগত সাহচর্যের··· বিপজ্জনক পরিণতি হতে পারে। আমি ধরে নিচ্ছি. অন্য একটা ব্যবস্থা চাইলে সেটা পাওয়া হয়তো অসম্ভব হবে না, কারণ বিশেষ ট্রাইবুনাল আমাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেও তার সঙ্গে যক্ষ্মারোগও যুক্ত হবে এমন কোনো বিশেষ দণ্ড দেননি।···আমি প্রচণ্ড স্নায়বিক অবসাদে ভুগছি, তার সঙ্গে অনিদ্রা।' পরে গ্রামশিকে যখন স্বতন্ত্র কারাকক্ষ দেওয়া হয়, তার অবস্থান ছিল প্রহরীদের আড্ডার পাশেই, ফলে তাদের অহরহ চেঁচামেচিতে গ্রামশির পক্ষে ঘুমনো শক্ত হয়ে পড়ে। তুরি-তে অচিরেই তাঁর বইয়ের সরবরাহ চালু হয়ে যায়, কিন্তু কারাজীবনের এই প্রথম বছরদুয়েকে দুটো সমস্যা তাঁকে পীড়িত করে চলেছে ; এক, তাঁকে বই ও পত্র-পত্রিকা (অবশ্যই সেনসর-সাপেক্ষ) পড়তে দেওয়া হলেও একেবারেই লিখতে দেওয়া হয় না, বই পড়ে নোট নেওয়ারও অধিকার নেই তাঁর। ১৯২৮-এর ২০ ফেবরুয়ারি মিলান থেকেই তিনি ভগিনী তেরেসিনাকে লিখেছিলেন : 'আমি পড়তে পাই, কিন্তু পড়াশোনা করতে পারি না, কারণ ওরা আমাকে লিখবার উপ-করণ দেবে না।··· মনে হয়, ওরা ধরে নিয়েছে আমি এক সাংঘাতিক ব্যক্তি, আমি হয়তো দেশের চার প্রান্ত জ্বালিয়ে দিতে পারি, বা অমনই আর-কিছু করে ফেলতে পারি।' তাঁর দ্বিতীয় অস্বস্তি, কারাজীবনের সমাজবিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব তাঁকে বাস্তবের প্রত্যক্ষ বোধ থেকে বড় দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, এই যন্ত্রণা তাঁকে বিদ্ধ করছে। ১৯২৯-এর ২৪ ফেবরুয়ারি মা-কে লেখা এক চিঠিতে গ্রামশি লেখেন : 'তোমরা যারা আমাকে কখনো কখনো চিঠি লেখ, ···তোমাদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে বাইরের জগতে কী ঘটছে আমার কাছে তা প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি যখন কোনো পত্র-পত্রিকা পড়ি তখন আমার কল্পনাশক্তিকে প্রাণপণে টেনে বাড়িয়ে নিয়ে জীবনের সাধারণ-তম দৃশ্যপটটা আমায় নতুন করে গড়ে নিতে হয়। আমি যেন সেই প্রত্ন-বিজ্ঞানী যে কোনো প্রাগৈতিহাসিক গুহায় পেয়ে যায় একটা দাঁত কিংবা একটা ছোট্ট পুচ্ছাস্থি, তারপর তা-ই থেকে তৈরি করতে বসে যায় লুপ্ত

কোনো পশু যা হয়তো আয়তনে তিমির চেয়েও বড়। তাই আমি বিশেষ করে পছন্দ করি আমার কোনো পরিচিত গ্রামের সেই-সব খুঁটিনাটি যা থেকে তাদের তাৎপর্য ও পরিণাম আমি অনুমান করতে পারি।' তার আগেই ১৯২৮-এর ১৯ নভেম্বর জুলিয়াকে তিনি লিখেছেন: 'আমি অনেক পড়ছি। কিন্তু আগের মতো মজা পাচ্ছি না। বইয়ে কিংবা পত্র-পত্রিকায় থাকে কেবল সামান্যীকৃত কিছু ধারণা মাত্র, পৃথিবীর ঘটনাধারা তারা সাধ্যমতো ছকে দেয় মাত্র। রাম শ্যাম যদুর জীবন-নির্বাহের প্রত্যক্ষ, তাৎক্ষণিক, প্রাণময় কোনো অনুভব ওরা তোমায় কখনো দেবে না। অথচ সত্যিকারের ব্যক্তি মানুষকে না বুঝতে পারলে তুমি কোনোদিনই সার্বভৌম বা সর্বজনীন কোনো-কিছুও বুঝতে পারবে না।' এই পীড়াবোধ থেকেই হয়তো গ্রামশি কারাগারের বাগান পরিচর্যায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন, তাতিয়ানা তাঁকে বীজ-চারা এনে দেন, গ্রামশি তাঁকে লেখা চিঠিতে গোলাপের মৃত্যু, ডালিয়া আর বাঁশগাছের অঙ্কুরোদ্গমে শিথিলতা ও ছটি চিকরি চারার দ্রুত বৃদ্ধির খবর দেন, আরো নতুন বীজের ফরমায়েশ করেন। কিন্তু কিছুতেই ভরাট হয় না 'আণবিক সংবেদনের' অভাব, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেখা না হওয়ার যন্ত্রণা; স্ত্রীকে তাই চিঠিতে লেখেন: 'তোমার জীবন, তোমার সন্তানদের জীবন এখন কীভাবে কাটছে জানতে না পেলে আমার জীবনেও আমি অবশ অসাড় হয়ে যাই।'

শেষ পর্যন্ত ১৯২৯-এর ফেবরুয়ারি মাসে গ্রামশিকে কাগজ-কলম দেওয়া হল। ৮ ফেবরুয়ারি দুশো পৃষ্ঠার এক নোটবই-এর প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি যে ষোলটি বিষয়ের নম্বরওয়ারি তালিকা লিখে ফেলেন তার মধ্যে অন্যতম 'ইতিহাসতত্ত্ব ও ইতিহাসপদ্ধতি'; '১৮৭০ সাল পর্যন্ত ইতালীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ'; 'ইতালীয় বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীগুলির গঠন, বিকাশ ও দৃষ্টিভঙ্গি'; 'জনপ্রিয় সাহিত্য, বিশেষত ধারাবাহিক উপন্যাস, ও তার অব্যাহত জনপ্রিয়তার কারণ'; 'গীদো কাভালকান্তি এবং "দিভিনা কোমেদিয়া"-র কাঠামো ও শিল্পে তাঁর অবস্থান'; 'লোকচর্যার তত্ত্বভূমি'; 'কারা-জীবনের অভিজ্ঞতা'; 'দক্ষিণী প্রশ্ন ও দ্বীপগুলির সমস্যা'; 'ইতালির জনমণ্ডলী সম্পর্কে ভাবনা; তার গঠন, দেশত্যাগী পরিযানের ভূমিকা'; 'মার্কিনিবাদ ও ফোর্ডবাদ'; 'ইতালিতে ভাষার প্রশ্ন'। ১৯২৯-এর ২৫ মার্চ তাতিয়ানাকে লেখা চিঠিতে এই তালিকা ছোট হয়ে আরো নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী হয়। তিনি লেখেন: 'আমি স্থির করেছি, তিনটি মূল বিষয়ে মনোনিবেশ করে আমি নোট নিতে থাকব: (প্রথম) উনবিংশ শতাব্দীর ইতালীয় ইতিহাস, তার মধ্যেও বিশেষ দৃষ্টি থাকবে বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীগুলির গঠন ও বিবর্তনের ওপর; (দ্বিতীয়) ইতিহাসতত্ত্ব ও ইতিহাসপদ্ধতি; (তৃতীয়) মার্কিনিবাদ ও ফোর্ডবাদ।' মৃত্যুর আগে গ্রামশি মোট বত্রিশটি নোটবই সম্পূর্ণ করেন। তাঁর এই লেখাপত্রই তাঁর 'জেলখানার নোটবই'-এর

বিভিন্ন প্রকাশিত ভাষ্যে বাছাই হয়ে সংকলিত হয়েছে, তাঁর চিন্তার পরিণত-তম পর্বের সাক্ষ্য বহন করে।

তাঁর লেখার ধরন সম্পর্কেও খবর পাওয়া যায়। লিখবার সময় তিনি কোনো আসনে বসতেন না। ঘরের মধ্যে ক্রমাগত পায়চারি করতে করতেই তিনি ভাবতেন, তাঁর চিন্তাসূত্রগুলো সাজিয়ে নিতেন ; তারপর কয়েকটি ছত্র দানা বাঁধলেই তিনি তাঁর টেবিলের কাছে চলে আসতেন, একটা ছোট টুলের ওপর হাঁটু রেখে ঝুঁকে পড়ে তিনি এক একটা অংশ লিখে ফেলতেন। তারপর আবার দ্রুত পায়চারি শুরু হয়ে যায়। তাঁর নির্দিষ্ট পরি-কল্পনামতো বিষয়ানুসারী 'নোট' রচনার পাশাপাশি গ্রামশি জর্মন থেকে অনুবাদ করেন গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের কিছু রূপকথা, একেরমান ও গ্যোয়টে-র কথোপকথন ও গ্যোয়টে-র গদ্য ও কবিতার অংশ বিশেষ, ফ্রানৎস্ নিকো-লাউশ ফিংক্-এর 'পৃথিবীর ভাষাপরিবারসমূহ' বিষয়ক একটি জর্মন বই। বাইরের জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বলতে চলতে থাকে তাতিয়ানার আসা-যাওয়া। সামান্য কিছুক্ষণের জন্য দেখা হয়, মাসে একবার। ২০ মে জুলিয়াকে লেখা এক চিঠিতে প্রকাশ, মাসে দুটি মাত্র চিঠি লেখার অনুমতি আছে গ্রামশির, বড়দিন আর ঈস্টার-এর সময় দু-চারটে বেশি লেখার অনুমতি জোটে। গ্রামশি জুলিয়াকে লেখেন : 'চিঠি লেখায় আমার চিরকালই অনীহা ছিল। কিন্তু এখন, কারাগার থেকে আমি নিশ্চয়ই অন্তত দুশো চিঠি লিখেছি। কী ভয়াবহ কথা!'

গিলাৎ'সায় পরিবারের জীবননির্বাহের চাপ, মস্কোয় জুলিয়ার শিশু-পালন ও জীবননির্বাহের চাপে মানসিক বিপর্যয় ইত্যাদি কারণে প্রায়ই গ্রামশি প্রত্যাশিত-কাঙ্ক্ষিত চিঠি না পেয়ে অধৈর্য হয়ে ওঠেন ; বিশেষত জুলিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষোভতাড়িত হয়ে ওঠে, জুলিয়া গ্রামশিকে চিঠি লেখেন দীর্ঘ সময় অন্তর। চিঠি না পেলেই গ্রামশির একাকীত্ব তথা বিচ্ছিন্ন-তার বেদনা তীব্রতর হয়ে ওঠে, তাই নিয়ে তিনি ক্রমাগত অনুযোগ করে যান। ১৯৩০ সালের জুন মাসে গ্রামশির দাদা জেন্নারো তুরি-তে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে তাঁকে আন্তর্জাতিক ও ইতালীয় ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্দো-লনের পরিস্থিতির যে খবরাখবর গ্রামশিকে পৌঁছে দেন, তাতে গ্রামশি প্রবল বিচলিত হন। সোভিয়েত পার্টিতে তখন স্তালিন একক আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত ; কমিনটার্ন-এর ষষ্ঠ কংগ্রেসে (৭ জুলাই—১ সেপটেম্বর ১৯২৮) ও তার কর্মনির্বাহী সমিতির দশম প্লেনামে (জুলাই ১৯২৯) যুক্তফ্রন্ট-এর আদর্শ ও পুঁজিবাদ-ফ্যাশিবাদ ও প্রলেতারিয়তের একনায়কতন্ত্রের অন্তর্বর্তী কোনো সোশাল-ডেমোক্র্যাটিক বা সমাজতান্ত্রিক আদর্শে আস্থাশীল গণতন্ত্রের লক্ষ্য সম্পূর্ণ খারিজ হয়ে গেছে ; ১৯২৯-এর ৩ এপ্রিল কমিনটার্ন-এর শেষ সভাপতি বুখারিন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনির্বাহী সমিতি ও কমিনটার্ন-এর সভাপতিমণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন ; ইতালীয় কমিউ-নিস্ট পার্টি থেকে ১৯৩০-এর ৯ জুন লেওনেত্তি, ত্রেস্সো ও রাভাৎসোলির

মতো প্রথম সারির নেতারা বহিষ্কৃত হয়েছেন। গ্রামশির জীবনীকার জিউসেপ্পে ফিওরি-কে পরে জেন্নারি গ্রামশি জানিয়েছেন, গ্রামশি আন্তর্জাতিকের নতুন নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ মতানৈক্য জানিয়েছেন। কিন্তু জেন্নারি তোইলিয়াত্তির সঙ্গে যখন দেখা করেছেন, তখন তাঁকে জানিয়েছেন যে আনতোনিও তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। তাঁর ভয় হয়েছিল, আনতোনিও-র মতভেদের কথা জানতে পারলে তোইলিয়াত্তি হয়তো গ্রামশিকেও 'সুবিধাবাদের' অভিযোগে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করতেন। ১৯৩০ সালের শেষ দিকে গ্রামশি কারাগারের অভ্যন্তরেই বন্দী পার্টি কমরেডদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার ক্লাস শুরু করার একটা উদ্যোগ নিয়ে অসফল হন, পার্টির মধ্যে তাঁর সম্পর্কে অবিশ্বাস গড়ে উঠেছে তখন, তিনি কারাগারে লেখাপড়া করার যে বিশেষ সুযোগ পাচ্ছেন তাতেও অনেকের সন্দেহ বেড়ে যায়। গ্রামশি আবার নিজের নিঃসঙ্গ লেখাপড়ায় নিমজ্জিত হয়ে যান।

কিন্তু গ্রামশির শরীর ক্রমেই ভাঙছে—অনিদ্রা, স্মৃতিশক্তির ক্ষয়, ক্লান্তি, তার সঙ্গে ১৯৩১-এর অগস্টে যুক্ত হয় আরেক উপসর্গ, একদিন হঠাৎ কাশির সঙ্গে 'আড়াইশো কি তিনশো গ্রাম রক্ত ওঠে।' ১৯৩২ সাল জুড়ে মায়ের অসুখের খবর, নিজের কারামুক্তির মিথ্যা আশা-আশ্বাসে প্রথমে উৎসাহ, পরে আশাভঙ্গের যন্ত্রণার মধ্যে আরো একটা কষ্ট উঠে আসে, তাতিয়ানাকে তিনি লেখেন: 'একসময় আমি আমার একাকীত্ব নিয়ে গর্ববোধ করতাম, এখন কেবলমাত্র নিজের ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল একটা জীবনের সমস্ত নীচতা, শুষ্কতা ও সংকীর্ণতা আমি দেখতে পাই।' নিজের গবেষণার কাজেও একটা অতৃপ্তি চলে আসে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব পাঠের সময় ·· যে পদ্ধতিগত খুঁতখুঁতানি' তিনি আত্মস্থ করেছিলেন, সমস্ত প্রয়োজনীয় বই বা খোঁজখবর হাতের কাছে না পেয়ে সেইটেই বড় হয়ে উঠে তাঁর কাজের মূল্য সম্পর্কে তাঁকে সন্দিহান করে তুলছে। ঐ ১৯৩২ সালেই জুলিয়ার কোনো চিঠির একটা চোরা ইংগিতে তাঁর মনে হয়, তাতিয়ানা স্বদেশে ফিরে না গিয়ে ইতালিতে রয়ে গেছেন তাঁরই প্রতি আসক্তিতে, আর জুলিয়া তা সন্দেহ করেই গ্রামশির কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তাতিয়ানাকে দেশে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন; আবার ঐ বছরই নভেম্বরে তিনি তাতিয়ানাকে লেখা একাধিক চিঠিতে প্রস্তাব করতে থাকেন, তিনি জুলিয়াকে ছেড়ে দিতে চান, রাজনীতির টানাপোড়েনে ব্যতিব্যস্ত মানুষ তিনি, জুলিয়ার কথা সেভাবে ভাবেনইনি কোনোদিন, তাঁর এই দীর্ঘ কারাপ্রবাসে জুলিয়াকে কেবল আরোই একাকীত্বের কষ্ট দিয়েছেন তিনি। ৩০ ডিসেম্বর গ্রামশির মা পেপ্পিনা গ্রামশির মৃত্যু হয়; সে-খবর গ্রামশিকে জানানো হয় না অনেকদিন—পাছে তিনি হঠাৎ আঘাত পান।

মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্রমেই ভাঙতে ভাঙতে ১৯৩৩-এর ৭ মার্চ সকালে ঘুম থেকে উঠেই মাটিতে পা দিয়েই তিনি পড়ে যান, অন্যেরা ধরে উঠে দাঁড় করালে ভুল বকতে থাকেন; ধরা পড়ে, তিনি আর্টেরিও-স্ক্লেরসিস

বা ধমনীকাঠিন্যে আক্রান্ত। খবর পেয়ে তাতিয়ানা আবেদন-নিবেদন করে বাইরের ডাক্তার ডেকে গ্রামশিকে দেখানোর ব্যবস্থা করেন। উমবের্তো আর্কানজেলি ২০ মার্চ তাঁকে পরীক্ষা করে ধমনীকাঠিন্য, যক্ষ্মা, ডান ফুসফুস থেকে একাধিকবার গুরুতর রক্তক্ষরণ, এবং 'পট্স্‌ ডিজীজ'-এর লক্ষণ পান। 'পট্স্‌ ডিজীজ' আসলে এক ধরনের যক্ষ্মা যাতে শিরদাঁড়া ক্রমশ ক্ষয়ে যেতে থাকে, পিঠের পেশীতে ফোড়া হতে থাকে। আর্কানজেলি তাঁর রিপোর্টে লেখেন: 'বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রামশি বেশিদিন বাঁচবেন না। আমার মতে, তাঁকে শর্তসাপেক্ষ মুক্তি না দেওয়া গেলে তাঁকে কোনো হাসপাতাল বা ক্লিনিকে পাঠানো একান্তই আবশ্যক।'

কেমব্রিজে অধ্যাপনারত অর্থনীতিবিদ-বন্ধু পিয়েরো স্রাফা আর্কানজেলির ডাক্তারি রিপোর্ট সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিলে তা 'ল্যুমানিতে' সহ বহু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়, গ্রামশিসহ ফ্যাশিস্তদের হাতে বন্দী অন্যদের মুক্তির দাবিতে প্যারিসে যে আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত হয় তার পুরোভাগে থাকেন রম্যাঁ রলাঁ ও আঁরি বারবুস। আন্তর্জাতিক জনমতের চাপ ও তাতিয়ানা ও কার্লোর ক্রমাগত ছুটোছুটির ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩-এর ৭ ডিসেম্বর তিনি ফর্মিয়ায় দিবারাত্র পাহারায় ডাক্তার কুসুমানো-র ক্লিনিকে ভর্তি হন। ১৯ ডিসেম্বর সরকারের বিশেষ অনুমতির দাক্ষিণ্যে তিনি সপ্তাহে একদিন ক্লিনিকের বাগানে বেড়াবার সুযোগ পান।

গ্রামশির স্বাস্থ্য ও মনোবল এই ক্লিনিকে কিছুটা উন্নত হয়। কিন্তু প্রাণপণে 'জেলখানার নোটবই'-এর সংশোধন, সম্পূরণ করতে গিয়ে তিনি চিঠিপত্র লেখা প্রায় বন্ধ করে দেন। মায়ের মৃত্যুর প্রায় দেড় বছর পর ১৯৩৪-এর ৮ মার্চ তিনি মাকেই চিঠি লেখেন (তাঁকে তখনও মায়ের মৃত্যুর খবর জানানো হয়নি)। ২২ জুলাই তিনি তাতিয়ানাকে চিঠি লেখেন, স্নায়ুরোগের চিকিৎসার জন্য বিশেষ এক ক্লিনিকে তাঁর স্থানান্তরের চেষ্টা করবার অনুরোধ জানিয়ে। সেই অনুরোধে তাতিয়ানার চেষ্টায় কোনো ফল হয়নি। কিন্তু অকটোবর মাসে তাঁর ঘরের সামনে থেকে পাহারা তুলে নেওয়া হয়। তাঁকে ক্লিনিকের বাইরে বেরিয়ে ঘুরে আসবার অনুমতি দেওয়া হয়। গ্রামশি তখন এমনই ক্ষীণবল যে দুচারদিন মাত্র তিনি তাতিয়ানা, কার্লো বা স্রাফা সমভিব্যাহারে পায়ে হেঁটে নয় ট্যাকসিতে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য একটু ঘুরে আসেন। লেখাপড়ার কাজ অব্যাহত ছিল ১৯৩৫-এর গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত। যদিও হাতের লেখা খারাপ হয় ক্রমাগতই, শরীর ও শক্তির ভাঙনের চিহ্নস্বরূপ। ২ অগস্ট তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় রোম-এর কিসিসানা ক্লিনিক-এ। সেখানে ২৬ অগস্ট ডা. সেজারে ফ্রুগোনি তাঁকে পরীক্ষা করে পট্স্‌ ডিজীজ, ফুসফুসীয় যক্ষ্মা, অত্যুচ্চ রক্তচাপ, অ্যানজাইনা ও গাউট-এর প্রবল লক্ষণ দেখতে পান। গ্রামশির অবস্থা তখন ক্রমশই অবনতির দিকে। নভেম্বর থেকে লেখা একাধিক চিঠিতে তিনি জুলিয়াকে একবার দুই পুত্রসহ ইতালিতে আসবার অনুরোধ জানাতে

থাকেন। কিসিসানায় তিনি অনেকটা স্বাধীনতা পেয়েছেন, কিন্তু পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের কোনো চেষ্টা করেননি। তাঁর কারাদণ্ডের মেয়াদ খানিকটা মকুব হয়ে তখন তাঁর মুক্তির নির্দিষ্ট তারিখ দাঁড়িয়েছে ১৯৩৭-এর ২১ এপ্রিল। দু একটি চিঠিতে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন, মুক্তির পর তিনি সার্দিনিয়ায় গিয়ে একা থাকবেন। ভগিনী তেরেসিনা ও ভ্রাতুষ্পুত্রী এদমেয়া (তার বাবা জেন্নারি তখন স্পেনের গৃহযুদ্ধে লড়াই করছেন বিপন্ন স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রের সপক্ষে) তাঁরই ইচ্ছামতো সানতুলুস্সুরজিউতে তাঁর জন্য একটি ঘরও ভাড়া করে ফেলেন।

১৯৩৭-এর ২৭ এপ্রিল ভোর চারটে দশে ছেচল্লিশ বছর বয়সে আনতোনিও গ্রামশির মৃত্যু হয়। ২৮ এপ্রিল সকালে বেতারে সেই খবর শুনে প্রতিবেশীরা গিলার্ৎসায় গ্রামশি পরিবারকে সেই খবর দেন। তাঁরা তখনও আশা করে বসেছিলেন, গ্রামশি মুক্তি পেয়েই বাড়ি ফিরে আসছেন। এদমেয়ার তখন সতেরো বছর বয়স, পরবর্তী জীবনে তাঁর মনে ছিল, খবর পেয়ে আনতোনিও-র উনআশি বছর বয়সী পিতা ফ্রানচেস্কো চিৎকার করছেন : 'খুনি, খুনির দল, ওরা আমার ছেলেটাকে খুন করেছে, খুন করেছে।' ঐদিনই সন্ধেবেলা রোমে আনতোনিও গ্রামশির কফিনের পিছনে একটি গাড়িতে দুজন মাত্র শবযাত্রী তাতিয়ানা ও কার্লো শবানুগমন করেন, বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বর্ষণের মধ্যে। ফ্রানচেস্কো গ্রামশি মারা যান পনেরো দিন পর, ১৯৩৭-এর ১৬ মে।

দীর্ঘ কারাবাসের পর্বে তিল তিল করে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগোতে এগোতে গ্রামশির উপর বারবার চাপ এসেছে ফ্যাশিস্ত সরকার ও মুসোলিনির কাছে করুণা ভিক্ষা করতে। আত্মীয়স্বজন কিংবা আমৃত্যু গভীর প্রেমের আনুগত্যে অটল তাতিয়ানা শুখুখৎ নিজেরাও কখনও কখনও দয়া ভিক্ষার উদ্যোগ নিতে গেছেন। গ্রামশি অনড় কঠোরতায় আইনে স্বীকৃত তাঁর অধিকারের বাড়তি কণামাত্র সুযোগ বা সুবিধা প্রার্থনায় শেষ দিন পর্যন্ত অরাজি থেকেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাতিয়ানাকে লেখা এক চিঠিতে বলেছেন : 'তুমি আমাকে ভেবে নিচ্ছ এমন একটা মানুষ যে জেদ করে তার কষ্ট পাবার অধিকার, তার শহিদ হবার অধিকার দাবি করছে ; যে তার শাস্তির একটা মুহূর্ত বা একটা সূক্ষ্ম পরত থেকেও নিজেকে বঞ্চিত করবে না। তুমি আমায় ভাবো যেন আরেক গান্ধী যিনি ভারতীয় জনগণের যাবতীয় ক্লেশভার নিজে গ্রহণ করে সর্বকাল সর্বমানবের কাছে তার সাক্ষী হয়ে থাকতে চান।' সে-রকম কোনো সাধ গ্রামশির ছিল না। ছিল ব্যক্তিগত সততা ও বৌদ্ধিক নিষ্ঠায় অবিচল থাকবার অঙ্গীকার।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থপঞ্জি

'গ্রামশি পরিচয়' রচনায় মূলত যে বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে বা যা থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া গেছে, তার এই তালিকা এখানে সন্নিবেশিত হল এই ভাবনা থেকে যে উৎসাহিত পাঠকেরা এগুলিও পড়তে প্রণোদিত হবেন।

একশ একচল্লিশ

বুদ্ধিজীবী শ্রেণী

[**সম্পাদকীয় ভূমিকা**। বাংলায় 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটা নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। প্রয়াত সুশোভন সরকার যখন পরিবর্তে 'বুদ্ধিবাদী' শব্দটি প্রস্তাব করেন কিংবা অতি সম্প্রতি অম্লান দত্ত যখন 'চিন্তক' ব্যবহার করেন, তাঁরা বুদ্ধিজীবীর যে-সংজ্ঞা নির্দেশ করেন, তা হল প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের আওতা থেকে মুক্ত তথা স্বাধীন কোনো চিন্তাশীল মানুষ যিনি প্রয়োজনে গরিষ্ঠ জনমতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও তাঁর বিশ্বাসমতো সত্যভাষণের সাহস ও স্পর্ধা রাখেন। বুদ্ধিজীবীর এই বিশেষ সংজ্ঞাটি মুখ্যত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ঠাণ্ডা লড়াই, ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবিরাম প্রবাহ, পারমাণবিক যুদ্ধের আতঙ্ক ইত্যাদির মধ্যে গড়ে উঠে ষাটের দশকের শেষ থেকে সত্তরের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যুব বিদ্রোহের বিস্ফোরণের মধ্যেও অর্থবহ ছিল। এই কালসীমার মধ্যেই জোলিও কুরি, বারট্রাণ্ড রাসেল, জঁ-পল সার্ত্র্, নোয়াম চমস্কি প্রমুখ ঐ বুদ্ধিজীবী ভূমিকার প্রতিভূ তথা উপমান হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের এক-একটি বিবৃতি, এক-একটি ক্রিয়া, এক-একটি প্রতীকি আচরণ পর্যন্ত (যেমন ১৯৪০ সালে পারি শহরে মাওপন্থী পত্রিকা 'লা কোজ দ্যু প্যপ্ল্' রাস্তায় ফেরি করতে গিয়ে সার্ত্র্-এর গ্রেপ্তার বরণ প্রতিবাদী মাত্রা পরিগ্রহ করে জনসাধারণের বিবেককে তাড়িত করে। সত্তর থেকে নব্বই-এর দশকের মধ্যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিজীবীর ঐ ভূমিকা বা চারিত্র্যই দ্বিধাসংশয়ে বিদীর্ণ হয়। ঐসব প্রতিবাদী ভঙ্গিমাই অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়, নয়তো প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবীদেরই অচিরেই দেখা যায় কর্তৃত্বের নরম আয়েসি গদিতে—যেমন দেখা গেল চেক নাট্যকার ভাৎস্লাভ হাভেল-কে।

ইতিহাসের ঊর্ধ্বে কিংবা তার টানাপোড়েনের বাইরে বুদ্ধিজীবীর স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে যে অনৈতিহাসিকতাদোষ ঘটেছিল, যার ফলে বুদ্ধিজীবীরাই যেন এক ধরনের অবান্তরতায় বাতিল হয়ে যাচ্ছিলেন, আর যার সুযোগে স্বৈরাচারী কর্তৃত্বই আরো শক্তপোক্ত হয়ে উঠেছিল, তার নিষ্কৃতির সম্ভাবনা নিহিত আছে আনতোনিও গ্রামশি-র এই প্রবন্ধটিতে। এটিকে হয়ত প্রবন্ধ বলা ঠিক হবে না। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৫ একটানা কারাবাসের মধ্যে সূত্রাকারে তিনি তাঁর চিন্তাভাবনা লিপিবন্ধ করে যাচ্ছিলেন। তারই একটি অংশ এই লেখাটি। সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিন জমানা থেকে স্তালিন

জমানার বিবর্তন, মার্কসবাদী আন্দোলনের মধ্যেই ত্রত্স্কি, বুখারিন ও রোজা লুকসেমবুর্গ-এর অন্যমতের প্রভাব ও পরিণতি এবং ফ্যাসি-বাদের উন্মেষ, এই সবেরই সাক্ষী গ্রামশি কারান্তরালের দূরত্বে সুযোগ পেয়েছিলেন মার্কসবাদের প্রাথমিক কয়েকটি প্রশ্নের পুনর্বিবেচনার, পুনর্বিচারের। যেমন ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর সম্পর্কের প্রশ্নটি, এবং তার সঙ্গে মিলিয়ে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা ও শিক্ষার লক্ষ্যের প্রশ্ন।

গ্রামশি-র চিন্তায় 'হেজিমনি' (আমরা যার বাংলা করেছি 'আধিপত্য') এবং 'ডমিনান্স' (আমরা যার বাংলা করেছি 'প্রাধান্য') শব্দ দুটি বিশেষ অর্থ পরিগ্রহ করেছে। যে-কোনো শ্রেণী (কারাগারের বিধিনিষেধ তথা সেনসর-এর কাটাকুটি এড়াতে গ্রামশি অবশ্য 'শ্রেণী' কথাটি না ব্যবহার করে 'সামাজিক গোষ্ঠী' বা 'মৌল সামাজিক গোষ্ঠী' জাতীয় শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন, খুঁটিয়ে পড়লে অবশ্য তার যথার্থ তাৎপর্য ধরতে এতটুকু অসুবিধা হয় না) ক্ষমতা লাভ করতে কোনো না কোনো ভাবে জোর খাটায়, জোর খাটিয়ে সেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। এর অবশ্যম্ভাবিতা মানতে গ্রামশির কোনো বাধা নেই। এই যে ক্ষমতা যা জোর বা শক্তিরই দান, তাকেই গ্রামশি বলেন 'প্রাধান্য'। কিন্তু এই প্রাধান্যকে যদি যথার্থই প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তবে তার পত্তনের আগেই এবং পত্তনের অব্যবহিত পরেও চালিয়ে যেতে হবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, অর্থাৎ সমগ্র জনসমাজের মধ্যে ঐ শ্রেণীর ভাবাদর্শ তথা মূল্যবোধ তথা সামগ্রিক চিন্তাপদ্ধতি সর্বস্তরে প্রোথিত করে দিতে হবে। সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের অভিযানে, নির্বিত্ত শ্রেণীর আন্দোলনে শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা দখল নয়, শুধু রাষ্ট্রীয় বা সরকারি যন্ত্রের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা নয়, জনসমাজের সমগ্র বিস্তার ব্যেপে শিক্ষা, সংস্কৃতি, নীতিবোধ, বুদ্ধিচর্চা, সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসেই বিপ্লবের পরিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা। প্রাধান্য ও আধিপত্য, একে অন্যের অপরিহার্য পরিপূরক। বস্তুত, যে-শ্রেণীর প্রাধান্যকে উৎখাত করে নতুন শ্রেণী ক্ষমতায় আসে, তার আধিপত্য আপনা-আপনি ভেঙে পড়ে না, বরং তাকে সংযত না করতে পারলে তা অলক্ষে নতুন শ্রেণীর প্রাধান্যকেই জীর্ণ করতে পারে।

আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই গুরুত্ব অনুধাবন করলে তারই পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধিজীবীর নতুন সংজ্ঞা তথা ভূমিকা চিহ্নিত হয়। গ্রামশি দুই বর্গের বুদ্ধিজীবীর কথা বলেছেন। একটি বর্গকে তিনি বলেন 'জৈব' : অর্থাৎ একটি শ্রেণী তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিজস্ব পরিচয়, ভূমিকা, আন্তর সমজাতীয়তা ইত্যাদি গুছিয়ে নির্দেশ করে দেবার দায়িত্বে নিজে থেকেই যাদের প্রতিষ্ঠিত করে,

সেই বুদ্ধিজীবীকুল ঐ শ্রেণীর উন্মেষের ইতিহাসের এক স্বাভাবিক অঙ্গ এবং ঐ শ্রেণীর সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অন্য বর্গ 'প্রথাগত': এই বুদ্ধিজীবীরা আপাতদৃষ্টিতে কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিকাশ অবলম্বন করে আবির্ভূত হয়নি, বরং যেন প্রাচীনতর কোনো পরম্পরার প্রতিভূ। গ্রামশি পুরোহিত শ্রেণীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে ধরিয়ে দেন যে এই 'প্রথাগত' বুদ্ধিজীবীরাও কোনো শুদ্ধ, স্বতন্ত্র স্বাধীন শ্রেণী নয়, তাদের শ্রেণীপরিচয় তথা শ্রেণীগত আনুগত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে মাত্র।

বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বর্গবিভাজন এবং বিভিন্ন বর্গের ইতিহাস তথা চরিত্রলক্ষণ বিশ্লেষণে গ্রামশি যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেও তাঁর আসল লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকার দিক্‌নির্দেশ। তাই তিনি প্রকারান্তরে বলেন, শ্রমিকশ্রেণী যে সমাজরূপান্তরে অঙ্গীকারবদ্ধ তা যথার্থ ও সার্বিকভাবে সিদ্ধ করতে গেলে তাঁদের নিজেদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করতে হবে এক নতুন 'জৈব' বুদ্ধিজীবী বর্গ যাঁরা শ্রমিকদের দৈনন্দিন কর্মাভিজ্ঞতার মধ্যেই কর্মপ্রক্রিয়ার পরিচালনায় প্রথমে নেতৃত্ব নেবেন, তারপর ক্রমে ইতিহাসের মানবিকী বোধ থেকে শ্রমিকদের জীবনে 'অগ্রগণ্য' তথা রাজনীতিগতভাবে নির্দেশক-নিয়ামক ভূমিকা পালন করতে থাকবেন। শ্রমিকশ্রেণী তার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, তার নিজস্ব 'জৈব' বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে ক্রমে 'প্রথাগত' বুদ্ধিজীবীদের তার সপক্ষে আহ্বান করে আনবে। এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ জনসমাজের মধ্যে ছড়াবে, তার 'সম্মতি' আয়ত্ত করবে, এবং সেই 'সম্মতি'র সমর্থনেই সমাজের রূপান্তর ঘটানো যাবে।

ইতালীয় ইতিহাসের যে বিভিন্ন পর্ব থেকে গ্রামশি তাঁর তথ্য তথা সাক্ষ্য আহরণ করেছেন তার এক প্রান্তে রয়েছে ইতালির ক্ল্যাসিকাল যুগ যার বিস্তার খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দী, অন্য প্রান্তে গ্রামশির সমকাল যখন সাহিত্যের শুদ্ধ নান্দনিক ধর্মের প্রবক্তা দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচে (১৮৬৬—১৯৫২) যানবাহনশিল্পের প্রবাদপ্রতিম ব্যবসায়ী ফিয়্যাট-মালিক আইনিয়েল্লি পরিবার বা রাসায়নিক শিল্পের বড় ব্যবসায়ী মন্তেকাতিনি-মালিক বেন্নি-র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গোপন করেন না। জ্যভান্নি আইনিয়েল্লি, বেন্নি ও ক্রোচে নিজে, তিনজনই বিশের দশকে ইতালির সেনেটের অর্থাৎ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তুরিন-এর ফিয়্যাট কারখানায় শ্রমিকেরা তাঁদের দাবি আদায় করবার আন্দোলনে কারখানা দখল করলে আইনিয়েল্লি প্রগতিশীলতার ভান করে শ্রমিকদের কিনে নেবার চেষ্টা করেন। তাঁর সেই প্রয়াসের মুখে শ্রমিক প্রতিরোধের নেতৃত্বে ছিলেন গ্রামশি, ১৯২০ সালে। ক্রোচে তখন ফ্যাশিস্ত

মুসোলিনির প্রথম মন্ত্রীসভায় শিক্ষামন্ত্রী। একদা ক্রোচের দার্শনিক চিন্তায় প্রভাবিত গ্রামশি এখন আর ক্রোচের 'বুদ্ধিজীবীসুলভ' উদারতা তথা নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করেন না। যেমন বিশ্বাস করেন না দার্শনিক ও শিক্ষাতাত্ত্বিক জ্যভান্নি জেনতীল (১৮৭৫—১৯৪৪)-এর আদর্শবাদে। বহুদিন ক্রোচেরই সহযোগী ও অনুগামী জেনতীল পরে ফ্যাশিবিরোধীদের হাতে নিহত হন। শুদ্ধ মননের যে আদর্শ ক্রোচে ও জেনতীল তুলে ধরেছিলেন, তার মধ্যে গ্রামশি যে বিপদ দেখেছেন, সেই বিপদই দেখেছেন আদি মার্কিন ম্যানেজমেণ্ট-তাত্ত্বিক ফ্রেডেরিক টেলর (১৮৫৬—১৯১৫)-এর মধ্যেও। জেনতীল ও ক্রোচে মানুষকে এক তুরীয় বৌদ্ধিক স্তরে উন্নীত করতে যেমনই আগ্রহী, টেলরও তেমনই কর্মদক্ষতা নিশ্চিত করতে শ্রমিক-কর্মচারীদের 'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোরিলা'য় রূপান্তরিত করতে আগ্রহী।

শিল্পোন্নত সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যে বুদ্ধিজীবী বর্গ তাঁদের স্থান নেবেন, তাঁরা একাধারে 'প্রযুক্তিশিক্ষা', ইতিহাস ও শ্রমিকশ্রেণীর পরিবর্তনমুখী দর্শনে সমান পারঙ্গম হবেন। সেই বুদ্ধিজীবীবর্গকে তৈরি করা ও লালন করার কাজেই গ্রামশি তাঁর 'অব।দনে নুওভো' পত্রিকাকে লাগিয়েছিলেন। শিল্পনগরী তুরিন্-এ বাসকালে ১৯১৯-২০ সালে 'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির সাপ্তাহিক সমীক্ষা' রূপে বর্ণিত এই পত্রিকাটি গ্রামশি সম্পাদনা করেছিলেন। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সম্প্রসারণ ও বিকাশে শিক্ষাব্যবস্থা তথা নানা ধরনের ও নানা স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকার উপরও গ্রামশি জোর দিয়েছেন।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যতই জটিল হয়েছে, ততই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর নানা বর্গেরও বিকাশ ঘটেছে। ফলে এমন অনেক বর্গ দেখা যায় যাদের সঙ্গে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনেই হয় না। আকিলি লোরিয়া (১৮৫৭—১৯৪৩) এদেরই অনুৎপাদনক্ষম শ্রমিক বলে বর্ণনা করেছেন। গ্রামশি এদের 'অনুৎপাদনক্ষম' বলে মনে করেন না, উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রমিকদের 'সম্মতি' বা 'আস্থা' গড়ে তোলার কাজে এদেরও ভূমিকা আছে। রাজনৈতিক দলগুলিকে গ্রামশি দেখেন এক একটি সামাজিক গোষ্ঠী তথা শ্রেণীর সংগঠন হিসেবে। এই সংগঠনের কাজই হল ঐ শ্রেণীর 'জৈব' বুদ্ধিজীবীদের গড়ে তোলা, লালন করা, এবং প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাদের মেলবন্ধন ঘটানো। প্রধান শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারে রাজনৈতিক দল তন্নিষ্ঠভাবে কাজ করে যায়।

ইতালিসহ বিভিন্ন ইয়োরোপীয় দেশে প্রথাগত বুদ্ধিজীবী বর্গের বিকাশ ও এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সঙ্গে প্রধান শ্রেণী তথা শাসক শ্রেণীর সম্পর্কের চরিত্র বিশ্লেষণ করে গ্রামশি দেখান, যেখানেই

বুদ্ধিজীবী শ্রেণী শাসক শ্রেণী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে (যেমন ইতালিতে, রোমক সাম্রাজ্যের পতন থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত), সেখানেই রাষ্ট্রব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। ফ্রান্স্-এ ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে শ্রেণী রাষ্ট্রে 'প্রাধান্যে' আসে তাদের সঙ্গে সঙ্গেই তারা 'জৈব' বুদ্ধিজীবী বর্গের উন্মেষ ঘটায় জনসমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে। এমনকী খ্রিস্টিয় ধর্মসংঘ তথা ধর্মসংগঠনের মধ্যেও গ্যালিকান ধারা (অর্থাৎ ফরাসি ক্যাথলিক ধর্মসংঘে রোমক ধর্মসংঘের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষার যে ধারা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই প্রচলিত ছিল) এই সময়ে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জর্মনির ইয়ুংকার শ্রেণীর ভূমিকা লক্ষ করেছেন গ্রামশি। ইয়ুংকাররা ভূম্যধিকারী কিন্তু নিজেরা নিজেদের জমির সরাসরি খবরদারি করতে অভ্যস্ত, তারা জমি চাষ করায় ভূমিহীন কৃষিজীবীদের দিয়ে। তাদের জমিদারিকে এ জে পি টেলর বর্ণনা করেন 'পুঁজিবাদী সংস্থা' বলে, ইয়ুংকারদের তিনি বলেন, 'কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিপতি'। ইয়ুংকারদের স্বনির্ভরতা তাদের কখনোই প্রধান শ্রেণীর বশ্যতায় নামায়নি। তাদের একচেটিয়া ক্ষমতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জর্মন শিল্পপতিদের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। বিশের দশকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো বুদ্ধিজীবী বর্গের সম্প্রসারণ ও বিকাশ লক্ষ করে গ্রামশি যে কটি সম্ভাবনা দেখেছেন, তার সবকটিই আমরা পরবর্তীকালে বাস্তবায়িত হতে দেখেছি। আমরা একদিকে দেখেছি সেই সুবিধাভোগী ভাগ্যবান নিগ্রো বুদ্ধিজীবীদের যাঁদের লালন করা হয়েছে আকর্ষক দৃশ্যবস্তু রূপে বর্ণবৈষম্যের নগ্ন সত্যকে গোপন করার প্রয়াসে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বর্ণবৈষম্যের শিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নিগ্রো সম্প্রদায়ের সামনে প্রলুব্ধকর টোপ হিসেবে! অন্যদিকে আমরা দেখেছি উইলিয়াম ই. বি. ডুবয়স্ (১৮৬৮—১৯৬৩) প্রমুখের নেতৃত্বে সর্ব-আফ্রিকী আন্দোলনে মার্কিন নিগ্রো বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকায় মার্কিন শাসকশ্রেণীর প্রাধান্যের সবল অস্বীকৃতি। গ্রামশি-র পদ্ধতি অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে সত্তর-আশির দশকে এই দ্বিতীয় ধারার পতন ও প্রায় বিলোপের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মার্কিন রাষ্ট্রের প্রধান শ্রেণী তার আধিপত্যের প্রভাবেই নিগ্রো সমাজের এই প্রতিবাদী বহির্মুখী প্রবণতাকে বশ করে ফেলেছে। রাজনৈতিক প্রাধান্যের দিকে অগ্রসরমান কোনো শ্রেণীর সমর্থন ছাড়া নিগ্রো স্বাতন্ত্র্যবাদের আত্মপ্রকাশের প্রয়াস অবধারিতভাবেই চাপা পড়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর ইতালীয় ইতিহাসে পীডমণ্ট ইতালির নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে নেতৃত্বের স্থানে অধিষ্ঠিত হয়, কিংবা ইজরায়েল যেমন পৃথিবীর সর্বদেশের ইহুদিদের

পবিত্র আশ্রয়স্থলে ('জায়ন') পরিণত হয়েছে, কোনো আফ্রিকী রাষ্ট্রই শেষ পর্যন্ত সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের অনুরূপ কোনো নেতৃত্ব-বিন্দুতে পৌঁছয়নি। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে বৈপ্লবিক রূপান্তরের সম্ভাবনা বা আন্দোলন বারংবার পর্যুদস্ত হয়েছে। গ্রামশি তার ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন এইসব দেশে লাতিফুন্দিউম নামে পরিচিত বিশাল জমিদারি সম্পত্তির মালিকানায় ধর্মসংঘের অবস্থান এবং সেই ভূম্যধিকারী ধর্মসংঘকে ঘিরে বুদ্ধিজীবীদের অবস্থানে। স্বভাবতই এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী 'ধর্মনিরপেক্ষ ও বুর্জোয়া' কোনো অবস্থানে পৌঁছতে পারেনি, আধুনিক রাষ্ট্রের স্বার্থে ধর্মসংঘ ও প্রথাগত সামরিক কর্তৃত্বের দাপটকে সংযত করতে পারেনি। জর্মনিতে ১৮৭০-এর দশকে বিসমার্ক-এর নেতৃত্বে কুলটুরকাম্‌প্‌ফ নামে বর্ণিত আন্দোলনে এবং ফ্রান্‌স্‌-এ ১৮৯৪-১৯০৬ এর মধ্যে দ্রেফুস মামলাকে কেন্দ্র করে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ও ব্যাপকতম চিন্তারাজ্যে পুরনো ক্যাথলিক ধর্ম-নির্ভর সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে উদারপন্থী প্রগতিশীল চিন্তাধারার যে সরাসরি সংঘাত বাধে, তাতে সমাজরূপান্তরের পথই সুগম হয়েছিল, দুই সংস্কৃতির বিরোধ ও বিরোধ-নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত হয়েছিল। লাতিন আমেরিকায় অনুরূপ কোনো ঘটনা ঘটলে তবেই সেখানে নতুন শ্রেণী ও তার নতুন সংস্কৃতির উন্মেষ সম্ভব বলে গ্রামশির বিশ্বাস। কারাগারে বসেই ১৯২৪-২৮ এর মধ্যে রাষ্ট্রপতি প্লুতারকো এলিয়াস কালেস-এর নেতৃত্বে মেকসিকোয় নতুন সংবিধানে ধর্মীয় ও শিক্ষাক্ষেত্রে নববিধানের খবর পেয়ে গ্রামশি স্বভাবতই আশান্বিত হয়ে ওঠেন। আবার চীন ও ভারতে জনগণ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মারাত্মক বিচ্ছেদের চিত্র দেখে ভয় পান। শ ব]

বুদ্ধিজীবীদের গঠন বৃত্তান্ত

বুদ্ধিজীবীরা কি কোনো স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সামাজিক গোষ্ঠী, না কি প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যেই রয়েছে তার নিজস্ব বুদ্ধিজীবীর বিশিষ্ট এক শ্রেণী? বিভিন্ন অভিধার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আত্মপ্রকাশের আসল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় অদ্যাবধি যে বিচিত্র রূপভেদ দেখা গেছে তাতেই সমস্যাটি জটিল হয়ে উঠেছে।

এই বিভিন্ন রূপের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই দুটি :

১। অর্থনৈতিক উৎপাদনের জগতে কোনো আবশ্যিক ভূমিকার মৌল ক্ষেত্র অবলম্বন করে যখনই কোনো সামাজিক গোষ্ঠী আবির্ভূত হয়, তখনই সেই গোষ্ঠী তার নিজের ভেতর থেকে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এক বা

একাধিক বর্গের জন্ম দেয়। এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ঐ গোষ্ঠীকে সমজাতীয়তার বোধ দেয় এবং তার ভূমিকা সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলে। ধনতান্ত্রিক আঁত্রেপ্রনর তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি করে শিল্প-প্রযুক্তিবিদ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, নতুন সংস্কৃতির সংগঠক, এক নতুন আইন ব্যবস্থার সংগঠক ইত্যাদি। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে আঁত্রেপ্রনর নিজেই সমাজবিকাশের এক উচ্চতর স্তরের প্রতিভূ, এবং এক ধরনের অগ্রগণ্য ও প্রয়োগগত (বা বুদ্ধিবৃত্তিগত) ক্ষমতাও তার চরিত্রস্বরূপ। তার কর্ম-ক্ষেত্র ও উদ্যোগের সীমার বাইরে অন্য ক্ষেত্রেও, বিশেষত অর্থনৈতিক উৎ-পাদনের সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে তার খানিকটা প্রয়োগগত দক্ষতা থাকবেই। জনসাধারণকে সংগঠিত করা, ব্যবসায়ে যারা অর্থ লগ্নী করবে তাদের 'আস্থা'কে সংগঠিত করা, তার উৎপাদিত পণ্যের ক্রেতাদের 'আস্থা'কে সংগঠিত করা ইত্যাদি তার দায়স্বরূপ।

সব আঁত্রেপ্রনর না হলেও তাদের মধ্যে অন্তত একটি এলীট অংশের সেই ক্ষমতা থাকতেই হবে যার বলে তারা সমগ্র সমাজের সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে নিতে পারে; সমাজ বলতে রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃত তার যাবতীয় জটিল ক্রিয়াবিন্যাস; কারণ তাদের নিজেদের শ্রেণীর প্রসারের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে নিতে গেলে এই দায়িত্ব তাদের নিজেদের হাতে তুলে নিতেই হবে। নয়তো অন্তত সেই ক্ষমতা তাদের থাকতেই হবে যার জোরে তারা এমন সহযোগী (বিশেষভাবে দীক্ষিত কর্মচারী) খুঁজে নিতে পারবে যাদের উপর ব্যবসাক্ষেত্রের বাইরে সম্পর্কসমূহের ব্যাপকতর বিন্যাসকে সংগঠিত করে তোলার দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়। বলা যায়, প্রত্যেক নতুন শ্রেণী তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যে 'জৈব' বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টি করে এবং তার নিজ বিকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাদের সম্প্রসারিত করে তারা মুখ্যত নতুন শ্রেণীর দ্বারা প্রতিস্থাপিত নতুন সামাজিক বর্গের আদি ক্রিয়ার অংশবিশেষে 'কৃতবিদ্য'।[১]

সামন্ত প্রভুরাও এক বিশেষ প্রয়োগদক্ষতা ও সামরিক দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। বস্তুত যে-মুহূর্তে অভিজাত শ্রেণী প্রায়োগিক-সামরিক দক্ষতায়

১। এই সূত্রে মস্কা-র 'রাজনীতিবিজ্ঞানের উপাদান' (নতুন বর্ধিত সংস্করণ, ১৯২৩) দেখা যেতে পারে। মস্কা-র তথাকথিত 'রাজনৈতিক শ্রেণী' প্রধান সামাজিক গোষ্ঠীর বুদ্ধিজীবী বর্গেরই নামান্তর। মস্কা-র এই 'রাজনৈতিক শ্রেণী'র ধারণার সঙ্গে পারেতো-র এলীট'-এর ধারণা মিলিয়ে দেখা যায়। পারেতো-র ধারণাও রাষ্ট্র ও সমাজের জীবনে বুদ্ধিজীবীদের ঐতিহাসিক উপস্থিতি ও ভূমিকা ব্যাখ্যা করার আরেকটি প্রয়াস। মস্কা র বইটি এক অতিকায় জগাখিচুড়ি যার ধাঁচটা সমাজতাত্ত্বিক ও দৃষ্টবাদী, এবং তারই সঙ্গে রয়েছে প্রত্যক্ষ রাজনীতির একদেশদর্শিতা যার গুণে লেখাটি ততটা দুষ্পাচ্য হয়ে ওঠে না এবং সাহিত্যমূল্যবিচারে সজীবতর হয়ে ওঠে।

তাদের একচেটিয়া অধিকার হারাতে শুরু করে, সেই মুহূর্তেই সামন্ততন্ত্রের সংকটের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক জগৎ ও তার পূর্ববর্তী ক্ল্যাসিকাল জগতে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর গঠনের প্রশ্নটি স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করতে হবে। এই গঠন ও সম্প্রসারণ যে পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে তার বস্তুধর্মী বিচার আবশ্যক। যেমন ধরুন লক্ষ করা যায় যে উৎপাদনক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করলেও কৃষিজীবী শ্রেণী তার নিজস্ব কোনো 'জৈব' বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্ম দেয় না বা 'প্রথাগত' বুদ্ধিজীবীদের কোনো বর্গকে 'আত্মসাৎ'ও করে না, যদিও ঐ কৃষিজীবী শ্রেণী থেকেই অন্য সামাজিক গোষ্ঠী তাদের অনেক বুদ্ধিজীবীকেই আহরণ করে। প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশই কৃষকবংশোদ্ভূত।

২। পূর্বতন অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে এবং ঐ কাঠামোর ক্রম-বিকাশের পরিণামস্বরূপ যখনই কোনো 'অপরিহার্য' সামাজিক শ্রেণী ইতিহাসে তার স্থান করে নিয়েছে, তখনই সেই শ্রেণী (অন্তত বর্তমান কাল পর্যন্ত সমগ্র ইতিহাস জুড়েই) বুদ্ধিজীবীদের এমন কোনো বর্গের সন্ধান পেয়ে গেছে যাতে একটা ঐতিহাসিক ক্রমান্বয়তার বোধ আসে। এই ক্রমান্বয়তা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিন্যাসের জটিলতম ও মৌল রূপান্তরেও ব্যাহত হয় না।

বুদ্ধিজীবীদের এই বর্গগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রতিনিধিস্থানীয় হল পুরোহিত শ্রেণী। এরা দীর্ঘকাল জুড়ে (ইতিহাসের একটা সমগ্র পর্ব জুড়েই যার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিল এই একচেটিয়া অধিকার) অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সুকৃতির একচেটিয়া দায়ভার বহন করেছে: ধর্মীয় মতাদর্শ, অর্থাৎ ঐ যুগের দর্শন ও বিজ্ঞান, এবং তৎসহ বিদ্যালয়, শিক্ষা, নীতিজ্ঞান, বিচারব্যবস্থা, দয়াধর্ম, সদাচার ইত্যাদি। পুরোহিতবর্গকে ভূম্যধিকারী অভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে জৈব যোগে সম্পৃক্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বলে গণ্য করা যায়। আইনের চোখে এরা অভিজাত শ্রেণীর সমমর্যাদা ভোগ করেছে, তাদেরই মতো জমির উপর সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা এবং সম্পত্তির অধিকারে রাষ্ট্রীয় বিশেষাধিকারের সুযোগ লাভ করেছে।[২] উপরিকাঠামোর স্তরে পুরোহিত শ্রেণী যে একচেটিয়া

২। প্রাচীন সমাজে মর্যাদা ও সামাজিক ভূমিকার কারণে পুরোহিত শ্রেণীর ঠিক পরেই গুরুত্বের বিচারে যাদের স্থান, ব্যাপক অর্থে চিকিৎসক বলে যাদের চিহ্নিত করা যায়, অর্থাৎ যারাই মৃত্যু ও ব্যাধির বিরুদ্ধে 'সংগ্রামে' রত বা যাদের রত বলে মনে হয়, তাদের বিবরণের জন্য আর্তুরো কাস্তীলিওনি-র 'ভেষজের কাহিনী' দ্রষ্টব্য। লক্ষ করবেন, ধর্ম ও ভেষজের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে অনেক দিন ধরেই, এখনও কোনো কোনো অঞ্চলে সেই সম্পর্ক রয়ে গেছে: বিশেষ সাংগঠনিক ভূমিকায় নিয়োজিত ধর্মীয় গোষ্ঠীর হাতে অনেক হাসপাতাল রয়েছে; আর তা ছাড়াও যেখানেই ডাক্তারের আবির্ভাব ঘটে সেখানেই পুরোহিতেরও আবির্ভাব ঘটে (ঝাড়ফুঁক, নানা ধরনের সহায়তা ইত্যাদি)।

ক্ষমতা ধারণ করে গেছে³ তা প্রয়োগ করতে গিয়ে তাদের সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে, ব্যাঘাত মেনে নিতে হয়েছে। তারই পরিণামস্বরূপ নানা আকারে (যা নিয়ে আরো গভীরভাবে ও বস্তুগতভাবে বিচার করে দেখা যাবে) এমন অন্য বর্গের জন্ম হয় যারা সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্র পর্যন্ত রাজতন্ত্রের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে তারই সাহায্যে বিস্তৃতি লাভ করে। এইভাবেই গড়ে ওঠে বিশেষ অধিকারপুষ্ট এক নব্য অভিজাত শ্রেণী, যার অন্তর্গত হয় প্রশাসক সম্প্রদায় ইত্যাদি, বিদ্বান ও বিজ্ঞানী, তাত্ত্বিক ও পুরোহিত শ্রেণীর বাইরেকার দার্শনিককুল ইত্যাদি।

যেহেতু এই বিভিন্ন বর্গের প্রথাগত বুদ্ধিজীবীরা একধরনের 'গোষ্ঠীবোধ' থেকে তাঁদের অব্যাহত ঐতিহাসিক ক্রমান্বয়তা এবং তাঁদের বিশেষ যোগ্যতার বিশিষ্টতা অনুধাবন করেন, তাই তারই জোরে তাঁরা প্রধান সামাজিক শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলে নিজেদের পরিচয় দেন। এই স্বমূল্যায়নের পরিণাম দেখা যায় মতাদর্শ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে। বহুদূর-প্রসারী সেই পরিণাম। বুদ্ধিজীবীদের এই সামাজিক গোষ্ঠী এই যে অবস্থানে নিজেদের স্থাপন করেন, তার সঙ্গে সহজেই সমগ্র ভাববাদী দর্শনের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। যে সামাজিক কল্পরাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধি-জীবীরা নিজেদের 'স্বাধীন', সম্পূর্ণ স্বয়ংচালিত, স্বকীয় চরিত্রের গুণে বিশিষ্ট বলে বিবেচনা করেন, ঐ দর্শনকে তারই প্রকাশ বলে চিহ্নিত করা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এও লক্ষ করতে হবে যে পোপ এবং ধর্মসংঘের ঊর্ধ্বতন স্তরগুলি যদিও বা সেনেট-সদস্য আইনিয়েল্লি ও বেন্নি-র চেয়ে খ্রিস্ট ও তাঁর সন্তদের সঙ্গেই নিজেদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর বলে মনে করেন, তবুও জেনতীল ও ক্রোচে সম্পর্কে সে-কথা খাটে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ক্রোচে আরিস্ততল্ ও প্লাতো-র সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করলেও অন্যদিকে তিনি কখনোই সেনেট-সদস্য আইনিয়েল্লি ও বেন্নি-র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গোপন করেন না। ঠিক এইখানেই ক্রোচে-র দর্শনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণটিকে লক্ষ করা যায়।

বহু মহান ধর্মীয় ব্যক্তি মহান 'উপশমক' রূপে কীর্তিত হয়েছেন এবং হন। তার সঙ্গেই রয়েছে মৃতের পুনরুজ্জীবন পর্যন্ত অলৌকিক নিরাময়ের ধারণা। রাজাদের ক্ষেত্রেও বহুদিন পর্যন্ত এমন বিশ্বাস থেকে গিয়েছিল যে তাঁরা স্পর্শমাত্রে রোগ নিরাময় ঘটাতে পারেন ইত্যাদি।

৩। রোম্যান্স্ ভাষাগোষ্ঠীর অনেক ভাষাতেই বা খ্রিস্টীয় ধর্মচর্যায় ব্যবহৃত লাতিন ভাষার মধ্য দিয়ে রোম্যান্স্ ভাষা দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত অনেক ভাষাতেই এই সূত্র থেকেই 'কিয়েরিকো' (ধর্মসংঘের সদস্য) শব্দটির একটা সাধারণ অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে 'বুদ্ধিজীবী' বা 'বিশেষজ্ঞ', যেমন তারই বিপরীত 'লাইকো' (ধর্মসংঘের বহিঃস্থ) শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে 'ধর্মবিচ্যুত', 'অবিশেষজ্ঞ'।

'বুদ্ধিজীবী' কথাটিকে গ্রহণ করলে শেষ পর্যন্ত কত দূর যাওয়া যায়? এমন কোনো একক লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় কি যা দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের যাবতীয় বিচিত্র ও স্বতন্ত্র ক্রিয়াকলাপের চারিত্র্য ধরা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীগুলির ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তার মৌলিক প্রভেদটাও চিনে নেওয়া যায়? আমার মনে হয় পদ্ধতির সবচেয়ে ব্যাপক যে ভুল হয়েছে তা হল সামাজিক সম্পর্কসমূহের জটিল ক্ষেত্রে যে বিশেষ সম্পর্ক বিন্যাসের মধ্যে এই ক্রিয়াকলাপ (এবং স্বভাবতই যে বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীগুলি তা সাধন করে) সংঘটিত হয়, তার মধ্যে ঐ বৈশিষ্ট্যচিহ্ন সন্ধান না করে মননধর্মী ক্রিয়াকলাপের অন্তর্লীন চারিত্র্যের মধ্যে তার সন্ধান করা হয়েছে। উদাহরণত, শ্রমিক বা নির্বিত্তের বিশেষ চারিত্র্য তার হাতের কাজ বা যন্ত্রচালনার মধ্যে নিহিত নয়। যে বিশিষ্ট অবস্থায় এবং যে বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের আওতায় এই কাজ সে সাধন করে, তাতেই সেই চারিত্র্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়াও অবশ্য বিবেচ্য যে শুদ্ধ শারীরিক শ্রম বলে কিছু নেই, এবং টেলর 'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোরিলা'-র যে অভিধাটি ব্যবহার করেন তাও একটি অলঙ্কারমাত্র এবং একটি বিশেষ দিকের সীমা নির্দেশ করেই ক্ষান্ত হয়। যে-কোনো শারীরিক ক্রিয়ায়, তা যতই নিচু ধরনের ও যান্ত্রিক হোক না কেন, প্রয়োগগত দক্ষতার একটা ন্যূনতম মান থাকবেই। আমরা আগেই বলেছি, আন্ত্রেপ্রনর্-এর বিশেষ ভূমিকার কারণেই বুদ্ধিজীবী লক্ষণাক্রান্ত কিছু যোগ্যতা তাঁর থাকতেই হবে যদিও সমাজে তাঁর স্থান এই যোগ্যতাবলীর কারণে নির্ধারিত হয় না; ব্যাপকতর যে সামাজিক সম্পর্ক বিন্যাসে শিল্পক্ষেত্রে আন্ত্রেপ্রনর-এর বিশেষ অবস্থান নির্ধারিত হয়ে যায়, তাই তাঁর সামাজিক ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয়।

কেউ তাই বলতেই পারেন যে সব মানুষই বুদ্ধিজীবী; কিন্তু তাই বলে সমাজে সব মানুষকে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করতে হয় না।[৪]

যখন কেউ বুদ্ধিজীবী ও অ-বুদ্ধিজীবীর মধ্যে প্রভেদ করেন, তখন তিনি কার্যত কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবী নামধেয় পেশাদার বর্গের প্রত্যক্ষ সামাজিক ভূমিকার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে সেইদিকে যেদিকে বুদ্ধিজীবীদের বিশিষ্ট পেশাদার বৃত্তিতে জোর পড়ে; অর্থাৎ যা বিচার করা হচ্ছে তা হল, জোরটা কোনদিকে পড়ছে, বুদ্ধিগত বিস্তারের দিকে, নাকি পেশীগত-স্নায়ুগত প্রয়াসের দিকে। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কথা বলা গেলেও অ-বুদ্ধিজীবী কোনো শ্রেণীর কথা বলা যাবে না, কারণ অ-বুদ্ধিজীবীদের কোনো অস্তিত্বই নেই। কিন্তু বুদ্ধিগত-মস্তিষ্কচালিত বিস্তার ও পেশীগত-স্নায়ুগত প্রয়াসের মধ্যেও যে

৪ ঠিক যেমন প্রত্যেকেই জীবনে কোনো না কোনো সময়ে এক জোড়া ডিম ভেজেছেন কিংবা জ্যাকেটের একটি ছেঁড়া অংশ রিপু করেছেন বলেই আমরা প্রত্যেককে পাচক বা দর্জি বলে বসব না।

সম্পর্ক', তা সবসময় এক থাকে না, ফলে বিশেষ কোনো বুদ্ধিগত ক্রিয়ার মানগত তারতম্য ঘটে। এমন কোনো মানবিক ক্রিয়া নেই যা থেকে বুদ্ধিগত অংশগ্রহণের সমস্ত সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বর্জন করা যায়; যে মানুষ নির্মাতা এবং যে মানুষ চিন্তাশীল তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা যায় না। চূড়ান্ত বিচারে প্রত্যেক মানুষই তার পেশাগত ভূমিকার বাইরে কোনো কোনো ধরনের বুদ্ধিগত ক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকে; অর্থাৎ, সে তখন একজন 'দার্শনিক', একজন শিল্পী, একজন রুচিমান মানুষ, সে এক বিশেষ বিশ্বদর্শনে নিরত, তার মধ্যে রয়েছে নৈতিক আচরণের এক সচেতন বিধি, ফলে এক বিশেষ বিশ্ববোধকে লালন করা বা তার সংস্কার সাধনের কাজে, অর্থাৎ নতুন চিন্তা-পদ্ধতির জন্ম দেওয়ার কাজে তার ভূমিকা থাকে।

কোনো নতুন পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে গেলে একটা সমস্যা এসে দাঁড়ায়। প্রত্যেকেব মধ্যেই বিকাশের কোনো একটি স্তরে যে বুদ্ধিগত ক্রিয়া সচল তার বিচারসমৃদ্ধ বিস্তার ঘটিযে এমন এক নতুন স্থিতির দিকে এগোনোর সমস্যা দেখা দেয যাতে সর্বব্যাপী ক্রিয়াকর্মের অন্যতম উপাদান এবং বস্তুজগৎ ও সমাজের ক্রমাগত নবরূপান্তরে সদা সক্রিয় শক্তি রূপে ঐ পেশীগত-স্নায়ুগত প্রয়াসই পৃথিবীর এক নতুন ও অন্তর্লীন ধারণার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। লেখক, দার্শনিক ও শিল্পীদেব মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসেন প্রথাগত ও সবচেয়ে সাধারণ স্তরের বুদ্ধিজীবী। ফলে সাংবাদিকেরা নিজেদের লেখক, দার্শনিক বা শিল্পী বিবেচনা করে নিজেদের 'যথার্থ' বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য কবতে থাকেন। আধুনিক জগতে শিল্পে শ্রমের সঙ্গে আদিমতম ও অদক্ষতম স্তরেও ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি শিক্ষাকেই হতে হবে নতুন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের ভিত্তিভূমি।

এই ভিত্তি থেকেই সাপ্তাহিক 'অরদিনে নুওভো' পত্রিকা নব্য বুদ্ধিজীবী-তন্ত্রের কয়েকটি ধারার বিকাশ ও তার নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিল। এই পত্রিকার সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল এইটেই, কারণ সমাজজীবনের বাস্তব কাঠামোগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা ও তাদের বিকাশের সঙ্গে এই নব্য বুদ্ধিজীবীতন্ত্রের সাযুজ্য ছিল। নব্য বুদ্ধিজীবীর অস্তিত্ব আর কেবল বাগ্মিতার উপর নির্ভরশীল থাকতে পারে না, কারণ বাগ্মিতা অনুভূতি ও আবেগকে বাইরে থেকে তাৎক্ষণিক নাড়া দিতে পারে মাত্র। নব্য বুদ্ধি-জীবীকে সরাসরি বাস্তব জীবনে অংশগ্রহণ করতে হবে, কেবলমাত্র মামুলি বক্তা হিসেবে নয়, নির্মাতা, সংগঠক ও 'স্থায়ী সম্মতিগ্রাহী'রূপে, সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বস্তুবিচ্ছিন্ন কোনো গাণিতিক স্তরের চেয়ে উন্নততর স্তরে সক্রিয় হতে হবে। কাজের মধ্যে প্রয়োগবিদ্যা আয়ত্ত করেই সেই প্রয়োগবিদ্যাকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে হয়, তার থেকেই পেঁছতে হয় ইতিহাসের মানবিক-বাদী ধারণায় যা ছাড়া একজন কেবল 'বিশেষজ্ঞ'ই থেকে যায়, একাধারে বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক, অর্থাৎ 'অগ্রগণ্য' ভূমিকায় পেঁছতে পারে না।

বুদ্ধিজীবী ভূমিকা পালনের ইতিহাস-নির্দিষ্ট বিশেষিত বিভিন্ন বৃত্তি

আছে। সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠীকে ঘিরেই এই বৃত্তিগুলি গড়ে ওঠে, বিশেষত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীগুলির সঙ্গেই এই বৃত্তিগুলি গড়ে ওঠে, প্রধান সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে তাদের ব্যাপকতর ও জটিলতর সম্প্রসারণ ঘটে। যে-কোনো গোষ্ঠী যখন প্রাধান্যের দিকে অগ্রসরমান তখন তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠে প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের আত্মসাৎ করা ও 'মতাদর্শগতভাবে' তাদের জয় করে নেবার জন্য ঐ গোষ্ঠীর সংগ্রাম। কিন্তু ঐ গোষ্ঠী সঙ্গে সঙ্গেই তার নিজস্ব জৈব বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সম্প্রসারণে যতই সফল হয় প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের আত্মসাৎ ও জয় করে নেবার প্রয়াস ততই দ্রুত ও সার্থকতর হয়।

মধ্যযুগীয় সভ্যতা থেকে যে-সব সমাজের অভ্যুদয় ঘটে সেই সব সমাজে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার কর্মকাণ্ড ও সংগঠনের যে বিপুল বিকাশ লক্ষ করা যায় তাতেই আধুনিক পৃথিবীতে বুদ্ধিজীবী ভূমিকা ও বৃত্তির নবপ্রতিষ্ঠিত গুরুত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির 'বুদ্ধিজীবী চারিত্র্য'কে গভীরতর ও প্রশস্ততর করার পাশাপাশি বিভিন্ন বিশেষিত বৃত্তিগুলিকেও আরো সংকীর্ণ করে তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা চলেছে। এই প্রবণতা লক্ষ করা যায় সর্বস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে—একেবারে সেইসব জৈব সংগঠন পর্যন্ত যাদের অস্তিত্বের শর্তই হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বক্ষেত্রে তথাকথিত 'উচ্চমার্গের সংস্কৃতি'র প্রসার।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই সেই মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে নানা স্তরের বুদ্ধিজীবীর সম্প্রসারণ ঘটে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে বুদ্ধিজীবী ভূমিকার জটিলতার একটা বাস্তব পরিমাপ পাওয়া যায় বিশেষবিদ্যার অনুশীলনে নিয়োজিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মানবিন্যাস থেকে। যেখানে শিক্ষার আওতার 'ক্ষেত্র' যত বেশি বিস্তৃত, যেখানে শিক্ষাদানের স্তর ওপর থেকে নিচে সংখ্যায় যত বেশি সেই রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক জগৎ তথা সভ্যতা তত বেশি জটিল। শিল্প-প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও একটা তুলনীয় ব্যাপার দেখা যায়। যে-যন্ত্র দ্বারা অন্য যন্ত্র নির্মাণ করা যায়, যন্ত্র নির্মাণের জন্য আরো নিখুঁত যন্ত্র এবং যন্ত্র নির্মাণের জন্য যন্ত্রের উৎপাদনে যে দেশ যত কর্মক্ষম তারই ভিত্তিতে তার শিল্পায়নের মান পরিমাপ করা যায়। পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক গবেষণা-গারের জন্য যন্ত্র নির্মাণে এবং প্রথম স্তরের যন্ত্রগুলির পরীক্ষার জন্য যন্ত্র নির্মাণে যে দেশ সবচেয়ে দক্ষ তাকেই প্রযুক্তিগত-শিল্পগত ক্ষেত্রে জটিলতম এবং সভ্যতার উন্নততম স্তরে প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য করা যায়। এই একই মানদণ্ড প্রয়োগ করা যায় বুদ্ধিজীবী তৈরি করে তোলার ব্যাপারে এবং এই তৈরি করার কাজে নিয়োজিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও। উচ্চমানের সংস্কৃতির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও চর্চাকেন্দ্র পরস্পরের পরিপূরক। এক্ষেত্রেও পরিমাণ ও গুণগত মানের মধ্যে প্রভেদ করা যায় না। যেখানেই প্রযুক্তিগত-সংস্কৃতিগত বিশেষানুশীলন যত সূক্ষ্ম স্তরে উঠেছে, সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপকতম সম্ভবপর বিস্তার ঘটেছে এবং পরিমাণগতভাবে মাধ্যমিক

স্তরে প্রসার ঘটাবার জন্য প্রচণ্ডতম প্রয়াস ঘটেছে। স্বভাবতই আবার উচ্চতম বুদ্ধিজীবী যোগ্যতার জন্য মানুষ বাছাই ও ঐ যোগ্যতার সম্প্রসারণের জন্যই যে ব্যাপকতম সম্ভবপর ভিত্তির প্রয়োজন তথা উচ্চ-মার্গের সংস্কৃতি ও উন্নততম স্তরের প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োজনেই এক গণ-তান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার যে তাগিদ অনুভূত হয়েছিল, তার মধ্যে কিছু অসুবিধার বীজও নিহিত ছিল ; কারণ মধ্য বুদ্ধিজীবী স্তরে বেকারির প্রবল সংকটের সম্ভাবনা এইভাবেই সৃষ্টি হয়। সমস্ত আধুনিক সমাজেই বাস্তবে তা-ই ঘটেছে।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, বাস্তবক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সম্প্রসারণ ঘটে নির্বস্তুক গণতন্ত্রের কোনো পটভূমিকায় নয়, বরং বাস্তব প্রথানুগ বিভিন্ন ঐতিহাসিক পারম্পর্যের মধ্যেই। এইভাবেই অনেক শ্রেণী গড়ে উঠেছে যার মধ্য থেকে প্রথাগতভাবেই বুদ্ধিজীবী বর্গ 'উৎপন্ন' হয়। আবার দেখা যায় যে এইসব শ্রেণীই সেইসব শ্রেণী যারা 'সঞ্চয়েই' বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছে, অর্থাৎ ভূম্যধিকারী নিম্ন ও মধ্য বুর্জোয়া শ্রেণী এবং নিম্ন ও মধ্য নাগরিক বুর্জোয়া শ্রেণীর কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী। 'অর্থনৈতিক' ক্ষেত্র জুড়ে নানা ধরনের (চিরায়ত ও পেশাগত) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিচিত্র সমাবেশ এবং এইসব বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বর্গের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষাই বুদ্ধিজীবী বিশেষানুশীলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপস্থিতি নির্দেশ বা নির্ধারণ করে। এই ধারাতেই ইতালিতে গ্রামীণ বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে যেমন প্রধানত রাষ্ট্রের প্রশাসক ও বিভিন্ন পেশার বিশেষজ্ঞরা বেরিয়ে আসেন, তেমনই নাগরিক বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে বেরিয়ে আসেন শিল্পের প্রযুক্তিবিদেরা। ফলে মুখ্যত উত্তর ইতালি থেকেই আসেন প্রযুক্তিবিদেরা আর দক্ষিণ থেকে আসেন প্রশাসক ও পেশাদার মানুষেরা।

মৌল সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্ক যতটা প্রত্যক্ষ, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ততটা প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু সমাজের সমগ্র বিন্যাস দ্বারা এই সম্পর্ক নানা মাত্রায় প্রভাবিত হয়, যেমন প্রভাবিত হয় বিভিন্ন পরিকাঠামোর জটাজাল দ্বারা ; বুদ্ধিজীবীরা আসলে ঐ উপরিকাঠামোগুলিরই 'প্রয়োগকর্তা'। বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী বর্গ এবং কোনো মৌলিক সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের মাত্রার 'জৈব চারিত্র্যের' মূল্যায়ন করে তাঁদের ভূমিকা এবং পরিকাঠামোগুলির একেবারে অধস্তন স্তর থেকে শীর্ষস্তর পর্যন্ত (অর্থাৎ কাঠামোগত ভিত্তি থেকে ঊর্ধ্বমুখী) একটা ক্রম তৈরি করা যেতে পারে। আপাতত আমরা দুটি মুখ্য উপরিকাঠামোগত 'স্তর' ঠিক করে নিতে পারি। একটিকে বলা যাবে জনসমাজ, অর্থাৎ সচরাচর 'ব্যক্তিগত' বলে বর্ণিত জৈব সম্পর্কগুলির সমাহার ; অন্যটি হল 'রাজনৈতিক সমাজ' বা 'রাষ্ট্র'। এই দুটি স্তরের সঙ্গে সাযুজ্য থাকে একদিকে সেই আধিপত্যের যা প্রধান গোষ্ঠী সমগ্র সমাজের উপর খাটায়, অন্যদিকে রাষ্ট্র ও 'আইনানুগ' সরকারের মধ্য দিয়ে যে

'প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব' বা শাসন চালিত হয়, তার। যে ভূমিকাগুলি আমরা বিবেচনা করছি, তা সম্পূর্ণতই সাংগঠনিক ও যোগসূত্রস্বরূপ। প্রধান গোষ্ঠীর 'প্রতিনিধি' স্বরূপ বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক আধিপত্য ও রাজনৈতিক দেশশাসনের নিম্নবর্গীয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এর মধ্যে আছে :

১। প্রধান মৌল গোষ্ঠী সমাজজীবনের উপর যে সাধারণ লক্ষ্য চাপিয়ে দেয় তার সপক্ষে ব্যাপক জনসাধারণের 'স্বতঃস্ফূর্ত' সম্মতি আদায় ; উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রধান গোষ্ঠী তার স্থান ও ভূমিকার কারণে যে মর্যাদার (ও তারই পরিণামস্বরূপ, আস্থার) অধিকারী, তারই জোরে 'ঐতিহাসিক' কারণেই ঐ সম্মতি পাওয়া যায়।

২। যে-সব গোষ্ঠী সক্রিয়তায় বা নিষ্ক্রিয়তায় ঐ 'সম্মতি' দেয় না, তাদের উপর 'আইনবলে' চাপ সৃষ্টি করার জন্য রাষ্ট্রের বশকারী ক্ষমতা-যন্ত্রের প্রয়োগ। স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি অনাদায়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনের সংকটমুহূর্তের সম্ভাবনায়ই সমগ্র সমাজের জন্যই অবশ্য এই ক্ষমতাযন্ত্র তৈরি করা থাকে।

এইভাবে সমস্যাটিকে সাজালে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সংজ্ঞার যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটে। বস্তুত কেবল এই পথেই প্রকৃত বাস্তবের সমীপবর্তী হওয়া যাবে। এতে কোনো বিশেষ জাতের বদ্ধমূল ধারণাও ধাক্কা খায়। সামাজিক আধিপত্য ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সংগঠিত করার দায়িত্ব থেকেই নিশ্চিতভাবেই এক বিশেষ শ্রমবিভাজন ঘটে যায়, ফলে বিশেষ যোগ্যতার এক সামগ্রিক মান-ক্রম তৈরি হয়ে যায় যাতে নিয়ামক ও সাংগঠনিক ভূমিকার সরাসরি কোনো ইঙ্গিত আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় না। যেমন দেখা যায়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নির্দেশনার ক্ষমতাযন্ত্রে এক ধরনের অনেক কর্মের সংস্থান থাকে যা একেবারেই হাতে কলমে করার বা একান্তই যান্ত্রিক (নির্বাহী পর্যায়ের নয়, পদাধিকারী বা দায়িত্বসম্পন্ন নয়, বরং নিতান্তই আজ্ঞাধীন মাত্র)। অন্য পার্থক্যের মতো এইরকম একটা পার্থক্যও যে করতেই হবে তা বলাই বাহুল্য। অন্তর্লীন লক্ষণ ধরেও বুদ্ধিজীবী ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বিচার করতে হবে ; তাতে যে-সব স্তরপর্যায় বেরিয়ে আসবে তাদের তীব্রতম বিরোধের মুহূর্তে যথার্থ গুণগত পার্থক্য ধরা পড়বে—সবচেয়ে উপরের স্তরে স্থান হবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, দর্শন, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রের স্রষ্টাদের, সবচেয়ে নিচের স্তরে স্থান হবে সবচেয়ে অধস্তন 'প্রশাসকদের' এবং পূর্বতন, প্রথাগত, সঞ্চিত বুদ্ধি প্রসূত সম্পদের বিবরকদের।[৫]

৫। নিম্নবর্গীয় আধিকারিক, ঊর্ধ্বতন আধিকারিক, জেনারেল স্টাফ এবং সচরাচর স্বীকৃত না হলেও যাদের গুরুত্ব সমধিক সেই এন সি ও-দের নিয়ে সামরিক সংগঠনের মধ্যে জটিল মানবৈচিত্র্যের এক উপমান পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, এই অংশগুলিই নিজেদের মধ্যে এক সৌহার্দ্য অনুভব করে এবং বস্তুত অধস্তন স্তরগুলিতেই এক অখণ্ড গোষ্ঠীবোধের সবচেয়ে প্রকট দৃষ্টান্ত দেখা যায় যাতে তারা নিজেরা এক ধরনের 'আত্ম-শ্লাঘা' বোধ করলেও তা নিয়ে আবার অন্যেরা ঠাট্টা-তামাশাও করে থাকে।

এই অর্থে যাঁরা বুদ্ধিজীবী বর্গ বলে চিহ্নিত আধুনিক জগতে তাঁদের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটেছে। গণতান্ত্রিক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এমন বহু সংখ্যক কার্যাবলির উদয় হয়েছে যার সবগুলি উৎপাদনের সামাজিক তাগিদের দান নয় বরং প্রধান মৌল গোষ্ঠীর রাজনৈতিক চাহিদায় তাদের সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে লোরিয়ার অনুৎপাদনক্ষম 'শ্রমিকের' ধারণা (কিন্তু কার সূত্রে বা কোন উৎপাদনব্যবস্থার সূত্রে অনুৎপাদনক্ষম ?)। এই জনসম্প্রদায় তাদের অবস্থানের সুযোগ নিয়ে জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ আদায় করে নেয়, এই কথাটি মনে রাখলে এই ধারণাটিকে খানিকটা যুক্তিসঙ্গত বলে মেনে নেওয়া যায়। যেমন অনেক প্রমাণ চরিত্রের জনসম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, তেমনই এই ক্ষেত্রেও এই জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত থাকে মনস্তাত্ত্বিক বিচারে ও ব্যক্তিগত যোগ্যতার মান অনুযায়ী প্রমাণ চরিত্রের ব্যক্তিসমূহ, এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণেই স্বাভাবিক হয়ে দেখা দেবে সেইসব সংগঠন যারা পেশাগুলিকে মদত দেবে, বেকারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতি উৎপাদন, অভিবাসন ইত্যাদি সামলাবে।

নাগরিক ও গ্রামীণ চরিত্রের বুদ্ধিজীবীদের ভিন্ন অবস্থান

নাগরিক চরিত্রের বুদ্ধিজীবীরা গড়ে উঠেছেন শিল্পব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই, এবং তাদের ভবিষ্যৎ তারই সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। সামরিক বাহিনীতে অধস্তন অফিসারদের ভূমিকার সঙ্গে তাঁদের ভূমিকার তুলনা করা যায়। নির্মাণকর্মের পরিকল্পনার সম্প্রসারণে তাঁদের কোনো স্বাধীন উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ নেই। তাঁদের কাজ বলতে আঁত্রেপ্রেনর ও প্রয়োগকারী জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক রচনা করা এবং শিল্পোদ্যোগের জেনারেল স্টাফ যে উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তার তাৎক্ষণিক রূপায়ণের খবরদারি করা, কাজটির প্রাথমিক পর্বের দেখাশোনা করা। সব মিলিয়ে সাধারণ স্তরের নাগরিক বুদ্ধিজীবীরা একেবারেই গড়পড়তা। ওপরের স্তরের বুদ্ধিজীবীরা তেমনই আবার শিল্পব্যবস্থার জেনারেল স্টাফ-এর সঙ্গে বহুলাংশে অবিচ্ছেদ্যরূপে একাত্ম।

গ্রামীণ চরিত্রের বুদ্ধিজীবীরা বহুলাংশেই 'প্রথাগত' অর্থাৎ তাঁরা যে গ্রামদেশবাসী জনসমষ্টি এবং শহরের (বিশেষত মফঃস্বল শহরের) পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ তারা এখনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আওতায় পড়ে সম্প্রসারিত বা কর্মতৎপর হয়ে ওঠেনি। এই ধরনের বুদ্ধিজীবীরা (আইনব্যবসায়ী, নোটারি প্রভৃতি) কৃষিজীবী জনসাধারণের সঙ্গে স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সম্পর্ক স্থাপন করে। এই কাজের খাতিরেই তাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-সামাজিক ভূমিকা থাকে, কারণ পেশাগত মধ্যস্থতা ও রাজনৈতিক মধ্যস্থতার মধ্যে তফাত করা শক্ত। তা

ছাড়াও গ্রামদেশে বুদ্ধিজীবীদের (পুরোহিত, আইনজীবী, নোটারি, শিক্ষক, ডাক্তার ইত্যাদি) জীবনযাত্রার মান সাধারণভাবে সাধারণ কৃষকের মানের চেয়ে উঁচুতে বা অন্তত পৃথক ; ফলে তাঁরা হয়ে ওঠেন এমন এক সামাজিক উপমান যে কৃষক তাকে তাঁর নিজের অবস্থা থেকে পালিয়ে বা তার উন্নতি ঘটিয়ে অন্য কোথাযও পেঁছবার আকাঙ্ক্ষায় একটা লক্ষ্য বলে ধরতে পারেন। কৃষক সবসময়ই ভাবেন যে তাঁর অন্তত এক পুত্র বুদ্ধিজীবী (বিশেষত পুরোহিত) হতে পারবে, এবং ঐভাবে ভদ্রলোক হয়ে উঠে বাকি অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে তার যে যোগাযোগসূত্র গড়ে উঠতে বাধ্য তারই সুযোগ নিযে সে তাব পবিবারের অর্থনৈতিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে তার সামাজিক অবস্থানটাও কিছুটা তুলতে পারে। বুদ্ধিজীবীদের প্রতি কৃষকের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বৈতভাবাপন্ন এবং আপাতদৃষ্টিতে অন্তর্বিরোধে পরিকীর্ণ। বুদ্ধিজীবীদের ও সাধারণভাবে রাষ্ট্রের কর্মচারীদের সামাজিক অবস্থানের প্রতি সম্ভ্রম সত্ত্বেও কৃষকেরা কখনও কখনও তাদের প্রতি বিদ্বেষের ভাব দেখান। তাতে বোঝা যায় তাঁদের সম্ভ্রমের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে ঈর্ষা ও ক্রোধাবেগেব সহজাত প্রবৃত্তি। বুদ্ধিজীবীদের কাছে কৃষকশ্রেণীর এই বাস্তবিক পরবশতা লক্ষ কবে তার বস্তুনিষ্ঠ ও গভীর পর্যালোচনা না করতে পারলে কৃষকশ্রেণীর সামূহিক জীবন ও তার মধ্যে অন্তর্লীন বিকাশের বীজ ও তাড়নার কিছুই বোঝা যাবে না। কৃষক জনতার মধ্যে প্রত্যেকটি জৈব বিকাশ একটা পর্যায় পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত এবং তার উপর নির্ভরশীলও বটে।

নাগরিক বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপার আলাদা। যন্ত্রজীবী জনতার উপর কারখানার প্রযুক্তিবিদদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার নেই। বা বলা যায় যে ঐ পর্বটি পেরিয়ে আসা গেছে। বরং কখনও কখনও উলটোটাই দেখা যায়। তখন যন্ত্রজীবী জনগণ তাঁদের মধ্য থেকে প্রসূত জৈব বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে প্রযুক্তিবিদদের উপরই রাজনৈতিক প্রভাব খাটান।

আসল প্রশ্নটা হল প্রত্যেক মৌল সামাজিক গোষ্ঠীর একটি জৈব বর্গরূপে উদ্‌ভূত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং প্রথাগত একটি বর্গরূপে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রভেদ। এই প্রভেদ থেকেই বেরিয়ে আসে এমন অনেকগুলি সমস্যা ও সম্ভাব্য প্রশ্ন যা ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় হবার যোগ্য।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে দেখলে যে সমস্যাটি সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে আধুনিক রাজনৈতিক দল ও তার যথার্থ উৎস, বিকাশ ও সম্ভাব্য নানা রূপের। বুদ্ধিজীবীদের সমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে রাজনৈতিক দলের চরিত্র কী দাঁড়াবে ? কয়েকটি প্রভেদ আগেই চিহ্নিত করা যায়।

১। কিছু সামাজিক গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল তৈরি করে কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব জৈব বুদ্ধিজীবীদের উৎপাদনী প্রয়োগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ

না রেখে তাদের সরাসরি রাজনৈতিক ও দার্শনিক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেবার একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা হিসেবে। এইসব সামাজিক গোষ্ঠীর সাধারণ চারিত্র্য এবং তাদের গঠন, জীবন ও বিকাশ বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় যে এই বুদ্ধিজীবীরা কেবলমাত্র এইভাবেই তৈরি হতে পারেন, অন্য কোনোভাবে তৈরি হয়ে ওঠা সম্ভবই নয়।[৬]

২। রাজনৈতিক সমাজে রাষ্ট্র আরো সর্বাঙ্গীণভাবে ও ব্যাপকতর মাত্রায় যে ভূমিকা পালন করে থাকে, সকল সামাজিক গোষ্ঠীর পক্ষেই রাজনৈতিক দলগুলি জনসমাজে সেই ভূমিকাই পালন করে। অর্থাৎ কোনো গোষ্ঠীবিশেষের—প্রধান গোষ্ঠীর—জৈব বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের সুদৃঢ় সম্বন্ধবন্ধন রচনা রাজনৈতিক দলেরই দায়িত্ব। দল যখন এই ভূমিকা পালন করে, তখন সে পুরোপুরি নির্ভর করছে তার মূল দায়িত্বের উপর। এই দায়িত্ব বলতে তার নিজস্ব অঙ্গগুলিকে, অর্থাৎ কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর সেই প্রতিভূদের যারা এক 'অর্থনৈতিক' গোষ্ঠী রূপে জন্মেছে ও বিকশিত হয়েছে, তাদের প্রসারিত করা এবং সুযোগ্য রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী তথা জনসমাজে ও রাজনৈতিক সমাজে একটি সুসংবদ্ধ সমাজের জৈব বিকাশে অন্তর্লীন যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের নেতা (অগ্রগণ্য) ও সংগঠকে পরিণত করে তোলা। জোর দিয়েই বলা যায়. রাষ্ট্র স্পষ্টতই তার অনেকটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করে, রাজনৈতিক দল তার নিজস্ব ক্ষেত্রে সেই ভূমিকা আরো সামগ্রিকভাবে ও জৈবভাবে পালন করে থাকে। একজন বুদ্ধিজীবী যখন কোনো বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দলে যোগ দেন তখন তিনি ঐ গোষ্ঠীর জৈব বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে ঐ গোষ্ঠীর সঙ্গে আরো সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। রাষ্ট্র-জীবনে সীমিত মাত্রায় যোগদানের মধ্য দিয়ে কিংবা কখনও তা ছাড়াই এই সম্পর্কবন্ধন স্থাপিত হয়। এমনও ঘটে যে অনেক বুদ্ধিজীবী ভেবে বসেন যে তাঁরাই রাষ্ট্র। যে-বর্গের বুদ্ধিজীবীরা এমন ভাবতে থাকেন, তা যদি যথেষ্ট লোকবলে বলীয়ান হয়, তবে এই ভাবনা থেকেই কখনও কখনও গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম ঘটতে পারে। ফলে যে মৌল অর্থনৈতিক গোষ্ঠী যথার্থই রাষ্ট্র পদবাচ্য সেই গোষ্ঠীকেই অপ্রীতিকর জটিলতার মধ্যে পড়তে হয়।

কোনো রাজনৈতিক দলের সব সদস্যকেই বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য করতে হবে এমন দাবি করলে তা স্বতঃই পরিহাস বা ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে উঠতে

৬। উৎপাদনী প্রয়োগের মধ্যে যে-বর্গগুলি গঠিত হয় তারা সেনাবাহিনীতে এন সি ও-দের সমবর্গীয়, অর্থাৎ শহরে দক্ষ ও বিশেষকর্মে দক্ষ শ্রমিকেরা এবং গ্রামে (আরো জটিল ভাবে) ভাগচাষী বা অন্যের জমিতে খাজনা দিয়ে কর্মরত কৃষিজীবীরা—কারণ সাধারণ বিচারে এই শ্রেণীর কৃষিজীবীরা অনেকটা কারিগরদের সমবর্গীয়। কারিগরই মধ্যযুগীয় অর্থনীতিতে দক্ষ শ্রমিক।

পারে। অথচ কথাটা একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে এর চেয়ে যথার্থ কিছু হতেই পারে না। বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কিছু প্রভেদ অবশ্য করতেই হবে। কোনো দলের মধ্যে উচ্চতর বা নিম্নতর বর্গের মানুষের সংখ্যা বেশি বা কম হতেই পারে। তাতে কিছু আসে যায় না। তার ভূমিকারই আসলে যা-কিছু গুরুত্ব। সেই ভূমিকা হবে নিয়ামক ও সাংগঠনিক, অর্থাৎ শিক্ষকোচিত তথা মননধর্মী। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা কৃষিজীবীর স্বাভাবিক দাবির কিছু কিছু অংশ দলের মধ্যে চরিতার্থ হলেও কোনো ব্যবসায়ী ব্যবসা করার জন্য, কোনো শিল্পপতি আরো কম ব্যয়ে আরো বেশি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বা কোনো কৃষিজীবী কৃষিকর্মের নতুন পদ্ধতি শিখবার জন্য রাজনৈতিক দলে যোগ দেন না ; যদিও ব্যবসায়ী, শিল্পপতি বা কৃষকের এই জাতীয় চাহিদার খানিকটা দল পুষ্ট করতে পারে।[৭]

ঐ বিশেষ উদ্দেশ্যে সীমিত দায় পালনের জন্য রয়েছে বৃত্তিগত সংগঠন যার মধ্যে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কৃষিজীবীর অর্থনৈতিক শ্রেণীগত ক্রিয়াকলাপ যথার্থ সমর্থনে পুষ্ট হয়। রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোনো একটি অর্থনৈতিক সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিভূরা তাদের ঐতিহাসিক বিকাশের ঐ বিশেষ মুহূর্তের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মাত্রার বৃহত্তর সর্বজনীন ক্রিয়াকর্মের ধারক হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে জৈব ও প্রথাগত বর্গের বুদ্ধিজীবীরা কীভাবে বিকশিত হয়েছে এবং প্রত্যেক জাতির মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক গোষ্ঠী ও বিশেষত যে-সব গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে, তাদের বস্তুনির্ভর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ থেকেই রাজনৈতিক দলের এই ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের গঠন ঐতিহাসিক বিচারে এক অত্যন্ত মনোগ্রাহী সমস্যা। এই সমস্যার সঙ্গে নিঃসন্দেহেই সম্পর্ক রয়েছে ক্ল্যাসিকাল যুগে দাসপ্রথার এবং রোমক সাম্রাজ্যের সামাজিক বিন্যাসে গ্রীক বা প্রাচ্যদেশজাত দাসত্বমুক্ত সম্প্রদায়ের অবস্থানের।

টীকা। প্রজাতন্ত্রী আমল ও সাম্রাজ্যিক আমলের মধ্যে (অভিজাত-সম্প্রদায়গত থেকে গণতান্ত্রিক-আমলাতান্ত্রিক শাসনে রূপান্তর) রোমে বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক স্থিতির যে পরিবর্তন ঘটে তার উদ্যোগ সীজার-এর। তিনি চিকিৎসকদের ও মানবিকী বিদ্যার বিদ্বানদের নাগরিকত্ব দান করেন যাতে তাঁরা রোমে বাস করতে আগ্রহী হন এবং তাঁদের দেখে অন্যেরাও সেখানে আসতে প্রণোদিত হন (দ্র. সুয়েতো-

৭। জনমত এটা মানতেই চায় না। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, যে-ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও কৃষিজীবী 'রাজনৈতিক ধান্দাবাজি'তে নামে তার লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয় এবং তারা নিজস্ব শ্রেণীর মধ্যে সেই নিকৃষ্টতম। এই ধারণাটাই বিতর্কিত।

নিয়স, 'সীজার-জীবনী', ৪২ অধ্যায়)। সীজার প্রস্তাব করেন: ১। রোমে যে-সব বুদ্ধিজীবী ইতোমধ্যেই বসবাস করছেন, তাঁদের রোমে পাকাপাকি ভাবে প্রতিষ্ঠা করে এক স্থায়ী বুদ্ধিজীবী বর্গ সৃষ্টি করা হোক, কারণ তাঁরা এখানে স্থায়ী অধিবাসী না হলে কোনো সাংস্কৃতিক সংগঠন তৈরি করা যাবে না ; এবং ২। সারা রোমক সাম্রাজ্য থেকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের রোমে আকৃষ্ট করা হোক যাতে ব্যাপক মাত্রায় কেন্দ্রীয় প্রবণতা বাড়ানো যায়। এইভাবেই রোমে 'সাম্রাজ্যিক' বুদ্ধিজীবীদের যে বর্গের পত্তন হয়, সেই ধারাতেই আসে ক্যাথলিক পুরোহিত বর্গ। তার বহু প্রভাবচিহ্ন থেকে যায় ইতালীয় বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাসে: যেমন ধরা যায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত তাঁদের বিশিষ্ট 'বিশ্বজনীনতা'।

বুদ্ধিজীবীদের বিরাট অংশের সঙ্গে রোমক সাম্রাজ্যের প্রধান শ্রেণীর এই যে সামাজিক, দেশীয় ও জাতীয় বিভেদ তারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায় রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর জর্মানীয় যোদ্ধৃকুলের সঙ্গে (দাসত্বমুক্ত বর্গের উত্তরসূরী) রোমক জাতির মধ্যে জাত বুদ্ধিজীবীদের ব্যবধানে। এই ব্যাপারের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে ক্যাথলিকদের জন্ম ও বিকাশ। এরই মধ্য থেকে যে ধর্মসংগঠন গড়ে ওঠে তা বহু শতাব্দী ধরে মননধর্মী ক্রিয়াকলাপের একটি বিরাট অংশই ধারণ করে থাকে এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এমন এক একচেটিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে যার বিরোধিতা করবার বা যাকে কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলেই যে-কেউ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সম্মুখীন হতেন। ইতালিতে এই উপদ্বীপের বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বজনীন ভূমিকার যে পরিচয় আমরা পেয়েছি কালভেদে তার তীব্রতার তারতম্য ঘটেছে। এবার আমি দৃষ্টি ফেরাব আরো গুরুত্বপূর্ণ অন্য কয়েকটি দেশের দিকে যেখানে বুদ্ধিজীবীদের বিকাশে অন্যাবিধ লক্ষণ সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাবে। অবশ্য এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করে রাখছি যে এই বিচার আরো গভীরভাবে পরীক্ষা ও সুসংযত করার সুযোগ রয়েছে।

ইতালির ক্ষেত্রে মূল কথাই হল তার বুদ্ধিজীবীদের এই আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন ভূমিকা যা একাধারেই রোমক সাম্রাজ্যের পতন থেকে ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত ব্যাপ্ত ইতালির বিপর্যস্ত দশার কারণ ও পরিণাম।

ফ্রান্স্-এ দেখা যায় একটি জাতির অন্তর্নিহিত যাবতীয় শক্তির এবং বিশেষভাবেই তার মননধর্মী ক্ষেত্রগুলির সুষম বিকাশের একটি পরিণত দৃষ্টান্ত। ১৭৮৯ সালে যখন একটি নতুন সামাজিক গোষ্ঠী ইতিহাসের জমিতে তার রাজনৈতিক উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে, তখনই সেই গোষ্ঠী তার সামাজিক ভূমিকা গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং স্বভাবতই সমগ্র জাতির উপর সর্বাঙ্গীণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেমে পড়তেও পারঙ্গম। পুরনো শ্রেণীগুলির সঙ্গে কোনো মৌল প্রশ্নে আপস করার দায় তাকে নিতে হয় না,

বরং তার নিজস্ব লক্ষ্য সাধনে তাদেরই সে তার ক্ষমতায় বশীভূত করতে পারে। এই নতুন শ্রেণীর প্রথম অর্থনৈতিক অনুসংগঠনগুলির সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রথম বুদ্ধিজীবী অনুসংগঠনগুলিও আবির্ভূত হয়। তার প্রভাব পড়ে ধর্মসংগঠনের উপরেও—যা ধরা পড়ে গ্যালিকানইজ্‌মু-এর মধ্যে, রাষ্ট্র ও ধর্মসংঘের মধ্যে অকালপরিণত লড়াইয়ের মধ্যে। এই বিপুল মননধর্মী কাঠামো থেকেই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে ফ্রান্‌স্‌-এ সংস্কৃতির ভূমিকার চারিত্র্য বোঝা যায়। এই ভূমিকা ছিল একদিকে আন্তর্জাতিক তথা বিশ্বজনীন বহির্মুখী বিকীরণের, অন্যদিকে জৈব পদ্ধতিতে সাম্রাজ্যিক ও আধিপত্যকামী প্রসারণের। ফলে এই ভূমিকা ইতালীয় অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইতালীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তি ছিল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত পরিযানের উপর, ফলে জাতীয় ভিত্তি থেকে প্রতিক্রিয়া আহরণ করে তাতে শক্তি সঞ্চার করতে তাঁরা সমর্থ হননি। বরং তাঁরা একটি শক্তপোক্ত জাতীয় ভিত্তি নির্মাণের সম্ভাবনাকেই বিনষ্ট করতে মদত জুগিয়েছেন।

ইংলণ্ডের বিকাশ ফ্রান্‌স্‌ থেকে খুবই আলাদা রকমের। আধুনিক শিল্পব্যবস্থার ভিতের উপর যে নতুন সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে উঠে, তার লক্ষণীয় অর্থনৈতিক-সাংগঠনিক বিকাশ ঘটলেও বৌদ্ধিক-রাজনৈতিক স্তরে তার অগ্রগতি থেকে যায় অনিশ্চিত অনির্দেশ্য। এখানে জৈব বুদ্ধিজীবীদের এক বিশাল সম্প্রদায় দেখা যায়—যারা অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে একই শিল্পভূমিতে আবির্ভূত হয়। কিন্তু উচ্চতর স্তরে দেখা যায়, পুরনো ভূম্যধিকারী শ্রেণীই কার্যত একচেটিয়া ক্ষমতার আসনে বহাল রয়েছে। অর্থনৈতিক প্রাধান্য হারিয়েও তারা বহুদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক-বৌদ্ধিক প্রাধান্য রক্ষা করে যায়, 'প্রথাগত বুদ্ধিজীবী'-দের মধ্যে এবং নতুন ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টিতে অগ্রগণ্য ('দিরিজেন্তে') গোষ্ঠী বলে গণ্য হয়। অন্য দেশে যে-ধরনের সূত্রে প্রথাগত বুদ্ধিজীবীরা নতুন প্রধান শ্রেণীগুলির সঙ্গে যুক্ত হন, ঠিক সেই রকম সূত্রেই এখানে পুরনো ভূম্যধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় শিল্পপতিদের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ইংলণ্ডের এই ঘটনা-পরম্পরা জর্মনিতেও দেখা যায়, সেখানে অবশ্য অন্য কিছু ঐতিহাসিক ও প্রথাগত ব্যাপার জটিলতা সৃষ্টি করে। ইতালির মতো জর্মনিও ছিল একটি অতিজাতিক প্রতিষ্ঠান ও ভাবাদর্শের পীঠস্থান। জর্মন জাতির পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য নামে পরিচিত এই মধ্যযুগীয় বিশ্বরাষ্ট্রের চালনার জন্য বিশেষ সংখ্যক কর্মী জোগাতে গিয়ে জর্মনি তার নিজস্ব শক্তিক্ষয় করেছে এবং এমন সংঘাতের জন্ম দিয়েছে যাতে জাতীয় সংহতির সমস্যাগুলিতে হাত দেওয়ার অবকাশ মেলেনি; ফলত মধ্যযুগের ভৌগোলিক বিশৃঙ্খলা অব্যাহত রয়ে গেছে। শিল্পবিকাশ ঘটেছে এক আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যা ১৯১৮-র নভেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইংলণ্ডে অনুরূপ অবস্থানের গোষ্ঠীর চেয়ে জর্মনিতে ইয়ুংকার-রা আরো সুদৃঢ় রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক প্রাধান্য কায়েম রেখেছে। তারাই ছিল

জর্মন শিল্পপতিদের প্রথাগত বুদ্ধিজীবী। কিন্তু তাদের ছিল বিশেষ কিছু অধিকার এবং এক স্বাধীন সামাজিক গোষ্ঠীর প্রবল বোধ। এই বোধের ভিত্তি ছিল জমির উপর তাদের সমধিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা যা ইংলণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি 'উৎপাদনক্ষম' ছিল। প্রুশিয়ার ইয়ুংকার-রা ছিল একাধারে পুরোহিত ও সামরিক একটি গোত্রস্বরূপ। রাজনৈতিক সমাজে নিয়ামক-সাংগঠনিক ভূমিকায় তাদের যেমন কার্যত একচেটিয়া অধিকার ছিল, তেমনই ছিল নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি; ফলে প্রধান অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর দাক্ষিণ্যের উপর তাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হত না। উপরন্তু ইংলণ্ডের ভূম্যধিকারী অভিজাততন্ত্রের থেকে ইয়ুংকার-দের আরেকটি পার্থক্যস্থল, তারা ছিল একটি বিশাল স্থায়ী সামরিক বাহিনীর অফিসার শ্রেণী, ফলে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক অতি পোক্ত সাংগঠনিক ক্যাডার শ্রেণী যারা তাদের অভ্যন্তরীণ শ্রেণীবোধ ও তাদের একচেটিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা রক্ষায় সহায় ছিল।[৮]

রুশ দেশে দেখা গেছে বিভিন্ন লক্ষণ। নরম্যান (ভ্যারানজিয়ান)-রা এখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক-ব্যবসায়িক সংগঠন সৃষ্টি করে; বাইজ্যানটাইন গ্রীকেরা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক সংগঠন। পরবর্তীকালে জর্মনরা ও ফরাসিরা রুশ দেশে ইয়োরোপীয় অভিজ্ঞতা বয়ে আনে এবং রুশ ইতিহাসের প্রোটোপ্ল্যাজম্-কে প্রথম সুসমন্বিত এক কাঠামো দেয়। জাতির নিজস্ব শক্তি তখন নির্জীব, নিষ্ক্রিয়, কিন্তু গ্রহণে আগ্রহী; বোধহয় সেই কারণেই এই জাতি বিদেশি প্রভাবসমূহ এবং বিদেশিদেরও সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নেয়, তাদের সম্পূর্ণ রুশ করে নেয়। ইতিহাসে আরো সাম্প্রতিককালে কিন্তু উলটো ব্যাপারটাই দেখা গেছে। সমাজের সবচেয়ে সক্রিয়, তাজা, উদ্যোগী ও সুশৃঙ্খল ব্যক্তিদের একাংশকে নিয়ে গঠিত এক এলীট শ্রেণী বিদেশে চলে গিয়ে পশ্চিমের সবচেয়ে অগ্রগামী দেশগুলির সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা আত্মস্থ করে ফেলে; অথচ তাদের নিজেদের জাতীয় চরিত্রের মৌল লক্ষণগুলি অটুট রাখে, নিজেদের স্বজাতীয়দের সঙ্গে আবেগ ও ইতিহাসের যোগসূত্রগুলি অক্ষুণ্ণ রাখে। এই বৌদ্ধিক শিক্ষানবিশি সম্পূর্ণ করে তারা স্বদেশে ফিরে এসে জনসাধারণকে জোর করে জাগিয়ে তোলে, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কয়েকটি ধাপ এইভাবে তারা

৮। মাক্স্ ভেবার-এর 'জর্মনিতে নয়া জমানায় পার্লামেণ্ট ও সরকার' নামে বইতে কিছু উপাদান পাওয়া যায় যাতে দেখা যায় অভিজাত বর্গের একচেটিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা কীভাবে বুর্জোয়া রাজনৈতিক কর্মীদের এক ব্যাপক ও অভিজ্ঞ শ্রেণীর সম্প্রসারণকে ব্যাহত করেছে, এবং কীভাবে ক্রমাগত পার্লামেণ্টারি সংকট ও উদারপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের ভাঙনের মূলে তা কাজ করে চলেছে। এই কারণেই ক্যাথলিক কেন্দ্র ও সোশ্যাল ডেমক্রাসির গুরুত্ব। সাম্রাজ্যের পর্বে সোশ্যাল ডেমক্রাসি নিজেদের পার্লামেণ্টারি ও নিয়ামক স্তর ইত্যাদি গড়ে তুলতে অনেক দূর পর্যন্ত সফল হয়েছিল।

টপকে যেতে পারে। জর্মান থেকে আমদানি করা এলীট (যেমন আমদানি করেছিলেন রুশ দেশের মহান পিটার) থেকে এই এলীট-এর পার্থক্য এদের মূলত জাতীয়-জনপ্রিয় চারিত্র। রুশ জনসাধারণের নির্জীব অক্রিয়তা এই শ্রেণীকে গ্রাস করে নিতে পারেনি, কারণ এই শ্রেণী ছিল রুশ দেশের নিজের ঐতিহাসিক নির্জীবতার বিরুদ্ধে তার সবল প্রতিক্রিয়ার প্রতিমূর্তি।

আরেক ভৌগোলিক ক্ষেত্রে, একেবারেই ভিন্ন স্থান-কালের পরিবেশে রুশ ঘটনাপরম্পরার তুল্য ব্যাপার লক্ষ করা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিন জাতির উন্মেষের ইতিহাসে। যে অ্যাংলো-স্যাক্সন সম্প্রদায় ইংলণ্ড থেকে এখানে এসে বসতি করেন তাঁরা নিজেরাই ছিলেন এক বুদ্ধিজীবী এলীট; শুধু বুদ্ধিজীবী নয়, বরং আরো বিশেষ ভাবেই এক নীতিসচেতন এলীট। আমি বলছি স্বভাবতই সেই প্রথম অভিবাসীদের কথা, সেই অগ্রগামী শ্রেণীর কথা, যাঁরা ইংলণ্ডে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগ্রামের পুরোভাগে থেকে পরাভূত হয়েছিলেন কিন্তু স্বদেশে আত্মাবমাননা বা হীনতা মেনে নেন নি। নিজেদের নৈতিক বল ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির সঙ্গেই তাঁরা আমেরিকায় নিয়ে এসেছিলেন এক বিশেষ স্তরের সভ্যতা, ইয়োরোপের ঐতিহাসিক বিকাশের একটি বিশেষ স্তর। আমেরিকার অনাবাদি মাটিতে এই রকম মানুষেরা যখন তা বপন করলেন, তখন থেকেই তা তার অন্তর্নিহিত শক্তিগুলিকে বিকশিত করে চলেছে। এখানকার বিকাশ তাই পুরনো ইয়োরোপের তুলনায় অনেক দ্রুত। কারণ ইয়োরোপে রয়েছে একরাশ প্রতিবন্ধক (নৈতিক, বৌদ্ধিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, যা জনসাধারণের বিশেষ বিশেষ অংশের মধ্যে জমাট বেঁধে রয়েছে, অতীত শাসনের সেইসব চিহ্ন যা কিছুতেই মরতে চায় না), যা দ্রুত অগ্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেই এবং প্রত্যেক উদ্যোগকে এনে দাঁড় করাবেই মাঝারিপনার ভারসাম্যে যাতে তার শক্তি স্থান-কালের আবহে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের অপ্রতুলতা। ফলে সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেখা যায় অন্য ধরনের একটা ভারসাম্য। একটা শিল্পনির্ভর ভিত্তির উপরে এখানে আধুনিক উপরিকাঠামোগুলির সমগ্র ক্ষেত্রের বিপুল বিকাশ ঘটেছে। জৈব বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের মেলবন্ধন ঘটাবার তাগিদ থেকে ভারসাম্য রচনার আবশ্যকতা নির্ধারিত হয় না। বরং একক সংস্কৃতির এক জাতীয় ক্রুসিবল্-এ বিভিন্ন জাতীয় অভিবাসীদের বয়ে আনা নানা ধরনের সংস্কৃতিকে গলিয়ে এক করে দেবার তাগিদেই ভারসাম্য সৃষ্টির তাগিদ নির্ধারিত হয়। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসসমৃদ্ধ দেশগুলিতে প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের যে ব্যাপক পলল দেখা যায় তার অবর্তমানেই দুটি মাত্র মুখ্য রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের অন্তত আংশিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বস্তুত এই দুটি দলকে কমিয়ে একটাও করা যায়। (এর সঙ্গে ফ্রান্স্-এর পরিস্থিতির তফাৎ লক্ষ করুন; কেবলমাত্র যুদ্ধোত্তর পর্বেই নয়, যদিও

তখন বহুসংখ্যক দলের অস্তিত্বই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল)। উলটো দিকে ধর্মীয় অনুগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যার ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় ঐ একই তথ্যে।[৯]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরো একটি ব্যাপার প্রণিধানযোগ্য। এই ব্যাপারটি হল বিস্ময়কর হারে এমন নিগ্রো বুদ্ধিজীবীদের গঠন যাঁরা মার্কিন সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান আত্মস্থ করে নেন। এই নিগ্রো বুদ্ধিজীবীরা আফ্রিকার পশ্চাৎপদ জনগণের উপর কী অপ্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলতে পারেন, তা মাথায় রাখা উচিত। বস্তুত নিম্নোক্ত সম্ভাবনাগুলির যে-কোনো একটি কখনও বাস্তব হয়ে উঠলে ঐ প্রভাব প্রত্যক্ষও হয়ে উঠতে পারে: (১) যদি মার্কিন সম্প্রসারণবাদ আফ্রিকার বাজার দখল ও মার্কিন সভ্যতা বিস্তারের (এই রকম একটা কিছু ইতোমধ্যেই ঘটেছে, যদিও তা কতদূর পর্যন্ত গেছে তা আমার জানা নেই) অভিযানে মার্কিন নিগ্রোদের তার প্রবক্তা হিসেবে ব্যবহার করে; (২) যদি মার্কিন জাতির ঐক্য সাধনের সংগ্রাম এমনভাবে তীব্র হয়ে ওঠে যাতে নিগ্রোদের মধ্যে সবচেয়ে স্বাধীনচেতা ও বলবান বুদ্ধি-জীবীরা দেশ ত্যাগ করে আফ্রিকায় ফিরে যেতে বাধ্য হন; কারণ বর্তমানে প্রচলিত ব্যাপক সামাজিক বিধির চেয়েও অবমাননাকর কোনো সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আইন মেনে নিতে এঁরাই সবচেয়ে পরাঙ্মুখ হবেন। এই ব্যাপারটি যদি ঘটে যায় তা থেকে দুটি মৌল প্রশ্ন উঠে আসবে: (১) ভাষাগত: ইংরেজি কি তখন আফ্রিকার শিক্ষিত মানুষের ভাষা হয়ে উঠে বর্তমানের বিপুল সংখ্যক উপভাষার ভিড়ের মধ্যে ঐক্য বিধান করতে পারবে? (২) আফ্রিকী জাতিসমূহের মধ্যে অবজ্ঞাত জাতিরূপে গণ্য বলে যে প্রাচীন গ্লানিবোধ বর্তমান, তা থেকে তাঁদের মধ্যে এমন এক 'জাতীয়' ভাবের সৃষ্টি করা যাতে আফ্রিকা মহাদেশ সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ জাতির আদি পিতৃভূমির এক পুরাণোপম মর্যাদা লাভ করে—এই রূপান্তর ঘটাবার মতো যথেষ্ট সাঙ্গীকরণ ও সংগঠনের ক্ষমতা কি এই বুদ্ধিজীবী বর্গের আয়ত্ত? আমার মনে হয়, এই মুহূর্তে মার্কিন নিগ্রোদের মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ বা জাতি-কুলবোধ দেখা যাচ্ছে তা সদর্থক নয়, নঞর্থক; তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে হতাশায় নিমজ্জিত করার জন্য শ্বেতাঙ্গরা যে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে, তারই প্রতিক্রিয়া মাত্র। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এবং তারপরও ঐ গোটা শতাব্দী জুড়ে ইহুদিদেরও কি ঐ একই অবস্থায় থাকতে হয় নি? লাই-বেরিয়া ইতোমধ্যেই সম্পূর্ণ মার্কিনি বনে গেছে; ইংরেজিই তার সরকারি ভাষা। এই লাইবেরিয়াই হয়ে উঠতে পারে মার্কিন নিগ্রোদের জাইঅন, এক আফ্রিকী পীডমণ্ট প্রতিষ্ঠার পথে পদক্ষেপ।

মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্ন বিবেচনা করতে গেলে

৯। আমার ধারণা দুশোরও বেশি এমনি ধর্মীয় উপদলের হিসেব পাওয়া গেছে। আবার তুলনা করে দেখা যায় ফ্রান্স-এর ঘটনাপরম্পরার সঙ্গে, যেখানে ফরাসি জনসাধারণের ধর্মীয় ও নৈতিক সংহতি বজায় রাখার জন্য প্রবল সংগ্রাম চলে।

আমার মনে হয় কয়েকটি মৌলিক ব্যাপার মনে রাখতে হবে। মধ্য বা দক্ষিণ আমেরিকাতেও প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের কোনো বিপুল সমাবেশ নেই, কিন্তু প্রশ্নটি এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো চরিত্র নিয়ে দেখা দেয় না। বস্তুত এই সমস্ত দেশে এই বিকাশের মূলে আমরা যা দেখি তা হল, কাউনটার-রিফর্মেশন ও সামরিক পরজীবীতন্ত্রের পরিণামে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেনীয় ও পর্তুগীজ সভ্যতা যে ধরন লাভ করেছিল, তা-ই। এই দেশগুলিতে যে-দুটি সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের চাপ প্রতিহত করে অদ্যাবধি টিঁকে রয়েছে তারা হল পুরোহিত শ্রেণী ও সামরিক শ্রেণী। এই দুই বর্গই প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণী বলে গণ্য হবে, ইয়োরোপীয় উৎস-ভূমি থেকে যে আকারে তারা এসে পৌঁছেছিল, সেই আকারেই তারা প্রস্তরীভূত হয়ে রয়ে গেছে। এই দেশগুলিতে শিল্পের ভিত্তি খুবই সংকীর্ণ। সেই ভিত্তি থেকে কোনো জটিল উপরিকাঠামোও গড়ে ওঠে নি। এখানে বুদ্ধিজীবীদের বৃহদংশই গ্রামীণ বর্গের, এবং যেহেতু এখানে এক একটি বিশাল জমিদারি সম্পত্তিরই প্রাধান্য এবং ধর্মসংঘের আয়ত্তে রয়েছে বিপুল সম্পত্তি, তাই স্বভাবতই এই বুদ্ধিজীবীদের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে পুরোহিত শ্রেণী ও বড় ভূম্যধিকারীদের সঙ্গে। শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর মধ্যেও জাতিগত বিন্যাস অত্যন্ত অসম্বদ্ধ। এই পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলেছে বিপুল সংখ্যক ইণ্ডিয়ান জাতিভুক্ত অধিবাসীর উপস্থিতি; কোনো কোনো দেশে এঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বলা যায়, আমেরিকা মহাদেশের এই অঞ্চলগুলিতে এখনও কুলটুরকাম্‌প্‌ফ্‌ ও দ্রেফুস মামলার সময়কার পরিস্থিতি রয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এমন একটা অবস্থা যাতে ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া অংশ এখনও সেই স্তরে পৌঁছয়নি যেখানে পৌঁছলে আধুনিক রাষ্ট্রের ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতির শক্তি প্রয়োগ করে তারা পুরোহিততন্ত্রের ও সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রভাব ও স্বার্থকে খর্ব করতে পারে। ফলে ফ্রীমেসন সম্প্রদায় ও পজিটিভিস্ট চার্চ-এর মতো সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ জেসুইটবাদের বিরুদ্ধতায় প্রবল প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। মেক্‌সিকোয় কালেস্‌-এর কুল-টুরকাম্‌প্‌ফ্‌ থেকে শুরু করে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, পেরু, চিলি ও বোলিভিয়া প্রভৃতি দেশে খুবই সাম্প্রতিক কালে যা ঘটেছে তা থেকে এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রমাণ হয়ে যায়।

বুদ্ধিজীবীদের অন্য ধরনের বর্গের গঠন ও জাতীয় শক্তিসমূহের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের অন্যতর বিন্যাস দেখা যায় ভারত, চীন ও জাপানে। জাপানে আছে ইংলণ্ডের ও জর্মানির ধাঁচের বিন্যাস; অর্থাৎ এমন এক শিল্পনির্ভর সভ্যতা যা অভ্রান্তভাবেই স্বকীয় সব লক্ষণ সমন্বিত এক সামন্ততান্ত্রিক-আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বিকাশ লাভ করে।

চীনে আছে লিপি—যা আসলে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের দ্যোতক। ভারত ও চীন, দুই দেশেই বুদ্ধিজীবী সমাজ ও জনগণের মধ্যে দুস্তর বিচ্ছেদের প্রকাশ দেখা যায় ধর্মের ক্ষেত্রেও।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকমের বিশ্বাস এবং একই ধর্ম ঘিরে বিভিন্ন ধারণা ও আচারবিধি এবং বিশেষত তারই ভিত্তিতে পুরোহিত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী সমাজ ও জনগণের মধ্যে গড়ে ওঠা বিভাজন নিয়ে গবেষণা করা দরকার, কারণ এই ব্যাপারটি সর্বত্রই খানিকটা ঘটে থাকে; কিন্তু পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতেই এই ব্যাপারটি তার চরম রূপ পরিগ্রহ করে। প্রটেস্টান্ট দেশগুলিতে এই বিভাজন অপেক্ষাকৃত কম (জনগণের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের নিখুঁত জোড় রচনার তাগিদেই ধর্মীয় উপদলের ছড়াছড়ি, ফলে জনগণের প্রাত্যহিক ধ্যানধারণার যাবতীয় স্থূলতা উচ্চতর সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়)। এই বিভাজন ব্যাপারটি ক্যাথলিক দেশ-গুলিতেই বেশি লক্ষণীয়, যদিও তার মাত্রার তারতম্য আছে। জর্মানি ও ফ্রান্স্-এর ক্যাথলিক অঞ্চলগুলিতে এই প্রবণতা কম; ইতালিতে অপেক্ষা-কৃত বেশি, বিশেষত দক্ষিণাংশে এবং দ্বীপগুলিতে; এবং খুবই বেশি আই-বেরীয় উপদ্বীপে ও দ্বীপপুঞ্জে। অরথোডক্স্ খ্রিস্টধর্মের দেশগুলিতে এই প্রবণতার মাত্রা ঊর্ধ্বমুখী; সেখানে একই ধর্মের তিনটি পৃথক ধাপের কথা এসে পড়ে: উচ্চতর পুরোহিত শ্রেণী ও সন্ন্যাসীরা, ধর্মসংঘ-বহির্ভূত পুরোহিত শ্রেণী এবং জনসাধারণ। এই প্রবণতা পূর্ব এশিয়ায় এক ধরনের অসারতায় পর্যবসিত হয় যখন জনসাধারণের আচরিত ধর্মের সঙ্গে প্রায়শই বইতে লিপিবদ্ধ ধর্মের কোনো সম্পর্কই থাকে না, যদিও দুই-ই একই ধর্মের নামে চিহ্নিত হয়।

শিক্ষা প্রসঙ্গে

[**সম্পাদকীয় ভূমিকা**। মুখ্যত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রামশি-র এই রচনাটি সমকালীন ইতালির শিক্ষা সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত। ১৯২২ সালের অকটোবরে সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনীর জোরে বেনিতো মুসোলিনি ইতালিতে প্রথম ফ্যাশিস্ত রাজ কায়েম করেন। ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শিক্ষাব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেন। গ্রামশি-র সূত্র অনুসরণ করেই বলা যায়, ফ্যাশিস্ত বাহিনীর জোরে রাষ্ট্রক্ষমতায় 'প্রাধান্য' অর্জন করেও মুসোলিনি বুঝেছিলেন, জাতির মূল্যবোধকে প্রভাবিত করেই তাঁকে 'আধিপত্য' লাভ করতে হবে, তবেই ফ্যাশিস্ত শাসন যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই লক্ষ্যসাধনেই তিনি একদিকে দেশ ও বিদেশের 'প্রথাগত' বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাশিস্ত মূল্যবোধ ও আদর্শের মোহে আচ্ছন্ন করে তাঁদের 'সম্মতি' আয়ত্ত করার চেষ্টায় নামেন। একাজে তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথকেও ব্যবহার করেন। যদিও কিছুদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ হয় এবং তিনি ফ্যাশিবাদের স্বরূপ চিনতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের আঁকা মুসোলিনির ব্যঙ্গপ্রতিকৃতি স্পষ্টভাবে এই পরিচয় বহন করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তদানীন্তন উদীয়মান নেতা জওয়াহরলাল নেহরুকেও মুসোলিনি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য সাদর নিমন্ত্রণ জানান। নেহরু অবশ্য সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। অন্যদিকে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে ফ্যাশিস্ত তন্ত্রের 'জৈব' বুদ্ধিজীবী বর্গ গঠনের উদ্যোগও গ্রহণ করেন মুসোলিনি। কোনো শাসকশ্রেণী এইভাবে তার 'আধিপত্য'কে কায়েম করতে গেলে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শুরু হতে পারে পালটা এক শিক্ষাব্যবস্থার জন্য দাবি জানিয়ে। এই প্রেক্ষাপটেই গ্রামশি-র শিক্ষাচিন্তার তাৎপর্য।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে ফ্যাশিস্ত বিশ্ববিদ্যালয়-ছাত্রদের উদ্দেশে এক ভাষণে মুসোলিনি বলেন, 'ফ্যাশিস্ত সরকারের প্রয়োজন এক শাসক শ্রেণীর। রাষ্ট্র শাসনের জন্য আবশ্যক কর্মকর্তাদের আমি শূন্য থেকে সৃষ্টি করতে পারব না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেই তাদের ক্রমে ক্রমে গঠন করে দিতে হবে আমার জন্য ··· আমরা পশ্চাদ্‌-পদ ও সদ্যোপস্থিত বলেই আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সবলে শক্তি-মান করে তুলতে হবে। ··· এই হল জেন্‌তীল সংস্কারের গভীরতর কারণ।' ক্রোচে ও জেন্‌তীল সনাতনী ইতালীয় শিক্ষারীতির বিরুদ্ধে শতাব্দীর আরম্ভ থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন। গ্রামশি

যখন 'নির্দেশন ও শিক্ষার পার্থক্যের ওপর অত্যধিক জোর' দেওয়ার কথা বলেন, তখন তিনি জেন্তীল ও ক্রোচে-র শিক্ষাতত্ত্বের কথাই বলছেন, গ্রামশি-র মতে, কোনো শিক্ষক তাঁর 'তাজা কাজকর্মের' মধ্য দিয়ে এই বিচ্ছেদ ভরাট করে দিতে পারেন। মুসোলিনির পূর্বসূরী জ্যালিত্তির ১৯২১ সালের সরকারে শিক্ষামন্ত্রী রূপে ক্রোচে যে নতুন শিক্ষানীতির প্রবর্তন করেন, ১৯২৩ সালে মুসোলিনি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী জেন্তীল তারই ভিত্তিতে সেই নীতিকে পূর্ণতা দেন। 'শিক্ষণীয়তা' ও 'সক্রিয় শিক্ষা', এইসব ধারণার আড়ালে, গণতন্ত্রীকরণের নামে তাঁরা যে শিক্ষাদর্শকে আক্রমণ করছিলেন তার ভিত্তি প্রোথিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতালীয় নবজাগৃতিকালে, এবং সেই আদর্শই নিহিত ছিল ১৮৫৯-এর কাসাতি কানুনে, যে-কানুন মেনেই ইতালির পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

কাসাতি কানুনের আওতায় যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাতে জিনাসিও ও লিচেও নামে স্কুলের যে বিভাজন ছিল তাতে জিনাসিও পর্ব থেকে লিচেও পর্বে উত্তরণে শিক্ষাপদ্ধতির কোনো পরিবর্তন ঘটত না, কেবল লিচেও পর্বে ধরে নেওয়া হত, ছাত্রছাত্রী বয়সে-বুদ্ধিতে আরো পরিণত হয়ে উঠেছে, আর সেইমতো তাদের শিক্ষাদান করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্বের জন্য প্রস্তুত করে নেওয়া হত। জিনাসিও ও লিচেও, দুই পর্বেই জোর দেওয়া হত লাতিন ভাষা তথা সেই ভাষায় বিধৃত সমগ্র সংস্কৃতির উপর। এই ধারাকে উলটে দিয়েই জেন্তীল একদিকে ক্ল্যাসিকাল ও বৃত্তিমূলক (পেশাভিত্তিক) স্কুলের বিভাজনের উপর জোর দেন, অন্যদিকে শিক্ষাদান-শিক্ষাগ্রহণকে সহজ করে দেবার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি তিনি সমস্ত ইতালীয় স্কুলে ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক করে দেন। গ্রামশি অন্যত্র বলেন: 'জেন্তীল-এর চিন্তার··মূলে রয়েছে এই ধারণা যে জনসাধারণের জন্য ধর্মের উপযোগিতা আছে, যেন জনসাধারণ শিশু তথা চিন্তার আদিমতম স্তরের সমার্থক এবং ধর্ম সেই স্তরেরই পরিপোষক। এইভাবেই তিনি একরোখা মেজাজে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যকেই জলাঞ্জলি দেন।'

প্রধান শ্রেণীসমূহ ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য ক্ল্যাসিকাল স্কুল, যেখানে থাকবে মানবিকী বিদ্যার সামগ্রিক চর্চার সমূহ সুযোগ, এবং অধস্তন শ্রেণীর জন্য বৃত্তিমূলক (পেশাভিত্তিক) স্কুল, এবং দুয়ের মাঝামাঝি আবার কারিগরি শিক্ষার স্কুল, যা বৃত্তিমূলক কিন্তু কায়িক শ্রমভিত্তিক নয়, এই তিন ধরনের স্কুলের ব্যাপক বিন্যাসে আপাতদৃষ্টিতে গণতন্ত্রের লক্ষ্যই সাধিত হচ্ছে বলে মনে হয়। অর্থাৎ বৃহত্তর সংখ্যক অধস্তন শ্রেণীর মানুষ কোনো বিশেষ বৃত্তি বা পেশার বিশেষ দক্ষতায় দ্রুত শিক্ষিত হয়ে উঠে কাজ পাবার সুযোগ পেয়ে

যাচ্ছেন এই ব্যবস্থায়। পাশাপাশি যাঁদের সেই অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বা অবকাশ আছে সেই অল্পসংখ্যক শ্রেণীও সুযোগ পাচ্ছেন উচ্চতর মার্গের এক শিক্ষাক্রমের। কিন্তু গ্রামশি লক্ষ করেন যে এই বিভাজনে 'গ্রীক-রোমক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মানব-মুখী সর্বগ সংস্কৃতির আদল' ভেঙে এই 'বিশেষ বিশেষ বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্কুল ··· ছাত্রদের নিয়তি ও ভবিষ্যৎ ও কার্যকলাপ সবই আগে থেকে নির্ধারিত' করে দিচ্ছে। বৃত্তিমূলক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কোনোদিনই রাষ্ট্রচালনা বা রাষ্ট্রশাসনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যথা-যোগ্য ভূমিকা গ্রহণের উপযুক্ত শিক্ষা এমনকী তথ্য/তত্ত্বসম্ভারও আয়ত্ত করতে পারছেন না। ফলে শেষ পর্যন্ত শাসকশ্রেণীর জৈব বুদ্ধিজীবী বর্গ তথা এক বিশেষ এলীটের হাতেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে, ফ্যাশিস্ত শাসকশ্রেণী এইভাবেই তার আধিপত্যকে প্রসারিত করতে পারবে। এই আশংকা থেকেই গ্রামশি যে নতুন শিক্ষানীতি প্রস্তাব করেছেন, তাতে এমন এক বুনিয়াদি শিক্ষার ভিত থাকবে যাতে 'ব্যবহারিক কার্যকারিতার' পাশাপাশি 'কর্তব্য ও অধিকারের' শিক্ষার সুযোগ থাকবে, যাতে সাধারণ স্কুলের শেষ পর্বে 'মানবতার' 'মৌলিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা' যাবে এবং 'সেই সঙ্গে বৌদ্ধিক শৃংখলাবোধ ও নৈতিক স্বাধীনতার' বোধও যুক্ত করা যাবে।

সাবেকি ক্ল্যাসিকাল শিক্ষাধারায় লাতিন ভাষার ব্যাকরণনির্ভর, যান্ত্রিক, মুখস্থবিদ্যাশ্রিত শিক্ষার বিরুদ্ধে জেনতীল-এর আক্রমণের মুখে গ্রামশি নিয়ে আসেন দুটি অকাট্য যুক্তি। তিনি বলেন, লাতিন যে শুধু ইতালীয় ভাষার উৎস, তা-ই নয়, লাতিন ইতালীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ধারকও বটে। ছাত্রছাত্রীরা লাতিন ভাষার শিক্ষাকালে শুধু ভাষা শিখছেন না, আত্মস্থ করছেন এক সুদীর্ঘ পরম্পরা যার আদিতে আছে 'দ্বাদশ স্তম্ভে' বিধৃত সেই আইন যা খ্রিস্টপূর্ব ৪৫১-৫০ অব্দে ব্রোন্‌জ্‌ ফলকে খোদিত হয়ে রোমক প্রজাতন্ত্রের আইন ও বিচারব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই প্রথম অলিখিত দুর্জ্ঞেয় এক বিধিব্যবস্থা নাগরিকদের আয়ত্তের মধ্যে এসে গিয়েছিল, তাদের প্রতিদিনের জীবনে স্থান করে নিয়েছিল। শহরের মাঝখানে সকলের দৃষ্টির সম্মুখে খোদিত এই আইনের খণ্ড উদ্ধৃতিমাত্র রয়ে গেছে পরবর্তী লাতিন সাহিত্যের পরম্পরায়। 'দ্বাদশ স্তম্ভের' আইনের সূত্রে যেমন ইতালীয় আইনের সূত্রপাত, তেমনই তার সাহিত্যের সূত্রপাত ইনিয়ুস্‌ (খ্রি. পূ. ২৩৯—১৬৯ অব্দ)-এর 'আনালেস্‌' নামে মহাকাব্যে যার অষ্টাদশ পর্বের মধ্যে মাত্র ৫০০ ছত্র টিঁকে আছে। ক্ল্যাসিকাল রোমক সাহিত্যের ইতিহাস শেষ হয়ে যায় ফায়েদ্রুস (আনু. খ্রি. পূ. ১৫—৫০ খ্রি.)-এর কাব্যে লেখা নীতিকাহিনী ও লাতিনের প্রথম খ্রিস্টীয় লেখকদের সৃষ্টিতে

এসে। লাতিন ভাষার মধ্যেই ইনিয়ুস ও নাট্যকার প্লাউতুস (আনু. খ্রি. পূ. ২৫৪—১৮৪)-এর যুগ থেকে চিচেরো (খ্রি. পূ.১০৬—৪৩) বা তেরতুল্লিয়ান (আনু. খ্রি. ১৬০—২২৫) বা লাক্তানতিউস্ (আনু. খ্রি. ২৫০—৩১৭)-এর যুগে যে পরিবর্তন ঘটে যায় তাতে ভাষার বিবর্তন লক্ষ করতে করতেই জানা হয়ে যায় এক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিবর্তন ও তার নানা প্রবণতা।

প্রাথমিক ও মধ্য স্তরের স্কুল শিক্ষায় মানবিকী সংস্কৃতির বৃহত্তর পরিমণ্ডলের মধ্যে এবং বিশেষভাবেই লাতিন ভাষার চর্চার অধ্যবসায়ে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে প্রতিষ্ঠিত করার যে-গুরুত্ব গ্রামশির প্রতিপাদ্য, তা ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনায় কাজে লাগাতে গেলে একদিকে যেমন গ্রামশি-র সিদ্ধান্ত এদেশে বর্তমানে অতিরিক্ত বৃত্তি-মুখীনতার স্বাস্থ্যকরতা সম্পর্কেই সংশয় এনে দেয়, তেমনই কিন্তু আবার সংস্কৃতকে লাতিনের স্থানে বসাতে দ্বিধান্বিত করে তোলে। ইয়োরোপীয় নবজাগৃতিকালে লাতিন ভাষাকে পুরোহিত শ্রেণীর হাত থেকে যেন ছিনিয়ে নিয়েই তৎকালীন নব্য জৈব বুদ্ধিজীবীরা খ্রিস্টীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে নতুন ধর্মচেতনা তথা দর্শন সৃষ্টি করে-ছিলেন। আমাদের দেশের তথাকথিত 'নবজাগরণে' সংস্কৃত সেই ভূমিকা পালন করেনি, সংস্কৃত 'আলোকপ্রাপ্ত যুগান্তরের' বাহন হয়নি। ইংরেজ প্রাচ্যবাদীদের হাতে পড়ে সংস্কৃত বহুদিন পশ্চাদ্-মুখী তথা অতীতবিলাসী এক সংস্কৃতির ধারক হয়ে থেকেছে। তবুও আজ হিন্দু মৌলবাদের ভয়ংকর আস্ফালনের মুখে বিমলকৃষ্ণ মতিলালের মতো বুদ্ধিজীবীরা সংস্কৃত ভাষায় তাঁদের গভীর ব্যুৎ-পত্তিকে কাজে লাগাচ্ছেন ঐ মৌলবাদকে সংযত করতে। জনসমাজের মধ্যে বিশ্বাসের যে জমি রয়েছে, তাতেই প্রতিবাদী তথা বৈপ্লবিক ভবিষ্যদ্দর্শনের ভিত খুঁড়তে হবে। তাতে ক্ল্যাসিকাল শিক্ষার সচেতন প্রয়োগ অপরিহার্য এক পন্থা।

গ্রামশি-র দ্বিতীয় যুক্তি ঐ শিক্ষাধারার মধ্যে নিহিত কাজ ও শ্রমের ভারের গুরুত্ব ধরে। ডলটন পদ্ধতির মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের উপর শৃঙ্খলার বা নিয়মানুবর্তিতার ভার লাঘব করার যে প্রবণতা ইতালিতে অনেকে তখন আদর্শ পদ্ধতি বলে মনে করছেন, গ্রামশি তার মাহাত্ম্য মানতে চান না। বরং শিক্ষার শ্রমকে তিনি বিশেষ মূল্য দেন। ক্ল্যাসিকাল তর্কশাস্ত্রের সিলজিজ্‌ম্ বা অনুমান-বাক্যের সূত্রগুলি মনে রাখার জন্য 'বারবারা, বারালিপ্‌তন' মুখস্থ করে যাবার মধ্যেও তিনি আত্মসংযম ও শৃঙ্খলাবোধ আয়ত্ত করার পথ দেখতে পান। বস্তুত শিক্ষাগ্রহণকে বৌদ্ধিক চর্চার এক শুদ্ধ ক্ষেত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে, এই প্রক্রিয়া থেকে শ্রম বা আয়াসকে নির্বাসন করে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমিকের মধ্যে যে

ভয়ংকর ভেদ রচনা করা হয়, গ্রামশি তার সম্ভাবনাকে সমূলে বিনষ্ট করে এমন এক শিক্ষাপদ্ধতি তথা শিক্ষাক্রমের পরিকল্পনা রচনা করেন যার সতর্ক পর্বভেদ তথা বিবর্তনে 'ক্ল্যাসিকাল স্কুলের যথার্থ লক্ষ্য' 'বস্তুতপক্ষে সাধন' করা যাবে। এই ক্ল্যাসিকাল শিক্ষার 'প্রকৃত নজর ছিল ব্যক্তিত্বের আন্তর বিকাশ এবং আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার সমগ্র সাংস্কৃতিক অতীতকে আয়ত্ত ও গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে চরিত্রগঠনের ওপর।' যে পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামশি তাঁর এই আলোচনাকে স্থাপন করেন, তাতে 'চরিত্রগঠন' তার ব্যাপকতর 'মানবিকী' মাত্রা থেকেও সরে আসে সমাজরূপান্তরের জন্য সংগ্রামের মাত্রার মধ্যে। অথচ শিক্ষার ক্ষেত্রকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করতে তিনি সর্বদাই আগ্রহী। তাই বিবাদীর মধ্যে বিরোধের দার্শনিক তত্ত্বে তিনি যেমন আগ্রহী, তেমনই আগ্রহী ক্রোচে-র 'পৃথকের বিশ্লেষণে'র তত্ত্বে, যদিও ক্রোচের এই তত্ত্বের অসারতা তাঁর কাছে অতীব প্রকট। গ্রামশি এই প্রশ্নে ক্রোচের কঠোর সমালোচক। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বিরোধী শক্তির সংঘর্ষের মধ্যে না দেখে তাকে কেবলমাত্র 'পৃথকের দ্বন্দ্ব' বিবেচনা করে ক্রোচে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বাস্তবকেই অস্বীকার করেছেন।

বিশেষীকরণ তথা বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির তথা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর যে ঝোঁক নব্য ফ্যাশিস্ত শাসনের মূল প্রবণতা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, গ্রামশি তার বিরুদ্ধে মানবিকী পরম্পরারই এক আধুনিক কালোপযোগী ভাষ্য উপস্থাপিত করেছেন। এই পদ্ধতি কেবলমাত্র স্কুল-কলেজের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়, পত্রিকা সম্পাদনাসহ নানা সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম তথা প্রকল্পের মধ্যেও গ্রামশি তা ছড়িয়ে দিতে চান। তার মধ্যে সক্রিয় শিক্ষাগ্রহণের নানা উপায়ও তিনি কল্পনা করেন। এই সূত্রেই তিনি দে সাংক্তিস্-এর স্মৃতিকথা থেকে পুওতির স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে এক বিশেষ বিদ্বান ও প্রাজ্ঞ শ্রেণীর বিশেষ প্রতিষ্ঠা তথা ভূমিকার দৃষ্টান্ত দেন। ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যেই দক্ষতর এক অংশের এই প্রতিষ্ঠা শিক্ষায় ছাত্রদের সক্রিয় ভূমিকারই প্রমাণবহ। দান্তের 'দিভিনা কোমেদিয়া' কাব্যের নরক-পর্বে সন্ত জিতার বিশেষ আশীর্বাদধন্য লুক্কা শহরের নগর প্রশাসকেরা যে বিশেষ শ্রদ্ধার স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এই ছাত্রেরা তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেই সম্মানে সম্মানিত ছিলেন। গ্রামশি তাঁর শিক্ষানীতির বিশ্লেষণে শিক্ষাকে বিপ্লবী শ্রেণীর স্বার্থেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান। তার মানবিকী লক্ষ্য, তার পর্ব-নির্ভর উত্তরণ, তার মধ্যে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ, তার শ্রমভার, সবই ঐ একই লক্ষ্যাভিমুখী। শ. ব. / সৌ. ভ.]

শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংগঠন

সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, আধুনিক সভ্যতায় সমস্ত বাস্তব কাজকর্মই এত জটিল হয়ে উঠেছে, এবং জ্ঞানবিজ্ঞান দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যে প্রত্যেক বাস্তব কাজকর্ম পরিচালনার জন্য তার কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে নিজস্ব এক ধরনের স্কুল গড়ে তোলবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে এবং আবার এরই জন্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এইসব স্কুলে পড়াবার জন্য উচ্চতর এক শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিজীবীর। যে-ধরনের স্কুলকে বলা যেতে পারে 'মানবিকী'—প্রথাগত স্কুলের মধ্যে প্রাচীনতম, যাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে এমন এক রকমের সর্বতোমুখী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো যা এখনো পর্যন্ত টুকরো টুকরো হয়ে বহুবিচিত্র রূপ গ্রহণ করেনি, তাদের মধ্যে চিন্তাশক্তির মৌলিক ক্ষমতা জাগানো, ও জীবনের মধ্যে নিজের নিজের পথ খুঁজে নিতে পারার বল বাড়ানো—তার পাশাপাশি গড়ে উঠছে আর এক ধরনের বিশেষজ্ঞদের স্কুলের একটা গোটা জগৎ, বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের চাহিদা মেটাতে, অথবা এমন বৃত্তির চাহিদার জন্য যা ইতিমধ্যেই খুব বিশেষজ্ঞদের জন্য চিহ্নিত এবং খুব নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে যার কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ। বস্তুত, একথাও বলা যেতে পারে যে, আজ যে শিক্ষা-সংকট মাথা চাড়া দিয়েছে তা এই ব্যাপারটার সঙ্গেই জড়িত, কারণ এই বিভাজন ও বিশেষীকরণের প্রক্রিয়াটা এগোচ্ছে বড় এলোমেলোভাবে, কোনো পরিষ্কার নির্দিষ্ট নীতি নেই এর পেছনে, সুচিন্তিত ও সচেতনভাবে গৃহীত কোনো কর্মসূচি নেই এর জন্য। পাঠক্রমের ও স্কুল ব্যবস্থার সাংগঠনিক যে সংকট, অর্থাৎ আধুনিক বুদ্ধিজীবী বাহিনী তৈরি করবার নীতিকাঠামোর যে-সার্বিক সংকট তা কিন্তু অনেকাংশে ব্যাপকতর সাধারণ জৈব সংকটেরই একটা দিক ও তারই অন্যতম চরিত্রলক্ষণ।

ক্ল্যাসিকাল ও বৃত্তিমূলক (পেশাভিত্তিক) স্কুলের এই মৌলিক শ্রেণীবিভাগ যুক্তিযুক্ত ছিল: অধস্তন শ্রেণীর জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্কুল আর প্রধান শ্রেণীসমূহ ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য ক্ল্যাসিকাল স্কুল। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে শিল্পবিকাশের ফলে এক ধরনের নতুন নাগরিক বুদ্ধিজীবীর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। ক্ল্যাসিকাল স্কুলের পাশাপাশি তাই গড়ে উঠেছিল কারিগরি শিক্ষার স্কুল (বৃত্তিমূলক, কিন্তু কায়িক শ্রমভিত্তিক নয়), আর এর জন্যই এক প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছিল সর্বগ সংস্কৃতির নির্দিষ্ট কর্মসূচি সংক্রান্ত গোটা মূলনীতির সামনে, গ্রীক-রোমক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মানবমুখী সর্বগ সংস্কৃতির সমস্ত আদলটার সামনেই। এই আদলটার বিষয়ে একবার প্রশ্ন উঠলে এর ভবিষ্যৎ কিন্তু অন্ধকার, কারণ এর বেড়ে ওঠার ক্ষমতাটাই অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল এক বিশেষ ধরনের সভ্যতার ওপর আরোপিত প্রশ্নাতীত মর্যাদার ওপর।

আজকের প্রবণতা হল সেই সব স্কুলের বিলোপসাধন যা কিনা 'নিঃস্বার্থ' (তাৎক্ষণিক কোনো উদ্দেশ্যসাধনে যা লিপ্ত নয়) অথবা 'গঠনমূলক'—বড় জোর খুব ছোট মাপে এদের একটু আধটু বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে যাতে সেই মুষ্টিমেয় উচ্চকোটির ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের কাজে লাগতে পারে, যাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনে কোনো ধরনের কোনো বৃত্তি নির্বাচনের দুশ্চিন্তা নেই। বদলে, বিশেষ বিশেষ বৃত্তিমূলক শিক্ষার স্কুল ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, এবং এতে করে ছাত্রদের নিয়তি ও ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ সবই আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সংকটের কোনো ন্যায্য সমাধান এই দিক থেকে ভাবা উচিত। প্রথম, সকলের জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা, যাতে করে কিছুটা সাধারণ, মানবমুখী, গঠনমূলক সংস্কৃতির শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে; এর ফলে কায়িক শ্রমের (শিল্পক্ষেত্রের, কারিগরি কর্মের) ক্ষমতার বিকাশ এবং মননকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার বিকাশের মধ্যে একটা সমতা সাধিত হবে। এই ধরনের সাধারণ স্কুল থেকে বৃত্তিমূলক প্রবণতার পুনঃপুনঃ পরীক্ষানিরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্ররা কোনো না কোনো বিশেষ প্রশিক্ষণের স্কুলে চলে যাবে অথবা সরাসরি উৎপাদনমুখী কাজে যোগ দেবে।

একথা মনে রাখা দরকার যে, প্রত্যেক বাস্তবমুখী কাজকর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাদেব নিজেদের জন্য বিশিষ্ট স্কুলও তৈরি করে নেবার প্রবণতা দেখা দেয়, ঠিক যেমন প্রত্যেক মননধর্মী কাজকর্মও তার নিজের প্রযোজন মতো নিজস্ব সাংস্কৃতিক সংঘ গড়ে নেয ; এই সংঘগুলি উত্তর-বিদ্যাশিক্ষা পর্বের প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা পালন করে। কোনো নির্দিষ্ট বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাজের কীরকম অগ্রগতি হচ্ছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকার উপযুক্ত অবস্থা তৈরি করা এই সংঘগুলির বিশেষ দায়িত্ব।

একথাও খেয়াল রাখা দরকার যে, বিচার-বিশ্লেষণে নিযুক্ত এইসব সংঘগুলি ক্রমশ তাদের কাজকর্মকে দুটো 'জৈব' ধরনে ভাগ করে ফেলে : প্রকৃত বিচার-বিশ্লেষণী কাজ যা তাদের মূল করণীয় এবং বিষয়গত অর্থে সাংস্কৃতিক কাজকর্ম, যে-অংশে কী কী প্রশ্ন নিয়ে বিশ্লেষণী কাজ করা হবে তা প্রথমে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করানো এবং বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করানো হয়। এই বিষয়মুখী কাজকর্মের জন্যই ইতিমধ্যে এক বিরাট আমলাবাহিনী গড়ে উঠেছে, তার কাঠামো বেশ নতুন ধরনের ; বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তৈরি বিশিষ্ট বিভাগগুলো, যারা ঐ বিশ্লেষণী সভার জন্য বিষয়গত উপকরণ প্রস্তুত করে তারা ছাড়াও কর্মকর্তাদের একটা দ্বিতীয় স্তরও তৈরি হয়েছে—মোটামুটিভাবে পক্ষপাতহীন একদল 'স্বেচ্ছাকর্মী,' এঁদের নির্বাচন করা হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে, শিল্প থেকে, ব্যাংক থেকে, আর্থিক সংস্থা থেকে। এটা একটা অন্যতম প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে পেশাদারি আমলাতন্ত্র পরিশেষে গোটা গণতান্ত্রিক জমানা ও আইনসংসদকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে ; বর্তমানে এই প্রক্রিয়া জৈবভাবে আরো বিস্তারলাভ করছে এবং বেসরকারি সংস্থার বড় বড় বিশেষজ্ঞদেরও আপন বৃত্তের মধ্যে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে,

এবং এইভাবে দুই জমানা ও আমলাতন্ত্রকেই সে নিয়ন্ত্রণ করছে। এর মধ্যে যা নিহিত আছে তা হল এমন এক জৈব বিকাশের অনিবার্য প্রবণতা যার লক্ষ্য হবে রাজনৈতিক কাজে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে সেইসব ব্যক্তিদের একটা সম্মিলন ঘটানো যাঁরা আজকের দিনের জটিল জাতীয় সমাজের বাস্তব-মুখী কাজকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট সমস্যাগুলোর প্রশাসনিক মোকাবিলায় বিশেষজ্ঞ। এইসব প্রবণতাগুলোকে বাইরের থেকে তাড়াবার যে-কোনো চেষ্টার ফল দাঁড়ায় নিতান্ত নীতিকথার প্রচার ও আলংকারিক বিলাপ।

তাই প্রশ্নটা উঠছে বিষয়মুখী-রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের সংস্কারসাধন নিয়ে, যাতে করে নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে তাদের সংস্কৃতিকে পূর্ণ করে তোলা যায় এবং বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন এক নতুন কর্মকর্তাগোষ্ঠী যেন গড়ে তোলা যায়, যাঁরা গোষ্ঠীগতভাবে ঐ বিচার-বিশ্লেষণী কাজেও পরিপূরক অংশ নেবেন। রাজনৈতিক 'নেতা'-র সাবেকি যে-ধরন, যাঁরা শুধুই আনুষ্ঠানিক কানুনমাফিক কাজকর্মে দক্ষ, সেটা কালাতিক্রমদোষে দুষ্ট হয়ে পড়ছে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে এক বিপদ হয়ে দেখা দিচ্ছে : নেতার দিক থেকে সেই ন্যূনতম সাধারণ বিষয়গত সংস্কৃতির বোধ থাকা প্রয়োজন যার জোরে তিনি নিজের থেকেই যদি ঠিক সমাধানটা 'বাতলাতে' নাও পারেন, অন্তত বিশেষজ্ঞরা যে-সব সমাধানের প্রস্তাব দিচ্ছেন তাদের মধ্যে বিচার-বিবেচনা যেন করতে পারেন এবং এইভাবে রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের 'সমন্বয়ী' দৃষ্টিকোণের মধ্য থেকে যেন ঠিক জিনিসটিকে বেছে নিতে পারেন।

যাতে করে বাস্তবসম্মতভাবে কাজকর্ম চালানো যায় সেজন্য বিষয়মাফিক বিশেষজ্ঞ যা প্রয়োজন তা অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে তৈরি করা সভার একটা ধরন অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে। কিছু কিছু পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয় সমিতিতে যা ঘটে তার মধ্যে এর উদাহরণ আছে ; এইসব সমিতি একই সঙ্গে সম্পাদক-মণ্ডলী ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে। গোষ্ঠীর সকলে এক সঙ্গে আলোচনা সমালোচনা করে, এতে করে বিভিন্ন সম্পাদকের দায়িত্বভার আলাদা করে নির্দিষ্ট করা যায়। তাঁদের কাজকর্ম একটা পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে সংগঠিত হয় এবং সুচিন্তিত এক রকমের শ্রমবিভাজনও আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই যৌথ আলোচনা ও সমালোচনায় (যার মধ্যে থাকে উপদেশ, পরামর্শ, পদ্ধতি বিষয়ে মন্তব্য, এবং এমন গঠনমূলক সমালোচনা যার লক্ষ্য পারস্পরিক শিক্ষা) প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের মতোই কাজ করেন এবং গোটা গোষ্ঠীর দক্ষতার মান পূর্ণতর করে তুলতে সাহায্য করেন : আলাদা আলাদা সম্পাদকের গড় মান এতে করে সত্যিই অনেক উন্নত হয় যাতে করে সবচেয়ে দক্ষ কর্মীর যোগ্যতা ও মানে পৌঁছনো যায়—এতে করে গোটা পত্রিকার জন্য ক্রমশ উত্তম ও জৈব সহযোগিতার একটা ধরন শুধু

সুনিশ্চিত হয় তাই নয়, সমধর্মী বুদ্ধিজীবীদের একটা গোষ্ঠী গড়ে ওঠবার উপযুক্ত আবহাওয়াও এতে করে তৈরি হয়। এই বুদ্ধিজীবীরা নিয়মিত ও সুপরিকল্পিত 'রচনা'-কর্মের জন্য দক্ষ হয়ে ওঠেন (শুধুই মাঝেমধ্যে প্রকাশিত লেখা বা ছোট প্রবন্ধের জন্যই নয়, আরো অনেক জৈব সমন্বয়ধর্মী বিস্তৃত রচনার জন্যও)।

সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের সমবায়ী কাজে প্রত্যেকটা দায়িত্ব আরো নতুন নতুন কাজের সম্ভাবনা ও যোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে, কারণ এতে করে ক্রমেই আরো কাজের জৈব অবস্থার সৃষ্টি হয়: ফাইল, বইপত্রের সংক্ষিপ্তসার, আকর গ্রন্থাদির সংগ্রহ ইত্যাদি। এইসব কাজের জন্য প্রয়োজন এক অবিরত সংগ্রামের—চটকদারি স্বভাব, চটজলদি কিংবা 'আলংকারিক' সমাধান অথবা বাহবা পাবার জন্য প্রস্তাবিত সমাধান—এ সবের বিরুদ্ধে। কাজটা করতে হবে বিশেষত লিখিতভাবে, ঠিক যেমন সমালোচনাও করতে হবে লিখিত-ভাবে—কাটাছাটা পরিষ্কার লিখিত নোটের মতো: এটা করা যায় যদি উপকরণগুলো যথাসময়ে বিতরণ করা হয়, ইত্যাদি; নোট রাখা, সমালোচনা লিখে তৈরি করা, এগুলোর মধ্যে কিছু শিক্ষণীয় দিক আছে, বিশেষত জন-সভায় বক্তৃতার মধ্যে গড়ে ওঠা কিছু কিছু অভ্যাস দূর করবার জন্য, যা খুব প্রয়োজন—যেমন, বাকসর্বস্বতা, গলাবাজি, যুক্তিবিভ্রাট। যারা স্বশিক্ষিত হতে চাইবে তাদের জন্য এই রকমের মননকর্ম খুব দরকার, প্রথাবদ্ধ বিদ্যাচর্চায় যে-ধরনের শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ওঠে সেটা এতে করে তৈরি হতে পারে, এতে করে মননকর্মের টেলরীকরণ সম্ভব। 'সান্তা জিতার বন্ধদের' নীতির উপযোগিতা এখানেই, বাসিলিও পুয়োতি-র নাপোলি স্কুলের স্মৃতিকথায় দে সাংক্তিস্ এই নীতির কথা বলেছেন। এই নীতির মূল কথা হল যোগ্যতা ও মনোভঙ্গির এক রকমের 'স্তরবিন্যাস', এবং সবচেয়ে দক্ষ ও সবচেয়ে উন্নতমানের কারো নেতৃত্বাধীন কর্মগোষ্ঠী গড়ে তোলা, যাতে করে যারা পিছিয়ে পড়া বা যাঁরা প্রশিক্ষণ পান নি তাঁদের প্রশিক্ষণ ত্বরান্বিত করা যায়।

বাস্তবে কোনো সাধারণ স্কুল সংগঠন করতে গেলে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর নিয়ে একটা বড় সমস্যা দেখা দেয়। এই স্তরগুলো হতে পারে শিক্ষার্থীর বয়স ও তার বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক বিকাশের মান অনুসারে এবং স্কুলের ঘোষিত উদ্দেশ্য অনুসারে। সাধারণ স্কুল বা মানবিক বিদ্যা শিক্ষার স্কুল (মানবিক শব্দটাকে শুধু প্রচলিত অর্থে না নিয়ে একটু বিস্তারিত অর্থে নেওয়াই ভালো) অথবা সাধারণ সংস্কৃতির স্কুলের লক্ষ্য হতে পারে তরুণ-তরুণীদের সামাজিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে প্রবেশ করানো, এবং সেই উদ্দেশ্যে তাদের মানসিক পরিণতি সাধন করা, মননকর্ম ও বাস্তবকর্মের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করা ও স্বাধীন কর্মোদ্যম ও সদিচ্ছার সঞ্চার করা। বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে যাবার বয়স নির্ধারণ করার প্রশ্নটা সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে, কারণ ঐ অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যই

তরুণ-তরুণী, এমনকী অনেক সময়ে শিশুদেরও সরাসরি উৎপাদনমুখী কাজে লেগে পড়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এই সাধারণ স্কুলগুলোর খরচের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হতে পারে, বর্তমানে এই দায়িত্ব রয়েছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পরিবারের ওপর ; একটু অন্যভাবে বলতে গেলে, এতে করে জাতীয় বাজেটে একটা পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে, ওপর থেকে নিচের দিকে, একটা নতুন ধরনের বিস্তার ঘটছে এর এবং আরো জটিলও হয়ে উঠছে। নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা দেবার ও গড়ে তোলার সমস্ত দায়িত্ব এতে করে ব্যক্তিগত উদ্যমের ওপর আর থাকছে না, তা জনজীবনের পর্যায়ে এসে পড়ছে ; কারণ একমাত্র এভাবেই গোটা প্রজন্মকে, কোনো গোষ্ঠী বা জাতপাতের ভিত্তিতে ভাগ না করে, এই শিক্ষা-কর্মসূচির আওতায় আনা যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে এই রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন স্কুলের বাস্তব সংগঠনের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব বিস্তার, অর্থাৎ, স্কুলবাড়ি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষক সম্প্রদায় ইত্যাদি। বিশেষত, শিক্ষকের সংখ্যা খুব বাড়াতে হবে, কারণ শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত যত কম হবে স্কুলের দক্ষতা তত বৃদ্ধি পাবে—আর এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরো কিছু সমস্যা যার সমাধান খুব সহজ নয়, খুব তাড়াতাড়িও হবার নয়। স্কুলবাড়ির প্রশ্নটাও খুব সহজ নয়, কারণ এই ধরনের স্কুল আসলে কলেজের মতো, একসঙ্গে শোবার ঘর, খাবার ঘর, বিশেষ বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগার, সেমিনারের ঘর ইত্যাদি সব থাকা দরকার। তাই শুরুতে, এই নতুন ধরনের স্কুলে আসতে পারবে কেবল নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীরা, এছাড়া উপায় নেই ; ঐ ছাত্রছাত্রীদের বেছে নেওয়া হবে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বা সমতুল্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ অনুসারে।

এই সাধারণ স্কুলের শিক্ষাকাল হবে মোটামুটি বর্তমানের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের মতো ; অবশ্যই একে পুনর্বিন্যাস করে নিতে হবে শুধু শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির দিক দিয়ে নয়, শিক্ষাপ্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থাদির দিক দিয়েও। প্রথম, প্রাথমিক স্তরের মেয়াদ তিন চার বছরের বেশি হওয়া উচিত নয়, এবং 'ব্যবহারিক কার্যকারিতা'-র দিকে যে-সব বিদ্যা লাগে—পড়া, লেখা, অংক, ভূগোল, ইতিহাস—এসব শেখানো ছাড়াও শিক্ষার আর একটা দিক যেটা বর্তমানে অবহেলিত তা নিয়ে বিশেষ ভাবিত হওয়া উচিত, যথা—'কর্তব্য ও অধিকার' নিয়ে, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রাথমিক ধারণা নিয়ে, একেবারে আদি যে-ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে পৃথিবী বিষয়ে নতুন চেতনা। বিভিন্ন প্রচলিত সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে যে সব ধারণা গড়ে ওঠে, অর্থাৎ যেসব ধারণাকে বলা যেতে পারে লোক-কথা ভিত্তিক, সেইসব ধারণার প্রতিস্পর্ধী হিসেবে দেখা দেবে এই চেতনা। শিক্ষাদানের সমস্যাটা মূলত দাঁড়াবে প্রথম কয়েক বছরের বিদ্যাদান প্রক্রিয়ায় যে কট্টর কড়াকড়ি চেহারা প্রায় অনিবার্য তার চাপ কিছুটা শিথিল করা এবং গোটা পদ্ধতিটা কিছু পরিমাণে সজীব ও ফলপ্রসূ করে তোলা। পাঠক্রমের

বাকি অংশটা ছ-বছরের বেশি হবার দরকার নেই, যাতে করে মোটামুটি পনেরো-ষোল বছরের মধ্যে সাধারণ স্কুলের সবগুলি স্তর সম্পূর্ণ করা যায়।

কেউ আপত্তি তুলতে পারেন যে এই পাঠক্রম খুব ক্লান্তিকর হবে, কেননা সময় বড় কম, আর সেটার কারণ হল যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ল্যাসিক্যাল স্কুলের সংগঠনে যে-সব ফলাফলের দিকে লক্ষ রাখা হয় কিন্তু যা সাধন করা যায় না, তা বস্তুতপক্ষে সাধন করা। তবু সামগ্রিকভাবে এই নতুন সংগঠনের মধ্যেই অন্তর্গত করে নিতে হবে সেইসব সাধারণ উপাদান প্রকৃত-পক্ষে যার জন্যে এইসব পাঠক্রম বর্তমানে খুব ধীরগতি, অন্তত ছাত্রদের কোনো কোনো অংশের পক্ষে। কী সেইসব উপাদানগুলো? অনেক অনেক পরিবার আছে যেখানে, বিশেষত বুদ্ধিজীবী স্তরে, ছেলেমেয়েরা তাদের পরিবারের মধ্যেই স্কুল জীবনের একটা প্রস্তুতি পায়, প্রায় যেন তারই সম্প্রসারণ ও পূর্ণতা ; যাকে বলা যেতে পারে তারা যেন 'নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে' গ্রহণ করে এমন কিছু কিছু ধারণা ও মনোভঙ্গি যাতে করে সত্যিকার শিক্ষা-দানের অনেক সুবিধা হয়। লিখিত ভাষার ধাচটা তারা আগে থেকেই জানে এবং তাকে বেশ কাজেও লাগায়, অর্থাৎ, ছয় থেকে বারো বছর বয়সের স্কুলের ছেলেমেয়েদের গড়পড়তা মানের তুলনায় এদের প্রকাশের ও ইতিমধ্যে আর্জিত জ্ঞানের মান অনেকটা উন্নত। তাই শহরাঞ্চলের ছেলেমেয়েরা, শহরাঞ্চলে বসবাস করে বলেই, ছ-বছর বয়সের মধ্যেই তারা বিভিন্ন ধারণা ও মনোভঙ্গির যে-পরিমাণ আয়ত্ত করে তাতে তাদের স্কুলজীবনের কাজটা অনেকখানি সহজ হয়ে ওঠে, তারা সেখান থেকে অনেক দ্রুত অনেক বেশি গ্রহণ করতে পারে। সাধারণ স্কুলের সংগঠনের গোড়ায়, এইসব অবস্থার নিতান্ত প্রয়োজনীয় দিকগুলোকে তো গড়ে তুলতে হবে—একথা অবশ্যই বলার অপেক্ষা রাখে না যে সাধারণ স্কুলের পাশাপাশি কিণ্ডারগার্টেন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একটা বৃত্ত গড়ে উঠবে যাতে করে স্কুলে যাবার বয়সের আগেই ছেলেমেয়েরা সঙ্ঘবদ্ধ শৃঙ্খলাতে অভ্যস্ত হয় ও আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শেখার আগেই কিছু কিছু ধারণা ও মনোভঙ্গি আয়ত্ত করে নিতে পারে। বস্তুত, সাধারণ স্কুলগুলি ঠিক কলেজের মতো সংগঠিত হওয়া উচিত, যেখানে দিনরাত্রির সবসময় একটা সঙ্ঘবদ্ধ জীবন থাকবে, বর্তমানের অসাধু ও যান্ত্রিক শৃঙ্খলা থেকে একে মুক্ত হতে হবে ; লেখাপড়ার চর্চাও হবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে, এমনকী তথাকথিত ব্যক্তিগত বিদ্যাচর্চার সময়েও শিক্ষকদের ও তুলনায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতাও যেন পাওয়া যায়।

খুব মৌলিক সমস্যা দেখা দেবে বর্তমানের স্কুলজীবনের যে স্তরটাকে লিচেও বলে সেই স্তরটা নিয়ে ; এই স্তরে বর্তমানে যে-ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে এর আগের স্তর থেকে আদৌ কোনো তফাৎ নেই—একমাত্র বোধ হয় শুধু এইটুকু যে লিচেও স্তরের একটু বেশি বয়স ও ইতিমধ্যে অর্জিত অভিজ্ঞতার জন্য এই স্তরের ছাত্রদের ক্ষেত্রে দাবি করা হয় যে বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে তারা কিছুটা অগ্রসর ও নৈতিক দিক দিয়েও তুলনায় তারা বেশি পরিণত।

বস্তুত লিচেও ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে, অর্থাৎ যথার্থ স্কুল ও জীবনের মধ্যে, বর্তমানে রীতিমতো এক ফারাক রয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের ধারায় একটা প্রকৃত ছেদ, এবং পরিমাণ (বয়স) থেকে প্রকৃতি (বুদ্ধিবৃত্তির ও নৈতিক পরিণতি)-তে যাবার কোনো যুক্তিসঙ্গত পথ যেন নেই। প্রায় বিশুদ্ধ কট্টর এক শিক্ষাপদ্ধতি থেকে, যেখানে মুখস্থবিদ্যার এক বড ভূমিকা রয়েছে, শিক্ষার্থীরা সোজা পেঁছে যায় সৃষ্টিশীল পর্বে, যে পর্বে তাদের কাজকর্ম স্বনিয়ন্ত্রিত ও স্বাধীন। স্কুলে তাদের লেখাপড়া শৃঙ্খলাবদ্ধ, কোনো এক কর্তৃত্বকেন্দ্র থেকে আরোপিত ও নিয়ন্ত্রিত, সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা পেঁছে যায় বিদ্যাচর্চা বা তাদের পেশাগত কাজের এমন একটা স্তরে যেখানে বৌদ্ধিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নৈতিক স্বাধীনতা তত্ত্বগতভাবে সীমাহীন। আর এটা ঘটে বয়ঃসন্ধির সংকটের ঠিক অব্যবহিত পরেই, যখন প্রবৃত্তিগত সরল কামনা বাসনার তীব্রতার সঙ্গে চরিত্রের বন্ধন ও নৈতিক বিবেকের বোঝাপড়া তখনো পর্যন্ত মেটেনি. আর ঐ চারিত্র্য ও নৈতিকতা তখন তো সবে গড়ে ওঠাব পর্যায়ে রয়েছে। বিশেষ করে ইতালিতে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে 'সেমিনার' ধরনের কাজের নীতিটা ঠিক তেমন ব্যাপক-ভাবে স্বীকৃত নয়, সেখানে এই যাত্রাপথ আরো আচমকা ও যান্ত্রিক।

অতএব, পক্ষান্তরে, সাধারণ স্কুলের শেষ পর্বটাকে এমনভাবে ভাবতে হবে ও তার কাঠামো এমনভাবে বচনা করতে হবে যে সেটাই যেন এক চূড়ান্ত পর্ব, যার উদ্দেশ্য হবে 'মানবতা'-র মৌলিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং সেইসঙ্গে বৌদ্ধিক শৃঙ্খলাবোধ ও নৈতিক স্বাধীনতার এক বোধ গড়ে তোলা যা পরবর্তী পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজন—সেই বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের ধরন যাই হোক না কেন, বৈজ্ঞানিক (বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাচর্চা) অথবা তাৎক্ষণিক বাস্তব প্রয়োজন ও উৎপাদনমুখী চরিত্রের যে রকমই হোক (যেমন শিল্পোৎপাদন, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, বাণিজ্য সংগঠন ইত্যাদি)। বিজ্ঞানে ও জীবনে সৃজনী পদ্ধতির চর্চা ও শিক্ষার সূত্রপাত হওয়া উচিত অবশ্যই স্কুলের এই শেষ পর্যায়ে, এটা কখনোই বিশ্ববিদ্যালয়ের একচেটিয়া হতে পারে না বা বাস্তব জীবনের হঠাৎ পাওয়া সুযোগ সুবিধার ওপরে ছেড়েও রাখা যায় না তাকে। স্কুলের এই পর্যায়েই প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে স্বাধীন দায়িত্ববোধের উপাদানগুলি বিকশিত হতে শুরু করা দরকার, এই অর্থে স্কুলগুলি সত্যিকার সৃজনশীল হয়ে ওঠা উচিত। সৃজনশীল ও কর্মমুখী স্কুলের মধ্যে একটা তফাৎ অবশ্যই করা দরকার, এমনকী ডল্টন পদ্ধতিতে এই শেষোক্তের যে-চেহারা দাঁড় করানো হয়েছে তাতেও। সাধারণ স্কুলের সবটাই আসলে কর্মমুখী স্কুল, যদিও এক্ষেত্রে উদারতাবাদী মতাদর্শের সীমানা নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন এবং কিছুটা জোর দিয়েই নির্দেশ করা দরকার বয়স্ক প্রজন্মের কর্তব্য কী হবে, যেমন রাষ্ট্রের তরফে নতুন প্রজন্মকে প্রয়োজনমতো 'গড়ে' নেবার যে-কর্তব্য সেটার দিকে জোর দেওয়া দরকার। কর্মমুখী স্কুল এখনো তার রোম্যাণ্টিক পর্যায়ে রয়ে গেছে, যে-

পর্যায়ে যান্ত্রিক ও জেসুইট স্কুলের বিরুদ্ধে তাদের যে লড়াই তার উপাদান-গুলিকে কিছুটা অস্বাস্থ্যকরভাবে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে—সম্ভবত ঐসব স্কুলের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য পরিষ্কার করে চিহ্নিত করার জন্য এবং বিতর্কের কারণেও। এখন প্রয়োজন 'ক্ল্যাসিক্যাল', যুক্তিবাদী পর্যায়ে প্রবেশ করা এবং উপযুক্ত পদ্ধতি ও রূপ-কাঠামো খুঁজে বার করার লক্ষ্যে নিবিষ্ট হওয়া।

কর্মমুখী স্কুলেরই শেষ পরিণতি সৃজনশীল স্কুল। প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্য হল শৃঙ্খলা, অতএব কিছুটা সমানভাবে দস্তুর করে দেওয়া—এক ধরনের 'মেনে নেবার' মনোবৃত্তি তৈরি করা যাকে হয়তো কিছুটা 'গতিশীল' বলা যেতে পারে। সৃজনশীল পর্যায়ে লক্ষ্য হল, সামাজিক টাইপের যে 'একত্রী-করণ' ইতিমধ্যে সাধন করা গেছে তার ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের বিস্তার ঘটানো—যে ব্যক্তিত্ব এখন স্বনির্ভর ও দায়িত্ববান, কিন্তু যার নৈতিক ও সামাজিক বিবেক এখন কিছুটা দৃঢ়ভাবে সমমাত্রিক। তাই সৃজনমূলক স্কুল মানে কিন্তু 'উদ্ভাবক ও আবিষ্কারকদের' স্কুল নয় ; এ হল গবেষণা ও জ্ঞানের একটা পর্যায় ও এক পদ্ধতি, যে-কোনো ভাবেই হোক নতুন নতুন মৌলিক উদ্ভাবনের জন্য দায়বদ্ধ পূর্ব-নির্ধারিত এক 'কর্মসূচি' নয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার উপায় হল ছাত্রের স্বতঃস্ফূর্ত স্বনির্ভর প্রচেষ্টা, শিক্ষকের দায়িত্ব মূলত সহৃদয় নির্দেশকের—যেমনটা বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় বা হওয়া উচিৎ। নিজের মতো কোনো সত্যের আবিষ্কার, বাইরের কোনো পরামর্শ ও সাহায্য ছাড়াই, তাইতো সৃষ্টি—ঐ সত্য যদি পুরনো সত্যও হয় কিছু এসে যায় না। এতে করে পদ্ধতির ওপরে দখল প্রকাশ পায়, এবং অন্তত এটুকু এর থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষার্থী তার বৌদ্ধিক পরিণতির এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যখন সে নিজেই নতুন সত্যের সন্ধান পেতে পারবে। তাই এই পর্বে বিদ্যাচর্চার মূল কাজকর্ম হবে সেমিনারে, গ্রন্থাগারে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার গবেষণাগারে ; এবং এরই মধ্যে পেশাগত শিক্ষানবিশির জন্য একেবারে ভেতর থেকে পাওয়া জৈব তথ্যও সংগৃহীত হবে।

সাধারণ স্কুলের বিকাশ হলে বুদ্ধিবৃত্তিনির্ভর কাজ ও শিল্প-কর্মের মধ্যে এক নতুন সম্পর্কের সূচনা হবে, শুধু স্কুলেই নয় সমাজজীবনের সর্বত্র। এই সার্বিক সূত্র তাই প্রতিফলিত হবে সংস্কৃতির সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, পরিবর্তন আসবে তার বিষয়বস্তুতেও, এবং এইভাবে এক রূপান্তর সাধিত হবে।

শিক্ষাতত্ত্বের সন্ধানে

পুরনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শিক্ষাবিকাশের মধ্যে দুটো জিনিস ছিল। প্রকৃতিবিজ্ঞানের অল্পস্বল্প তাদের শেখানো হত এবং পৌর অধিকার ও কর্তব্যের ধারণাও তাদের দেওয়া হত। বৈজ্ঞানিক ধারণার উদ্দেশ্য ছিল শিশুকে বস্তুবিশ্বে (*societas rerum*) স্থাপিত করা আর কর্তব্য ও অধিকার বিষয়ে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য হল তাকে রাষ্ট্র ও জনসমাজে

প্রতিষ্ঠিত করা। শিশু তার পরিপার্শ্বে প্রচলিত লোকপ্রসিদ্ধি থেকে জগৎ ও প্রকৃতি বিষয়ে যে জাদুধর্মী ধারণা গড়ে তোলে তার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে তার নতুন শেখা বিজ্ঞানচিন্তার। আর পৌর কর্তব্য ও অধিকার বিষয়ে তার ধারণার সঙ্গে সংঘর্ষ দেখা দেবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রবণতা ও এক ধরনের স্থানীয় বর্বরতার—যা কিনা ঐ কথা-কাহিনীর অন্য এক মাত্রা। স্কুলের লড়াই ঐ কথা-কাহিনীর জগতের সঙ্গে, বস্তুত জগৎ বিষয়ে প্রথাগত ধারণার যা কিছু অবশেষ তার সবার সঙ্গে। স্কুলের শিক্ষা থেকে পাওয়া যাবে এক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। বস্তুগত দুর্জ্ঞেয় সব প্রাকৃতিক নিয়ম যে আছে এবং তাদের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে যে সে সবের সঙ্গে মানুষকে মানিয়ে নিতে হবে এই সরল ও মৌলিক তথ্য বিষয়ে মানুষের সচেতনতাই ঐ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত ভিত্তি—তেমনি এই বোধেরও প্রয়োজন যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুনও আছে যা মানুষের ক্রিয়া-কর্মেরই পরিণতি, যা মানুষই প্রবর্তন করে এবং মানুষের সামগ্রিক বিকাশের স্বার্থে তার পরিবর্তনও সম্ভব। রাষ্ট্র ও সমাজের এইসব নিয়ম সেই মানবিক বিন্যাস তৈরি করে যার ওপর ভর করে ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে মানুষ ঐ প্রকৃতির নিয়মের ওপর সবচেয়ে জোরালোভাবে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, একটু অন্যভাবে বলতে গেলে, ঐ মানবিক বিন্যাস মানুষের কাজের সবচেয়ে বড় সহায় হয়ে ওঠে। কারণ, কাজই সেই নির্দিষ্ট প্রকরণ যার মধ্য দিয়ে মানুষ সক্রিয়ভাবে প্রাকৃতিক জীবনে অংশ নেয়, যাতে করে ক্রমশ আরো গভীর ও আরো ব্যাপকভাবে প্রকৃতির রূপান্তর সাধন করে তাকে সামাজিক করে তোলা সম্ভব হয়।

তাই একথা বলা চলে যে, যে-শিক্ষাতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে পুরনো প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার মূল কথা ছিল কাজ। প্রাথমিক নিয়মের যথাযথ ও বাস্তবসম্মত জ্ঞান ছাড়া এবং ভেতর থেকেই এক জৈব প্রক্রিয়ায় সাধারণভাবে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এমন এক আইনী বিন্যাস ছাড়া মানুষের কাজ তার বিস্তার ও উৎপাদনী ক্ষমতার সমস্ত সম্ভাবনা সমেত কখনো রূপায়িত হতে পারে না। স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতির মধ্য দিয়েই এই আইনী বিন্যাস মানুষকে মেনে নিতে হবে, শুধু বাইরের থেকে চাপানো হলে চলবে না—এই নিয়ন্ত্রণ মানুষের নিজেদেরই স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন, এইভাবেই তা যেন স্বীকৃতি পায় এবং সেইভাবেই যেন তা নিজেদের কাছে প্রতিভাত হয়, শুধুমাত্র জোর করে চাপানো কোনো কিছু বলে মনে না হয় যেন। ধারণা হিসেবে এবং তথ্য হিসেবে কাজই (তত্ত্বগত ও প্রয়োগধর্মী) ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পেছনে নিহিত শিক্ষাতত্ত্ব, কারণ কাজের মধ্য দিয়েই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিন্যাসকে (অধিকার ও কর্তব্য) প্রাকৃতিক বিন্যাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ও স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়। কাজের মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ মানুষের তত্ত্বগত ও প্রয়োগধর্মী কাজকর্মের মধ্য দিয়েই যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিন্যাসের মধ্যে এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে,

এই আবিষ্কার থেকেই জগৎ বিষয়ে জাদু ও কুসংস্কারমুক্ত এক প্রাথমিক-বোধের উন্মেষ হয়। এই ভিত্তিতেই এর পরে গড়ে উঠতে পারে জগৎ বিষয়ে ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বময় এক ধারণা, যা গতি ও পরিবর্তনকে বোঝবার চেষ্টা করে। এই ধারণাই বুঝে নিতে পারে অতীতের কোন প্রয়াস ও ত্যাগের পথে আজকের বর্তমানে পৌঁছনো গেছে এবং কোন পথেই বা আজকের বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে পৌঁছনো যাবে। এই ধারণাই সমসাময়িক পৃথিবীকে অতীতের ও সমস্ত অতীত প্রজন্মের এক সংশ্লেষ হিসেবে দেখতে শেখায়, এবং এইভাবেই তা যেন ভবিষ্যতের দিকে উন্মুখ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ছিল প্রকৃত ভিত্তি। সমস্ত প্রত্যাশিত ফল এর থেকে পাওয়া গিয়েছিল কিনা এবং শিক্ষক যাঁরা ছিলেন তাঁরা তাঁদের দায়িত্বের দার্শনিক স্বরূপ ও সারবস্তু সম্বন্ধে কতটা সচেতন ছিলেন সে-প্রশ্ন আলাদা। এর জন্য প্রয়োজন সমগ্র জাতির পৌর সচেতনতার বিশ্লেষণ, শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে তারই এক প্রকাশ, এবং সে প্রকাশও যে খুব সার্থক তা নয়, অন্তত প্রাগ্রসর নয় ত বটেই।

একথা পুরোপুরি সত্য নয় যে 'নির্দেশন' 'শিক্ষা' থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। এই পার্থক্যের ওপর অত্যধিক জোর দেওয়াটা ভাববাদী শিক্ষা-তাত্ত্বিকদের এক মস্ত ভুল এবং তাঁরা যেভাবে স্কুলব্যবস্থার পুনর্গঠন করেছেন তার মধ্যেই এর ফলাফল ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে। নির্দেশন শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে গেলে ছাত্রকে হতে হয় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, বিমূর্ত সব ধারণার 'যান্ত্রিক প্রাপক'. মাত্র—সে তো এক অদ্ভুত ব্যাপার এবং শুদ্ধ শিক্ষার সমর্থকেরা নিতান্ত যান্ত্রিক নির্দেশনার প্রতি তাঁদের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে এটাকে অন্তত 'তাত্ত্বিকভাবে' তো অস্বীকার করেছেন। যা 'নিশ্চিত' তা শিশুর চেতনায় 'সত্য হয়ে দেখা দেয়'। কিন্তু শিশুর সচেতনতা তো কোনো 'নিজস্ব' ব্যাপার নয় (তার বিশিষ্ট কিছু বলে চিহ্নিত নয় তো বটেই), জনসমাজের যে-ক্ষেত্রে শিশু অংশ নেয় এ তারই একটা প্রকাশ, পরিপার্শ্ব বা তার গ্রাম ইত্যাদির মধ্যে যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এ তারই এক প্রতিফলন। শিশুদের প্রায় অধিকাংশের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব চেতনা বলতে যেটুকু তার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে স্কুলের পাঠ্যসূচির মধ্যে নিহিত যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তার থেকে পৃথক ও বিরোধী সম্পর্ক : এইভাবেই কোনো অগ্রসর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যা 'নিশ্চিত' তাই পচাগলা ও কালাতিক্রমী কোনো সংস্কৃতির কাঠামোয় 'সত্য' হয়ে দেখা দেয়। স্কুল ও জীবনের মধ্যে কোনো সংগতি নেই আর তাই নির্দেশন ও শিক্ষার মধ্যেও কোনো স্বয়ংক্রিয় সংগতি নেই। স্কুলে নির্দেশন ও শিক্ষার মধ্যেকার সম্পর্কটাকে শিক্ষকের তাজা কাজকর্মের মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত করে তোলা যায়। তবে এজন্য শিক্ষককে সচেতন হতে হবে—তিনি যে-ধরনের সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে আসছেন এবং তাঁর ছাত্ররা যে-ধরনের সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে আসছে এ দুয়ের বৈপরীত্য তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে। এ

বিষয়েও তাঁকে সজাগ থাকতে হবে যে তাঁর দায়িত্ব হল শিশুর বিকাশকে এমনভাবে ত্বরান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যাতে করে সে ঐ প্রথমটির ধাঁচে বেড়ে ওঠে এবং তাতে দ্বিতীয়টির সঙ্গে হয়তো বৈষম্যও দেখা দিতে পারে। শিক্ষককুল যদি পর্যাপ্ত না হতে পারেন এবং নির্দেশন ও শিক্ষার সম্পর্কটা যদি ছিন্ন হয়ে যায় এবং শিক্ষাদানের সমস্যাটা যদি ছককাটা যান্ত্রিকতায় হারিয়ে যায় ও তার মধ্য দিয়ে শিক্ষণীয়তা ক্রমশ এক বড় আদর্শ হিসেবে প্রতিভাত হয় তাহলে এতে করে শিক্ষকের কাজ কিন্তু আরো অপর্যাপ্ত হয়ে উঠবে। আমরা অলংকারসর্বস্ব স্কুল পাব, যা হবে খুবই অযত্নবান, কারণ যা 'নিশ্চিত' তার বস্তুগত ভার যাবে হারিয়ে এবং যা 'সত্য' তা হবে শুধু কথার সত্য : অর্থাৎ, নেহাতই আলংকারিক।

এই স্খলন মাধ্যমিক স্কুলে আরো পরিষ্কার, সাহিত্য ও দর্শনের পাঠ-ক্রমে। আগে ছাত্ররা অন্তত প্রকৃত তথ্যের একটা 'ঝোলা' বা 'সরঞ্জাম' (রুচি অনুসারে) আয়ত্ত করত। আর এখন যেহেতু শিক্ষককে নির্দিষ্ট-ভাবে দার্শনিক ও নান্দনিক হতে হবে তাই ছাত্র তো স্পষ্ট তথ্য নিয়ে মাথা ঘামায় না, সে তার মাথা ভর্তি করে শুধু সূত্র দিয়ে আর শব্দ দিয়ে, প্রায়শ যেগুলোর কোনো মানে থাকে না তার কাছে এবং যা সে প্রায় তৎক্ষণাৎ ভুলে যায়। পুরনো স্কুলের বিরুদ্ধে লড়াই করা ঠিকই ছিল, কিন্তু তার সংস্কার সাধন যত সহজ মনে হয়েছিল তত সহজ ছিল না। সমস্যাটা আদর্শ পাঠক্রমের নয়, সমস্যাটা ছিল উপযুক্ত লোকের ; শুধু শিক্ষক হবেন যে মানুষেরা তাঁদেরই নয়, তাঁরা যে গোটা সামাজিক বিন্যাসটাকে প্রকাশ করেন তারও। বাস্তবে একজন মাঝারি গোছের শিক্ষকও এ দায়িত্ব পালন করতে পারেন যাতে তাঁর ছাত্ররা আরো বেশি তথ্যবহ হয়ে ওঠে, যদিও তিনি তাদের আরো ভালোভাবে শিক্ষিত করে তুলতে সমর্থ হবেন না ; তিনি বেশ নিষ্ঠাভরে আমলাতান্ত্রিক বিবেকপরায়ণতার সঙ্গে যান্ত্রিক অংশের প্রতি মনোযোগ দিতেও পারেন—আর তাঁর ছাত্র, তার মেধা যদি সক্রিয় থাকে, তাহলে তার নিজস্ব সামাজিক পটভূমির সাহায্যে সে তার অধিগত বিদ্যার 'ঝুলি'তে নিজের মতো এক ধরনের একটা সাজানো গোছানো করেও নিতে পারে। নতুন পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-বৃত্তির মান সাধারণভাবে নেমে যাচ্ছে তো বটেই এবং এতে করে ঐ সাজানো গোছানোর মতো কোনো 'ঝুলি' আর অবশিষ্ট থাকবে না। নতুন পাঠক্রমে পরীক্ষা ব্যাপারটা ভয়াবহভাবে লাগে তাক না লাগে তুক গোছের হয়ে উঠছে। একটা তারিখ তো একটা তারিখই, পরীক্ষক যিনিই হোন না কেন, এবং কোনো একটা সংজ্ঞা তো সংজ্ঞাই, সব সময়েই তাই। কিন্তু কোনো নান্দনিক বিচার বা দার্শনিক বিশ্লেষণ ?

কাসাতি কানুনের সাহায্যে সংগঠিত পুরনো ইতালীয় মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষাগত কার্যকারিতা ঐ কানুনের ঘোষিত 'শিক্ষাগত' উদ্দেশ্যের মধ্যে খুঁজে লাভ হবে না ; বস্তুত ঐ ব্যবস্থার গড়ন ও পাঠক্রম আসলে প্রথাগত

বৌদ্ধিক ও নৈতিক জীবনের প্রকাশ—ইতালির সমস্ত সমাজজীবনের মধ্যে এক প্রাচীন ঐতিহ্যের মাধ্যমে ঐ সাংস্কৃতিক পরিবেশটা চারিয়ে গিয়েছিল। এ কথা ঠিক যে ঐ পরিবেশ ও জীবনচর্যা এক মুমূর্ষু অবস্থায় পেঁৗছে গিয়েছিল এবং স্কুলগুলি জীবন থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়েছিল—শিক্ষার সংকটটা এসেছিল এখান থেকেই। এই অবস্থা মনে না রাখলে শুধু পাঠ-ক্রমের বা পুরনো ব্যবস্থার কট্টর কাঠামোর সমালোচনা করে কিছুই এগোবে না। অতএব আমরা আবার ফিরে এলাম স্কুলে ছাত্রের প্রকৃত অর্থে সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রশ্নে ; স্কুল যদি জীবনের সঙ্গে অন্বিত হয় তবেই এ জিনিস সম্ভব। নতুন পাঠক্রম ছাত্রের কাজকর্ম এবং শিক্ষকের সঙ্গে তার এক ধরনের কাজ চালানো সহযোগিতার বিষয়ে যত তত্ত্ব বানাবে এবং বুলি কপচাবে ততই কিন্তু ঐ পাঠক্রমের ধরনধারণে ছাত্রকে মূলত নিষ্ক্রিয় বলেই কল্পনা করা হচ্ছে।

পুরনো স্কুলে লাতিন ও গ্রিকের ব্যাকরণ চর্চা ও সেইসঙ্গে ঐসব ভাষার সাহিত্য ও রাজনৈতিক ইতিহাসের চর্চার মধ্যে নিহিত ছিল এক শিক্ষাসূত্র—আথেন্স ও রোমের প্রতীকি তাৎপর্যে বিধৃত এক মানবিক আদর্শ সমাজের আগাপাশতলা ছড়িয়ে গিয়েছিল, আর তা ছিল জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ। এই সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতের জন্য এমনকী ব্যাকরণ চর্চার যান্ত্রিক চরিত্রও অনেকটা সজীব হয়ে উঠেছিল। এক একটি তথ্য যে অধীত হত শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক বাস্তব ও পেশাদারি উদ্দেশ্যের জন্য তাও নয়। ঐ উদ্দেশ্যের ব্যাপারটা ছিল তুলনায় গৌণ, কারণ প্রকৃত নজর ছিল ব্যক্তিত্বের আন্তর বিকাশ এবং আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার সমগ্র সাংস্কৃতিক অতীতকে আয়ত্ত ও গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠনের ওপর। ছাত্ররা লাতিন ও গ্রিক শিখত ঐ ভাষায় কথা বলার জন্য নয়, দোকানের বেয়ারাগিরি করা বা অনুবাদক কিংবা বাণিজ্যিক পত্রলেখক হবার জন্যও নয়। তারা ঐসব ভাষা শিখত গ্রিক ও রোমের সভ্যতার সঙ্গে সরাসরি পরিচয়ের জন্য—যে-সভ্যতাকে আমাদের আধুনিক সভ্যতার আবশ্যিক পূর্ব-শর্ত বলে গণ্য করা চলে : একটু অন্যভাবে বলা যায় যে তারা ঐসব ভাষা চর্চা করত নিজেদের মতো হবার জন্য এবং সচেতনভাবে আত্মপরিচয় আবিষ্কারের জন্য। লাতিন ও গ্রিক শেখা হত ঐসব ভাষার ব্যাকরণের মধ্য দিয়ে, যান্ত্রিকভাবে ; কিন্তু আঙ্গিকসর্বস্বতা ও নিষ্ফল বন্ধ্যাত্বের অভি-যোগ অন্যায় ও অনুচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে কিছু কিছু অভ্যাস তো গড়ে দিতে হয়—পরিশ্রম, সূক্ষ্ম নির্দিষ্টতা, স্থৈর্য (এমনকী শারীরিক স্থৈর্য), কোনো বিশেষ বিষয়ের ওপর মনঃসংযোগের ক্ষমতা—কিন্তু এসব গুণ তো প্রথাবদ্ধ সুশৃঙ্খল যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি ব্যতীত আয়ত্ত করা সম্ভব না। কেউ যদি শৈশবাবস্থায় বাধ্যবাধকভাবে খানিকটা যান্ত্রিক জোরজারের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত মানসিক ও শারীরিক অভ্যাসগুলি গড়ে না তোলে তাহলে কোনো বিদ্বান কি চল্লিশ বছর বয়সে এসে একনাগাড়ে ষোল ঘণ্টা কাজের

টেবিলে বসে কাজ করে যেতে পারবেন ? সত্যিকারের বড় মাপের বিদ্বান বা পণ্ডিত মানুষ তৈরি করতে গেলে এইখানেই শুরু করতে হবে এবং শিক্ষা-ক্ষেত্রের সর্বত্র এই চাপটা দিয়ে যেতে হবে যাতে করে যে-কোনো সভ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় সেই কয়েক হাজার বা কয়েক শো বা মাত্র কয়েক ডজন সেরা পণ্ডিত মানুষ তৈরি করা যায়। (অবশ্যই জেসুইটদের শিক্ষাপদ্ধতিতে ফিরে না গিয়েও এক্ষেত্রে অনেকটাই উন্নতি করা যায় যদি গবেষণার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করা যায়।)

লাতিন শেখা হয় (চর্চাই হয় বলা যায়) ভাষাটাকে তার ক্ষুদ্রতম অংশ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে—যেন কোনো মৃত বস্তুর বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এমনি ভাবে, কথাটা ঠিক, কিন্তু শিশু যে সব বস্তুর বিশ্লেষণ করে তার সবই তো প্রকৃত অর্থে মৃত বস্তু। তা ছাড়া একথা তো ভুললে চলবে না যে রোমক জীবন ইতিমধ্যেই খানিকটা কল্পপুরাণের মতো হয়ে উঠেছে এবং শিশুর কল্পনাকে তা ক্রমাগত উদ্দীপিত করে আর তাই ঐ মৃত বস্তুর মধ্যেই সব সময়ে রয়েছে আরো বৃহত্তর এক জীবন্ত সত্তার অস্তিত্ব। তাই ভাষাটা মৃত বটে, জড় বস্তু হিসেবে তাকে বিশ্লেষণ করা হয় ঠিক যেন কাটাছেঁড়া করার টেবিলে লাশ কাটার মতো, কিন্তু ভাষাটা তা সত্ত্বেও ক্রমাগত জীবন্ত হয়ে ওঠে উদাহরণের মধ্য দিয়ে, গল্পের মধ্য দিয়ে। ইতালীয় ভাষা কি কেউ এভাবে চর্চা করতে পারত ? অসম্ভব। কোনো জীবন্ত ভাষাকেই লাতিনের মতো চর্চা করা চলে না : সে ব্যাপারটাই হবে উদ্ভট, দেখাবেও সেইরকম। কোনো শিশু যখন এইসব বিশ্লেষণী পদ্ধতির মধ্য দিয়ে লাতিন চর্চা করতে আরম্ভ করে তখন তো সে ঐ ভাষাটা জানে না। কিন্তু একটা জীবন্ত ভাষা তো জানা যায় এবং কোনো শিশু যদি ভাষাটা জানে তবে সেটাই যথেষ্ট, ঘোরটা কেটে যাবে : প্রত্যেকেই মুহূর্তের মধ্যে ধাবিত হবে বেরলিৎস স্কুলের দিকে। লাতিন (গ্রিকের মতো) কল্পনায় নেহাতই পুরাণপ্রতিম হয়ে দেখা দেয়, শিক্ষকের কাছেও। ভাষাটা শেখবার জন্য তো আর কেউ লাতিন চর্চা করে না। দীর্ঘদিন ধরে, এমন একটা সাংস্কৃতিক ও বিদ্যাচর্চার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে যার সূত্রপাত ও বিকাশ নিয়ে নিশ্চয়ই গবেষণা করা সম্ভব, কিন্তু বুঝতে হবে যে তারই পরিপ্রেক্ষিতে লাতিন চর্চা করা হয়েছে এক আদর্শ শিক্ষাক্রমের অঙ্গ হিসেবে, এমন এক অঙ্গ যার মধ্যে মিলে যেতে পারে শিক্ষাদানের অনেক শর্ত ও মনস্তাত্ত্বিক বহুবিধ প্রয়োজন। এটা চর্চা করা হয়েছে এক বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে শিশুকে পরিচয় করাবার জন্য, এমন এক ঐতিহাসিক দেহকে বিশ্লেষণ করার জন্য যাকে এমন এক লাশের মতো ব্যবহার করা চলে যা বারবার জীবন্ত হয়ে ওঠে ; শিশুকে যুক্তি-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য, বিমূর্তভাবে চিন্তা করবার জন্য, এক একটা ছক অনুসারে যেন সে এগোতে পারে এবং এমনভাবে যাতে ঐ বিমূর্তচিন্তার ভেতর থেকে আবার ফিরে আসতে পারে বাস্তবে, প্রত্যক্ষ জীবনচর্চায় সরাসরি, প্রত্যেকটা ঘটনার মধ্যে বা তথ্যের মধ্যে যেন সে চিনে

নিতে পারে কোনটা সাধারণ আর কোনটা বিশেষ, ধারণার থেকে তার কোনো নির্দিষ্ট উদাহরণকে যেন সে তফাৎ করে নিতে পারে।

লাতিন ও মুখে বলা হচ্ছে এমন কোনো ভাষার মধ্যে এই যে ক্রমাগত তুলনা করা হচ্ছে এর শিক্ষাগত তাৎপর্য কী? এর মধ্যে শব্দ ও ধারণার পার্থক্য ও একাত্মতা দুইই বিদ্যমান; যুক্তিবিজ্ঞানের সমস্ত আনুষ্ঠানিক কাঠামোও এর লক্ষ্যে আছে—দুই বিপ্রতীপের অসঙ্গতি থেকে শুধু পৃথকের বিশ্লেষণ পর্যন্ত সবই এর মধ্যে বিধৃত; গোটা ভাষাটার ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতিও এর মধ্যে প্রকাশিত, সময়ের মধ্যে দিয়ে এই প্রকৃতি বিবর্তিত হচ্ছে, তা বিকাশমান, স্থাণু নয়। জিনাসিয়ো ও লিচেও-র আট বছরে প্রকৃত ভাষার গোটা ইতিহাসটা চর্চা করা হয়, এর আগে অবশ্য কোনো এক অনির্দেশ্য মুহূর্তে তার এক স্থিরচিত্র গৃহীত হয়ে গেছে, তাকেই বলে ভাষার ব্যাকরণ। চর্চা হয় একেবারে ইনিয়ুস থেকে বা দ্বাদশ স্তম্ভের খণ্ডাংশের শব্দসম্ভার থেকে ফায়েদ্রুস ও লাতিনের খ্রিস্টীয় লেখকগোষ্ঠী পর্যন্ত: এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা হয় উৎস থেকে একেবারে তার বিনাশ-কাল পর্যন্ত—বা হয়তো আপাতবিনাশ, কারণ আমরা জানি যে, ইতালীয় ভাষার সঙ্গে যদিও স্কুলে লাতিনের ক্রমাগত পার্থক্য নির্দেশ করা হয়, তবুও সেটাই আধুনিক লাতিন। শুধুই যে একটা কালপর্যায়ের ব্যাকরণ (যদিও সেটা একটা বিমূর্ত ধারণা মাত্র) চর্চা করা হয়, বা তার শব্দভাণ্ডার, তা নয়; তুলনার জন্য প্রত্যেক লেখকের ব্যাকরণ বা তাঁর শব্দসম্ভার এবং প্রত্যেকটি ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যা প্রতিটি 'শৈলী-পর্যায়ের' জন্য আলাদাভাবে আলোচনা হয়ে থাকে। কাজেই শিশু জানতে পারে যে ফায়েদ্রুসের ব্যবহৃত শব্দসম্ভার বা তাঁর ব্যাকরণ আর চিচেরোর বা প্লাউতুসের বা লাক্‌তান্‌-তিউসের বা তেরতুল্লিয়ানের ব্যবহৃত ব্যাকরণ বা শব্দসম্ভার এক নয় এবং ধ্বনির একই সংযোগ বিভিন্ন কালপর্যায়ে একই অর্থ সূচিত করে না, বিভিন্ন লেখকের ক্ষেত্রেও তার মাত্রা আলাদা। লাতিন এবং ইতালীয় ভাষার মধ্যে তুলনা ক্রমাগতই চলতে থাকে; কিন্তু প্রতিটি শব্দ তো এক একটি ধারণা, একটা প্রতীক, যা বিভিন্নকালে বা বিভিন্ন লেখকের হাতে বিভিন্ন অর্থের প্রচ্ছায় গ্রহণ করে, একথা আমাদের তুলনীয় দুই ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শিশুর চর্চার মধ্যে থাকে ঐ ভাষায় লিখিত বইয়ের সাহিত্যিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস, ঐ ভাষাভাষী মানুষের কৃতির ইতিহাস। তার শিক্ষা তো নির্ধারিত হয় এই গোটা জিনিসটার জৈব সামগ্রিকতা দিয়ে, সে যে এই পথটা পরিক্রমা করেছে তাই দিয়ে, হয়তো একেবারে আক্ষরিক অর্থেই সে যে এই বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে গেছে তাই দিয়ে, ইত্যাদি। সে যে ইতিহাসে একেবারে নিমজ্জিত এবং সেইভাবে জগৎ ও জীবনের এক ইতিহাসনিষ্ণাত বোধ যে তার গড়ে উঠল, এটাই তার দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে দাঁড়াল—প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, কারণ সরাসরি শিক্ষা দেবার মতলব নিয়ে এটা তো কোনো পাণ্ডিতভাবে তার মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করা হয় নি। সেরকম কোনো

ঘোষিত উদ্দেশ্য ছাড়াই এই চর্চার ভেতর দিয়ে শিক্ষাদানটা হল, শিক্ষকের দিক থেকে শিক্ষাদানের ন্যূনতম ব্যবহারিক প্রচেষ্টা ছাড়াই : ওঁরা তাকে শিক্ষা দিলেন কারণ ওঁরা তাকে যথোপযুক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। ক্রমাগত সচেতনতা ছাড়াই, নিতান্ত অসন্দিগ্ধভাবে অর্জিত হয়ে গেল যুক্তিবৈজ্ঞানিক নান্দনিক ও মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার এক স্তর। সর্বোপরি এক বাস্তব ঐতিহাসিক বিকাশের সুগভীর 'সংশ্লিষ্ট' ও দার্শনিক এক প্রেক্ষাপট অর্জন করা গেল। এর মানে অবশ্য এই নয়—সেরকম ভাবাও খুব বোকামি হবে—যে শিক্ষাক্ষেত্রে লাতিন ও গ্রিকের মধ্যেই কোনো সহজাত জাদুকরি ক্ষমতা আছে। আসলে একটা গোটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যার অস্তিত্বের অনেকটাই বিশেষত স্কুলের বাইরে, একটা বিশেষ প্রতিবেশের মধ্যে দিয়ে এইসব কাজ করে যায়। যাই হোক আজ তো পরিষ্কার বোঝা যায় যে কীভাবে সংস্কৃতির প্রথাগত ধারণার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্কুলব্যবস্থা এক সংকটের মধ্যে এসে পড়েছে আর তার সঙ্গে লাতিন ও গ্রিকের চর্চাও।

স্কুলের গোড়ার দিকটায় লাতিন ও গ্রিকের ওপর এই একান্ত নির্ভরতা বদলাতে হবে, এবং বদল হবেও। তবে নতুন বিষয়গুলোকে এমনভাবে শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা খুব সহজ হবে না যাতে করে শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে বা একেবারে ছেলেবেলা থেকে পরিণত বয়সের জীবনযাত্রা নির্বাচন করার মুহূর্ত পর্যন্ত তার ব্যক্তিত্বের গড়নে একই রকমের ফল পাওয়া যায়। কারণ এই পর্বে যা শেখবার—বা তার অন্তত বড় একটা অংশ—শিক্ষার্থীদের কাছে নিতান্ত নীরস বলে মনে হবেই অর্থাৎ সে-সবের সরাসরি বা খুব প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহারিক প্রয়োজন বেশি নেই। এগুলোকে 'নির্দেশাত্মক' চরিত্রের সঙ্গে হতে হবে গড়নমূলক—একটু অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রকৃত তথ্যে সমৃদ্ধ হতে হবে। বর্তমান স্কুলে প্রথাগত সংস্কৃতির গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে এবং জীবন ও মানুষ বিষয়ে তার ধারণার ভেতরে ভেতরে এক গভীর অবক্ষয় তৈরি হয়ে গেছে। বৃত্তিমূলক ধরনের স্কুল, অর্থাৎ যাদের লক্ষ্য খুব সরাসরি ব্যবহারিক উদ্দেশ্য, তারাই ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এসব গড়নমূলক স্কুলের ওপরে - যাদের লক্ষ্য প্রত্যক্ষ 'বাস্তব' স্বার্থে নিবদ্ধ নয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কূটাভাস এখানেই যে এই নতুন ধরনের স্কুলগুলোকেই প্রচার করা হচ্ছে গণতান্ত্রিক বলে, যদিও প্রকৃত অর্থে এই স্কুলগুলোর মধ্য দিয়েই সামাজিক বৈষম্য আরো জোর করে টিঁকিয়ে রাখা হচ্ছে এবং প্রায় চৈনিক জটিলতার ধাঁচে এগুলো দানা বাঁধছে।

প্রথাগত স্কুল ছিল কতিপয়তন্ত্রের আদলে, কারণ তাদের লক্ষ্যে ছিল শাসকশ্রেণীর এক নতুন প্রজন্ম, যারা নিজেরাই একদিন শাসনের দায়িত্বে এসে যাবে অবধারিতভাবে : কিন্তু এদের শিক্ষাদানের ধরনটা কতিপয়তন্ত্রের আদলে ছিল না। শিক্ষার্থীরা যে শাসনপদ্ধতি শেখে বা ঐসব স্কুলে যে প্রতিভার বিকাশ ঘটানো হয় তা দিয়ে কিন্তু স্কুলগুলোর সামাজিক চরিত্র নির্ধারিত হয় না। এই সামাজিক চরিত্র নির্ধারিত হয় এ তথ্য দিয়ে যে প্রত্যেক সামাজিক

গোষ্ঠীরই রয়েছে নিজস্ব স্কুল যার উদ্দেশ্য হল এক নির্দিষ্ট প্রথাগত কর্ম-ভূমিকাকে জীইয়ে রাখা, সে ভূমিকা কখনো শাসকের, কখনো শাসিতের। এই ধাঁচটাকে ভাঙতে গেলে যা প্রয়োজন তা হল বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক স্কুলের স্তরবিন্যাস বা তাদের সংখ্যা আরো না বাড়িয়ে এক রকমের গড়নমূলক স্কুল (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) তৈরি করা, যাদের দায়িত্ব হবে শিশুকে একেবারে তার বৃত্তিনির্বাচনের মুখোমুখি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া, তাকে এই সময়টার মধ্যে এমনভাবে তৈরি করে দেওয়া যাতে সে এক পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে উঠে, চিন্তা, বিদ্যাচর্চা, শাসন—অথবা যারা শাসন করে তাদের নিয়ন্ত্রণ—সর্বক্ষেত্রেই পারঙ্গম হয়ে ওঠে।

নানা ধরনের বৃত্তিমূলক স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি তাই সামাজিক বৈষম্যকে জীইয়ে রাখতেই সাহায্য করে; কিন্তু যেহেতু এই বৈষম্যের মধ্যে, এক ধরনের অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তাই এর প্রকৃতিটা গণতান্ত্রিক বলে একটা ধারণা তৈরি হয়। শ্রমিক কুশলী শ্রমিক হয়ে উঠতে পারে, একজন চাষি হয়তো সার্ভেয়ার বা ছোটখাটো কৃষিবিদ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারে গণতন্ত্র মানে শুধু এই নয় যে একজন অদক্ষ শ্রমিক দক্ষ হয়ে উঠবে। গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ অবশ্যই হওয়া উচিত যে প্রত্যেক নাগরিক' যেন 'শাসন' করতে পারে এবং সমাজ যেন নেহাত তাত্ত্বিক অর্থে হলেও এই সামাজিক অবস্থাটা সৃষ্টি করতে পারে যাতে সবার পক্ষেই এটা অর্জন সম্ভব হয়। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে শাসক ও শাসিতের এক ধরনের সন্নিবেশ সম্ভব হয় (শাসিতের মধ্যে সকলের সম্মতি নিয়ে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অর্থে) এবং এর মধ্যে দিয়ে অ-শাসক যাঁরা তাঁদের জন্যও শাসনে অংশ নেবার মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রস্তুতির শিক্ষাদীক্ষা সুনিশ্চিত করা যায়। কিন্তু বর্তমানে জনগণের স্কুল বলে যে ধরনটা গড়ে উঠছে তার মধ্যে এই মোহসৃষ্টির চেষ্টাও নেই। কারণ এইসব স্কুল ক্রমশ এমনভাবে সংগঠিত হচ্ছে যাতে করে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরের প্রস্তুতি সমেত শাসকশ্রেণীর স্তরভুক্ত বলে গণ্য হবার সম্ভাবনা ক্রমেই কমে যাচ্ছে এবং এটা ঘটছে এমন একটা সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে' ঐসব শাসকসুলভ গুণাবলি ও দক্ষতা ও রাজনৈতিক প্রস্তুতি অর্জন করা ক্রমেই বেশি বেশি করে শক্ত হয়ে উঠছে। তাই আমরা কিন্তু প্রকৃত অর্থে এমন একটা অবস্থার দিকে ফিরে চলেছি যেখানে ভাগ-গুলো একেবারে আইনী অর্থে স্তরবিন্যস্ত এবং মূলুকগুলো যেন নির্দিষ্ট-ভাবে দানাবাঁধা—শ্রেণীগত বিভাজনের উত্তরণের দিকে আমরা আদৌ এগোতে পারছি না। বৃত্তিমূলক স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং এসব স্কুলে যে শিশুর বিদ্যারম্ভের শুরু থেকেই কোনো না কোনো রকমের বিশেষ ধরনের দীক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকে তার মধ্যেই এই ঝোঁকটা অত্যন্ত পরিষ্কার। এটা লক্ষণীয় যে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির সমস্ত চাপটা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে 'একরোখা'-ভাবে নির্দেশ দান ও খুব কাটাছাঁটা তথ্য আয়ত্ত করার

ওপর—অর্থাৎ ঠিক সেই ক্ষেত্রের ওপর যেখানে এক ধরনের একরোখা ভাব বস্তুত প্রায় অপরিহার্য এবং যেটা পুনরায় আহরণ করা ও আবার নিঃশেষে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব গোটা শিক্ষাপ্রক্রিয়ার বৃত্তের মধ্যে (নিচেও শ্রেণীতে ঐতিহাসিক ব্যাকরণ শেখানো সম্ভব ছিল না)। পক্ষান্তরে, এই শিক্ষা-ব্যবস্থা ধর্মবিষয়ক চিন্তার ক্ষেত্রে এক পরম একরোখা চিন্তার অন্তর্ভুক্তি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে, আর তার ফল হয়েছে যে দর্শনের সমস্ত ইতিহাসকে মনে হয় মূলত ভ্রমাত্মক মতিচ্ছন্নতার এক পর্যায়ক্রম। দর্শনের পাঠক্রমে এই নতুন ব্যবস্থা শিক্ষাটাকে অত্যন্ত ম্লান করে তুলেছে এবং বস্তুত তার মানের অবনতি ঘটিয়েছে (অন্তত সেই বৃহৎ সংখ্যক ছাত্রদের ক্ষেত্রে যারা স্কুলের বাইরে পরিবারে বা বাড়ির আবহাওয়াতে কোনো বিশেষ বৌদ্ধিক সাহায্য পায় না এবং যাদের সবটাই গড়ে ওঠে ক্লাসে পাওয়া জ্ঞানের মধ্য দিয়ে)—দেখতে এটা হয়তো খুব সুবিবেচনাপ্রসূত এবং চমৎকার, এক কল্পজগতের মতো চমৎকার যেন। এক প্রথাগত বর্ণনাত্মক দর্শন, সঙ্গে যদি দর্শনের ইতিহাসের একটা পাঠক্রম থাকে আর তার সঙ্গে যদি কয়েকজন দার্শনিকের মূল রচনা পড়া যায় তাহলে সেটাই মনে হয় সবচেয়ে ভালো। বর্ণনাত্মক, সংজ্ঞামূলক দর্শন হয়তো একটু বেশি রকম বিমূর্ত, ঠিক যেমন ব্যাকরণ বা গণিত, কিন্তু সেটা শিক্ষাগত দিক দিয়ে অতীব প্রয়োজনীয়। 'এক একেরই সমান' এটা অবশ্যই বিমূর্ত, কিন্তু এর থেকে কোনো লোকেরই এটা মনে হবে না যে একটা মাছি একটা হাতির সমান। যুক্তিবিজ্ঞানের সূত্রগুলো এই রকম বিমূর্ত, সাধারণ চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন ব্যাকরণ ঠিক তেমন; কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব জিনিসের চর্চা করতেই হবে, কারণ এসব বিদ্যা তো অন্তর্জাত নয়, কাজ এবং চিন্তার মধ্য দিয়ে এদের অর্জন করতে হয়। নতন শিক্ষাক্রম এই চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, যে-কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেই চিন্তা করবার সময় যেন যুক্তিবিজ্ঞান আনুষ্ঠানিকভাবে তার অধিগত, কী করে যে এটা অর্জিত হল তা ব্যাখ্যা করা হয় না, আর তাই বস্তুত এটা যেন অন্তর্জাত বলেই ধরে নেওয়া হয়। যুক্তিবিজ্ঞান ব্যাকরণের মতো: এটা একটা 'জীবন্ত' পদ্ধতিতে আয়ত্ত হয়, প্রকৃত শিক্ষাপদ্ধতি কিছুটা আবশ্যিকভাবে ছকে বাঁধা এবং বিমূর্ত হলেও। কারণ শিক্ষার্থী তো একটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো নিষ্ক্রিয় যান্ত্রিক প্রাপক মাত্র নয়—যদিও পরীক্ষা প্রাসঙ্গিক নিয়মকানুনের প্রতি অনুগতি দেখে অনেক সময়ে তাই মনে হয়। শিক্ষার এইসব আঙ্গিকের সঙ্গে শিশুর মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধ সব সময়েই সক্রিয় ও সৃজনমূলক, ঠিক যেমন শ্রমিকের সঙ্গে তার যন্ত্রপাতির সম্বন্ধ সক্রিয় ও সৃজনমূলক। ঠিক তেমনি কারো ক্ষমতা-প্রতিভা তো অনেক বিমূর্তনের এক জটিল সমাবেশ, কিন্তু যত্নে দেগে না নিলে তো প্রকৃত বস্তু নির্মাণ করা যায় না—যে সব প্রকৃত বস্তু আসলে সামাজিক সম্বন্ধ এবং যার অবয়বে বিধৃত আছে মানুষের চিন্তা ও কল্পনা।

যে শিশু বারবারা, বারালিপ্‌তন করতে করতে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছে সে নিশ্চয়ই

একটা ক্লান্তিকর কাজই করে চলেছে এবং এটা খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি যে নিতান্ত যেটুকু না হলেই নয় তার বেশি যেন এ ধরনের কাজ করানো না হয়। কিন্তু একথাও সত্য যে শারীরিক শৃঙ্খলা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা সব সময়েই বেশ কষ্টকর ব্যাপার হবে ; শিক্ষার্থীকে বস্তুত এক মনস্তাত্ত্বিক-শারীরিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। অনেক লোককেই তো একথা বেশ কষ্ট করে বোঝাতে হয় যে লেখাপড়া করাও একটা কাজ এবং বেশ কষ্টকর কাজই, এরও রয়েছে নিজস্ব বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া—তার মধ্যে পেশীশক্তি, স্নায়ুশক্তি ও ধীশক্তি সবেরই সম্মিলন প্রয়োজন। এটা অভি-যোজনের একটা প্রক্রিয়া, এমন এক অভ্যাস যা বেশ কষ্ট করে ক্লান্তিকর যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তবে অর্জন করা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষায় ব্যাপক অংশ-গ্রহণের ফলে এমন একটা ঝোঁক দেখা দিতে পারে যে শিক্ষার শৃঙ্খলা একটু আলগা করে দেবার প্রবণতা বাড়ছে, একটু যেন 'বিশ্রাম'-এর প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। অনেকে এমনও মনে করেন যে শিক্ষার শ্রম ব্যাপারটা খুব কৃত্রিম, কারণ তাঁরা শ্রম বলতে শারীরিক শ্রম ভাবতেই অভ্যস্ত। প্রশ্নটা বেশ জটিল। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রথাগত মননমুখী পরিবারের শিশুর ক্ষেত্রে এই মনস্তাত্ত্বিক-শারীরিক অভিযোজন অনেক সহজে হয়। ক্লাসঘরে প্রথম ঢোকার আগেই তার সতীর্থদের তুলনায় তার অনেকখানি সুবিধা রয়ে গেছে, ইতিমধ্যেই পারিবারিক আবহাওয়া থেকে সে একধরনের মনোভঙ্গি শিখে নিয়েছে : সে অনেক সহজে মনঃসংযোগ করতে পারে কারণ সে 'স্থির হয়ে বসতে' জানে ইত্যাদি। এই রকম ভাবে, কারখানায় কাজ করতে গেলে একজন কৃষকের ছেলের বা গ্রামের জীবনেই অভ্যস্ত এমন তরুণ কৃষকের যত কষ্ট হবে শহরের শ্রমিকের ছেলের সে তুলনায় অনেক কম কষ্ট হবে। (এমন কী এ ব্যাপারে খাদ্যেরও গুরুত্ব রয়েছে ইত্যাদি।) এই কারণেই যারা সরল বিশ্বাসে নিজেদের বোকা বলে ধরে নিতে প্রস্তুত নয়, এমন অনেকে মনে করে যে লেখাপড়ার পরিশ্রমের আড়ালে আসলে কিছু 'চালাকি' লুকোনো আছে, যার জন্যে তারা পারছে না ; তারা যখন দেখে যে 'ভদ্রলোকেরা'—আর অনেকের কাছে, বিশেষত গ্রামের দিকে, 'ভদ্রলোক' বলতে বোঝায় বুদ্ধিজীবী —বেশ আপাতদৃষ্টিতে সহজে দ্রুত তাদের কাজগুলো শেষ করে ফেলে, যে-সব কাজ করতে তাদের ছেলেদের চোখের জল ঝরে আর কালঘাম ছুটে যায়, তখন তারা ভাবে যে নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা 'চালাকি' আছে। ভবিষ্যতে এই প্রশ্নগুলো খুব বড় হয়ে দেখা দিতে পারে এবং যে কাজ বিকৃত না করে সহজ করে তোলা যায় না তাকে সহজ করে তোলার প্রবণতা হয়তো প্রতিরোধ করতে হতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য যদি হয় নতুন বুদ্ধিজীবীদের একটা স্তর তৈরি করা, যাদের পক্ষে সর্বোচ্চ মাত্রায় বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে এবং এ বুদ্ধিজীবী স্তরকে যদি সেই সামাজিক শ্রেণী থেকে গড়ে তুলতে হয় যে শ্রেণীতে প্রথাগতভাবে উপযুক্ত মনোভঙ্গি তৈরি হয় নি, তাহলে আমাদের অভূতপূর্ব অসুবিধার সম্মুখীন হতেই হবে।

দর্শনচর্চা

[**সম্পাদকীয় ভূমিকা ১। আন্দোলনের স্বার্থেই দর্শনচর্চা।** কারান্তরালে বসে তাঁর 'নোটবই'তে লিখতে লিখতে গ্রামশি দেখতে পাচ্ছিলেন, পুঁজিবাদ তার ফ্যাশিবাদী রূপান্তরণে এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করছে যা সহজেই শ্রমিক আন্দোলনের অর্থনীতিকতাবাদী প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে সেই আন্দোলনের ধারকেই নষ্ট করে দিতে পারে। নিম্নবর্গ শ্রেণী তার নিম্নবর্গীয় সত্তাকে অতিক্রম করে 'হেজিমান' তথা আধিপত্যের স্তরে পৌঁছতে পারলে তবেই তারা সমাজের কাঠামোগত পুনঃসংগঠনে তাদের যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। মার্কসবাদকে (কারাগারের সেনসরের শ্যেনদৃষ্টিকে এড়াতেই হয়ত) যখন গ্রামশি 'কর্মকাণ্ডের দর্শন' বলে অভিহিত করেন, তখন তার মধ্যেও এই ধারণা নিহিত থাকে। অর্থাৎ মার্কসবাদকে দর্শনরূপে আয়ত্ত বা অধিকার করতে গেলে ব্যক্তি বা শ্রেণীকে সমভাবেই এক সমগ্র কর্মকাণ্ডের তথা আত্মাবিষ্কার, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মরূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। ইতালিতে ফ্যাশিবাদের আত্মপ্রকাশ সমাজতন্ত্রীদের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতার চেহারা নেয়নি তার আদিপর্বে, বরং তেমন খুঁটিয়ে লক্ষ না করলে এমনও মনে হতে পারত যে ফ্যাশিবাদ বুঝি সমাজবাদী আন্দোলনেরই স্বাভাবিক উত্তরণ মাত্র। এই অভিজ্ঞতা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম প্রকট হয়েছিল দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন ইতালিতেই। ভাবাদর্শের তথা দর্শনের বৃহত্তর মাত্রা ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া বা অধিকারের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইও সহজেই পৌঁছে যেতে পারে ফ্যাশিবাদী আস্ফালনে। এই সম্ভাবনা তথা বিপদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই গ্রামশি-র কাছে ভাবাদর্শ তথা দর্শনের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি যেমন নিহিত ছিল আঠারো শতকের এনলাইটেনমেন্ট বা জ্ঞানকাণ্ডে, তেমনই ইতালিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত তৈরি হতে পারে ইতালীয় নির্বিত্ত শ্রেণীর জ্ঞানকাণ্ডে। গ্রামশি বলেন: 'প্রত্যেক বিপ্লবের পূর্বাহ্নেই ঘটেছে সমালোচনার সুতীব্র আয়াস, সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তার এবং জনগণের মধ্যে ধ্যানধারণার সঞ্চার।' প্রোলেতারীয় চেতনার বিকাশেই সৃষ্টি হতে পারে সেই 'সমষ্টিগত বোধ' যা সমষ্টিগত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্ম দিতে পারে—এবং এই সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডই নতুন ঐতিহাসিক বাস্তব পত্তন করতে পারে। এই কর্মকাণ্ডই সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণার সঙ্গে সৃষ্টিশীল দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটাতে পারে। গ্রামশি-র বিবেচনায় উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিকীকরণের চেয়ে সাংস্কৃতিক ও

বৌদ্ধিক উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিকীকরণের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। জনগণের চিন্তার স্তরে ইতিহাসবোধ ও মার্কসীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য নিশ্চিত করতে পারে। বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণনির্দেশে প্রায়ই বলা হয়, বিপ্লবের বস্তুগত সম্ভাবনা বা যথোপযোগী পরিস্থিতি না থাকার কারণেই বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। গ্রামশি সেখানে অন্য একটি প্রশ্ন জুড়ে দিলেন: বিপ্লবের উপযুক্ত বস্তুগত পরিস্থিতি বা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার যথোপযুক্ত ও সর্বব্যাপী চেতনাগত বোধ বিপ্লবী শ্রেণী ও জনসাধারণের মনে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে কি বিপ্লব সফল হতে পারে?

নির্বিত্ত নিম্নবর্গ শ্রেণীর কাছে দর্শনের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই দর্শনচর্চায় তাঁদের অধিকার তথা প্রবেশের পদ্ধতিগত পথনির্দেশ করার তাগিদেই 'নোটবই'তে এই রচনাটির আবির্ভাব। দর্শনের যে-বীজ সামাজিক মানুষের প্রতিদৈনিক অভ্যাস, ভাষা ব্যবহার, বিশ্বাস ইত্যাদির মধ্যে নিহিত তা থেকেই এই দর্শনচর্চার সূত্রপাত হতে পারে, গ্রামশি যাকে বলেন, 'পৃথিবী বিষয়ে নিজের ধারণা সচেতন সমালোচনাত্মকভাবে গড়ে তোলা এবং সেইভাবে নিজের মগজ খাটিয়ে সেই বোধে পেঁছনো এমনিভাবে নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নেওয়া, নিজেই নিয়ন্তা হয়ে ওঠা, বাইরে থেকে নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর পরিবর্তনকামী প্রভাবকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করা।'

দর্শনের বোধ, অভিজ্ঞতা ও চর্চায় জনগণকে প্রণোদিত করতে গিয়ে গ্রামশি সেই বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ নির্দেশ করেন ঃ 'সমালোচনাত্মক বিশদীকরণের প্রস্থানবিন্দু হল আত্মসচেতনতা এবং "আত্মানং বিদ্ধি" হল আজ পর্যন্ত যেসব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ঘটেছে তার ফল পরিণাম, যা কোনো নির্ঘণ্ট ছাড়াই আপনার ওপর অন্তহীন ছাপ রেখে গেছে।' নিজেকে জানার এই দায় গ্রীক-রোমক ধ্রুপদী ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন গ্রীসে দেলফাই-এ আপোলো মন্দিরে গ্রীকেরা যেতেন আপোলোর ভরে-পাওয়া পুরোহিতের কাছে দৈববানী শুনতে। অথচ সেই মন্দিরেরই তোরণশীর্ষে লেখা ছিল: 'নিজেকে জানো।' সক্রেতিস-এর দর্শনেরও অন্যতম সূত্র ছিল এই বাণী। এই সাবেকি সূত্রটিকে গ্রামশি ঐতিহাসিকতাবোধে জারিত করে তাকে নতুন, তাৎপর্য দিয়েছেন। আধুনিক মানুষ যখন নিজেকে জানবার চেষ্টা করবে, সে তখন নিজেকে দেখবে ইতিহাসের প্রক্রিয়ার পরিণাম রূপে, ইতিহাসের মধ্যেই সে নিজেকে স্থাপন করবে, সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসের ভবিষ্যৎ ক্রমপরিণতিতেও সে নিজের ভূমিকা ধরতে পারবে। এই দৃষ্টির উন্মেষ বস্তুত ব্যক্তির সচেতন দার্শনিকতার সূত্রপাত।

নতুন সংস্কৃতির 'সৃষ্টি' হবে ব্যক্তিক স্তরে এই আত্মজিজ্ঞাসা থেকেই, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেই তার যে 'সামাজিকীকরণ' ঘটবে, তাতেই তার

যথার্থ বিকাশ ঘটবে। ইতিহাসের সত্যকে আবিষ্কার করার মধ্য থেকেই যে সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশের সম্ভাবনা গ্রামশি দেখেন, তাঁর ভাষা ব্যবহারে তিনি যেন তার সঙ্গে অ রি বের্গস* (১৮৫৯—১৯৪১)-এর 'এলান ভিতাল' বা জীবনময় প্রণোদনার যোগসূত্র পেয়ে যান। বের্গস কল্পনা করেছিলেন, মানববিবর্তনের সমগ্র প্রক্রিয়া তথা ইতিহাসের মধ্য দিয়ে এই জীবনময় প্রণোদনা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে সেই মানবগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই সেই প্রণোদনার সামাজিকীকরণ তথা বাস্তবায়ন ঘটে। গ্রামশি বের্গস-এর ধোঁয়াটে স্বপ্নবিলাসকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করলেও তার অন্তর্নিহিত ক্রমোন্নয়ন বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছিলেন, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে।

এই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রেক্ষিতেই গ্রামশি সাধারণ সামাজিক মানুষের মন ও মননের যাবতীয় উপাদানগুলিকে বিচার করে দেখতে চান, অর্থাৎ কার্যত তাঁর পাঠক তথা শ্রমজীবী জনসাধারণের আত্মানুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় প্রথম পা ফেলার কাজটাই তিনি সহজ করে দিতে চান। যে 'কাণ্ডজ্ঞান' বা 'শুভজ্ঞান' সামাজিক মানুষের সহজাত বলেই বোধ হয়, গ্রামশি তার মধ্যেও ইতিহাসের হস্তাবলেপ দেখতে পান। অন্যত্র তিনি বলেন: 'প্রত্যেক সামাজিক স্তরেরই তার নিজস্ব "কাণ্ডজ্ঞান" ও নিজস্ব 'শুভজ্ঞান" আছে, যা আসলে জীবন ও মানুষ সম্পর্কে ব্যাপকতম প্রচলিত ধারণারই নামান্তর। প্রত্যেকটি দার্শনিক ধারা শেষ হয়ে যাবার পর "কাণ্ডজ্ঞানের" একটি পলিস্বরূপ আস্তরণ রেখে যায়। এই আস্তরণই শেষ পর্যন্ত তার ঐতিহাসিক মূল্যের একমাত্র সাক্ষ্যস্বরূপ থেকে যায়। কাণ্ডজ্ঞান অনড় অচল কিছু নয়, বরং তা ক্রমাগতই নিজেকে রূপান্তরিত করে চলেছে, বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা ও সাধারণ জীবনে প্রবিষ্ট দার্শনিক ধারণা গ্রহণ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। কাণ্ডজ্ঞান দর্শনের লোককথা; লোককথা বলতে আসলে যা বোঝায় এবং বিশেষজ্ঞদের চর্চিত দর্শন, বিজ্ঞান ও অর্থনীতির মধ্যে ঠিক মাঝামাঝি এক জায়গায় কাণ্ডজ্ঞানের অবস্থান। কাণ্ডজ্ঞান স্থানবিশেষে, কালবিশেষে আপেক্ষিক বিচারে এক অনড় পর্বে অবস্থান করেও ভবিষ্যতের লোককথা সৃষ্টি করে।'

'সাধারণ দর্শন' বলে 'কোনো কিছুর অস্তিত্ব' গ্রামশি মানতে চান না। কাণ্ডজ্ঞান বা ধর্মের পিছনে যে ঐতিহাসিক গঠনকর্ম আছে তা লক্ষ করলে এগুলিকেও 'মতাদর্শ' বা 'রাজনীতি' বলেই চিহ্নিত করতে হবে। কোনো বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর ঘোষিত 'ধর্ম' ও তার আচরণের মধ্যে প্রায়শই যে বৈপরীত্য তথা অসংগতি লক্ষ করা যায়, তার মধ্যে গ্রামশি ঐ 'রাজনীতি'র লক্ষণই দেখতে পান। অর্থাৎ ঐ গোষ্ঠী তার বোধ, অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় যে বিশ্ববীক্ষায় এসে

পেঁছেছে, অন্য সামাজিক গোষ্ঠীর কাছে বৌদ্ধিকভাবে অবদমিত হয়ে তার সেই নিজস্ব বিশ্ববীক্ষা চাপা দিয়ে শক্তিমান গোষ্ঠীর বিশ্ব-বীক্ষাকেই সে তার বিশ্ববীক্ষা বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হচ্ছে।

'সাধারণ অবস্থায়' নিম্নবর্গ শ্রেণী আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর বিশ্ববীক্ষাকেই তার নিজস্ব বিশ্ববীক্ষা বলে মেনে নেয়, এই কথাটি বলবার সময় গ্রামশি ইঙ্গিত করেন যে ইতিহাসে সেই 'অ-সাধারণ' মুহূর্তগুলি যখন আসে অর্থাৎ যখন নিম্নবর্গ শ্রেণী তার বৈপ্লবিক ভূমিকায় বা ক্রিয়াকর্মে তার ভিতর ও বাইরের আচরণে ও বিশ্বাসে এক অভিন্ন সংহতির আস্বাদ পায়, তখনই তার নিজস্ব বিশ্ববীক্ষায় তার অধিকার আসে। এক ধরনের শস্তা বাজারি মার্কসবাদ দেশে-বিদেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যার প্রতিপাদ্য, লোকপ্রিয় সংস্কৃতি মাত্রই নিম্ন-বর্গের সহজাত সংস্কৃতি এবং সেইহেতুই তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য বুদ্ধি-জীবী শ্রেণীর চিন্তা ও মননের প্রসাদধন্য যে-কোনো সাংস্কৃতিক সৃষ্টির ঊর্ধ্বে। এই ধরনের অনৈতিহাসিক 'মার্কসীয়' বিচারের ফাঁকটাই গ্রামশি এখানে ধরিয়ে দেন। যে-শ্রেণীর আধিপত্যে নিম্নবর্গ শ্রেণী অবদমিত তারই সংস্কৃতি 'সাধারণ অবস্থায়' স্বভাবতই নিম্নবর্গ শ্রেণীর সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়ায়। এই ঐতিহাসিক সত্যটি বিস্মৃত হলেই লোকসংস্কৃতি ও লোকপ্রিয় চলচ্চিত্রকে অতিরিক্ত মানমর্যাদা দেবার প্রবণতা দেখা যায়, উচ্চমার্গ ও নিম্নমার্গের শিল্পসংস্কৃতির বিভাজনে ইতিহাস ও শ্রেণীর প্রশ্ন না এনে এক শুদ্ধ বিচারে নিম্নমার্গের সংস্কৃতিকে নিম্নবর্গের সংস্কৃতির সমার্থক ধরে বসা হয়।

ইতালির ইতিহাসেই রোমক ধর্মসংঘের উন্মেষ ও প্রতিষ্ঠা। তার ক্রিয়াকর্মে গ্রামশি দেখেছেন আধিপত্য প্রতিষ্ঠার তাগিদেই 'বুদ্ধিজীবী' ও 'শাদামাটা' মানুষদের মধ্যে একটা 'সাম্যাবস্থা' রক্ষা করার প্রচেষ্টা। রোমক ধর্মসংঘের মধ্যে জেস্যুইট সম্প্রদায় (শুধু ইতালিতে নয়, ভারতেও) শিক্ষা প্রসারে যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, তাতে শিক্ষাচর্চা ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই রোমক ধর্মসংঘের মতাদর্শ বহুদূরে চারিয়ে গেছে, শক্তপোক্তভাবে একটা দেশের সংস্কৃতির মধ্যে গেড়ে বসেছে, তার আধিপত্যও পাকা হয়েছে। আবার এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই খানিকটা প্রগতিশীল তথা মানবিকবাদী চেতনার যে বিকাশ ঘটেছে তাতে আতঙ্কিত হয়ে 'পূর্ণতাবাদ' নামে চিহ্নিত এক প্রতি-ক্রিয়াশীল আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। ইতালিতে (পরবর্তীকালে লাতিন আমেরিকাতেও খুবই ব্যাপকভাবে) ক্যাথলিক ধর্মসংঘ সমাজবাদী চিন্তাধারার কিছু সূত্র ও বিশেষত তার তাৎক্ষণিক লোকগামী আবেদনকে আত্মসাৎ করে এক ধর্মীয় আধুনিকবাদের পথ খুলে দেয়, যে-পথে ধর্মের তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক প্রশ্নগুলিকে সাময়িকভাবে মুলতবি রেখে সমাজে জনগণের যথার্থ স্থান ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায়

পুরোহিতেরা বাইবেল-এর নীতিবোধকে তাঁদের মতাদর্শ বা রাজনীতি রূপে তুলে ধরেন। এরই প্রতিরোধে ধর্মসংঘকে সমাজবিমুখ শুদ্ধ তাত্ত্বিকতায় তথা আধ্যাত্মিকতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কর্মসূচি গ্রহণ করেন তথাকথিত এই 'পূর্ণতাবাদীরা'।

রোমক ধর্মসংঘ বুদ্ধিজীবী ও শাদামাটা মানুষদের মধ্যে, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে যে 'মতাদর্শগত ঐক্য' গড়ে তুলতে পেরেছে, 'নিহিতার্থবাদী' দর্শনসমূহের প্রবক্তারা তা পারেননি। 'নিহিতার্থবাদী' দর্শন বলতে গ্রামশি বিভিন্ন স্থলে দর্শনের বিভিন্ন ধারার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন: কখনো বর্তমান শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভিক পর্বের ক্রোচে, জেনতীল প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকদের এই অভিধায় চিহ্নিত করেছেন, কারণ এঁরা ক্যাথলিকদের অতীন্দ্রিয়বাদকে সরাসরি বর্জন করেছেন। আবার ইয়োরোপীয় নবজাগরণের দর্শনচিন্তা কিংবা 'কর্মকাণ্ডের দর্শন'কেও তিনি অন্য অর্থে 'নিহিতার্থবাদী' বলেছেন। ভাববাদী নিহিতার্থবাদীরা তাঁদের দর্শনের শুদ্ধতা রক্ষায় এমনই ব্যস্ত থেকেছেন, তার গভীরতর তাৎপর্যের জটিলতাকে এতটুকু লাঘব করতে এমনই জেদের সঙ্গে অস্বীকার করেছেন যে তাঁদের দর্শন কোনোদিনই লোকপ্রিয় মাত্রা বা পরিচিতি পেল না। অন্যদিকে ক্যাথলিক ধর্মসংঘের মধ্যে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের বিরোধ ও সেই বিরোধের নিষ্পত্তির একটা ক্রমাগত ধারা অব্যাহত থেকেছে।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে বহু বাধাবিঘ্ন, প্রতিরোধ-নির্যাতন, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টীয় তথা রোমক ক্যাথলিক ধর্মসংঘ নবম শতাব্দীতে এসে শেষ পর্যন্ত জর্মনি থেকে আগত ফ্রাঙ্ক-জাতীয় রোমক সম্রাট শার্লেমান (শাসনকাল ৭৬৮—৮১৪)-এর নেতৃত্বে তথা পৃষ্ঠপোষণায় যুগপৎ রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও বৌদ্ধিক প্রাধান্য লাভ করে। এই প্রাধান্য আধিপত্যের তথা সাংস্কৃতিক ও চৈতন্যগত প্রভাবের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় কারোলিনজীয় নবজাগরণের মধ্য দিয়ে। তার আগেই ইংলণ্ড-এ খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে লাতিন ভাষা, একটি সুপরিকল্পিত বিদ্যালয় ব্যবস্থা। ইংলণ্ড্-এ খ্রিস্টীয় ধর্ম-প্রচারক ও পুরোহিতরাই প্রাচীনতর সাহিত্য (যা ছিল কেবলই মৌখিক) রোমক লিপিতে লিপিবদ্ধ করে লিখিত ভাষারূপে ইংরেজির আদিরূপ অ্যাংলোস্যাকসন-এর জন্ম দেন। সাধারণ মানুষের মুখের ও নিত্য ব্যবহারের ভাষা যে সম্মান ও মর্যাদা পায় তাতে জনসাধারণের কাছে এই বিদেশাগত সংস্কৃতি অনেক সহজে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। বস্তুত রাজকীয় সমর্থনে উচ্চবর্গের পৃষ্ঠপোষণায় প্রচারিত খ্রিস্টধর্মের এই যে লোকমুখিতা এরই বাহনস্বরূপ যে নব শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হয় ইংলণ্ড্-এ তার মূল তাত্ত্বিক তথা নির্দেশক অ্যালকুইন্ (আনু. ৭৩৫-৮০৪)-ই শার্লেমান-এর শিক্ষানীতিরও রচয়িতা। ৫৯০—৬০৪ খ্রি.

পোপের মর্যাদায় আসীন গ্রেগরি ধর্মকে সাধারণ মানুষের চেতনায় সহজে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজে ছবিকে ব্যবহার করার বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছেন, খ্রিস্টীয় আচারানুষ্ঠানে নাটকীয় উপাদান বা নাট্যকণিকা এবং স্তোত্রসংগীতের সুর ও গায়কীর এক বিশেষ পরম্পরা (যা গ্রেগরিয়ান চাণ্ট নামে আজ পরিচিত) প্রবর্তন করেছেন। পঞ্চম শতাব্দী থেকেই মার্তিয়ানুস কাপেল্লা-র 'মার্কারি ও শব্দতত্ত্বের বিবাহ' (আনু. ৪৩০ খ্রিস্টাব্দ) বা সেভিল্-এর ইসিডোরি (৫৬০—৬৩৬)-এর 'এটিমলজিজ্'-এর মতো গ্রন্থে জ্ঞানচর্চার সমস্ত ক্ষেত্রকে খ্রিস্টধর্মের চৌহদ্দির মধ্যে নিয়ে আসার সচেতন চেষ্টা খ্রিস্টীয় ধর্মসংঘের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসেরই অঙ্গ। খ্রিস্টধর্মকে গির্জার আনুষ্ঠানিকতায় বা আচারসর্বস্বতায় নিমজ্জিত না করে তাকে এক বিরাট বহুধাবিস্তৃত শিক্ষাব্যবস্থায় সঞ্চারিত করে দেওয়ার মধ্যে একটি বিশেষ মতাদর্শকে বিপুল জনগোষ্ঠীর চেতনার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল।

সংগঠিত ধর্মসংঘের বাইরেও অন্তত দুটি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গড়ে ওঠে মধ্যযুগের শেষদিকে। আসিসি-র ফ্রান্‌সিস (১১৮২—১২২৬) পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট-এর অনুমতিক্রমেই ১২০৯ সালে ফ্রানসিসকান সম্প্রদায় পত্তন করেন। স্পেনের দমিনিক দে গুজমান ১২১৬ খ্রিস্টাব্দে দোমিনিকান সম্প্রদায় পত্তন করেন। এই দুই খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই দারিদ্র্য ও সেবাধর্মকে তাঁদের জীবনযাত্রার মুখ্য অবলম্বন নির্বাচন করে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে এমনভাবে জড়িয়ে যান যে সংগঠিত ধর্মসংঘ ও তার বিশাল গির্জাগুলি ঘিরে তখন বৈভব ও ক্ষমতার যে চোখ-ঝলসানো বাহুল্য জনসাধারণকে ভয়ে ও সম্ভ্রমে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল, তার প্রভাবের বাইরে খ্রিস্টীয় ধর্মের একটা লোকায়ত মূর্তি তৈরি হয়ে যায়। সংগঠিত ধর্মসংঘের সার্বভৌম ধর্মযাজক পোপ এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দুটিকে যেমন অনুমোদন ও প্রশ্রয় দান করেছেন, ফ্রান্‌সিস ও দমিনিক দুজনকেই সন্ত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন তেমনই আবার তাদের কড়া নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। যেমন ১২২১ সালে সন্ত ফ্রানসিস ভবিষ্যৎ পোপ নবম গ্রেগরির চাপে (তখন তিনি কার্ডিনাল উগোলিনো) মেনে নিলেন যে তাঁর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা কখনোই হেরেসি অর্থাৎ ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধতার পথে যাবেন না এবং যাঁরা ধনবৈভবের মধ্যে বাস করেন তাঁদের সরাসরি নিন্দাবাদ করবেন না। ফ্রানসিসকান ও দোমিনিকান দুটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই ধর্মসংঘের ক্রমবর্ধমান প্রাতিষ্ঠানিক আয়তনের বাইরে জনসাধারণের সঙ্গে ধর্মের প্রত্যক্ষ সংযোগের সম্ভাবনা খোলা রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সেই লক্ষ্যাভিমুখে ফ্রানসিস পড়াশোনা বা বিদ্যাকেই অন্তরায় বিবেচনা করেছেন, দমিনিক জোর দিয়েছেন বিদ্যাচর্চার ওপরেই। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ই তাঁদের সমগ্র ভক্ত বা অনুগামী সম্প্রদায়কে এক

সমগ্র জীবনচর্যার স্বাদ দেবার চেষ্টা করেছেন, এমন এক কর্মদর্শনের মধ্যে নানা স্তর ও শ্রেণীর মানুষকে বাঁধবাব চেষ্টা করেছেন যাতে খ্রিস্টধর্ম তথা তার ধর্মসংঘের মানসিক ও বৌদ্ধিক আধিপত্য অটুট থাকে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কোনো অজ্ঞাতনামা লেখকের সন্ত ফ্রানসিস-এর বাণী ও কীর্তি সম্পর্কে লেখা 'ফিওরেত্তি' নামে বইটি সম্পর্কে গ্রামশি জেলখানা থেকে শ্যালিকা তাতিয়ানাকে লেখা এক চিঠিতে বলেন : 'ঐ যুগের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত কেউ "ফিওরেত্তি" পড়লে বইটি তাঁর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী লাগবে। শিল্পসৃষ্টিরূপে লেখাগুলি সুন্দর, তাজা, প্রত্যক্ষ। তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ঈশ্বরের নব অবতার তথা আবার ফিরে আসা খ্রিস্টেরই স্বরূপ বলে যাঁকে তখন অনেকেই বিবেচনা করেছে সেই ফ্রানসিস-এর প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও প্রেম। এই কারণেই এই "ফিওরেত্তি" ক্যাথলিক দেশগুলির চেয়ে প্রটেস্টান্ট দেশগুলিতে বেশি জনপ্রিয়। ঐতিহাসিক বিচারে এই লেখাগুলি থেকে বোঝা যায় ক্যাথলিক ধর্মসংঘ তখন কী শক্তিমান এক সংগঠন ছিল এবং এখনও আছে। ফ্রানসিস যখন নিজে নব্য এক খ্রিস্টধর্মের প্রথম প্রচারক রূপে আত্মপ্রকাশ করেন তখন যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয় তা কেবল প্রথম খ্রিস্টীয় শতাব্দীগুলির উদ্দীপনারই তুল্য। ধর্মসংঘ সরকারিভাবে তাঁকে নিগৃহীত করতে অপারগ হলেও (তাতে দু'শতাব্দী আগেই রেফর্মেশন ঘটে যেতে পারত) তাঁকে শক্তিহীন করে দিতে পেরেছিল, তাঁব শিষ্যদের দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে তাঁর নতুন ধর্মকে শেষ পর্যন্ত ধর্মসংঘেরই সেবায় নিয়োজিত সাধারণ একটি সন্ন্যাসীবর্গে পর্যবসিত করেছিল। · ফ্রানসিসকান সন্ন্যাসীকুল আজ সম্পূর্ণ পালটে গিয়ে জেসুইট, দোমিনিকান বা অগাস্তিনিয়ান-এর মতো অন্য যে-সব ধর্মীয় সম্প্রদায় রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে বিশেষ দৃষ্টি দেয়, তাদের থেকে পিছিয়ে পড়েছে। ক্যাথলিক মহাকাশে ফ্রানসিস এক ধূমকেতুর মতোই আবির্ভূত হয়েছিলেন। অন্যদিকে দমিনিক (যাঁর থেকেই সাভোনারোলা) এবং অগাস্তিন (যার পরিচয় বহন করে এক সন্ন্যাসীবর্গ রেফর্মেশন-এর জন্ম দেয় এবং পরে জানসেনবাদেরও)-এর মধ্যে এমন বীজ ছিল যা পরে বিকশিত হতে পারে। ফ্রানসিস ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন না। তিনি কেবল সু-সমাচারের শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। যতদিন এই আন্দোলনের স্রষ্টার স্মৃতি লোকমনে বেঁচে ছিল, ততদিন আন্দোলনও জনপ্রিয় ছিল, কিন্তু পারমার ফ্রা সালিমবেনের রচনায় পরের প্রজন্মেই ফ্রানসিসকানদের দেখা যাচ্ছে ভোগাসক্ত বিলাসীরূপে। ইতালীয় সাহিত্যে তাদের কীভাবে দেখানো হয়েছে তা তোমাকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। বোকাচ্চিও-র সব সন্ন্যাসীরাই ফ্রানসিসকান, এবং কেবলমাত্র

তাঁর রচনাবলীর দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রমাণ হয়ে যাবে জনসাধারণের দৃষ্টিতে এই সন্ন্যাসীকুল ততদিনে কত নেমে গেছে। ··· শেষ পর্যন্ত তোমায় খানিকটা ধর্মের ইতিহাস পড়িয়ে ছাড়লাম।' (১০ মার্চ ১৯৩০)।

'জেলখানার নোটবই'-এ আরেক জায়গায় গ্রামশি বলেন যে মধ্য-যুগের অন্যান্য লোকায়ত ধর্মীয় আন্দোলনগুলির মতোই ফ্রানসিসকান আন্দোলনও 'সীমিত সংখ্যক কঠোর ও কেন্দ্রিত অত্যাচারীর দাপটের মুখে বৃহত্তর জনসাধারণের রাজনৈতিক নির্বীর্যতার প্রকাশ। "অবমানিত ও আহত" জনগণ এইভাবেই আদিম সর্বাত্মক পাপবোধে ও ভক্তির আশ্রয়ে শান্তিবাদে নিমজ্জিত হয়ে আত্মরক্ষা করে, তাদের ঘৃণ্য অবনমিত মানব-প্রকৃতিকেই তুলে ধরে, পাশাপাশি ঈশ্বরপিতার চোখে তাদের সৌভ্রাত্র্য ও সমতার স্বীকৃতিতে শান্তি পায়।'

সন্ত ফ্রানসিস-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে গ্রামশি যা বুঝিয়ে দেন তা হল : প্রথমত, কোনো সামাজিক গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান যদি তার সার্বিক উপরি-কাঠামো যথেষ্ঠ পাকাপোক্তভাবে বেঁধে তার আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করে থাকে, তবে যে-কোনো প্রতিবাদী বা সংশয়ী প্রবণতাকে সহজেই তার আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এসে তাকে বিকৃত বা দমিত বা নিতান্তই অবান্তর করে ফেলতে তাকে বেগ পেতে হয় না। দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তি যদি প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে বা বাইরে যথার্থই অন্য মত বা দৃষ্টিকে প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁকে দাঁড়াতে হবে মতাদর্শের শক্ত জমির ওপর।

খ্রিস্টীয় ধর্মসংঘের মধ্যে ক্ষমতার যে কাঠামো গড়ে উঠেছিল, তা ক্রমশই লোভ ও গ্রাসের খেলায় এমনই বাঁধা পড়ে যায় যে জনসাধারণ তথা তার আস্থা থেকে রোমক ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেই ছিদ্রপথেই ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে রেফর্মেশন তথা সর্বাত্মক ধর্মসংস্কারের অভিযান তার পথ করে নেয়। রোমক ক্যাথলিক ধর্মসংঘ ব্রতপালন, আচারানুষ্ঠান, ধর্মতত্ত্বচর্চা, সংগীত ও নাট্যকলা, সাহিত্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে সাংস্কৃতিক বাতাবরণের মধ্যে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে তার আধিপত্যকে সুনিশ্চিত করেছিল, পুরোহিতবর্গের কুৎসিত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, অর্থলোভ ও দুর্নীতি তাকে ভিতর থেকে জীর্ণ করে দিলেও রেফর্মেশন-এর নতুন মতাদর্শ প্রটেস্ট্যান্টইজ্‌ম্‌ তার সমতুল্য কোনো সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো তৈরি করতে পারেনি। তাই রেফর্মেশন-এর স্বল্পজীবী প্রতিবাদকে দমিত করে ক্যাথলিক ধর্মসংঘ কাউন্টার-রেফর্মেশন নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। রেফর্মেশন-এর প্রতিবাদ শুধু যুক্তি ও বুদ্ধির উপর এমনই নির্ভরশীল যে তা জনচেতনায় তত গভীরে প্রবেশ করার সুযোগই পায়নি। রোমক ক্যাথলিকবাদের প্রত্যাক্রমণ একদিকে ইনকুইজিশন-এর রূপে

প্রতিবাদী কেন, তাবৎ সংশয়ীকেও নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্রিয় হয়; অন্যদিকে লয়োলার সন্ত ইগনেশস্ (১৪৯১—১৫৫৬) এবং তাঁর শিষ্য সন্ত ফ্রানসিস জেভিয়র (১৫০৬—৫২)-এর নেতৃত্বে সোসাইটি অফ জীসাস বা জেসুইট্স্ নামে নতুন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গভীর ধ্যান বা আত্মসমীক্ষণের মধ্যে ব্যক্তির আন্তর নবায়ণের সম্ভাবনার উপর জোর দিলেও সঙ্গে সঙ্গেই ১৫৩৮ সালে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা-মুহূর্তেই 'শিশুদের ও অশিক্ষিতদের খ্রিস্টধর্মে শিক্ষা দান করবার সংকল্প' গ্রহণ করে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি জেসুইটরা সমগ্র জর্মানি ও পূর্ব ইয়োরোপ জুড়ে অসংখ্য বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে প্রায় এক শিক্ষা-বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। ভারতেও মিশনারি শিক্ষার অনেকটাই জেসুইটদেরই দান: যা সন্ত জেভিয়র বা লয়োলার নামাঙ্কিত বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বেই সপ্রমাণ। ক্যাথলিক সমাজের মধ্যে বুদ্ধি-জীবী গোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা তথা মতাদর্শগত সংহতি রচনায় জেসুইটদের ভূমিকার কথা গ্রামশি যখন উল্লেখ করেন তখন তিনি জেসুইটদের শিক্ষাদর্শের দিকেও দৃষ্টিপাত করছেন। জেসুইট শিক্ষাদর্শে আধুনিক বিজ্ঞানকেও কী চমৎকারভাবে তার শিক্ষা-ক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে তার বৃহত্তর সামগ্রিক বিশ্ববীক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার দৃষ্টান্তের জন্য বেশি দূর যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। কলকাতায় ১৮৬০ সালে বেলজিয়াম থেকে আগত জেসুইটদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেন্ট জেভিয়ার্জ কলেজে বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ফাদার লাফঁ তাঁর ভাষণ ও পরীক্ষা প্রদর্শনের মাধ্যমে পদার্থ বিজ্ঞানের প্রচারেই ক্ষান্ত হননি, হীরালাল সেনের চলচ্চিত্র-প্রদর্শনের প্রথম প্রয়াসেও সহযোগী হয়েছেন। নানা ক্ষেত্রে আধুনিকতম চিন্তাকে তাঁদের শিক্ষাধারায় অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে জেসুইটরা সংস্কৃতির মূল ধারার সঙ্গে ক্যাথলিকবাদকে যুক্ত করে রেখে তাকে স্বভাবতই শক্তি ও ব্যাপকতর স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন।

গ্রামশির অনুযোগ, ভাববাদী বা 'নিহিতার্থবাদী' দার্শনিকেরা দর্শনকে 'মতাদর্শের স্তরে নিয়ে যাওয়ার এই চেষ্টায় পরাঙমুখ থেকে-ছেন। তথাকথিত 'উনিভের্সিতা পোপোলারি' বা 'জনগণের বিশ্ব-বিদ্যালয়' নামে যে বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বেসরকারি উদ্যোগে ইতালিতে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে গড়ে উঠেছিল, তাতে ক্রোচে বা জেন্তীল প্রমুখ দার্শনিকদের কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। সাক্ষরতা বা বয়স্ক-শিক্ষার এই ধরনের কোনো আন্দোলন বুদ্ধিজীবীদের (বা বিশেষ করে গ্রামশি যাঁদের 'জৈব' বুদ্ধিজীবী বলেন) সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারে না। বুদ্ধিজীবীরাও এলীটইজ্ম্-এর দুর্গে আবদ্ধ থেকে তাঁদের সামাজিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হন।

পাশাপাশি খ্রিস্টীয় ধর্মসংঘ তার কর্তৃত্বের অধীনেই যে-সব ধর্মীয়

সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে তাদের ধর্মীয় তাৎপর্য যৎসামান্য হলেও 'শৃঙ্খলা-গত' তাৎপর্য লক্ষণীয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রামশি ইতালীয় রাজনীতিতে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক দলের অভ্যুদয় ও বিকাশ লক্ষ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার জনপ্রিয়তা ও প্রসার রোধ করতে খ্রিস্টীয় ধর্মসংঘের নবায়নের যে উদ্যোগ 'আধুনিকবাদ' বলে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে ধর্মসংঘের ধর্মাদর্শগত সংস্কারের বা রূপান্তরের ততটা আগ্রহ ছিল না যতটা ছিল রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনে খ্রিস্টানদের ভূমিকা সংগঠিত করার ব্যাপারে। পোপ দশম পাইয়স ১৯০৩—১৪ তাঁর কর্তৃত্বকালে এই 'আধুনিকবাদ'-এর বিরুদ্ধে 'পূর্ণতাবাদের' ধারাকে খাড়া করেন। ধর্মসংঘকে রাজনীতির বাইরে রেখে রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে দূরত্ব ও প্রভেদকে আরো স্পষ্টভাবে আরো প্রবলভাবে চিহ্নিত করে ধর্মের শুদ্ধ রূপকে রক্ষা করার লক্ষ্যে নিয়োজিত 'পূর্ণতাবাদ' শেষ পর্যন্ত 'আধুনিকবাদ'-কে আটকাতে পারে নি। ১৯১৮ সালে দোম স্তুৎসো-র নেতৃত্বে পার্তিতো পোপোলারে ইতালিয়ানো নামে যে দলটি সক্রিয় হয়ে ওঠে, তাকেই বলা যায় ইতালির প্রথম ক্যাথলিক রাজনৈতিক দল। ১৮৮৬ সাল থেকে খ্রিস্টীয় পুরোহিতেরা উত্তর ইতালির কৃষিপ্রধান অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে স্বল্পসঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলবার কাজে, সার ব্যবহারে শিক্ষাদানের কাজে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, তারই শক্তিতে তাঁরা এই দল গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। নির্বাচনকালে স্থানীয় জমিদার বা অভিজাতদের বিরুদ্ধে তাঁরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রার্থী দাঁড় করিয়ে জয়ের পথ সুগম করেন। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির আকর্ষণ থেকে কৃষকশ্রেণীকে সরিয়ে আনতে পার্তিতো পোপোলারে নানারকম সংস্কারের দাবিও যেমন তোলে তেমনি আবার ফ্যাশিবাদ সম্পর্কে খানিকটা দ্ব্যর্থক মনোভাব গ্রহণ করে। পার্তিতো পোপোলারে যেভাবে খ্রিস্টীয় আদর্শ ও মূল্যবোধকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়, তাতেই তাদের রাজনৈতিক আদর্শের নাম হয়ে যায় ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাসি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫-৪৭ সালে বৃহৎ পুঁজি ও ধর্মসংঘের প্রত্যক্ষ আঁতাতে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক দল ইতালির রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠে। আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় ক্যাথলিক ধর্মসংঘের দীর্ঘ প্রয়াস অবধারিতভাবেই এই সরাসরি রাজনৈতিক চারিত্র্য পরিগ্রহ করে।

ফ্রান্স, জর্মনি ও ইতালিতে রাষ্ট্র ও রাজনীতির সঙ্গে ধর্মসংঘের সম্পর্কের প্রশ্নটিতে গ্রামশি বারবার ফিরে এসেছেন। অন্য লেখায় এবং জেলখানা থেকে বের্তি-কে লেখা চিঠিতে (৩০ জানুয়ারি ১৯২৮) গ্রামশি যখন ফ্রান্স্-এর রাজনীতিতে ১৯২৬-এর সংকটের সময় রোমক

ক্যাথলিক ধর্মসংঘের কেন্দ্র ভ্যাটিকানের হস্তক্ষেপের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করছেন, তখন ফ্যাশিস্ত সরকারের সঙ্গে পোপ একাদশ পাইয়াস-এর কনকর্দাত্ বা চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তুতি চলেছে। এই চুক্তিটি শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ সালে স্বাক্ষরিত হয়। তাতে ফ্যাশিস্ত সরকার ভ্যাটিকানের স্বাধীনতা মেনে নেয়, পোপও ফ্যাশিবাদের ইহুদি-সংহারকে প্রশ্রয় দেন।

গ্রামশি ইঙ্গিত করেন যে বুদ্ধিজীবীরা শৌখিন দুঃখবিলাস বা নৈরাশ্যবাদে মগ্ন হলে খ্রিস্টীয় ধর্মসংঘ নিম্নবর্গীয়দের নিশ্চিত আনন্দময় ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের কর্মিষ্ঠ করে তুলতে পারে। কিন্তু আদি খ্রিস্টধর্মের মধ্যে ঐ অনুপ্রেরণা নিহিত থাকলেও তাঁর সমকালীন 'জেসুইট খ্রিস্টধর্মকে' গ্রামশি দেখেছেন 'সাধারণ জনগণের পক্ষে বিশুদ্ধ আফিমের কাজ' করতে।

বরং মার্টিন লুথারের পর জন ক্যালভিন (১৫০৯—৬৪) প্রটেস্ট্যান্টইজম্-কে যে আরো গোঁড়া শুদ্ধাচারিতায় প্রতিষ্ঠিত করেন তাতে ধনতন্ত্রের উন্মেষপর্বে জনমনে একটি বিশেষ ধর্মীয় মূল্যবোধ গড়ে ওঠে, এমন কিছু ন্যায়-অন্যায় বা ভালোমন্দ বা দোষগুণের ধারণা তৈরি হয়ে যায় যা প্রথম যুগের অঁত্রপ্রেনররা কাজে লাগাতে সমর্থ হন। গ্রামশি তাঁর পাদটীকায় মাক্স্ হেবের্ (১৮৬৪—১৯২০)-এর 'দ্য প্রটেস্টান্ট এথিক অ্যান্ড দ্য স্পিরিট অফ ক্যাপিটালইজম্' (১৯০৪-৫)-এর উল্লেখ করেছেন। হেবের দেখিয়েছেন ক্যালভিন-অনুসারী পিউরিটান নীতিসূত্রে অবসর যাপন, আমোদ-প্রমোদ বা আলস্যকে ঘোরতর পাপ বলে নির্দিষ্ট করে শ্রমিককে দিয়ে নিরলস পরিশ্রম করিয়ে নেওয়ার নৈতিক যৌক্তিকতা তৈরি হয়ে যায়। শ্রমের মাহাত্ম্যকে সর্বোপরি স্থান দিয়েই পিউরিটানরা ক্ষান্ত হন নি, বিশেষ পেশায় বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থার মধ্যেই শ্রমের সার্থকতা, এই তত্ত্বটিও প্রচার করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমের উপযোগের আদর্শকে ধর্মীয় সমর্থন জোগান।

সুসংগঠিত খ্রিস্টীয় ধর্মসংঘ দীর্ঘকাল ধরে ইয়োরোপীয় রাজনীতিতে প্রায় এক রাজনৈতিক দলের ঐতিহাসিক ভূমিকাই পালন করে এসেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মসংঘ তার মূল মতাদর্শকে ধরে রেখেও তার কর্মনীতি তথা রণনীতি পালটে নিয়েছে। কোনো একক বুদ্ধিজীবী বা এলীট চিন্তক অন্য মতের প্রবক্তা হয়ে উঠলে ধর্মসংঘ হয় রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে বা রাষ্ট্রশক্তির প্রশ্রয়ে সেই অন্য-মতাবলম্বীকে বিনাশ করেছে নয় তাঁকে নিজ পক্ষপুটে গ্রহণ করে তার স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব বা অশক্ত করে দিয়েছে। রোমক ক্যাথলিক ধর্মসংঘের পরিপন্থী অ্যাংলিকান বা প্রটেস্টান্ট ধর্মসংঘও উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে এক ধরনের স্থিতাবস্থা রাখতে যেমন রাষ্ট্রশক্তি ও রাজনীতিকে ব্যবহার করেছে, তেমনই আবার আধিপত্য

কামী সামাজিক বা রাজনৈতিক গোষ্ঠীও ধর্ম বা ধর্মসংঘকে একটি সাংস্কৃতিক উপরিকাঠামো হিসেবে ব্যবহার করেছে।

খ্রিস্টীয় এবং বিশেষত ক্যাথলিক ধর্মসংঘের, উচ্চবর্গ ও নিম্ন-বর্গের মধ্যে সাযুজ্য ও এক ধরনের নৈকট্য বা বোঝাপড়া বজায় রাখার জন্য যে সচেতন প্রয়াস ছিল তা এখনও অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লক্ষ করা যায়। কিন্তু এ এক ধরনের 'রাজনীতি' মাত্র। এই প্রসঙ্গে তাঁর পাদটীকায় গ্রামশি ব্রিটিশ সাংবাদিক, 'টাইম্‌স্' পত্রিকার সম্পাদক হেনরি উইকহ্যাম্ স্টীড (১৮৭১—১৯৫৬)-এর স্মৃতিকথা 'থ্রু থার্টি ইয়ার্জ'' (লণ্ডন ১৯২৪)-এ উল্লিখিত একটি ঘটনার কথা স্মরণ করেন। এক ইতালীয় কার্ডিনালের কথায় যা ধরা পড়ে তা হল এই যে ক্যাথলিক ধর্মসংঘের প্রধান পুরুষেরা তাঁদের ধর্মচর্চার অনেক সূত্র বা উপাদানই বিশ্বাস করেন না অথচ ভক্তসমাজকে প্রভাবে রাখার জন্য তা কাজে লাগাতে দ্বিধা করেন না। 'রাজনৈতিক' উদ্দেশ্য প্রণোদিত এধরনের কোনো ঐক্য বা বোঝাপড়া গ্রামশি-র পরিকল্পিত কর্মসূচিতে স্থান পাবে না। 'সমালোচনাত্মক আত্মোপলব্ধি'র বিকাশের মধ্য দিয়ে, 'কোনো এক নির্দিষ্ট আধিপত্যমূলক শক্তির অংশ হবার যে চৈতন্য (অর্থাৎ রাজনৈতিক চৈতন্য),' তারই প্রাপ্তিতে যথার্থ প্রগতিশীল রাজ-নৈতিক কর্মীর সৃষ্টি হয়, 'এক বড় মাপের দার্শনিক ও বাস্তব-রাজনৈতিক অগ্রগতি সূচিত হয়।'

মার্কসীয় চিন্তার পরম্পরায় তত্ত্বকে কর্মেরই 'পরিপূরক' বা 'সহ-যোগী' মাত্র বলে বিবেচনা করার যে প্রবণতা রয়ে গেছে তাতে তত্ত্বের গুরুত্ব যথোচিত স্বীকৃতি পায়নি। মূল রচনায় গ্রামশি একটি মধ্যযুগীয় আপ্তবাক্য ঈষৎ পালটে নিয়ে বলেন যে এমন ধারণা লোকের মধ্যে বর্তমান যেন তত্ত্ব কর্মের 'পরিচারিকা' বা 'পরিষেবিকা' মাত্র। রোজা লুকসেমবুর্গ যখন তাঁর 'মার্কসবাদে অচলাবস্থা ও অগ্রগতি' রচনায় বলেন যে আন্দোলনের ক্রিয়াকর্মের দাবি অনুযায়ীই তত্ত্বের বিকাশ ঘটে বা স্তালিন যখন বলেন যে 'তত্ত্ব কর্মেরই দাবি মেটাবে' তখন কর্মের প্রাধান্যের পাশে তত্ত্বের গৌণমূল্যের দ্যোতনা এসে পড়ে। এই ধারণার বিপরীতে গ্রামশি তত্ত্ব ও কর্মের যে অভেদ কল্পনা করেন, তা রচনা ও রক্ষা করার ক্ষমতা ও দায়িত্ব 'বুদ্ধিজীবী এক এলীটবর্গের' যাঁদের সৃষ্টি হয় 'সমালোচনাত্মক আত্মসচেতনতা'র মধ্য দিয়ে। 'এলীট' শব্দটি গ্রামশি এই সূত্রে এক অত্যন্ত নির্দিষ্ট অর্থেই ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি অনুবাদের একটি পাদটীকায় জেফরি নোয়েল স্মিথ গ্রামশি-র ব্যবহারে 'এলীট' শব্দের সংজ্ঞা দেন: 'কোনো সামাজিক শ্রেণীর যে বিপ্লবী অগ্রবাহিনী তার রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক ভিত্তির সঙ্গে সর্বদা সংযোগ রক্ষা করে।' জনগণের সঙ্গে এই এলীট বর্গের সম্পর্কের চরিত্র বোঝাতে গ্রামশি যে-উপমাটি ব্যবহার করেন সেটি লক্ষণীয়। ষোড়শ-

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাদের সাজের অঙ্গ ছিল করসেট নামে অন্তর্বাস যা আঁট করে জড়ানো থাকত কোমর ও নিতম্বের ঊর্ধ্বদেশ ঘিরে যাতে কটিদেশ সরু থাকে ও তন্বী দেখায়। এই করসেট-এ দুপ্রস্থ কাপড়ের মধ্যে থাকত হোয়েলবোন, তিমির মুখের ভিতরের গঠন থেকে বার করে আনা শিংজাতীয় পদার্থের একটি শক্ত পাত। জনসাধারণকে নেতৃত্ব জুগিয়ে এই বর্গ জনসাধারণের কোমর মেরুদণ্ড সোজা রাখবে, তারই অন্তরঙ্গ অঙ্গ হয়ে থাকবে, তাকে জড়িয়ে থাকবে, অথচ কখনোই তেমন প্রকট কোনো অতিস্ফীত নেতার রূপ গ্রহণ করবে না।

এলীট-এর যে ধারণা গ্রামশি এই রচনায় ক্রমশ স্পষ্ট করতে থাকেন তা দুটি বিন্দুর মধ্যে ঘোরাফেরা করে। একদিকে দল বা পার্টি, অন্যদিকে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা : 'নতুন সত্যের গবেষণা, উন্নততর ও আরো সুসংহতভাবে সত্যের পরিচ্ছন্ন রেখাঙ্কন, এ কাজগুলো বোধ হয় ব্যক্তি বিশেষজ্ঞের নিজস্ব উদ্যোগের ওপর ছেড়ে রাখা ভালো মনে হয়, যদিও এমন হতেই পারে যে, এই বিশেষজ্ঞেরা ক্রমাগত একেবারে মূল সূত্রগুলো সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলতে থাকবেন।' এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই এই এলীট বর্গ কোনো নতুন পুরোহিত শ্রেণী বা স্বভাবতই অগ্রগণ্য বা মাতব্বর গোষ্ঠীর চরিত্র গ্রহণ করে না। বরং ইতিহাসের প্রক্রিয়ার মধ্যে এই বর্গের চরিত্র, ভূমিকা বা এমনকী লোকজনও পালটে পালটে যায়। কর্মকাণ্ডের দর্শন নিম্নবর্গ শ্রেণী যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে উপলব্ধি, আয়ত্ত ও প্রয়োগ করে তার আধিপত্য অর্জনের পথে অগ্রসর হবে, সেই প্রক্রিয়াও গ্রামশির বিশ্লেষণে ঐ দর্শনের অভিন্ন অঙ্গ হয়ে যায়। অন্যত্র গ্রামশি বলেন, কর্মকাণ্ডের দর্শন 'চিন্তার আমূল ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাগতিকীকরণ, আমূল ইতিহাসায়ন, ইতিহাসের আমূল মানবিকীকরণ। এই পথ ধরেই নতুন বিশ্ববীক্ষার সূত্র সন্ধান করতে হবে।' শ. ব.।

সম্পাদকীয় ভূমিকা ২। কেন্দ্রিকতা ও গ্রামশির দর্শন। কোনো একটি দার্শনিক অবস্থানকে আমরা কখন কী অবস্থায় দেখছি তার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে তার গুরুত্ব। অর্থাৎ, এই চিন্তা অনুসারে কোনো দার্শনিক অবস্থানের গুরুত্ব বা গুরুত্বের অভাব সর্বাংশে ঐ অবস্থানের নিজস্ব কোনো ধর্ম নয়। তা অনেকটাই নির্ভর করে আমাদের ওপর, অর্থাৎ, আমরা যারা বিচার করছি তাদের সমসময়, সামাজিক অবস্থা ও এমনকী অনেক ক্ষেত্রে তাদের মর্জির ওপর। ফলে কোনো দার্শনিক অবস্থানের দিকে এগোতে গেলে আর একটু খোলা মন নিয়ে, হয়তো আর একটু আলগা মন নিয়ে এগোনো ভালো। অবশ্যই

'আলগা' মানে 'শিথিল' নয়। এরকম একটা মেজাজে দেখলে এই মুহূর্তে গ্রামশির দর্শন থেকে আমরা আমাদের সময়ের জন্য দু-একটা জরুরি কথা বোধ হয় তুলে নিতে পারি।

কেন্দ্রিকতার ধরনে একটা বড় রকমের ভাঙাগড়া চলছে এই সময়ে। একদিকে রাষ্ট্রিক কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে যেমন সরব প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে তেমনি রাষ্ট্রিকতারও ওপরের কোনো এক স্তরে সম্ভবত রচিত হচ্ছে আর এক ধরনের কেন্দ্রিকতা। আজ সারা পৃথিবীর সামনে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে সেই বিপজ্জনক সম্ভাবনা যেখানে সংস্কৃতি—রাজনীতি—অর্থনীতি ও এমনকী প্রশাসনিক ধাঁচ পর্যন্ত এক ছাঁদে ঢালাই হতে চলেছে। ভিন্নতা, রকমফের, অন্যস্বর এসব মুছে গিয়ে কি সত্যিই দেখা দেবে একই নিরিখ ও একই মানদণ্ড? এবং এই যে বৈচিত্র্যের বিলোপসাধন তা কিন্তু চলছে স্বাধীনতারই নামে। বাজার-নির্ভর পুঁজির যুক্তিশাস্ত্র স্টিমরোলারের মতো এগিয়ে যেতে পারে সব উঁচুনিচু গুঁড়িয়ে দিয়ে, সব টিলা-ঢিবিকে দুরমুশ করে মিশিয়ে দিয়ে। এই যে এক নিখাদ সমতলভূমি রচনা করার বিপদ এও কিন্তু কেন্দ্রিকতারই এক ধরন।

চিন্তার ধাঁচের মধ্যেও এর ছায়াপাত ঘটতে পারে। অতীতেও এরকম ঘটেছে, বিভিন্ন স্তরে বর্তমানেও এ ঝোঁক আছে। একটা কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, কেন্দ্রিক একটা ধরন যা হোক কিছু থাকলে আমাদের কাজেকর্মে চিন্তাভাবনায় অনেক সুবিধা হয়। অন্য রকমের কোনো কিছু মাপজোক করতে গেলে মানদণ্ডের অসুবিধা দেখা দিতে পারে। বিষম বিশ্বে কেন্দ্রিক ঝোঁকের একটা মোহ সেই কারণে থেকে যেতেই পারে। প্রশ্নটাকে দার্শনিকভাবে তোলা খুব জরুরি। তৃতীয় দুনিয়ার উন্নয়নের মতো মাটি-ঘেঁসা সমস্যা থেকে শুরু করে সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো নৈতিক সমস্যা পর্যন্ত অনেকটা ব্যাপ্তিকে ছোঁয়া যেতে পারে ঐ প্রশ্নের মাধ্যমে।

আমাদের সময়কার এই সমস্যা হয়তো কোনো অর্থেই গ্রামশির সমস্যা ছিল না। কিন্তু তাঁর সময়েরও বিশেষ কেন্দ্রিকতার ধরন নিয়ে তাঁকে ভাবতে হয়েছিল। ভাবতে হয়েছিল বিপ্লবের মডেল নিয়ে। বিপ্লবের কি ওরকম কোনো অমোঘ মডেল থাকতেই হবে? তাঁকে প্রশ্ন তুলতে হয়েছিল রুশ বিপ্লব কি মার্কসের ডাস কাপিটাল-এর বিরুদ্ধেই কোনো বিপ্লব? তার তো মনে হয়েছিল যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সূত্র অনুসারে রাশিয়ার ইতিহাসের বিকাশ যে-পথে হবার কথা ছিল বাস্তবের ঘটনাবলি সে-ছকটাকে ভেঙে দিয়েছে। হয়তো একটু অতিরঞ্জিত আলংকারিক, তবু তাঁর তো একথাও মনে হয়েছিল যে বলশেভিকরা কি তবে কার্ল মার্কসকে প্রত্যাখ্যান করল? অন্তত তাদের ক্রিয়াকলাপ ও বিজয়সূচি থেকে মনে হতেই পারে যে ঐতিহাসিক বস্তু-

বাদের সূত্রাবলি তবে হয়তো অতটাই কট্টর ও অনড় ছিল না। এসব কথা গ্রামশি লিখেছিলেন 'অবন্তি' পত্রিকার মিলান সংস্করণে ১৯১৭-র ২৪ ডিসেম্বরে। তাঁর দার্শনিক প্রস্থানভূমি তখনো নিশ্চয়ই পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয় নি। কিন্তু ইঙ্গিতটা ধরা পড়ছিল।

গ্রামশি জেলখানার রচনার মধ্যে যে-দর্শনকে কর্মকাণ্ডের দর্শন বলে উল্লেখ করেন তাকে কোনো সরল যান্ত্রিক অর্থে মার্কসের দর্শন বলে ভাবলে তাকে খুব খাটো করে দেখা হবে। গ্রামশি মার্কসের দর্শনের, তথা ইতিহাসের দর্শনের একজন রূপকার। যে-রূপে তিনি এ-দর্শনকে বিশদ করে তোলেন তার মধ্যে অনেক নতুন ইঙ্গিত, ঝোঁক ও প্রবণতা লক্ষ করা যেতে পারে। সেগুলোকে ঠিকঠাক পড়তে পারা আমাদের কাজ। আর সেখানেই এসে পড়ে আমাদের সময়ের প্রয়োজনের কথা।

কেন্দ্রিকতার ধরনটাকে ভেঙে অন্য কোনো ছকে পৌঁছনো—এটাকে গ্রামশি-প্রকল্পের অন্যতম মূল উপাদান বলে আমরা ভাবতে পারি। বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষার প্রশ্ন থেকে শুরু করে সরাসরি দার্শনিক প্রশ্ন যে-ভাবে অবতারণা করেন গ্রামশি তার মধ্যেই টের পাওয়া যায় কীভাবে তিনি পৌঁছতে চাইছেন এক একক কেন্দ্র থেকে বিকেন্দ্রীকৃত বিভিন্নতায়। বিকেন্দ্রীকরণের এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত আছে বিভিন্ন সামাজিক বর্গের নিজস্ব জৈব বুদ্ধিজীবীর গুরুত্ব। সরাসরি দার্শনিক প্রশ্ন হিসেবে এক জনগোষ্ঠীর বিশ্ববীক্ষার কথা যখন তোলেন গ্রামশি তখনো এই বীক্ষার কোনো এক অনন্য রূপের কথা ভাবেন না তিনি। সেখানেও কোনো কেন্দ্রিকতার টান থাকে না। বদলে তাঁর কল্পনায় কাজ করে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববীক্ষার এক জটিল নকশা, তার মধ্যে থাকতে পারে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও আরো নানা রকমের সংঘাত। সংগ্রামের ও ভিন্ন রকমের বিশ্ববীক্ষার লড়াইয়ের নিরিখেই তৈরি হতে পারে বিচারের কোনো এক মানদণ্ড। কোনো দার্শনিক পরম নয়, এই ঐতিহাসিক সিদ্ধি গ্রামশির সমাজ-দর্শনের এক মূল ভাবনা। এই মূল ভাবনার স্রোতের ভেতরে কাজ করে কেন্দ্রিকতার বাইরেও এক অন্য চোরা টান। এই টানেরই সংলগ্ন রাজনৈতিক বিকাশে একদিন দেখা দিয়েছিল সম্ভবত সোভিয়েত ছাঁদের বাইরে ইয়োরোপের কমিউনিস্টদের একটা ধরন।

সোভিয়েত বৃত্তের বাইরে ইতালি ও ফ্রান্স ও স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির তরফে অনেক দিন ধরেই বিসম্বাদী স্বর ধ্বনিত হচ্ছিল। দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত কমিউনিস্ট মডেল-এর অনেক কিছুরই বিরুদ্ধে এঁরা প্রশ্ন তুলছিলেন। এর মধ্যে অন্তর্গত ছিল যেমন অনেক তাত্ত্বিক প্রশ্ন তেমনি ছিল অনেক কৌশলগত প্রশ্নও, বাস্তব রাজনীতির ধরন-ধারণেরও অনেক প্রশ্ন। এক সময়ে তো 'ডিক্টেটরশিপ অব দ্য

প্রলেটারিএট' এই প্রত্যয়টাকেও বিসর্জন দেওয়া হয়। স্বভাবতই সাবেকি ধারার কমিউনিস্ট চিন্তায় এ সব কিছুকে মনে হচ্ছিল শোধনবাদী বিচ্যুতি। সমস্যাটা যে শুধুমাত্র গোঁড়ামি বনাম শোধনবাদের নয়, আরো গূঢ় তাত্ত্বিক কিছু সমস্যা যে এর সঙ্গে সংলগ্ন ছিল সে কথা গোড়ার দিকে হয়তো যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল না। আজ সারা পৃথিবীর পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে, আজকের পৃথিবীতে ইয়োরোকমিউনিজমের প্রাসঙ্গিকতাও সেই অর্থে হয়তো আর তেমন নেই। কিন্তু এর পেছনে যেসব তাত্ত্বিক দার্শনিক প্রশ্ন কাজ করছিল সেগুলো এক অর্থে হয়তো এখন আরো বেশি প্রাসঙ্গিক। আজকের সমস্যা শুধুমাত্র সোভিয়েত ধাঁচ থেকে বেরিয়ে আসা নয়, সে ধাঁচ আজ তো আর তেমন করে নেইও। আজকের সমস্যা শুধুমাত্র কিছুটা গণতান্ত্রিক শর্তপূরণ করাও নয়, কোনোরকমে নাম কে ওয়াস্তে সমাজতন্ত্রকে জীইয়ে রাখবারও নয়। সমাজতন্ত্রের রূপ-কল্পনা নিয়েই আজকের প্রশ্ন, সেখানে রাষ্ট্র ও জনসমাজ ও তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পার্টির ভূমিকা ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই সংলগ্নভাবে উঠে আসবে। দর্শন ও সংস্কৃতির প্রশ্ন বাদ দিয়ে এসব প্রশ্নের মোকাবিলাও হয়তো করা যাবে না। এখানে দাঁড়িয়েই তাই গ্রামশির দিকে ফিরে দেখা প্রয়োজন। ইয়োরোকমিউনিজমের পেছনে গ্রামশি-দর্শনের প্রেরণা তো লক্ষ করা যেতেই পারে। তবে তা কতটা সচেতনভাবে কাজ করেছিল বলা শক্ত। কিন্তু ইয়োরোকমিউনিস্ট মহলের 'ভিন্ন' প্রবণতা আর গ্রামশির তত্ত্বচিন্তা দুইই যে এক ধরনের 'কেন্দ্রিক' চিন্তায় সমান সন্দেহভাজন হবে সেটা বুঝতে পারা যায়। তবে এসব প্রশ্ন আজ তোলাই ভালো। সো. ভ.]

কিছু প্রাথমিক প্রসঙ্গ কথা

প্রথমেই এই বহুল প্রচারিত সংস্কারটি ভেঙে ফেলা একান্ত জরুরি যে, দর্শন এক অত্যন্ত অদ্ভুত ও দুরূহ বিষয়, কেননা এটা এক বিশেষ ধরনের বিশেষজ্ঞ বা পেশাদার ও রীতিবদ্ধ দার্শনিকদের বিশিষ্ট বৌদ্ধিক চর্চার ক্ষেত্র। প্রথমেই এটা দেখাতে হবে যে সকলেই 'দার্শনিক'; প্রত্যেকের পক্ষে উপযুক্ত 'স্বতঃস্ফূর্ত' দর্শন'-এর সীমা ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে এটা করা সম্ভব। এই দর্শন নিহিত থাকে: 1. ভাষাতেই, কারণ ভাষা হল কতকগুলি নির্ধারিত প্রত্যয় ও ধারণার সমাহার, ব্যাকরণগতভাবে সারবস্তুহীন কতকগুলি শব্দমাত্র নয়; 2. 'কাণ্ডজ্ঞান' ও 'শুভজ্ঞান'; 3. লোকপ্রচলিত ধর্ম', অতএব তার অন্তর্গত বিশ্বাস, কুসংস্কার, অভিমত, দেখার ধরন ও আচরণের ধাঁচধোঁচ ইত্যাদি মিলিয়ে একটা সামগ্রিক ব্যবস্থা, যাকে একসঙ্গে 'লোককথা' নাম দিয়ে একই পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

'ভাষা'র মধ্য দিয়ে প্রকাশিত যে-কোনো বৌদ্ধিক কর্মের সামান্যতম প্রকাশের মধ্যেই যেহেতু বিশ্ব বিষয়ে এক নির্দিষ্ট ধারণা অন্তর্গত থাকে তাই প্রত্যেকেই দার্শনিক এটা দেখাবার পরে দ্বিতীয় স্তরে চলে যেতে হবে। এই দ্বিতীয় স্তরটা হল অবগতি ও সমালোচনার স্তর। অর্থাৎ কিনা, এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে: সমালোচনামূলক অবগতি ছাড়া বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরোভাবে 'চিন্তা করা' কি শ্রেয়? অন্যভাবে বলতে গেলে, বহিঃপরিবেশের দ্বারা যান্ত্রিকভাবে আরোপিত কোনো বিশ্ববোধে অংশ নেওয়া কি ভালো? বহিঃপরিবেশ বলতে সেইসব সামাজিক গোষ্ঠীর যে-কোনো একটাই হতে পারে যার মধ্যে মানুষ তার সচেতন জগতে প্রবেশের মুহূর্ত থেকে স্বাভাবিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে (হতে পারে কারো গ্রাম বা প্রদেশ; এর সূত্রপাত হতে পারে প্যারিশ-এ এবং স্থানীয় যাজকের 'মননকর্ম'-এ অথবা বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃপ্রতিম কারো কাজেকর্মে, যাঁর প্রজ্ঞাই যেন কানুন, অথবা ঐ সামান্য বৃদ্ধা যিনি কিনা ডাইনিকাহিনী উত্তরাধিকারসূত্রে আয়ত্ত করেছেন, অথবা সেই নগণ্য বুদ্ধিজীবী যিনি নিজের বোকামিতে এবং ক্রিয়াকর্মের অসামর্থ্যে নিজেই তিতিবিরক্ত)। অথবা, পক্ষান্তরে পৃথিবী বিষয়ে নিজের ধারণা সচেতন সমালোচনাত্মকভাবে গড়ে তোলা এবং সেইভাবে নিজের মগজ খাটিয়ে এই বোধে পৌঁছনো, এমনিভাবে নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নেওয়া, নিজেই নিজের নিয়ন্তা হয়ে ওঠা, বাইরে থেকে নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর পরিবর্তনকামী প্রভাবকে নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করা, এসব কি ভালো নয়?

টীকা ১। বিশ্ব সম্পর্কে নিজস্ব কোনো ধারণা অর্জন করতে গিয়ে মানুষ কোনো-না-কোনো বিশ্ব গোষ্ঠীতে শামিল হয়। এই গোষ্ঠী হল সমস্ত ধরনের সামাজিক মানুষের সমষ্টি যারা একই রকম ভাবে ও কাজ করে। আমরা সকলেই কোনো-না-কোনো ধরনের বশ্যতার বশ. সর্বক্ষেত্রেই গণভুক্ত মানুষ, সমষ্টিগত মানুষ। প্রশ্নটা এই: এই বশ্যতার ঐতিহাসিক ধরনটা কী, কোন গণসমষ্টির সে অন্তর্ভুক্ত? বিশ্ব সম্পর্কে কারো ধারণা যদি সমালোচনামূলক এবং সংগতিপূর্ণ না হয়ে অসংলগ্ন ও ছাড়াছাড়া হয় তাহলে সে যুগপৎ বহুতর গণ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিত্ব এক অদ্ভুত ধরনের সংমিশ্রণ: এর মধ্যে থাকে প্রস্তর যুগের কিছু উপাদান এবং আরো প্রাগ্রসর বিজ্ঞানের নীতিসূত্র, স্থানীয় স্তরে ইতিহাসের সমস্ত অতীত পর্যায়ের কিছু সংস্কার এবং ভবিষ্যতের দর্শনের এমন কিছু স্বজ্ঞা যা বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ মানবজাতির সবার। তাই বিশ্ব সম্পর্কে নিজের ধারণার সমালোচনা করার অর্থ হল তার মধ্যে একটা সংহত ঐক্য স্থাপন করা এবং বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর চিন্তার স্তরে তাকে নিয়ে যাওয়া। আর তাই এর অন্য অর্থ পূর্ববর্তী সমস্ত দর্শনেরই সমালোচনা, কেননা প্রচলিত দার্শনিক

ধারণার ওপর ঐ পূর্ববর্তী দর্শনের প্রভাব তো স্তরে স্তরে জমা হয়ে থাকে। সমালোচনাত্মক বিশদীকরণের প্রস্থানবিন্দু হল আত্মসচেতনতা এবং 'আত্মানং বিদ্ধি' হল আজ পর্যন্ত যে সব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ঘটেছে তার ফল পরিণাম, যা কোনো নির্ঘণ্ট ছাড়াই আপনার ওপর অন্তহীন ছাপ রেখে গেছে।

টীকা ২। দর্শনের ইতিহাস থেকে দর্শনকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, যেমন সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে আলাদা করা যায় না সংস্কৃতিকে। দার্শনিক হওয়া বলতে যদি বিশ্ব সম্পর্কে একটা সমালোচনামূলক ও সংগতিপূর্ণ ধারণার অধিকারী হওয়া বোঝায় তাহলে একান্ত আশু ও প্রাসঙ্গিক অর্থে কেউ দার্শনিক হতে পারে না, যদি না দর্শনের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সে সচেতন হয়, কোন দর্শন কোন বিশেষ পর্যায়ের এবং কোনো এক বিশেষ দর্শনে অন্য কোন ধরনের বিশ্ববোধ বা তার কোন কোন উপাদান খণ্ডিত হচ্ছে তা যদি তার বোধে পরিষ্কার না থাকে। কারো বিশ্ববোধ আসলে বাস্তব থেকে উঠে আসা কিছু নির্দিষ্ট সমস্যা বিষয়ে তার প্রতিক্রিয়া। আশু প্রাসঙ্গিকতার দিক দিয়ে এইসব সমস্যা খুবই নির্দিষ্ট ও মৌলিক। সুদূর ও অপগত কোনো অতীতে গড়া ওঠা চিন্তার কোনো ধাঁচ দিয়ে আজকের বর্তমানকে, খুব নির্দিষ্ট কোনো বর্তমানকে কীভাবে বিচার করা সম্ভব? বস্তুত, এটাই তো ঘটনা যে, কোনো কোনো দিক দিয়ে খুব বিকশিত আধুনিকতা প্রকাশ পায় যে-সব সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে তারাই আবার তাদের সামাজিক অবস্থার জন্য, অন্যান্য দিক দিয়ে অনগ্রসর থেকে যায় আর তাই পূর্ণ ঐতিহাসিক স্বাধিকারও প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

টীকা ৩। এ কথা যদি সত্য হয় যে প্রত্যেক ভাষাতেই বিশ্ব সম্পর্কে ধারণার ও সংস্কৃতির উপাদান নিহিত থাকে, তাহলে যে-কোনো মানুষের ভাষা থেকে বিশ্ব সম্পর্কে তার ধারণার তুলনামূলক জটিলতার মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। কেউ যদি শুধুমাত্র কোনো উপভাষায় কথা বলে এবং স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষা পুরোপুরি বুঝতেও না পারে তাহলে তার বিশ্বস্বজ্ঞা কিন্তু কমবেশি সীমাবদ্ধ ও প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। বিশ্ব ইতিহাসে প্রাধান্য বিস্তারকারী প্রধান প্রধান চিন্তা-ধারার তুলনায় এই বিশ্ববোধ স্থাণু ও কালাতিক্রান্ত। তার উদ্যমের ক্ষেত্র হবে সীমাবদ্ধ, মোটামুটি সমবায়ী ও অর্থনীতিকতাবাদী, সর্ব-জনীন নয়। অন্যদের সাংস্কৃতিক জীবনের স্পর্শ পাবার জন্য একাধিক বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা হয়তো সব সময়ে সম্ভব নাও হতে পারে, তবে অন্তত জাতীয় ভাষা যথাযথভাবে শিক্ষা করা প্রয়োজন। কোনো মহান সংস্কৃতিকে অন্য কোনো মহান সংস্কৃতির ভাষায়, অর্থাৎ ঐতিহাসিক জটিলতায় ঋদ্ধ কোনো জাতীয় ভাষায় তর্জমা করে নেওয়া

সম্ভব এবং এরই সাহায্যে আবার অন্য যে-কোনো মহান সংস্কৃতিকেও তর্জমা করে নেওয়া যেতে পারে আর সেইভাবে এক বিশ্বব্যাপী প্রকাশ-মাধ্যম পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কোনো উপভাষায় এ কাজ হবে না।

টীকা ৪। নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টি করা মানে এই নয় যে প্রত্যেকটি আবিষ্কার নিজস্ব ও 'মৌলিক' হতে হবে। এর মানে বরং বিশেষভাবে এই যে, এই সৃজনের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত সব সত্যের সমালোচিতরূপে প্রচার সম্ভব হবে, এ যেন এক ধরনের 'সামাজিকীকরণ' এবং এমনকী এইসব সত্যকেই গুরুত্বপূর্ণ সব কাজের ভিত্তি করে তোলা হবে। সমন্বয় ও বৌদ্ধিক-নৈতিক বিন্যাসের অন্যতম উপাদান হিসেবেও একে গড়ে তোলা সম্ভব। কোনো একটা জনসমষ্টিকে সু-সংগত চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারা এবং একই রকমের সংগতি-পূর্ণভাবে বর্তমান বাস্তব বিশ্ব সম্পর্কে চিন্তায় সক্ষম করে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ; কোনো এক দার্শনিক 'প্রতিভা' কর্তৃক আবিষ্কৃত কোনো সত্য, যা বুদ্ধিজীবীদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীর সম্পত্তি থেকে যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক এই 'দার্শনিক' ঘটনা।

'কাণ্ডজ্ঞান', ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক

দর্শন হল এমন এক বৌদ্ধিক বিন্যাস, যা ধর্ম কিংবা কাণ্ডজ্ঞানের পক্ষে হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। এটাও লক্ষ করতে হবে যে, ধর্ম ও কাণ্ডজ্ঞান ঠিক মিশেও যাবে না, বরঞ্চ ধর্ম হল খণ্ড কাণ্ডজ্ঞানের এক অন্যতম উপাদান। উপরন্তু, কাণ্ডজ্ঞান হল সমষ্টিবাচক বিশেষ্য, ধর্মেরই মতো: একটাই মাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে তা তো নয়, কারণ ঐ কাণ্ডজ্ঞানও ইতিহাসের ফসল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ারই এক অংশ। দর্শন হল সমালোচনা এবং ধর্ম ও 'কাণ্ডজ্ঞান'-কে পেরিয়ে যাওয়া। আর এই অর্থে তা 'সাধারণ' জ্ঞান নয়, 'শুভ' জ্ঞানের সঙ্গে সমার্থক হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞান, ধর্ম এবং কাণ্ডজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক

ধর্ম এবং কাণ্ডজ্ঞান কোনো বৌদ্ধিক বিন্যাস গড়ে তুলতে পারে না, কারণ যৌথ চৈতন্যের কথা দূরে থাক, এমনকী ব্যক্তি-চৈতন্যেও তাদের কোনো সংহত বিন্দুতে মেলানো সম্ভব হয় না। বা বরঞ্চ বলা যায় যে, কোনো 'মুক্ত' অবস্থায় তাদের এরকমভাবে মেলানো সম্ভব নয়—'স্বৈরতান্ত্রিক' উপায়ে এরকম মেলানো সম্ভব এবং কিছুটা মাত্রাজ্ঞান রেখে অতীতে এরকম করাও হয়েছে।

লক্ষ করা দরকার যে, ধর্মের সমস্যাটিকে শুধু স্বীকারোক্তির অর্থে নেওয়া হচ্ছে তা নয়। এর সেকুলার অর্থ হল বিশ্ব সম্পর্কে একটা ধারণা

এবং তদনুযায়ী আচরণবিধির মধ্যেকার একটা বিশ্বাসের সাযুজ্য। কিন্তু এই বিশ্বাসের সাযুজ্যকে 'মতাদর্শ' বা এমনকী সরাসরি 'রাজনীতি' না বলে 'ধর্ম' বলার কারণ কী ?

সাধারণ দর্শন বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব বস্তুত নেই ; যা আছে তা হল বিভিন্ন রকমের দর্শন, অর্থাৎ বিশ্ব সম্বন্ধে নানা রকমের ধারণা এবং সব সময়েই এর মধ্যে একটা বেছে নেবার প্রশ্ন থাকে। এই বেছে নেওয়াটা সম্ভব হয় কীভাবে ? এটা কি শুধুমাত্র কোনো বৌদ্ধিক ঘটনা, না কি তার চেয়ে আরো জটিল কিছু ? আর এরকম ব্যাপার কি খুব প্রায়শই দেখা যায় না যে, আমাদের বৌদ্ধিক নির্বাচন ও আচরণের ধরনধারণের মধ্যে একটা অসংগতি বর্তমান রয়েছে ? তাহলে বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রকৃত ধারণা কোনটা ? যেটা যুক্তি-পরম্পরার মধ্য দিয়ে বৌদ্ধিক নির্বাচন বলে চিহ্নিত ? না কি প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে-ধারণা ফুটে বেরোচ্ছে, যা কিনা আচার-আচরণের মধ্যে নিহিত থাকেই ? আর যেহেতু সব ক্রিয়াকাণ্ডই মূলত রাজনৈতিক, তাই এ-কথা কি বলা চলে না যে, সব মানুষের প্রকৃত দর্শন গোটাটাই তার রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে বিধৃত আছে ?

চিন্তার ও কর্মের মধ্যেকার এই বৈপরীত্য, অর্থাৎ. বিশ্ব সম্বন্ধে দুরকমের ধারণার সহাবস্থান, একটা, যা শব্দে চিহ্নিত আর অন্যটা, যা কর্মে প্রকাশিত, তা কিন্তু শুধুমাত্র আত্মপ্রবঞ্চনার ফসল নয়। আত্ম-প্রবঞ্চনা দিয়ে একটা যথাযোগ্য ব্যাখ্যা হয়তো করা যায়, কিন্তু সে কেবল বিচ্ছিন্ন কয়েকজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, বা বড়জোর ছোটখাটো কিছু কিছু গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, কিন্তু কোনো বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনে যখন এ ধরনের বৈপরীত্য দেখা যায় তখন এ ব্যাখ্যা চলে না। এসব ক্ষেত্রে চিন্তা ও কর্মের এই বৈপরীত্য সামাজিক ঐতিহাসিক বিন্যাসের আরো গভীরতর কোনো বৈপরীত্যের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এর অর্থ হল যে, আলোচ্য সামাজিক গোষ্ঠীর সত্যিই নিজস্ব কোনো বিশ্ববোধ থাকতে পারে, হয়তো বা নিতান্ত ভ্রূণাবস্থায়। এবং এই বিশ্ববোধ প্রকাশিত হতে পারে ঐ গোষ্ঠীর কর্মে, হঠাৎ হঠাৎ তা কখনো ঝলকে উঠতেও দেখা যায়, বিশেষত গোষ্ঠীটা যখন ঐক্যবদ্ধভাবে একেবারে জৈব একক হিসেবে কাজ করছে তখন। কিন্তু এই গোষ্ঠীই কখনো কখনো অবনমিত বা বৌদ্ধিক অবদমিত অবস্থার জন্য এমন কোনো বিশ্ববীক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হয় যা তার নিজস্ব নয়, অন্য কোনো গোষ্ঠী থেকে ধার করা। এবং বিশ্ব সম্বন্ধে এই ধারণাকেই সে মুখের কথায় প্রকাশ করে, বিশ্বাস করে যে তার আচার-আচরণও তদনুসারী ; এর কারণ হল যে 'সাধারণ অবস্থায়' ঐ গোষ্ঠী তো এই বিশ্ববীক্ষাই অনুসরণ করে। এই 'সাধারণ অবস্থা' মানে গোষ্ঠীজীবনের কাজকর্ম যখন স্বাধীন ও স্বনির্ভর নয়, অবনমিত ও অবদমিত। দর্শনকে যে কেন রাজনীতি থেকে আলাদা করা যায় না এই তার কারণ। উপরন্তু,

এ কথাও বেশ প্রমাণ করা যায় যে, কোনো একটা বিশ্ববীক্ষা গ্রহণ বা তার সমালোচনা একটি রাজনৈতিক ব্যাপারই বটে।

এর পর যা ব্যাখ্যা করা দরকার তা অবশ্যই এই: এটা কেমন করে হয় যে, সবকালেই দার্শনিক চিন্তার নানা তন্ত্র ও স্রোত একই সঙ্গে সহাবস্থান করে, কীভাবেই বা এই সব স্রোতের সূত্রপাত হয়, কীভাবে তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং এই ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়ায় কীভাবেই বা তারা কোনো একটা বিশেষ বিন্দুতে এসে বহুধাবিভক্ত হয়ে নানাদিকে বাঁক নেয়? এই প্রক্রিয়া থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদের স্বজ্ঞাকে খানিকটা সংহত প্রণালীবদ্ধ ও সমালোচনাত্মকভাবে সাজানোর প্রয়োজনটা কত জরুরি; ঐ 'প্রণালীবদ্ধ' শব্দটা দিয়ে কী বোঝানো হচ্ছে সেটাও খুব পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করে নেওয়া দরকার। অন্যথায় এই শব্দের প্রয়োগ একান্তই পণ্ডিতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে গিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু অর্থের এই ব্যাখ্যানটা অবশ্যই করতে হবে দর্শনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, আর একমাত্র সেভাবেই তা করা সম্ভব, কেননা এই ইতিহাস থেকেই জানা যাবে কীভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এইসব চিন্তা বিকশিত হয়েছে এবং কী বিপুল পরিমাণ সামগ্রিক চেষ্টার ভিত্তিতেই না গড়ে উঠেছে আমাদের বর্তমান চিন্তার ঠাট, আর এই ঠাটের মধ্যেই কীভাবে নিহিত আছে একটা গোটা অতীত ইতিহাস, তার সমস্ত কিছু ভুল ত্রুটি সব নিয়ে। এমনকী এই ভুলগুলোকেও অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ যদিও এসব অতীতের ব্যাপার এবং পরবর্তীকালে তা শোধরানোও হয়েছে, তবুও কে বলতে পারে যে এসব ভুল আবার হবে না এবং আবারও তাদের শোধরাবার দরকার পড়বে না!

দর্শন সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাটা কী? সাধারণ্যে ব্যবহৃত বাগ্‌বিধি থেকে এটা পুনর্গঠন করা সম্ভব। 'একটু দার্শনিকভাবে দেখতে গেলে' এরকম একটা বাক্যবন্ধ অত্যন্ত সুপ্রচলিত, এবং ভাবতে গেলে, বাক্যপ্রয়োগের একটা বিধি হিসেবে একে বর্জন করাও চলে না। একথা ঠিক যে এই বাক্যাংশের মধ্যে ধৈর্যসহকারে সব কিছু মেনে নেবার জন্য একটা প্রচ্ছন্ন আহ্বান আছে, কিন্তু আমার মনে হয় যে, সবচেয়ে জরুরি কথা হল এর মধ্যে এরকম একটা ইঙ্গিত আছে যে একটু নিবিষ্টভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখব যা কিছু ঘটছে তা মূলত যুক্তিযুক্ত এবং তাকে সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে এবং মানুষের মধ্যে যুক্তিসংগত মনোনিবেশের যে-ক্ষমতা রয়েছে তার পূর্ণ প্রয়োগ করতে হবে, শুধুমাত্র প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে দুরন্ত আবেগতাড়িত হয়ে কিছু করে বসা ঠিক হবে না। লোকপ্রচলিত এই ধরনের বাক্যাংশের সঙ্গে তুলনা করা উচিত মোটামুটি জনপ্রিয় লেখকদের ব্যবহৃত অনুরূপ প্রয়োগ সমূহের—'দর্শন' ও 'দার্শনিকভাবে' শব্দ দুটির প্রয়োগ দেখানো আছে এমন কোনো বড় অভিধান থেকেই এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে। এরকমের উদাহরণ থেকে দেখা যাবে যে এইসব শব্দের বেশ নির্দিষ্ট মানে রয়েছে: এই

মানের মধ্যে এরকম একটা ধারণা রয়েছে যে আদিম জান্তব প্রবৃত্তিগুলোকে জয় করতে হবে ; আবশ্যিকতার এমন এক ধারণার মধ্য দিয়ে এটা সম্ভব হতে পারে যাতে করে আমাদের কাজকর্মে একটা সচেতন দিশা মেলে। 'কাণ্ডজ্ঞান'-এর ধারণার মধ্যে বীজমন্ত্রের মতো এরকম একটা স্বাস্থ্যকর দিক রয়েছে, এটাই বোধ হয় সেই অংশ যাকে 'শুভজ্ঞান' বলা যেতে পারে আর সেটাকেই আরো ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করে তোলা দরকার। অতএব দেখা যাচ্ছে যে এখানেও যাকে 'বৈজ্ঞানিক' দর্শন বলে তার থেকে সাধারণ এবং জনপ্রিয় দর্শনকে আলাদা করা চলে না ; এই জনপ্রিয় দর্শন হল মোটামুটি ভাবে কিছু কিছু ধারণা ও মতামতের এক অসংলগ্ন সংকলন।

কিন্তু এখানেই যে-কোনো বিশ্ববীক্ষার সেই মৌলিক সমস্যার মুখোমুখি হই আমরা ; এই সমস্যা নিহিত আছে যে-কোনো দর্শনের মধ্যেই, যে-কোনো দর্শন যা একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠেছে বা একটা 'ধর্ম' বা 'বিশ্বাস' হিসেবে, অথবা যে-কোনো দর্শন যার থেকে কোনো এক ধরনের বাস্তব ক্রিয়াকাণ্ডের জন্ম হচ্ছে বা হবে এবং এমন এক ধরনের ক্রিয়াকাণ্ড যার ভেতরে নিহিত আছে কোনো তাত্ত্বিক 'প্রত্যয়'। এখানে হয়তো 'মতাদর্শ' শব্দটাই বলা যায়, তবে তার শর্ত থাকবে যে শব্দটিকে আমরা তার মহত্তম অর্থে ব্যবহার করব ; এই ব্যবহারের মধ্যে আছে বিশ্ব সম্বন্ধে এমন এক ধারণা যা নিহিতার্থে শিল্পের মধ্যে স্বপ্রকাশ, আইনের মধ্যে, অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে এবং ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনের সমস্ত কিছুর মধ্যেই তার পরিচয় প্রকাশিত হয়। সমগ্র সামাজিক জোটের পেছনে যে মতাদর্শগত ঐক্য তাকে ঠিকমতো বাঁচিয়ে রাখার যে-সমস্যা এটা সেই সমস্যা ; এবং এই মতাদর্শই আবার সেই জোটকে ঐক্যবদ্ধ করে ও তার সংহতিকে আরো জোরালো করে। ধর্মের, বিশেষত ক্যাথলিক ধর্মসংঘের চিরকালের জোরটাই এখানে, এবং আজো তাই তারা সমস্ত আস্তিকদের তাত্ত্বিক ঐকমত্যের গুরুত্ব প্রবলভাবে মেনে চলে। যাতে উচ্চতর বুদ্ধিজীবী স্তরটা নিচের স্তরের থেকে আলাদা না হয়ে পড়ে এ ব্যাপারে তারা সতত যত্নবান। যাতে অন্তত সরকারিভাবে দুটো ধর্মমত গড়ে না ওঠে, অর্থাৎ একটা যেন 'বুদ্ধিজীবী'দের জন্য আর অন্যটা 'শাদামাটা' মানুষদের জন্য ; এটা ঠেকাতে রোমক ধর্মসংঘ বরাবর এক তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে। এবং ধর্মসংঘের নিজের দিক থেকে এই সংগ্রামের জন্য অত্যন্ত অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে ; এই সব অসুবিধা তো আসলে সেই সব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত যার মধ্য দিয়ে সমগ্র জনসমাজটাই রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে এবং যার মধ্যে নিহিত থাকে ধর্মকেই ধ্বসিয়ে দিতে পারে এমন সব সমালোচনা। এসবের মধ্যেই ধরা পড়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পুরোহিতবর্গের সাংগঠনিক সামর্থ্য ; নিজেরই ক্ষেত্রে ধর্মসংঘ ঐ বুদ্ধিজীবী ও শাদামাটা মানুষদের মধ্যে যে বিমূর্ত, যুক্তিসিদ্ধ এবং ন্যায্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছে তাও এর মধ্য দিয়ে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ সাম্যাবস্থার প্রধান স্থপতি নিশ্চয়ই জেসুইট সম্প্রদায়,

এবং একে বাঁচিয়ে রাখতে তারা ধর্মসংঘকেই খানিকটা দূর পর্যন্ত আগুয়ান প্রগতিশীল করে তুলেছে এবং এরই জন্য অন্তত অংশত বিজ্ঞান ও দর্শনের বিচারেও এ ব্যবস্থা যেন কিছুটা গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই প্রগতির গতিস্পন্দ এতই মন্থর ও সুস্থির যে পরিবর্তনগুলো সাধারণ মানুষের চোখেই পড়ে না, যদিও পূর্ণতাবাদীদের কাছে তা যথেষ্ট 'বিপ্লবী' ও চিৎকৃত বলেই মনে হয়।

'নিহিতার্থবাদী' দর্শনের একটা বড় দুর্বলতাই এখানে যে এইসব দর্শনে নিচুতলা আর ওপরতলার মধ্যে বা 'শাদামাটা' মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কোনো মতাদর্শগত ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। পশ্চিমী সভ্যতার ইতিহাসে ইয়োরোপীয় প্রেক্ষাপটে এ ঘটনার প্রকাশ হল রেনেসাসের দ্রুত পতনে এবং কিছুটা পরিমাণে রোমক ধর্মসংঘের পুনর্গঠনে। এ দর্শনের দুর্বলতার প্রকাশ শিক্ষাক্ষেত্রেও দেখা যায়। নিহিতার্থবাদী কোনো দর্শনেই এমন কোনো ধারণা গড়ে তোলবার চেষ্টাই হয় নি যা শিশুশিক্ষায় ধর্মের বিকল্প হয়ে উঠতে পারত। আর এই কারণেই সেই আধা-ইতিহাসবাদী চুলচেরা যুক্তিবিন্যাসের প্রয়োজন পড়ে যেখানে অ-ধর্মীয়, স্বীকারোক্তিতে অবিশ্বাসী, বস্তুত নিরীশ্বরবাদী শিক্ষাবিদরাও ধর্মশিক্ষাকে সমর্থন করেন এই বলে যে, ধর্ম হল মানবজাতির শৈশবের দর্শন, যা প্রতিটি অনালংকারিক শৈশবস্থাতেই ফিরে ফিরে নতুন করে পেতে হয়। যে-সব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতিমুখ 'জনগণের দিকে' ভাববাদও তাদের সবার বিপক্ষে ; 'গণ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর ক্ষেত্রে এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এ জিনিস দেখা গেছে। একথা ঠিক নয় যে আপত্তিটা ছিল শুধু ঐসব প্রতিষ্ঠানের খারাপ দিকগুলোর সম্বন্ধে, কারণ সেক্ষেত্রে ঐসব দিকে সংস্কার সাধন করে প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নতিবিধান করা যেতে পারত। এসব সত্ত্বেও ঐ ধরনের আন্দোলনগুলো আমাদের মনোযোগ দাবি করে এবং তাদের নিয়ে চর্চারও দরকার আছে। এসব আন্দোলনের কিন্তু একটা সফলতার দিকও ছিল, কেননা এদের মধ্য দিয়েই একথাটা কিছুটা ব্যক্ত হতে পেরেছিল যে, তথাকথিত 'শাদামাটা' মানুষজনের মধ্যে সদর্থে একটা উদ্দীপনা রয়েছে এবং উন্নততর সাংস্কৃতিক জীবন লাভ করায় বা বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আরো পরিচ্ছন্ন ধারণা গড়ে তোলার বেশ জোরালো সংকল্পই ছিল তাদের মনে। যে জিনিসটার অভাব ছিল তা হল কোনোরকমের জৈব ধর্ম, তা সে দার্শনিক চিন্তাভাবনার বেলায় হোক, অথবা সাংগঠনিক স্থায়িত্বে হোক ; উপরন্তু, এসবের মধ্যে কোনো কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক দিগ্দর্শনও ছিল না। ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় ও আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে প্রথম পরিচয়ের সময়কার মতো অবস্থাটা ছিল আর কী : তাল তাল সোনার বদলে ছাইপাঁশ দু-একটা গয়না হাতে ধরিয়ে দেবার মতো। যাই হোক, ঐ জৈব ধর্ম ও সাংস্কৃতিক স্থায়িত্ব পাওয়া যেতে পারত একমাত্র যদি ঐ ঐক্যটা থাকত— শাদামাটা মানুষজন আর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, ঠিক যেমন তত্ত্ব ও আচরণের

মধ্যেও থাকা চাই এক নিবিড় ঐক্যবোধ। অর্থাৎ, বুদ্ধিজীবীরা যদি জৈব অর্থে গণমানুষের বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠতে পারতেন এবং যদি তাঁরা ঐ গণ-সম্প্রদায়ের বাস্তব কাজকর্মের মধ্যে থেকে উঠে আসা সমস্যাগুলো নিয়ে তাদের পেছনে যে-সব সূত্র কাজ করছে সেগুলোর একটা সংহত রূপ দানের চেষ্টা করতেন। এভাবেই গড়ে উঠতে পারত এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক জোট। যে-প্রশ্নটা এখানে তোলা হচ্ছে সেটা আগেও একবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্নটা এই : কোনো সত্যিকার দার্শনিক আন্দোলন কাকে বলে? যখন খুব সংকীর্ণ কোনো বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে এক বিশিষ্ট সংস্কৃতির জন্ম হয়? না কি একমাত্র তখনই যখন 'কাণ্ডজ্ঞানের' ঊর্ধ্বে কোনো চিন্তার এমন একটা ধরনের বিকাশ হয় যা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতেও বেশ সংহত এবং এই বিকাশ প্রক্রিয়ায় ঐ 'শাদামাটা' স্তরের থেকে কখনো দূরে সরে না গিয়ে তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকেই তবে আলোচ্য সমস্যার উৎস সন্ধান ও সমাধান সম্ভব হয়? একমাত্র এই সংস্পর্শের মধ্য থেকেই কোনো দর্শন 'ঐতিহাসিক' হয়ে উঠতে পারে, একক ব্যক্তিধর্মী বৌদ্ধিক উপাদান-গুলোর থেকে নিজেকে শুদ্ধ করে নিয়ে তা 'জীবন'[১]-এর সমার্থক হয়ে উঠতে পারে।

কর্মকাণ্ডের দর্শনকে নিজেকে গোড়া থেকেই তর্কমূলক ও সমা-লোচনাত্মকভাবে হাজির করতে হবে, যাতে বোঝা যায় যে তা প্রচলিত চিন্তার ধরন ও প্রতিষ্ঠিত চিন্তার ছাঁদ (তথা প্রচলিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল) ভেঙে অন্য স্তরে চলে এসেছে। অতএব, প্রথমেই 'কাণ্ডজ্ঞানের' সমালোচনা গড়ে তুলতে হবে; এটা করতে গেলেও অবশ্য ঐ কাণ্ডজ্ঞানের ওপরেই ভিত্তি করে তা করতে হবে, যাতে এটা দেখানো যায় যে 'প্রত্যেকেই' তো দার্শনিক এবং ব্যাপারটা তো এরকম নয় যে, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনে বৈজ্ঞানিক

১। দর্শন ও কাণ্ডজ্ঞানের মধ্যে এক 'বাস্তব' তফাত করা বোধ হয় খুব কাজের হবে। এতে করে একটা মুহূর্ত থেকে অন্য মুহূর্তে উত্তরণটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। দর্শনে চিন্তার ব্যক্তিগত বিশদীকরণ ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট : পক্ষান্তরে কাণ্ডজ্ঞানে এটা থাকে খুব অসংহত বিস্রস্তভাবে একটা সময়ের চিন্তার খুব মোটা দাগের ধাঁচ হিসেবে থাকে, একটা বিশেষ জনপরিবেশে এটা যেন একেবারে চারিয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক দর্শনেরই একটা ঝোঁক থাকে কোনো সীমাবদ্ধ একটা গণ্ডির মধ্যেকার কাণ্ডজ্ঞান হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবার (যেন ঐ সময়ের সব বুদ্ধিজীবীদের কাণ্ডজ্ঞান)। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াল যে, এমন এক দর্শন নিয়ে শুরু করতে হবে যা ইতি-মধ্যেই খানিকটা পরিমাণে ছড়িয়ে গেছে; কেননা বাস্তব জীবনের সঙ্গে সেই দর্শনের সম্পর্ক রয়েছে এবং তা ঐ বাস্তবেই নিহিত, তারপর একে এমনভাবে বিস্তারিত করে তুলতে হবে যাতে নতুন করে আবার এক রকমের কাণ্ডজ্ঞান হিসেবে তা যেন গড়ে উঠতে পারে এবং তাতে যেন ব্যক্তিগত দর্শন সমূহের সেই জোর ও সংহতি থাকে। কিন্তু এটা হতে পারে একমাত্র তখনই যখন 'শাদামাটা' জীবনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংস্পর্শটা নিরন্তর বোধে কাজ করে।

চিন্তাধারা একেবারে শূন্য থেকে শুরু করতে হয়, বরঞ্চ ব্যাপারটা হল প্রচলিত কোনো কর্মধারাকে বদলে নেবার বা তার সম্বন্ধে 'সমালোচন' গড়ে তোলবার। একে তাই হয়ে উঠতে হবে বুদ্ধিজীবীদের দর্শনের এক সমালোচনা, যে-দর্শনকে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে দর্শনের ইতিহাস। এই দর্শনকে মনে হয় ব্যক্তি-স্তরেরই এক ঘটনা (বস্তুত ব্যক্তিগত পর্যায়ে অত্যন্ত প্রতিভাবান কোনো কোনো একক ব্যক্তির প্রতিভার স্ফুরণ হিসেবেই তো এর বিকাশ ঘটে), কিন্তু আসলে কাণ্ডজ্ঞান কতদূর এগোতে পেরেছে তারই 'উচ্চতম নিদর্শন' ধরা থাকে এই ব্যক্তিক দর্শনের ইতিহাসে। অন্তত তুলনায় বেশি শিক্ষিত যে সামাজিক স্তর তার কাণ্ডজ্ঞান ধরা থাকেই এর মধ্যে, আর তারই ভেতর দিয়ে থাকে জনসাধারণের কাণ্ডজ্ঞানও। তাই দর্শনচর্চার ভূমিকা হিসেবে দায়িত্ব থাকে সংস্কৃতির সামগ্রিক বিকাশের মধ্য থেকে যে-সব সমস্যা উঠে এসেছে সংশ্লিষ্ট রূপে তাদের বিশদ বিশ্লেষণ করবার; দর্শনের ইতিহাসে কিন্তু এইসব সমস্যা নিতান্ত আংশিকভাবে ধরা পড়ে। (অবশ্য আকর তথ্যের অভাবে কাণ্ডজ্ঞানের ইতিহাস নির্মাণ করা অসম্ভব বলে দর্শনের ইতিহাসকেই প্রধান সূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।) এই সংশ্লেষের উদ্দেশ্য অবশ্যই হবে সমস্যাগুলোর সমালোচনা করা, তাদের প্রকৃত গুরুত্ব কিছু থাকলে তা তুলে ধরা এবং বৌদ্ধিক কোনো শৃঙ্খলের ছিন্নসূত্র হিসেবে তাদের কোনো তাৎপর্য থাকলে তারও বিচার করা। এইভাবেই নির্ধারণ করতে হবে সমসাময়িক কালের নতুন সমস্যা-গুলো কী এবং পুরনো সমস্যাকেই বা এখন কীভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত হবে তাও।

কাণ্ডজ্ঞান এবং দর্শনের উঁচু পর্যায়ের সম্পর্কটা ধরা পড়ে 'রাজ-নীতি'তে। ঠিক যেমন রাজনীতির মধ্যে দিয়েই নির্ধারিত হয়ে যায় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের মধ্যেকার ক্যাথলিক বিশ্বাসভিত্তিক সম্পর্ক। যদিও এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ধর্ম-সংঘকে যে 'শাদামাটা' মানুষের সমস্যা বলে বিশেষ একটা কিছুর কথা ভাবতে হচ্ছে এটার থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা ভাঙন ধরেছে। এই ভাঙনকে কিন্তু রোধ করা যাবে না ঐ 'শাদামাটা' মানুষকে বুদ্ধিজীবীর স্তরে তুলে এনে (এমনকী ধর্মসংঘ বর্তমানে এটা তার কাজের অন্তর্গত বলে মনেও করে না, কারণ মতাদর্শগত কিংবা অর্থনৈতিক কোনোদিক দিয়েই এ আর এখন তারসাধ্যের মধ্যে নয়)। এ ভাঙনকে রুখতে তারা কেবল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ওপর শক্ত হাতে এমন কিছু বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে যাতে তাদের বিভেদ মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়, যাতে ভাঙনটা মেরামতের অসাধ্য কোনো বিপর্যস্ত অবস্থায় পেঁৗছে না যায়। অতীতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধরনের বিভেদের প্রতিকার হিসেবে দেখা দিয়েছিল জোরালো গণ-আন্দোলন, যার ফলে এক একজন প্রবল ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পেরেছিল নতুন ধর্মীয় তন্ত্র (সন্ত

দোমিনিক, সন্ত ফ্রান্সিস)।[২] আন্দোলনগুলোও আবার কখনো কখনো এইসব নতুন তন্ত্রের মধ্যে মিলে যেতে পেরেছিল।

কিন্তু পুনর্গঠন-বিরোধী প্রতিক্রিয়ায় এই গণ আন্দোলনগুলির শক্তি অনেকটাই দুর্বল করা হয়েছে। সোসাইটি অব্ জিসাস্ হল শেষ বড় রকমের ধর্মীয় সংঘ। এর সূত্রপাত ছিল প্রতিক্রিয়াশীল ও কর্তৃত্বমূলক আর এর চরিত্র ছিল দমনমূলক ও দলাদলি-ঘোঁটবাজির। এর উদ্ভবের মধ্য দিয়ে ক্যাথলিক সংগঠনের এক ধরনের দৃঢ়তাই সূচিত হয়েছিল। তার পর থেকে আর যে-সব সংঘের বিকাশ হয়েছে তাদের ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল খুব সামান্য, যদিও তাবৎ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এর 'শৃঙ্খলাগত' তাৎপর্য ছিল দারুণ। সোসাইটি অব্ জিসাস্-এর নানা রকমের রকমফেরই ছিল তারা, অথবা সেইরকমই হয়ে দাঁড়িয়েছে ; নতুন কোনো ধরন গড়ে উঠতে পারে নি এ সবের মধ্য দিয়ে, বরঞ্চ যে-সব রাজনৈতিক ঘাঁটিগুলো জয় করা গেছে তাদের রক্ষা করার জন্য 'প্রতিরোধ'-এর অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল এরা। ক্যাথলিকবাদ রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়িয়েছে 'জেসুইটবাদে'। আধুনিকতাবাদ কোনো 'ধর্মীয় সংঘ'-এর জন্ম দিতে পারে নি, দিয়েছে রাজনৈতিক দলের—ক্রিশ্চয়ান ডিমক্রাসি।[৩]

কর্মকাণ্ডের দর্শনের অবস্থান ক্যাথলিকদের বিপরীতে। কর্মকাণ্ডের দর্শন 'শাদামাটা'-কে কাণ্ডজ্ঞানের আদিম দার্শনিক অবস্থায় ছেড়ে রাখতে চায় না, সে চায় তাকে জীবন সম্বন্ধে উন্নততর এক ধারণার পথে চালিত করতে। বুদ্ধিজীবী ও শাদামাটা লোকদের সংযোগের ওপর যে-জোরটা এই দর্শনে দেওয়া হয় তা কিন্তু বৈজ্ঞানিক কাজকর্মকে চেপে দেওয়া কিংবা

২। মধ্যযুগের প্রতিবাদী আন্দোলনগুলো ছিল ধর্মসংঘের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও তারই প্রকাশক্ষেত্র হিসেবে দানাবাঁধা স্কলাসটিক দর্শনের বিরুদ্ধে এক যুগপৎ প্রতিক্রিয়া। কমিউনের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত সামাজিক সংঘর্ষই ছিল এদের ভিত্তি। ধর্মসংঘের অন্তর্গত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আর জনগণের মধ্যেকার যে প্রভেদ তারও প্রকাশ হচ্ছিল এই প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যে। লোকপ্রচলিত ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে এই ভাঙনকে যেন খানিকটা 'সেলাই করা'র চেষ্টা ছিল ; কালক্রমে নতুন সন্ন্যাসীবর্গ তৈরি করে এক নতুন ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ধর্মসংঘ এইসব নতুন ধর্মীয় আন্দোলনগুলোকে আবার তার অঙ্গীভূতও করে নিতে পেরেছিল।

৩। স্টিড্ তাঁর স্মৃতিকথায় যে কাহিনীটা বলেছেন সেটা স্মরণ করা যাক : সেই কার্ডিনালের গল্প যিনি ক্যাথলিক-পন্থী ইংরেজ প্রটেস্টাণ্টকে বলেছিলেন যে, সান জেন্নারো [সন্ত জানুয়ারিয়ুস]-র অলৌকিক ঘটনা নাপোলির সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসের বস্তু, বুদ্ধিজীবীদের কাছে নয়, এমনকী শাস্ত্রের মধ্যেও 'অতিরঞ্জন' আছে এবং ইনিই তিনি যিনি 'আমরা কি খ্রিস্টান নই ?' এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এই বলে যে, 'আমরা তো আসলে রোমক গির্জার "প্রিলেট", অর্থাৎ "রাজনীতিবিদ" '।

নিচুতলার জনগণের মধ্যে এক ধরনের সংহতি বজায় রাখার জন্য নয়; এর লক্ষ্য হল এমন একটা বৌদ্ধিক-নৈতিক জোট তৈরি করতে পারা, যার ফলে শুধুমাত্র কোনো এক ছোট বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর নয়, সমগ্র জনসমষ্টির বৌদ্ধিক প্রগতির কাজটা রাজনৈতিকভাবে সম্ভব হতে পারে।

জন-স্তরের কর্মী মানুষটির কাজ তো নিতান্ত হাতে-কলমে, কিন্তু তার ঐ হাতে-কলমে কাজের পেছনে কোনো তাত্ত্বিক চিন্তা তত পরিচ্ছন্নভাবে হয়তো থাকে না; ঐ কাজের মধ্য দিয়েই যে-পৃথিবীর কিছুটা রূপান্তর সাধিত হচ্ছে তার নিয়মকানুন বুঝে নেবার একটা প্রয়োজন কিন্তু তা সত্ত্বেও থেকেই যায়। তার তাত্ত্বিক চিন্তা বস্তুত ঐতিহাসিকভাবে তার হাতে-কলমে কাজের পরিপন্থীও হতে পারে। এমনকী হয়তো এও বলা যায় যে, তার আসলে দু-রকমের তাত্ত্বিক চৈতন্য রয়েছে (অথবা হয়তো স্ব-বিরোধী একটাই): একটা, যা তার কাজকর্মের ভেতরে অন্তর্গত হয়ে থাকে এবং যে-চৈতন্যের বলে বাস্তব পৃথিবীর রূপান্তরের পথে তার যত সহকর্মী তাদের সঙ্গে সে যুক্ত হতে পারে; আর অন্যটা, যা বহিরঙ্গভাবে শাব্দিক রূপে প্রকাশিত, যা সে অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে এবং আত্মস্থ করে নিয়েছে অ-সমালোচিতভাবে। কিন্তু এই শাব্দিক রূপেরও তাৎপর্য খুব কম নয়। এর সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যেকার সংহতি বজায় রাখা সম্ভব হয়, নৈতিক আচরণ ও ইচ্ছাশক্তির দিক্‌নির্দেশ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে এ সবই যে সব সময়ে সমান জুতসইভাবে হয় তা নয়; কিন্তু এর মধ্যে প্রায়শ এমন একটা জোর থাকে যার জন্য চৈতন্যের ঐ স্ব-বিরোধী অবস্থার মধ্যে থেকে কোনো কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া, কিংবা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরিস্থিতি নির্বাচন আর সম্ভব হয় না এবং এর ফলে এক ধরনের নৈতিক ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয় অবস্থার উদ্ভব হয়। অতএব সমালোচনাত্মক আত্মোপলব্ধির জন্ম হয় রাজনৈতিক 'আধিপত্য'-এর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং এর মধ্যে থাকে নানা বিপরীতমুখী প্রবণতা—প্রথমে নৈতিক ক্ষেত্রে, পরে একেবারে সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে; আর তার মধ্যে দিয়েই সম্ভব হয় এক উন্নততর স্তরে বাস্তব সম্বন্ধে নিজের ধারণা গড়ে তোলা। কোনো এক নির্দিষ্ট আধিপত্য-মূলক শক্তির অংশ হবার যে চৈতন্য (অর্থাৎ, রাজনৈতিক চৈতন্য) সেটাই হল আরো প্রগতিশীল এক আত্মসচেতনতায় পেঁছবার প্রথম ধাপ এবং এরই মধ্যে তত্ত্ব ও কর্ম শেষ পর্যন্ত মিলে মিশে এক হয়ে যায়। অতএব তত্ত্ব ও কর্মের এই ঐক্য শুধু একটা যান্ত্রিক তথ্যমাত্র নয়, এটা একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ। এই প্রক্রিয়ারই প্রাথমিক ও আদিম পর্বটাকে খুঁজে পেতে হবে 'আলাদা' ও 'অন্যরকম' হবার একটা বোধের মধ্যে, স্ব-নির্ভরতার এক সহজাত অনুভূতির মধ্যে এবং এই বোধ ও অনুভূতিই আস্তে আস্তে উন্নীত হবে বিশ্ব সম্বন্ধে এক একক ও সংহত ধারণার স্তরে। এ জন্যেই এ কথাটায় জোর দেওয়া দরকার যে, আধিপত্যের ধারণার রাজ-

নৈতিক বিকাশের মধ্যেই এক বড় মাপের দার্শনিক ও বাস্তব-রাজনৈতিক অগ্রগতি সূচিত হয়। কারণ, এর পূর্বশর্ত হল কাণ্ডজ্ঞানের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া কোনো বিশ্ববোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এক বৌদ্ধিক ঐক্য ও নীতি-সূত্র; খুব সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে হলেও এই বিশ্ববোধ এক সমালোচনাত্মক বোধের স্তরে উন্নীত।

অবশ্য, কর্মকাণ্ডের দর্শনের অতি সাম্প্রতিক বিকাশের মধ্যে তত্ত্ব ও কর্মের ঐক্যের এই ধারণার বিচার-বিশ্লেষণ এখনো পর্যন্ত খুব প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। যান্ত্রিকতার খানিকটা অবশেষ এখনো পর্যন্ত বেশ রয়ে গেছে, যেমন, তত্ত্বের কথাটা বলা হয় কিন্তু কর্মের 'পরিপূরক' হিসেবে বা তার 'সহযোগী' বস্তু হিসেবে বা কর্মেরই উদ্ভাবন কিছু এই হিসেবে। এ প্রশ্নটাকেও ঐতিহাসিকভাবে বিবেচনা করা উচিত হবে, বুদ্ধিজীবী বিষয়ক রাজনৈতিক প্রশ্নের অঙ্গ হিসেবেই একে দেখা ঠিক হবে। সমালোচনাত্মক আত্মসচেতনতা মানে হল, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে বুদ্ধিজীবী এক এলীট্ বর্গ তৈরি করা। একদল মানুষ খুব ব্যাপক অর্থে নিজেদের সংগঠিত না করে তো নিজেদেরকে 'বিশিষ্ট' করে তুলতে পারে না, বা স্বাধিকারে স্বনির্ভরও হয়ে উঠতে পারে না; আর বুদ্ধিজীবী ছাড়া তো কোনো সংগঠন হতে পারে না, অর্থাৎ সংগঠক ও নেতৃবৃন্দ ছাড়া। একটু অন্যভাবে বলতে গেলে, এমন একটা বর্গ চাই যেখানে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনার ধারণাগত ও দার্শনিক দিক নিয়ে আলোচনায় বিশেষ 'পারদর্শী' মানুষেরা থাকবেন এবং তাঁদের অস্তিত্বের মধ্য দিয়েই তত্ত্ব-কর্ম সম্পর্কের তাত্ত্বিক দিকটা স্পষ্টভাবে বিশিষ্টরূপে চিহ্নিত হবে। কিন্তু বুদ্ধিজীবী-বর্গ সৃষ্টি করার কাজটা দীর্ঘ, জটিল ও সংঘাতময়, এতে কখনো এগোতে হবে, কখনো পেছোতে হবে, গোষ্ঠীটা কখনো যাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে, আবার কখনো বা পুনর্গঠিত হবে এবং এ-সবের মধ্য দিয়ে জনগণের আনুগত্যের ওপরেও যথেষ্ট চাপ পড়বে। (এবং এ-কথা ভুললে চলবে না যে, এই প্রাথমিক পর্বে সমগ্র সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশে জনগণের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার পন্থাই হল আনুগত্য ও শৃংখলাবোধ।)

বিকাশের প্রক্রিয়াটা বুদ্ধিজীবী ও জনগণের মধ্যেকার এক ধরনের দ্বান্দ্বিকতায় জড়িত। বুদ্ধিজীবী স্তরের বিকাশ হয় সংখ্যাগত ও গুণগত দুদিক দিয়েই। কিন্তু বুদ্ধিজীবী স্তরের ব্যাপকতর বিস্তার ও জটিলতার দিকে প্রত্যেকটি পদক্ষেপের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে ঐ 'শাদামাটা' মানুষদের তরফেও এক অনুরূপ বিকাশ। এই 'শাদামাটা' মানুষেরা নিজেদের উন্নীত করেন সংস্কৃতির এক উচ্চতর স্তরে এবং ঐ একই সঙ্গে নিজেদের প্রতিপত্তির গণ্ডিটাকেও তাঁরা বিস্তার করেন বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিজীবী-দের দিকে, আর এই প্রক্রিয়াতেই উদ্ভব হয় অসামান্য ব্যক্তির এবং কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ নানা গোষ্ঠীর। এই প্রক্রিয়ায় অবশ্য ক্রমাগত এমন মুহূর্ত তৈরি হয় যখন জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যেকার ফাঁকটা ক্রমশ বড় হয়

(অন্তত তাদের কারো কারো মধ্যে বা তাদের কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে) ; এর ফলে সংযোগটা এমনভাবে হারিয়ে যায় যে, এইরকম একটা ধারণা গড়ে ওঠে যে তত্ত্ব তো 'পরিপূরক' বা 'সহযোগী' কোনো বস্তুই বটে, খানিকটা অধোগত। তত্ত্ব-কর্ম সম্পর্কের মধ্যে থেকে তত্ত্ব ও কর্মের শুধু পার্থক্য নির্দেশ করা নয়, তাদের একেবারে আলাদা করে দুটো অংশকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার পরেও (শুধুই এ কাজটুকু অবশ্য যান্ত্রিক ও নিতান্ত প্রথাগত) কর্মের ওপরে জোর দেবার অর্থ হল যে আমরা তখনো আপেক্ষিকভাবে আদিম কোনো ঐতিহাসিক পর্যায়ে আছি ; এই পর্যায়টা তখনো আর্থনীতিক-সংঘ স্তরে এবং সাধারণ 'অঙ্গবিন্যাসগত' কাঠামোটা তখনো পর্যন্ত পরিমাণগতভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং উপযুক্ত গুণগত উপরিতলের স্তর তখনো পর্যন্ত কেবলমাত্র বিকশিত হতে শুরু করেছে, কিন্তু কোনো জৈব রূপ তখনো ধারণ করে নি। আধুনিক পৃথিবীতে বিশ্ববীক্ষার বিস্তার ও প্রচারে রাজনৈতিক দলগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ওপর জোর দেওয়া উচিত, কারণ ঐ দলগুলি মূলত যা করে থাকে তা হল তাদের বিশ্ববীক্ষার অনুরূপ এক রাজনীতি ও নীতিসূত্র গড়ে তুলে সেইমতো কাজ করে, যেন এটাই তাদের ঐতিহাসিক 'বীক্ষণাগার'। কর্মে লিপ্ত জনগণের মধ্যে থেকে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের কর্মী সংগ্রহ করে, এবং নির্বাচনটা করা হয়ে থাকে একই সঙ্গে কর্মভিত্তি ও তত্ত্বভিত্তির নিরিখে। বিশ্ববীক্ষাটা যত বেশি মৌলিক ও নিহিত অর্থে নতুন ও পুরনো চিন্তার পরিপন্থী হয়, ততই তত্ত্ব ও কর্মের সংযোগ আরো নিবিড় হয়। এই কারণেই বলা চলে যে, রাজনৈতিক দলগুলিই নতুন সংহত ও সার্বিক বুদ্ধিজীবীবর্গের বৃদ্ধির সহায়ক এবং এই দলগুলিই সেই আধারের কাজ করে যেখানে প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে ঐ তত্ত্ব ও কর্মের মিলন সাধিত হয়। এই আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, দলগুলি গড়ে তোলা দরকার ব্যক্তিগত সদস্যদের ভিত্তিতে, ইংরেজ শ্রমিক দলের ধাঁচে নয়, কারণ প্রশ্নটা যদি এই হয় যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে সক্রিয় একটা গোটা জনগোষ্ঠীকে জৈবিক নেতৃত্ব দিতে হবে তাহলে ঐ নেতৃত্বকে তো পুরনো ধরনধারণ অনুকরণ করলে চলবে না, তাকে নতুন নতুন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই উদ্ভাবন তো জনগোষ্ঠী থেকে আসতে পারে না, অন্তত গোড়ার দিকে, যদি না অবশ্য কোনো এলীটবর্গ এটাতে মধ্যস্থতা করে ; এই এলীটবর্গের কাছে মানুষের কাজকর্মের মধ্যেকার নিহিত ধারণাবিশ্ব ইতিমধ্যেই খানিকটা সংহত ও প্রণালীবদ্ধ রূপে তাদের চৈতন্যে সদা উপস্থিত এবং নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট এক ইচ্ছাশক্তির রূপ ধারণ করেছে।

কর্মকাণ্ডের দর্শনের সর্বাধুনিক বিকাশ বিষয়ে সাম্প্রতিক আলোচনা পাঠ করলে এরকম একটা পর্যায় লক্ষ করা যেতে পারে ; এরকম আলোচনার একটা সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যাবে 'লা কুলতুরা' পত্রিকার সহযোগী ডি. এস. মিরস্কির প্রবন্ধে। এ আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে, একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে,

যান্ত্রিক ও নিতান্ত বহিরঙ্গ ধারণা থেকে এই পরিবর্তিত ধারণায় নজর গেছে এমন একটা ধারণায় যা কর্মময় এবং আগেই যেমন বলা হয়েছে, যা তত্ত্ব ও কর্মের ঐক্য বিষয়ে যথার্থ বোধের অনেক কাছাকাছি, যদিও ধারণাটির পূর্ণ সংশ্লিষ্ট অর্থে পেঁছনো এখনো সম্ভব হয় নি। নির্ধারণবাদী, ভবিতব্যবাদী এবং যান্ত্রিক সব উপাদান কীভাবে যে কর্মকাণ্ডের দর্শনের ভেতর থেকে এক সরাসরি মতাদর্শগত 'সুরভি' হিসেবে নিঃসারিত হয় সে কথাটা লক্ষ করার মতো। এই 'সুরভি' অনেকটা যেন ধর্ম বা মাদকদ্রব্যের মতো (মানসিক অবসাদগ্রস্ত অবস্থার দিক দিয়ে)। কোনো কোনো সামাজিক স্তরের 'অধোগত' চরিত্রের জন্যই এটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং সেভাবেই তা ঐতিহাসিক দিক দিয়ে ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল।

সংগ্রামে যখন নিজের উদ্যম থাকে না, আর সংগ্রামটাই যখন শেষমেশ একটার পর একটা পরাজয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়, তখন যান্ত্রিক নির্ধারণবাদই একটা দারুণ শক্তি হিসেবে দেখা দেয়, নৈতিক প্রতিরোধের শক্তি ও সংহত, সুস্থির ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এক ঐকান্তিকতার শক্তি হিসেবে তা প্রতিভাত হয়। 'আপাতত এই মুহূর্তে পরাজিত বটে, কিন্তু আখেরে ইতিহাসের স্রোত আমারই পক্ষে বইছে।' ইতিহাসের কোনো এক যুক্তিসিদ্ধিতে এবং আবেগতপ্ত চূড়ান্তবাদের আদিম ও তথ্যনির্ভর কোনো রূপে প্রকৃত ইচ্ছাশক্তি অটল বিশ্বাসের আবরণে ভূষিত হয়। স্বীকারোক্তিমূলক ধর্মের অন্তর্গত প্রাক্‌সিদ্ধি ও দৈবের জায়গায় অধিষ্ঠিত হয় এই চূড়ান্তবাদ। অবশ্য একথা জোর দিয়ে বলা দরকার যে, ইচ্ছাশক্তির এক তীব্র প্রণোদনা এখানেও উপস্থিত, 'অবস্থাগতিক' এর মধ্যে যা সরাসরি অনুপ্রবিষ্ট, তবে কিছুটা যেন নিহিত ও প্রচ্ছন্নভাবে, একটু যেন সলজ্জ ভঙ্গিতে। অতএব, চৈতন্য এখানে স্ববিরোধী এবং সমালোচনাত্মক ঐক্য অনুপস্থিত ইত্যাদি। কিন্তু ঐ 'অধোগত' শ্রেণী যখন অগ্রগণ্য ভূমিকায় আসে এবং জাগরণের অর্থনৈতিক কাজকর্মের কর্তা হয়ে ওঠে, তখন একটা পর্যায়ে এসে যান্ত্রিকতা বেশ রীতিমতো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় এবং চিন্তার ধাঁচে একটা পরিবর্তন তখন অবশ্য বাঞ্ছনীয়, কারণ, সামাজিক অস্তিত্বের আদলে ইতিমধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। 'অবস্থাগতিক'-এর সীমা ও চৌহদ্দি তখন খুব সংকীর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কেন? কারণ, মূলত গতকাল ঐ অধোগত কোনো বিষয় যদি মাত্র একটা বস্তু হিসেবে থেকে থাকে, তাহলে আজ কিন্তু সেটা আর কোনো বস্তু নয়, এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, এক প্রধান চরিত্র। গতকাল বাইরের দিককার কোনো ইচ্ছাশক্তির 'প্রতিরোধ' করতে হচ্ছিল বলে সে যদি নিজেকে কর্তা বলে ভেবে থাকে, আজ কিন্তু সে নিজেকে কর্তা বলেই অনুভব করছে, কারণ এখন তো আর সে প্রতিরোধ করছে না, সে আজ নিজেই নিয়ন্তা, অবশ্যই ক্রিয়াশীল এবং উদ্যমী।

কিন্তু গতকালও কি তা ছিল শুধুই 'প্রতিরোধ', নিতান্ত কোনো 'বস্তু', নেহাতই 'অ-কর্তৃত্ব? কখনোই না। বস্তুত এ কথাটায় জোর দেওয়া দরকার

যে, নিয়তিবাদ তো প্রকৃত ক্রিয়াশীল ইচ্ছাশক্তির দুর্বল অবস্থায় পরা পোশাক বৈ আর কিছু না। এই কারণেই যান্ত্রিক নির্ধারণবাদের নিষ্ফলতা খুলে দেখানো সব সময়ে অতীব জরুরি কাজ: কারণ, জনগণের স্তরের এক শাদাসিধে দর্শন হিসেবে এই নির্ধারণবাদকে তবু বুঝতে পারা যায়, এবং সেই হিসেবেই একমাত্র একে এক আন্তর শক্তি হিসেবে হয়তো ভাবাও যায়, কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের তরফে যখন একে এক সুচিন্তিত ও সুসংহত দর্শন হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন কিন্তু এই নির্ধারণবাদ নিষ্ক্রিয়তা ও নির্বোধ আত্মম্ভরিতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা ঘটে তখনই যখন ঐ বুদ্ধিজীবীরা আর আশাই করতে পারে না যে, ঐ অধোগতেরা কখনো আবার অগ্রগণ্য বা কর্তৃত্বের ভূমিকায় আসবে। বস্তুতপক্ষে, অবশ্য এটাই দেখা যায় যে, অধোগত জনগণেরই কোনো একাংশ সব সময়ই থাকে অগ্রগণ্য ও কর্তৃত্বময়, এবং ঐ একাংশের দর্শনই সব সময়েই সমগ্রের দর্শনের অগ্রবর্তী হয়, এবং এই অগ্রবর্তিতা শুধু তাত্ত্বিক প্রাক্-প্রকাশ হিসেবেই দেখা যায় তা নয়, বাস্তব জীবনের প্রয়োজন হিসেবেই তার দেখা মেলে।

খ্রিস্টধর্মের বিকাশের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এটা দেখা যায় যে, ঐ যান্ত্রিক ধারণা অধোগতের ধর্ম হিসেবেই গৃহীত হয়েছে। ইতিহাসের কোনো এক কালখণ্ড জুড়ে, খুব নির্দিষ্ট কিছু ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্যে ধর্ম এক 'প্রয়োজন' হিসেবেই দেখা দিয়েছিল এবং ঐভাবেই তা বজায় ছিল। সাধারণ জনগণের স্তরের ইচ্ছাশক্তি ঐরূপেই যেন আবশ্যিকভাবে জেগে ওঠে, এবং ধর্ম যেন পৃথিবীকে ও বাস্তব জীবনকে বুঝে নেবার এক নির্দিষ্ট পন্থা, এবং এই পন্থাতেই প্রকৃত হাতেকলমে কাজকর্মের জন্য এক সাধারণ চালচিত্রের সন্ধান মেলে। **লা চিভিলতা কাত্তোলিকা**য় প্রকাশিত প্রবন্ধ (**ইনদিভিদুয়ালিজমো পাগানো এ ইনদিভিদুয়ালিজমো ক্রিসতিয়ানো** : ১৯৩২-এর ৫ মার্চ সংখ্যা) থেকে নিচের এই উদ্ধৃতিতে আমার মনে হয় খ্রিস্টধর্মের এই দিকটা খুব ভালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে :

> নিরাপদ ভবিষ্যতে আস্থা, পরমানন্দে দৈবাদিষ্ট আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস এবং অক্ষয় আনন্দধামে পৌঁছে যাবার নিশ্চিতি এসবই তীব্র আন্তরিক পূর্ণতাকাঙ্ক্ষা ও আত্মিক উন্নয়নের পেছনে শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। সত্যিকার খ্রিস্টীয় প্রাতিস্বিকতা এখানেই তার সেই প্রাণশক্তি পেয়েছিল যার বলে সে জয়ী হতে পেরেছিল। খ্রিস্টধর্মাবলম্বীর সমস্ত জোর এই মহৎ উদ্দেশ্যকে ঘিরেই বেড়ে উঠেছিল। জল্পনার অ-স্থির বোধ, যা মানুষের আত্মাকে সংশয়ে দুর্বল করে ফেলে, তার থেকে মুক্ত হয়ে, এবং অবিনশ্বর নীতিসূত্রে আলোকিত হয়ে মানুষ তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত বলে বোধ করে ; এ বোধে মানুষ স্থির থাকে যে, দুর্মতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোনো এক মহদাশয় শক্তি তার সহায় আছে, এবং এই স্থির প্রত্যয়ে সে নিজের প্রতি আঘাত হানে ও এইভাবেই জিতে নেয় তার পৃথিবী।

কিন্তু এখানেও সেই শাদাসিধে খ্রিস্টধর্মের কথাই বলা হচ্ছে : জেসুইট খ্রিস্টধর্মের কথা না, এই জেসুইটবাদ সাধারণ জনগণের পক্ষে বিশুদ্ধ আফিমের কাজ করেছে।

ক্যালভিনবাদের অবস্থান অবশ্য আরো পরিষ্কার ও তাৎপর্যপূর্ণ,[৪] তার ছিল বিধির নির্বন্ধ ও ঈশ্বরপ্রসাদ এই দুই লৌহদৃঢ় ধারণা, যার থেকে উদ্যমের একটা মেজাজ খুব ব্যাপ্ত আকারে তৈরি হয় (অথবা ঐ আন্দোলন সেই রূপটাই গ্রহণ করে ক্রমশ)।

চিন্তাপ্রক্রিয়ার প্রসারে প্রধান উপাদানগুলো কী কী (এই প্রসার মানে অবশ্য পুরনো ধারণার পরিবর্তে নতুনটাকে বসানো এবং অনেক সময়েই পুরনো আর নতুনটাকে মেশানো), আর কী করে এবং কতদূরেই বা তারা ক্রিয়াশীল থাকে ? নতুন ধারণাটা যেভাবে প্রচারিত ও উপস্থাপিত হয় তা কি যুক্তিসিদ্ধ ভাবেই হয়ে থাকে ? না কি চিন্তাবিদ ও প্রচারকরা এবং তাঁরা যে-সব বিশেষজ্ঞদের সমর্থন নেন তাঁদের কোনো কর্তৃত্ব (এই কর্তৃত্ব খুব সাধারণভাবে হলেও যতটুকু স্বীকৃত ততটুকু) এর পেছনে কাজ করে ? না কি যিনি এই নতুন ধারণার প্রচার করছেন তাঁর সঙ্গে একই সংগঠনভুক্ত হওয়া ব্যাপারটা কোনো কাজ করে ? (অবশ্যই ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, নতুন ধারণার অংশীদার না হয়েও সংগঠনে যোগ দিয়েছেন কেউ কেউ)।

বাস্তবে অবশ্য বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী এবং তাদের সাংস্কৃতিক স্তর অনুসারে উপাদানগুলো বিভিন্ন রকমের হবে। কিন্তু বিশেষ করে জনগণের সাধারণ স্তরের জন্য এই বিষয়টা বিচার করা খুব জরুরি। এই সাধারণ জনগণের যে-স্তর সেখানে ধারণার পরিবর্তন হয় খুব ধীরে ধীরে, কিংবা ধারণাগুলোকে তাদের 'শুদ্ধ'রূপে গ্রহণ করার অর্থে হয়তো পরিবর্তন কোনোদিনই হয় না, কিন্তু সবসময়েই যেটা হয় তা হল বড়জোর নানা রকমের অদ্ভুত ধরনের সব সংযোগের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন দেখা দেয়। সংহত ও সুসংগত যুক্তিবিন্যাস, যুক্তিবিচারে কিছুই বাদ না দেওয়া, পক্ষের বিপক্ষের সমস্তরকম যুক্তি খুঁটিয়ে বিচার করা, এসবের নিশ্চয়ই খানিকটা তাৎপর্য আছে, তবে তা কখনোই শেষ কথা নয়। এটা শেষ কথা হতে পারে, কিন্তু সে একটু অপ্রত্যক্ষভাবে, যখন কেউ একটা ধরনের বৌদ্ধিক সংকটের মধ্যে

৪। এই প্রশ্নে দ্রষ্টব্য : মাক্স হেবর, 'লেতিকা প্রোতেস্তান্তে এ লো স্পিরিতো দেল্ কাপিতালিস্মো' ; 'নুয়োভি স্তুদি', ১৯৩১-এর সংখ্যায় প্রকাশিত। ['ডী প্রোটেস্টান্টিশে এথিক উন্ড্ ডোর গাইস্ট ডেস কাপিটালিস্মুস্' ; 'আরকিভ্ ফ্যুর সোৎসিয়াল-হিসেনশাফ্ট্ উন্ড্ সোৎসিয়ালপলিটিক্', ২০ ও ২১ খণ্ড, ১৯০৪ ও ১৯০৫-এ প্রথম প্রকাশিত। ইংরেজি অনুবাদ ট্যালকট পারসন্স্) 'দ্য প্রটেস্ট্যান্ট এথিক অ্যান্ড দ্য স্পিরিট অব্ ক্যাপিটালিজ্ম্', লন্ডন, অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, ১৯৩০।] এবং আরো দ্রষ্টব্য ফ্রান্সে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অভ্যুদয় বিষয়ক বই 'ওরিজিন দ্যো লেস্প্রি বুর্জোয়া অঁ ফ্রঁস', প্রথম খণ্ড : 'লেগ্লিজ্ এ লা বুর্জোয়াজী' পারী, ১৯২৭]

দিয়ে যাচ্ছে তখন, পুরনো এবং নতুনের মধ্যে একটা দোলাচল অবস্থা চলছে, যখন পুরনো ধারণার প্রতি বিশ্বাস চলে গেছে, কিন্তু নতুন ধারণা তখনো গ্রহণ করা যায় নি, ইত্যাদি।

চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের কর্তৃত্বের জোর বিষয়ে বলা যায় যে, জনসাধারণের কাছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ. যদিও এও ঠিক যে, প্রত্যেক তত্ত্বচিন্তার ক্ষেত্রেই তাদের চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সন্ধান মেলে, এবং ঐ কর্তৃত্বের জোরটা যে শুধু এক পক্ষেই খাটে তা তো নয় ; উপরন্তু, প্রত্যেক চিন্তাবিদের বেলাতেই কিছু কিছু তফাত করা সম্ভব, সম্ভব এমন কিছু কিছু সন্দেহ তোলা যে তিনি সত্যিই এই এই কথাবার্তা বলেছিলেন কি না, ইত্যাদি।

এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নতুন ধারণার প্রসার মূলত রাজনৈতিক (অর্থাৎ, শেষমেশ, সামাজিক) কারণেই হয়ে থাকে ; কিন্তু তার রূপবন্ধ যে-চেহারা, যুক্তিবিন্যাসগত যে-সংহতি, কর্তৃত্বের উপাদান এবং সাংগঠনিক জোর, এ সবেরও খুব জরুরি ভূমিকা আছে এই প্রসারের প্রক্রিয়াতে, তবে তা কিন্তু প্রাসঙ্গিক হয় একটু পরে, সাধারণ ঝোঁকটা তৈরি হয়ে যাবার অব্যবহিত পরে, শুধু ব্যক্তির স্তরে হোক বা ছোটবড় যে-কোনো গোষ্ঠীর স্তরেই হোক। এর থেকে আমাদের অবশ্যই এ-সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, জনগণের মধ্যে দর্শনের অভিজ্ঞতাটা আসতে পারে একমাত্র বিশ্বাস হিসেবে।

জনগণের মধ্যে কাজ করেন যিনি তাঁর বৌদ্ধিক অবস্থানটা কল্পনা করা যাক : তাঁর নিজের মতামত, বিশ্বাস, ভালো-মন্দ বিচারের নিরিখ, আচার-আচরণের মান, এ সবই তৈরি হয়ে গেছে। তাঁর চেয়ে বুদ্ধির বিচারে শ্রেষ্ঠ কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপরীত এমন কেউ তাঁর চেয়ে জোরালো যুক্তিজাল বিস্তার করতে পারেন এবং বস্তুত যুক্তিবিন্যাসে তাঁকে খান খান করে দিতে পারেন। কিন্তু জনগণের মধ্যে যিনি কাজ করেন তিনি কি শুধু এই কারণে তাঁর মতামত বদলে ফেলতে পারেন ? শুধু এই কারণে যে যুক্তিবিন্যাসের লড়াইতে তিনি জিততে পারলেন না ? সেক্ষেত্রে তাঁকে তো প্রত্যেক দিনই নিজের মতামত বদলে ফেলতে হতে পারে, তাঁর চেয়ে যৌক্তিকতায় বড় যে কোনো মতাদর্শগত প্রতিপক্ষের সাক্ষাৎ পেলেই। তাহলে তাঁর দর্শন কোন উপাদানসমূহের উপর তাঁর ভিত প্রতিষ্ঠা করবে ? বিশেষত, তাঁর সেই দর্শন যা তাঁর আচার-আচরণের মান নির্ধারণে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ?

নিঃসন্দেহে সবচেয়ে জরুরি উপাদানগুলির চরিত্র বিশ্বাস দিয়েই নির্ধারিত হয়, যুক্তি দিয়ে নয়। কিন্তু বিশ্বাস কার উপর বা কীসে ? সে নিজে যে সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত বিশেষভাবে সেই গোষ্ঠীতে, কারণ সে যেমন যেমন ভাবে ঐ গোষ্ঠীও তো তার সঙ্গে সঙ্গে একটু আলগাভাবে হলেও তেমন তেমনই ভাবে। জনগণের ঐ ব্যক্তিটি ভাবতেই পারেন যে, একই রকমের চিন্তার শরিক এত মানুষ তো আর ভুল হতে পারে না, অন্তত তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁকে যেমন ভজাতে চাইছে যে সবই বেবাক ভুল, অন্তত অতটা

ভুল নিশ্চয়ই সবাই হতে পারে না। তিনি ভাবতেই পারেন যে, তিনি নিজে হয়তো স্পষ্টতই তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুক্তিবিস্তারে ঠিক সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারছেন না, কিন্তু তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে নিশ্চয় কেউ আছে যে তা পারবে এবং ঐ প্রতিপক্ষের চেয়েও জোরালো যুক্তি শানাতে পারবে, এবং এই সময়ে তাঁর মনে পড়ে যায় যে এই ধরনের বিস্তারিত, সংহত যুক্তিসঙ্গত বিচার বিশ্লেষণ শুনেই তো একদিন তিনি তাঁর বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন। সেইসব যুক্তিগুলো হয়তো আজ আর তাঁর পরিষ্কার করে মনে নেই, বা সেইসব যুক্তি আজ আর তিনি হয়তো নিজে বলতেও পারবেন না, কিন্তু তিনি তো জানেন যে যুক্তি আছে, কারণ তিনি তো শুনেছেন সেরকম যুক্তি এবং তার জন্যই তাঁর বিশ্বাস উৎপাদিত হয়েছিল একদিন। একদিন যে হঠাৎ তিনি আলো দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাতেই আস্থা স্থাপন করেছিলেন সেটাই তাঁর যুক্তিতে স্থির থাকবার স্থায়ী কারণ, পক্ষের যুক্তিগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে ঠিকমতো না সাজাতে পারলেও কিছু যায় আসে না।

এইসব কথা থেকে অবশ্য একটা কথা বেরিয়ে আসে যে, জনগণের মধ্যে কোনো নতুন ধারণার অস্তিত্ব কিছুটা অ-স্থির, বিশেষত চালু বিশ্বাসের সঙ্গে যখন এই নতুন ধারণার বিরোধ দেখা দেয়; ঐ চালু ধারণা (তা নিজেও নতুনই হতে পারে) যখন সামাজিকভাবে শাসকশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল। ধর্মের ও ধর্মসংঘের ইতিহাসে ওঠাপড়া দেখলে এ কথাটা বোঝা যাবে। ধর্ম বা কোনো বিশেষ ধর্মসংঘ তার বিশ্বাসকে চিরকাল সংগঠিতভাবে লালন করে এবং এই প্রক্রিয়ায় অক্লান্তভাবে তার সমর্থনে বুলি কপচিয়ে গিয়ে, সদাসর্বদা একই ধরনের যুক্তি আউড়ে গিয়ে এমন এক স্তরবিন্যস্ত বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী পালন করে যারা ঐ বিশ্বাসটাকে, অন্তত দৃশ্যত, একটা চিন্তার মহিমা প্রদান করতে পারেন, তার বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখতে পারে (সাধারণ ঐতিহাসিক বিকাশের শর্তসাবুদ মেনে তার সীমাবদ্ধতার মধ্যে যতদূর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব)। ধর্মসংঘ ও তার বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সম্পর্কের নিরবচ্ছিন্নতায় যখনই বড় রকমের ধাক্কা লেগেছে, রাজনৈতিক কারণের জন্যই, যেমন ফরাসি বিপ্লবের সময়, তখনই ধর্মসংঘের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। যে-অবস্থায় নিজের ধর্ম পালন করা শক্ত সে-অবস্থা যদি খুব বেশি দিন চলত তাহলে এই ক্ষতি খুব স্পষ্ট চেহারা নিত এবং আর একটা নতুন ধর্মেরও নিশ্চয় উদ্ভব হত, পুরনো ক্যাথলিকদের সঙ্গে সংযোগে যেমনটা নাকি হয়েছিল ফরাসি দেশে। যে-সমস্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের লক্ষ্য কাণ্ডজ্ঞান ও পৃথিবী সম্বন্ধে পুরনো ধ্যানধারণা বদলে ফেলা তাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় কিছু শর্তাদি আমরা এর থেকে পেয়ে যেতে পারি :

১. নিজেদের যুক্তিগুলো ক্লান্তিহীনভাবে পুনরাবৃত্তি করা (রচনশৈলীর ভিন্নতা অবশ্য করা যেতেই পারে): সাধারণ জনমানসে কাজ করবার দিক থেকে পুনরাবৃত্তিই সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি।

২. সাধারণ জনগণের ক্রমবর্ধমান স্তরে তাদের বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটানোর জন্য অবিরত কাজ করে যাওয়া, অর্থাৎ, অবিন্যস্ত গণ-উপাদানের মধ্যে একটা ব্যক্তিত্বের সঞ্চার করা। এর মানে সরাসরি জনগণের মধ্য থেকে উঠে আসছে এমন এক নতুন ধরনের বুদ্ধিজীবী এলীট্ তৈরি করার জন্য কাজ করা; যারা অবশ্য ঐ জনগণের সঙ্গে তাদের সংযোগটা রেখেই যাবে, যাতে করে তারা যেন করসেট-এর মধ্যে হোয়েল-বোনের মতো হয়ে যায়।

এই দ্বিতীয় শর্তটা যদি পূরণ করা যায়, তাহলেই প্রকৃত অর্থে গোটা যুগটার 'মতাদর্শগত বিশ্বপট' কিছুটা বদল হতে পারে। কর্তৃত্ব ও বৌদ্ধিক যোগ্যতার উচ্চাবচ স্তর-বিন্যাস ছাড়া কিন্তু এই এলীট্দের উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হবে না। এই প্রক্রিয়ারই চূড়ান্ত পরিণতি হবে একজন মহান দার্শনিকের আবির্ভাবে। কিন্তু এই ব্যাপক বৌদ্ধিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের সমতুল হবার জন্য তাকে স্পষ্টভাবে উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে; এ-কথাটা তাঁকে পরিষ্কার করে বুঝতে হবে যে, একজন ব্যক্তি-মানুষের মনন-চর্চায় যে-ধরনের অদলবদলের সম্ভাবনা থাকে তা কিন্তু এখানে অচল, তাঁকে বরঞ্চ সামগ্রিকের এই তত্ত্বকে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক করে এমন একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হবে যা সামবায়িক চিন্তাবিদের চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে সবচেয়ে সাযুজ্যবদ্ধ।

এটা স্পষ্ট যে এ-ধরনের জনগণসম্ভূত কোনো প্রবর্তনা হঠাৎ 'এমনি' ঘটে না, যে-কোনো একটা মতাদর্শকে ঘিরে তা গড়ে ওঠে না, কোনো একজন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অন্ধ দার্শনিক বা ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে এ-ধরনের কোনো দর্শন গড়ে তোলবার প্রণোদনা আছে বলেই তা গড়ে ওঠে না। কোনো একটা মতাদর্শকে জনগণের গ্রহণ করা বা না-করাটাই হল ঐ চিন্তা-ধাঁচের যুক্তিসিদ্ধি ও ঐতিহাসিকতার প্রকৃত মোক্ষম নিরিখ। এমনি এমনি গড়ে তোলা যে-কোনো তত্ত্ব-কাঠামো ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে অতি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যায়, যদিও কখনো কখনো, কিছুটা সময়ের জন্য, আপাত অনুকূল কিছু কিছু সংযোগের সুযোগে এ-সব তত্ত্বও এক ধরনের খানিকটা জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়; কিন্তু যে-সব তত্ত্বকাঠামো ইতিহাসের জটিল ও জৈব কোনো পর্বের চাহিদা মেটায় তারা ঠিকই প্রধান হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা পায়, যদিও তাদের নানা রকম অন্তর্বর্তী পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পার হতে হয় এবং এইসব পর্বে তারা যে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে সে কিন্তু নানা ধরনের বিচিত্র ও অদ্ভুত সব সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে।

এ-সবের মধ্যে অনেক সমস্যা আছে। তার মধ্যে প্রধান সমস্যাগুলো নানা রকম বৌদ্ধিক যোগ্যতা-সম্পন্ন স্তরের মধ্যেকার সম্পর্কের যে চেহারা ও ধরন, তার অন্তর্গত হয়ে যেতে পারে; অর্থাৎ, তুলনায় উচ্চতর পর্যায়ের যে-সব গোষ্ঠী তাদের সৃষ্টিশীল অবদানের যে ভূমিকা ও গুরুত্ব তার সংস্পর্শেই বৌদ্ধিক দিক দিয়ে অধস্তন গোষ্ঠী তার জৈব যোগ্যতায় নতুন সমালোচনাত্মক ধারণার সূত্রপাত করে ও বিকাশ ঘটায়। একটু অন্যভাবে বলতে

গেলে, এটা হল আলোচনা ও প্রচারের স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করার প্রশ্ন, প্রশাসনিক বা পুলিশি অর্থে স্বাধীনতার প্রশ্ন নয় এটা। এটা হল একটা স্ব-প্রণোদিত সীমা নির্ধারণের প্রশ্ন, যেখানে নেতারা নিজেরাই নিজেদের কাজকর্মের ওপর একটা সীমারেখা আরোপ করেন, অথবা ঠিকঠাক বলতে গেলে, নিজেদের সাংস্কৃতিক নীতির দিক নির্দেশ করে নেন। অর্থাৎ, প্রশ্নটা হল: 'জ্ঞানের অধিকার' এবং জ্ঞান-চর্চার সীমারেখা কে ঠিক করে দেবে? আর এই অধিকার ও সীমারেখা কি সত্যিই বেঁধে দেওয়া যায়? নতুন সত্যের গবেষণা, উন্নততর ও আরো সুসংহতভাবে সত্যের পরিচ্ছন্ন তত্ত্বায়ন ব্যক্তি বিশেষজ্ঞের নিজস্ব উদ্যোগের ওপর ছেড়ে রাখা ভালো বলে মনে হয়, যদিও এমন হতেই পারে যে, এই বিশেষজ্ঞরা ক্রমাগত একেবারে মূল সূত্রগুলো সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলতে থাকবেন এবং এই নিয়ে আলোচনার কোনো প্রস্তাব যদি বৈজ্ঞানিক কারণে না এসে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আসে, তা বুঝে ফেলা কিন্তু শক্ত হবে না। এরকম মনে করাও তো কিছু অসম্ভব না যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগও হবে সুশৃংখল এবং তারও থাকবে একটা রীতিবদ্ধ পদ্ধতি, যাতে এ-সবও বিদ্যায়তন ও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষিত হতে হতে তবেই সাধারণ-গ্রাহ্য হবে, এরকম একটা নির্বাচনের প্রক্রিয়া থাকতেই হবে।

একটা দেশের মধ্যে মতাদর্শের জগৎটাকে সচল রাখতে পারে এমন সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির রূপ ও প্রকৃতি এবং তারা কীভাবেই বা বাস্তবে তাদের কাজকর্ম চালায় সেটা খুঁটিয়ে বিচার করা বেশ দরকারি। জনসংখ্যার যে অংশটা পেশাগতভাবে সক্রিয় সাংস্কৃতিক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকে তাদের সঙ্গে দেশের মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগত সম্পর্কটা বিচার করাও প্রয়োজনীয়; আর যারা ঠিক লগ্ন নয় কিছুতে তাদেরও একটা আনুমানিক হিসাব থাকা চাই। কর্মসংস্থানের হিসেবে প্রত্যেক দেশেই সব স্তরের স্কুল ও ধর্মসংঘই সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক সংগঠন। তারপর আছে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র, বইয়ের বাণিজ্য এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে পড়বে হয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপূরক প্রতিষ্ঠান নতুবা গণ-বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য বৃত্তিতেও বৃত্তিগত বিশেষ কাজকর্মের মধ্যে একটা বড় অংশই থাকে সাংস্কৃতিক কাজকর্ম। যেমন ডাক্তার, সামরিক বাহিনীর অফিসার, আইনজীবী। কিন্তু এ-কথা খেয়াল রাখা দরকার যে. সব দেশেই, হয়তো কোথাও কম, কোথাও বেশি, সাধারণ জনগণ এবং বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান রয়েছে, এমনকী বৃহত্তম গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রেও এ-কথা সত্যি এবং যাঁরা জাতীয় জীবনের প্রত্যন্তের খুব সমীপবর্তী, যেমন পুরোহিত সম্প্রদায় ও স্কুলের শিক্ষকেরা, তাঁদের বেলাতেও। এর কারণ হল যে, শাসক সম্প্রদায় তার বিপরীতে যাই বলুন না কেন সাধারণভাবে রাষ্ট্রের চরিত্র কিন্তু একাত্মক, সুসংহত ও একমাত্রিক কিছু নয়, ফলত, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীগুলি ছড়িয়ে থাকে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে, অনেক

সময়ে এমনকী একই স্তরের মধ্যেও। সামান্য দু-একটা দেশ বাদ দিলে সংহতি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনো ভূমিকাই নেই। প্রায়শ দেখা যায় কোনো ব্যক্তিগত চিন্তাবিদের প্রভাব সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান-গুলোর থেকে বেশি, ইত্যাদি।

কর্মকাণ্ডের দর্শনের নিয়তিবাদী ব্যাখ্যার ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রসঙ্গে তার অন্তিম গাথা রচনার জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়; এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের কোনো এক কালে এর উপযোগিতার ওপরে জোর দিয়েও, এবং এর জন্যেই সব সম্মান প্রদর্শন করেও তাকে বর্জন করার ওপরও জোর দিতে হবে। আধুনিক পৃথিবীর সূত্রপাতে বিধির নির্বন্ধ ও ঈশ্বর-প্রসাদ তত্ত্বের যে ভূমিকা ছিল তার সঙ্গে এর ভূমিকা তুলনা করা যেতে পারে। এটা এমন এক তত্ত্ব যার পূর্ণ পরিণত রূপ আমরা দেখতে পাই ধ্রুপদী জর্মন দর্শনে এবং তার অন্তর্গত আবশ্যিকতার চৈতন্য হিসেবে গৃহীত স্বাধীনতার ধারণায়। জন-চৈতন্যে এটা 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' এই চিৎকারধ্বনির এক বদলি ধারণা, যদিও এই আদিম নিতান্ত সরল স্তরেও 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' বা ঈশ্বরপ্রসাদ তত্ত্বের তুলনায় তা অনেক বেশি আধুনিক ও সম্ভাবনাময়। এটা কি সম্ভব যে 'পোশাকি' অর্থে নতুন কোনো ধারণা সাধারণ মানুষজনের বোধগম্য এমন অ-সংস্কৃত মোটা দাগে ছাড়া অন্য কোনোভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে? তা সত্ত্বেও ইতিহাসবিদ তো ঠিকই তাঁর সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক্ষিতের সাহায্যেই এ জিনিসটা ধরতে পারেন যে নতুন একটা পৃথিবীর জন্মের সূত্রপাত হচ্ছে, সে পৃথিবী এখনো হয়তো ভাঙাচোরা, জোড়াতালি মার্কা, কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণা ও আর্তধ্বনির মধ্যে দিয়ে যে পৃথিবীর পালা ফুরিয়ে যাচ্ছে তার থেকে শ্রেয়তর।"

৫। 'নিয়তিবাদ' ও 'যান্ত্রিকতা'র অবসান একটা বড় ঐতিহাসিক দিকচিহ্ন মিরস্কির সারসংক্ষেপ এ-জন্যেই এত ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। যে-সব স্মৃতি জেগে ওঠে: ১৯১৭-র নভেম্বরে ফ্লোরেন্স-এ মারিয়ো ত্রেভঁস-র সঙ্গে এক আলোচনা মনে পড়ে, সেখানেই প্রথম বের্গসঁ-বাদ, স্বেচ্ছাবাদ ইত্যাদির উল্লেখ শুনি। এই ধারণা বাস্তবে কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল তার একটা আধা ভারিক্কি মেজাজের নকশা তৈরি করা যেতে পারে। ১৯২৪-এর জুনে রোমে অধ্যাপক প্রেসুত্তির সঙ্গে একটা আলোচনার কথাও মনে পড়ে। জি. এম. সেরাতি যে তুলনা করেছিলেন ক্যাপটেন জিউলেত্তির সঙ্গে সেটা কিন্তু তাঁর দিক থেকে চূড়ান্ত ছিল এবং মৃত্যু-দণ্ডাদেশ তুল্য। তাওবাদীর কাছে কনফুসিয়াসপন্থী যেমন, সেরাতির কাছে জিউলেত্তি ছিলেন ঠিক তেমন, বা উত্তরের ম্যান্ডারিন পণ্ডিতের দৃষ্টিতে ব্যস্তসমস্ত দক্ষিণী চীনা বণিক যেমন ঠিক তেমন; এই ম্যান্ডারিনরা তাঁদের আলোকোদ্ভাসিত ঋষিদৃষ্টির প্রবল অবজ্ঞায় ঐ দক্ষিণী ম্যানিকিনদের দিকে তাকাতেন যারা তাদের পিঁপড়ের মত ব্যস্ত চলাফেরায় 'রহস্য' করে ফেলতে চাইত; ঐ প্রজ্ঞাবানদের কাছে তো জীবনের আর কোনো রহস্য অজানা ছিল না।

পরিতাপের ওপর ক্লাউদিয়ো ত্রেভেস-এর বক্তৃতা। ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর কোনো প্রবক্তার মেজাজ যেন খানিকটা ছিল এই বক্তৃতায়। যারা যুদ্ধ চেয়েছিল এবং যুদ্ধটা বাধিয়েছিল, যারা পৃথিবী-টাকে যেন তার আংটা থেকে একেবারে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিল আর সেইজন্যই যারা যুদ্ধোত্তর ডামাডোলের জন্য দায়ী ছিল তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিছুটা করতেই হবে এবং ঐ বিশৃঙ্খলার দায়িত্বও তাদের নিতেই হবে। তারা তো 'স্বেচ্ছাবাদ'-এর দোষে দোষী এবং এ পাপের শাস্তি তাদের পেতেই হবে, ইত্যাদি। এই বক্তৃতায় যাজক-শোভন একটা জমক ছিল, আপৎবাণের এমন একটা তরঙ্গোৎক্ষেপ ছিল যাতে ভয়ে জমে যাবার কথা, কিন্তু তার বদলে এটা এক বড় সান্ত্বনা হিসেবে দেখা দিয়েছিল, কারণ এ-সবের মধ্যে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে ঘাতক তখনো ঠিক প্রস্তুত নয় এবং লাজারুস-এর উত্থান তখনও সম্ভব।

দর্শন ও ইতিহাসের সমস্যাবলি

[**সম্পাদকীয় ভূমিকা।** কর্মকাণ্ডের দর্শনের এক রূপরেখা প্রতিষ্ঠার দিকে এগোতে গিয়ে গ্রামশি 'দর্শন' কথাটিরই সংজ্ঞা নির্দেশ করতে চান। ক্রোচে ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন 'এতিকা' বা নৈতিকতার তথা নৈতিক আচরণের 'নর্মা' বা আদর্শমান রূপে। মানুষের নৈতিক বোধ বা আচরণ এবং মানুষের কর্মজীবন, এ দুয়ের মধ্যে কোনো কার্যকর সংযোগ ক্রোচে কার্যত অস্বীকার করেছিলেন। ক্রোচের সেই ধর্মের সংজ্ঞাকে পালটে নিয়ে গ্রামশি দর্শনের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন 'জীবনের আদর্শমান' ('নর্মা দি ভিতা') বলে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সতর্ক করে দেন, এই 'নর্মা' বা 'আদর্শমান' কোনো কেতাবি আদর্শ নয়, বরং বাস্তব জীবনে অনুসৃত মূল্যবোধের সমার্থক। মানবসমাজের বৃহত্তর বা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাঁদের জীবন-যাত্রা তথা বাস্তব জীবনকাণ্ডের আচরণে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকর্তব্যের যে বোধের দ্বারা চালিত হয়, তার মধ্যে স্বভাবতই জীবনের এক আদর্শ বা জীবনদর্শন নিহিত থাকে। দর্শন বলতে সাধারণত যাকে মানা হয়, তা কিন্তু এই জনজীবনযাত্রায় নিহিত বা প্রোথিত জীবনাদর্শ নয়। দর্শন বলতে আমরা সাধারণত বুঝি 'দার্শনিকদের দর্শনসমূহ' বা সেইসব দার্শনিক তত্ত্বের আনুপূর্বিক ইতিহাস। কার্যত এই দুই 'দর্শন'-এর মধ্যে যে সম্পর্ক, তার মধ্যেও রয়েছে এক ধরনের 'হেজিমনাইজেশন' বা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। দার্শনিকেরা তো মতাদর্শের স্তরে উদ্যোগ নিয়েছেন জনজীবনে নিহিত জীবনদর্শনকে 'বদলাতে, শোধরাতে বা তার

পূর্ণতা সাধন করতে' যার তাৎপর্য বা প্রভাব মতাদর্শের স্তরে সীমিত থাকে না, বরং সামগ্রিকভাবে মানুষের বা জনসমাজের বাস্তব ক্রিয়াকাণ্ড বা আচরণকেও পালটে দেয়। জনজীবন থেকে উৎসারিত দর্শন ও ব্যক্তি চিন্তকদের কল্পনা ও চিন্তায় রচিত দর্শন, এই দুয়ের মধ্যে গ্রামশি আরো একটি দর্শনের স্তর সংযোজন করেন, যাকে তিনি বলেন 'খুব সংকীর্ণ কোনো শাসক (কিংবা বুদ্ধিজীবী)-গোষ্ঠীর বিশ্ববোধ'। এই 'তৃতীয়' দর্শন কোনো একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বা কখনো হয়তো কোনো রাজনৈতিক দলেরই সেই পরিকল্পিত বিশ্ববোধ যা তারা জনমনে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট; ঐ দর্শনের জোরেই তারা জনসাধারণকে তাদের নেতৃত্বের ছত্রচ্ছায়ে সংগঠিত করতে প্রয়াসী। এই তৃতীয় দর্শন কার্যত প্রায়ই এক রাজনৈতিক কর্মসূচির অঙ্গ বা অবলম্বন। এই তিন দর্শনের বা দর্শনের এই তিন 'উপাদানের' 'সংযোগের প্রক্রিয়া' এবং সেই প্রক্রিয়ার পরিণতিস্বরূপ কোনো জনসমাজের সংঘবদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ডের এক বিশেষ চারিত্র্য পরিগ্রহণের ইতিহাসই যথার্থ 'দর্শনের ইতিহাস'। গ্রামশি-র দৃষ্টিতে এইভাবেই দর্শন ইতিহাস হয়ে যায়, ইতিহাস দর্শনকেই যেন রূপায়িত করে। দর্শনের ঐ তিন উপাদানের 'সংযোগের প্রক্রিয়ায়' যে দর্শন উদ্ভূত হয় তা একটি সমাজ-বিশেষের 'আত্মপ্রকাশ', এবং তার সেই আত্মপ্রকাশ যখন একটি স্পষ্ট তাত্ত্বিক চরিত্র লাভ করে, তখন সেই মতাদর্শ সমাজের প্রত্যক্ষ চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে।

আঠারো-উনিশ শতক জুড়ে ইয়োরোপীয় ভাববাদী দর্শনের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপস্থিত করে গ্রামশি দেখান যে ধ্রুপদী জর্মন দর্শনই প্রথম দর্শনকে এক 'সৃজনশীল' ভূমিকা তথা প্রভাবক্ষম ভূমিকা দেয়। 'কর্মকাণ্ডের দর্শন' সেই বিন্দু থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গিয়ে ভাববাদী দর্শনের স্বভাবজাত স্বজ্ঞাবাদ পরিহার করে চিন্তনকে ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করে, ইতিহাসের চালিকাশক্তির মর্যাদাও দেয়। ভাববাদী দর্শন যখন বস্তুলোকের ঊর্ধ্বে চিন্তনকে স্থান দেয়, তখন স্বজ্ঞাবাদের প্রবণতা এসে পড়ে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই জ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠতে থাকে। ক্রোচে এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই 'নান্দনিক', 'যুক্তিনির্ভর' ও 'কর্মাভিমুখী' এই তিন ধরনের ক্রিয়ার এক ক্রমান্বয় কল্পনা করেছিলেন যাতে প্রায় অনিবার্যভাবেই মানুষ তার ব্যক্তিগত সুখের আর্তির তীব্রতা থেকেই মানবসমাজেরই একজন বলে নিজেকে উপলব্ধি করে এবং সেই উপলব্ধি থেকেই তার ইচ্ছাশক্তি সমগ্র মানবসমাজের সুখ বা কল্যাণের দিকে ধাবিত হয়। গ্রামশির বৌদ্ধিক আত্মোপলব্ধির ইতিহাসের আদিপর্বে ক্রোচের প্রভাবেরই চিহ্ন বহন করছে দর্শন ও ইতিহাসের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে গ্রামশির এই ভাবনা। সৃজনশীল দর্শনের এই স্বরূপ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই দার্শনিকের যে নতুন সংজ্ঞা রচনা করতে হয় তাতে দার্শনিকের ভূমিকা যেমন বিশেষজ্ঞদের মতোই হয়ে পড়ে তেমনি আবার

অন্য ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের চেয়ে 'একটু বেশি রকম যেন অন্য মানুষদের মতোই' থেকে যায়। কারণ, মানুষ মাত্রই তার বুদ্ধির সহজাত ক্রিয়ার তাড়নায়ই দর্শনের চিন্তার দিকে যায় এবং সেই তাড়নারই আত্যন্তিক তীব্রতায় কোনো কোনো মানুষ দার্শনিক হয়ে ওঠেন।

সাধারণ মানবসমাজেব দিনানুদৈনিক জীবনধারণ ও আচার-আচরণের মধ্যে যে কাণ্ডজ্ঞান সক্রিয় থাকে, তারই মধ্যে দর্শনের বীজ নিহিত—এই থেকেই ব্যবহারিকতাবাদী দর্শনের কথা এসে পড়ে এবং এই দর্শন-প্রসূত ভাষাচিন্তার কথাও এসে পড়ে। ব্যবহারিকতাবাদ বা প্রয়োগবাদের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে—সি. এস পার্স (১৮৩৯-১৯১৪)-এর ভাবনাচিন্তাকে ভিত্তি করে উইলিয়ম জেম্‌স্ (১৮৪২-১৯১০)-এর তত্ত্বধারণায়। জেম্‌স্ কোনো পরম সত্য মানতে রাজি নন। তাঁর মতে ধারণা তখনই সত্য হযে ওঠে যখন তা আমাদের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন প্রদেশ বা খণ্ডের মধ্যে সন্তোষ-জনক সম্পর্ক রচনায আমাদের সহায় হয়। জীবনযাত্রার প্রক্রিয়ায় কোনো ধারণার কার্যকরতায় তার সত্য বা যাথার্থ্য নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ যে-ধারণা মানুষের জীবনযাত্রায় সত্যিই কাজ দেয় বা কাজে লাগে তাকেই জেম্‌স্ সত্য বলে মানবেন। গ্রামশি যাকে 'কাণ্ডজ্ঞান' বলছেন তার সঙ্গে ব্যবহারি-কতাবাদের প্রবক্তাদের 'সত্য'-এর একটা নৈকট্য আছে। ইতালিতে ব্যবহারি-কতাবাদের আবির্ভাব ঘটে জ্যভান্নি ভাইলাতি (১৮৬৩-১৯০৯)-র রচনায়। সমাজতাত্ত্বিক পারেতো-ও ব্যবহারিকতাবাদের প্রভাবে প্রভাবিত হন। ভাইলাতি ও ইতালীয় ব্যবহারিকতাবাদীরা তাঁদের দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতেই ভাষাকে একটা অন্য তাৎপর্য দেন। ইংরেজিতে যেখানে আমরা 'ল্যাংগুয়েজ' বা বাংলায় যেখানে আমরা 'ভাষা' শব্দটি ব্যবহার করছি, ইতালীয় ব্যবহারি-কতাবাদীরা ও গ্রামশি সেখানে দুটি পৃথক ইতালীয় শব্দ ব্যবহার করেন: 'লিংগুয়া' (আমরা যার অনুবাদ করেছি 'নির্দিষ্ট ভাষা') ও 'লিংগুয়াদজো' (আমরা যার অনুবাদ করছি 'সাধারণভাবে ভাষা')। 'লিংগুয়া' বলতে বোঝাচ্ছে ভাষাবিশেষের সমগ্র নিয়ম-নীতি, বিন্যাস, ব্যাকরণের সমন্বয়ে একটি বিশেষ ভাষার চরিত্র, বা বাংলা বা ইংরেজির মতো একটি নির্দিষ্ট ভাষা। 'লিংগুয়াদজো' বলতে বোঝাচ্ছে শব্দবন্ধে বা অন্যভাবে কোনো একটি সাধারণ্যে স্বীকৃত সূত্র ধরে কোনো বার্তা কাউকে পৌঁছে দেওয়ার পদ্ধতি বা ক্ষমতা। 'লিংগুয়াদজো' অর্থেই 'ভাষা' 'প্রকৃত অর্থে সামাজিক', তার 'দ্যোতনার মধ্যে সংস্কৃতি ও দর্শনও এসে পড়ে (হয়তো মাত্র কাণ্ড-জ্ঞানের স্তরেই)'—'বাঙময় প্রতিটি সত্তারই নিজের চিন্তা ও অনুভবের ভঙ্গি।' ভাষার শবিজ্ঞানের নামে শব্দবিদ্যার শৌখিন চর্চায় না নেমে গ্রামশি ভাষার এক 'সমালোচনাত্মক ও ইতিহাসাত্মক' ধারণা আশ্রয় করেছেন। ভাষাকে গ্রামশি যখন 'প্রকৃত অর্থে সামগ্রিক' বলেন, তখন তিনি ভাষার একাধারে সামাজিক ও দ্বান্দ্বিক মাত্রার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। কোনো বিশেষ ভাষার মধ্যে ব্যক্তিক ভাষা ও সামাজিক ভাষার মধ্যে এক

দ্বান্দ্বিকতার ক্রিয়া চলে। ব্যক্তিক ভাষার উপাদান সামাজিক ভাষা যেমন আত্মস্থ করে নেয়, তেমনি আবার সামাজিক ভাষা তার সংস্কার চাপিয়ে দেয় ব্যক্তির ভাষার উপর এমনভাবেই যে ব্যক্তি তার আত্মপ্রকাশে ব্যাহত হয়। এক একটা পাকাপোক্ত সামাজিক সংস্কার ভাষার মধ্যেই এমনভাবে চেপে বসে গেছে যে ঐ সমাজান্তর্গত মানুষ ভাষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই যেন ঐ সংস্কারগুলিকে প্রায়ই মেনে নেয়। এরই মধ্যে আবার এসে পড়ে এক একটি সামাজিক গোষ্ঠী বা শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ভাষার ব্যবহার। যে-কোনো ভাষায় যে ভাষাগত স্তরায়ন লক্ষ করা যায়, গ্রামশি তার মধ্যে সামাজিক স্তরায়নের ছবি দেখতে পান। প্রত্যেক বিশেষ ভাষার মধ্যেই থাকে বিভিন্ন শ্রেণীর ভাষা—বিভিন্ন শব্দ, শব্দবন্ধ, বাক্‌ভঙ্গি, এমনকী কথা বলার ধরনও এক একটি শ্রেণীর জাতিলক্ষণ বহন করে। স্বভাবতই যখন কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণী অন্য গোষ্ঠী বা শ্রেণীগুলিকে তার আধিপত্যের অখণ্ডতার মধ্যে নিয়ে আসতে উদ্যোগী হয়, তখন তার নিজস্ব ভাষাকেই সেই আধিপত্যকামী গোষ্ঠী তার সংস্কৃতির বাহন ও ধারক-রূপে অন্য গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিস্তার করতে থাকে। ভাষার মধ্য দিয়েই তার সংস্কৃতি অন্য গোষ্ঠীগুলিকে প্রায় তাদের অজান্তেই পরবশ করে ফেলে।

আধিপত্যের বিস্তার থেকেই 'সাংস্কৃতিক-সামাজিক' ঐক্য, সেই ঐক্য থেকেই 'ঐতিহাসিক কোনো কর্ম'-এর যে-সম্ভাবনা গ্রামশি নির্দেশ করেন তা বস্তুত বিপ্লব তথা ঐতিহাসিক রূপান্তরেরই সম্ভাবনা। এই সূত্রে গ্রামশি যখন 'পাস্‌সিওনে' বা 'প্যাশন' কথাটি (আমরা যার অনুবাদ করেছি 'দীপ্ত বাসনা') ব্যবহার করেন, তখন তিনি ক্রোচের ব্যবহারে ঐ কথাটির অনুষঙ্গ স্বভাবতই টেনে আনেন। ক্রোচের প্রয়োগে 'পাস্‌সিওনে' কথাটি সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় একান্তভাবেই বিষয়ীগত আবেগপ্রবণতারই দ্যোতক। ক্রোচে কথাটি ব্যবহার করেন নিন্দাকল্পেই। যেমন, তিনি বলেন, রাজনীতি কেবলমাত্রই 'পাস্‌সিওনে': গ্রামশি-র দৃষ্টিতে রাজনীতি মানবজীবনের একেবারে কেন্দ্রে সজীব এক প্রাণবিন্দুস্বরূপ। 'আধুনিক রাজকুমার' নামে তাঁর রচনায় গ্রামশি ক্রোচে-র 'পাস্‌সিওনে' কথাটির প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাজনৈতিক আবেগ বা 'দীপ্ত বাসনা'কে ক্রোচে তাৎক্ষণিক ও অস্থায়ী বললে গ্রামশি সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তোলেন: তাহলে রাজনৈতিক দল কীভাবে সংগঠিত হতে পারে বা হয়ে থাকে? 'পাস্‌সিওনে' 'স্থায়ীভাবে সংগঠিত' হতে পারে ধরে নিলে তো শেষ পর্যন্ত তা আর 'পাস্‌সিওনে' থাকবে না, হয়ে যাবে 'যুক্তি ও সচেতন বিচার'। অথচ বৈপ্লবিক বিশ্বাসের 'পাস্‌সিওনে', কোনো চূড়ান্ত মুক্তি-লক্ষ্যে আবেগ-বলিষ্ঠ আস্থা তথা 'পাস্‌সিওনে' ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন এগোবে কী করে? এই সমস্যার চমৎকার সমাধান করেন গ্রামশি: 'রাজ-নীতি অর্থনীতির সঙ্গে যখনই একাত্ম হতে পারে তখনই তা স্থায়ী কর্ম-

প্রযাসে রূপান্তরিত হয়, স্থায়ী সংগঠনের জন্ম দেয়। অথচ তখনও রাজনীতি অর্থনীতি থেকে স্বতন্ত্র থাকে। তাই স্বভাবতই অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করা যায়। "রাজনৈতিক পাস্‌সিওনে"-কে বর্ণনা করা যায় এমন এক তাৎক্ষণিক কর্মাভিমুখী প্রণোদনারূপে যার জন্ম অর্থনৈতিক জীবনের "স্থায়ী এ জৈব" ভূমিতে, অথচ যা ঐ ভূমিকে অতিক্রম করে এমন সব আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ছড়িয়ে দেয় যার দীপ্ত আবহে ব্যক্তিমানুষেব জীবন জড়িয়ে যে হিসেবিপনা কাজ করে থাকে তাও আর ব্যক্তিগত লাভক্ষতি ইত্যাদির আইন মানে না।'

এই 'পাস্‌সিওনে', যার সূত্রপাত মানবিক আবেগে, অথচ উত্তরণ ঘটে রাজনৈতিক 'প্রাক্‌সিস্‌' বা কর্মকাণ্ডে, তার এই বিবর্তনে সমাজবোধে উদ্‌বুদ্ধ দার্শনিকের ভূমিকাকে গ্রামশি বর্ণনা করেন শিক্ষাগত সম্পর্কেব সূত্রে; এই যে দার্শনিককে গ্রামশি 'গণতান্ত্রিক দার্শনিক' বলে অভিহিত করেন, তিনি একদিকে যেমন তাব সমগ্র 'সাংস্কৃতিক' পরিবেশকে তাঁব 'শিক্ষক' বলে মানেন (গ্রামশি অবশ্য আগেই আধুনিক শিক্ষাচিন্তার বিধি মেনে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ককে 'সক্রিয ও পারস্পরিক' বলে নির্দেশ করেছেন), তেমনি আবাব এই সংস্কৃতির সঙ্গে 'সক্রিয় সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে' তার 'রূপান্তরে' সচেষ্ট থাকেন। এইভাবেই দর্শন ইতিহাস হয়ে ওঠে। নিম্নবর্গ সমাজেবই আত্মীয়রূপে ঐ দার্শনিক সংস্কৃতিকে দেখবেন, বিচার করবেন, তাকে প্রভাবিত করে তাব উপর নিম্নবর্গ শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তার কববেন। একেই গ্রামশি বলেন 'বিজ্ঞান ও জীবনের · সক্রিয় ঐক্য'।

'বিজ্ঞান ও জীবনের' এই 'সক্রিয়' বা দ্বান্দ্বিক ঐক্য থেকেই গ্রামশি মানুষের সংজ্ঞা সন্ধান করেন। ইতিহাসেব পরিণতিস্বরূপ কোনো বিশেষ বর্তমানে মানুষ যে-চরিত্র পরিগ্রহ করেছে তারই পরিপ্রেক্ষিত থেকে মানুষ কীভাবে নিজেকে নতুন করে গঠন করবে, মানুষ বড় হয়ে উঠবার সংগঠিত চেষ্টা করবে, তা-ই বিচার করে দেখতে গেলে মানুষকে দেখা যাবে 'সক্রিয় সম্পর্কের একটা পর্যায় (একটা প্রক্রিয়া) হিসেবে।' গ্রামশি যখন বলেন যে কারো ব্যক্তিত্ব শেষ পর্যন্ত অন্য মানুষ ও প্রকৃতিলোকের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির যাবতীয় সক্রিয় সম্পর্কের 'সমাহার' মাত্র, তখন তার আড়ালে শোনা যায় মার্কস-এর কণ্ঠস্বর। বিশেষত ১৮৪৫ সালে লেখা মার্কস্‌-এর 'ফয়এরবাখ্‌ বিষয়ে সিদ্ধান্ত সমূহ'; যার মধ্যে বৈপ্লবিক 'প্রাক্‌সিস্‌' বা কর্মকাণ্ডবেই মার্কস্‌ ধরেছেন মানবিক ক্রিয়া তথা তার আত্মরূপান্তর এবং সমগ্র পরিবেশ বা পরিস্থিতিব রূপান্তরের ভিত্তিরূপে। এই পর্যায়ের ষষ্ঠ সিদ্ধান্তে মার্কস্ বলেন: 'মানবধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনো নির্বস্তুক সত্তা নয়, বাস্তবে তা হল যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কের সমাহার।' নব্য বস্তুবাদের 'আদর্শগত ভিত্তি হল মানবসমাজ বা সামাজিক মানবতা।' এই 'সিদ্ধান্তসমূহেরই' একাদশতম সিদ্ধান্ত: 'দার্শনিকেরা কেবল পৃথিবীর ব্যাখ্যাই দিয়েছেন নানাভাবে; আসল লক্ষ্য হবে তাকে পাল্টানো।'

প্রত্যেক মানুষই তার অন্তর্নিহিত যে তিনটি মানবিক উপাদান—ব্যক্তি নিজে, অন্য মানুষ তথা বৃহত্তর মানবসমাজ ও প্রকৃতিলোক—নিয়ে, তার সব কটির সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্ক সৃষ্টি করে নিজেকে প্রতিনিয়ত গড়ে চলেছে তার সব কটিকেই এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাদের নিয়ে মানুষের সব কর্মকাণ্ডই রোমক ক্যাথলিক ধর্ম অস্বীকার করে। ক্যাথলিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রথম মানুষ আদম ও ইভ-এর অবাধ্যতার পাপ রক্তে নিয়েই প্রত্যেক আধুনিক মানুষের জন্ম। সম্পূর্ণ বিশ্বাসে 'ঈশ্বরকে জানা, ভালোবাসতে শেখা ও তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করাই' ইহলোকে মানুষের একমাত্র কর্তব্য। খ্রিস্ট বলেন: 'প্রথমেই খোঁজ ঈশ্বরের মহারাজত্ব, এবং তাঁর ন্যায়বিচার, তারপর এই-সবকিছু আপনা থেকেই তোমার আয়ত্ত হবে' ('ম্যাথিউ', ৬.৩৩)। ইতালীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ক্যাথলিসিজ্‌ম্‌ এমনভাবেই প্রতিষ্ঠিত যে গ্রামশি-কে স্বভাবতই ঈশ্বরনির্ভর মানুষের আদর্শ ভেঙে স্বনির্ভর-ইতিহাসনির্ভর ও সক্রিয়-পরিবর্তনমুখী মানুষের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে অনেকটা সময় দিতে হয়। আদিপাপের ভার ও ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ও তারই মধ্য দিয়ে পাপবিমোচনের দায় চাপিয়ে দিয়ে মানুষকে ক্যাথলিকবাদ একান্তভাবেই পূর্বনির্ধারিত ও সীমিত রূপে কল্পনা করেছে। ক্যাথলিকবাদের এই সিদ্ধান্তেরই প্রতিফলন গ্রামশি দেখেছেন তাবৎ দর্শনের মধ্যে, কারণ এইসব দর্শনেও 'মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বের সীমার মধ্যেই সীমিত, এবং এই ব্যক্তিত্বও তার মানবসত্তার নামান্তর মাত্র।' পরিবর্তমান ইতিহাসকে অস্বীকার করে কোনো চিরন্তন, অনড় সম্পর্কের জটাজালে মানুষকে আবদ্ধ করার মতাদর্শের উৎস গ্রামশি দেখেছেন ক্যাথলিকবাদে।

দর্শনকে গ্রামশি যে নতুন তাৎপর্য দেন, তাতে মানবসমাজ, বস্তুসমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ককে তিনি সতত সজীব ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রত বিবেচনা করেন, এই ক্রমাগত ক্রিয়মাণতার 'উৎস' সচেতন মানুষের চেতনায়—যে-মানুষ অন্য মানুষ ও বস্তুসমুদায়ের মধ্যে ও তাদের সঙ্গে তার নিজের সম্পর্কের মধ্যে সমাজের ও নিজের রূপান্তরের সম্ভাবনা লক্ষ করে। শুধু লক্ষ করে তা-ই নয়, অন্য মানুষের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হয়, আর তখনই দর্শন থেকে বিজ্ঞানে উত্তরণ ঘটে। জ্ঞান তার স্বাভাবিক গতিতেই বিজ্ঞানমুখী তথা প্রয়োগমুখী হয়ে উঠে বৈপ্লবিক হয়ে ওঠে।

মানুষের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে দু-ধরনের ভুলের কথাই বলেছেন গ্রামশি। দুটিই অতিসরলীকরণ দোষে দুষ্ট। দুটিই অনেক সময় মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। একদিকে মানুষের সামাজিক জীবন বা সত্তার কোনো উপাদানকে অহেতুক গুরুত্ব দিয়ে তাকে চূড়ান্ত নিয়ামক শক্তি ধরে নেওয়া হয়। অন্যদিকে কোনো নির্বস্তুক একক মানবিক লক্ষণকে মানুষের অভিধার মর্যাদা দেওয়া হয়। প্রথম ভ্রান্তির দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রামশি জর্মন

দার্শনিক লুডভিগ ফয়এরবাখ্ (১৮৩৪-৭২)-এর মানুষের খাদ্যাভ্যাস থেকে মানুষের স্বধর্মের সন্ধান বা আমাদেও বোরদিগা-র সেই অনুমান যে কোনো বক্তা কোনো ভাষণদান করার আগে বাড়ি থেকে কী খেয়ে এসেছেন তা জানা গেলেই তার ভাষণের যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করা যাবে, এই দুটির উল্লেখ করেন। পাশাপাশি ইতালীয় খাদ্যাভ্যাসে জর্মন নুড্‌ল্‌স্‌-এর অনুপ্রবেশ থেকে ইতালীয় জাতীয় চরিত্রের অবনতি বিষয়ে ফিউচারিস্ট কবি-শিল্পী ফিলিপো তোমাসো মারিনেত্তির (১৮৭৫-১৯৪৪) ছেলে-মানুষি সিদ্ধান্ত ও নুড্‌ল্‌স্‌-এর সপক্ষে বনতেমপেল্লির ততোধিক ছেলে-মানুষি যুক্তি বিচারেও ঐ একই ধরনের সস্তা 'নৃতত্ত্বের' প্রকাশ। বরং মানবপ্রকৃতি বলে যদি কিছু মানতেই হয়, গ্রামশি তাকে ইতিহাস বলে মানবেন। কারণ তবেই মানুষের অবিরাম 'হয়ে ওঠার' প্রক্রিয়াটা ধরা যাবে। 'সামাজিক সম্পর্কের জটিল বিন্যাসই' মানবপ্রকৃতি। সামাজিক সম্পর্ক বলতে অন্য মানুষ বা অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা যেই উঠেছে সমাজান্তর্গত বিভিন্ন বর্গ বা গোষ্ঠীর মধ্যে 'দ্বান্দ্বিক' ঐক্যের কথাও তখনই এসে পড়েছে। ভূমিদাস বা নিম্নবর্গ শ্রেণী আছে বলেই অভিজাত শ্রেণীও আছে। একে অন্যের সঙ্গে শ্রেণীদ্বন্দ্বেই তার নিজস্ব চরিত্র বা ভূমিকা পরিগ্রহ করে। এই ভূমিকায় তারা সংঘাতের মধ্য দিয়েই ঐক্যে বা সমন্বয়ে পেঁছিতে সচেষ্ট হয়। সেই পথ ধরেই ইতিহাস আবর্তিত হয়। ইতিহাসের এই ধারার মধ্যেই দর্শন রাজনীতি হয়ে ওঠে, রাজনীতি দর্শনের জন্ম দেয়। তেমনিই 'হয়ে ওঠার' মধ্যে প্রগতির মতাদর্শ জন্ম নেয়, আবার ঐ প্রগতির মতাদর্শ 'হয়ে ওঠা'কে প্রভাবিত করে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেণ্ট বা জ্ঞানকাণ্ডের সমগ্র চিন্তা-ভাবনার মধ্যেই প্রগতির ধারণাটি দানা বেঁধে ওঠে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য, সমাজের সামগ্রিক বা সর্বাত্মক অগ্রগতি বা উন্নতি, এই অর্থে ইং-রেজিতে 'প্রোগ্রেস' শব্দের প্রথম ব্যবহার ১৬০৩ সালে : দ্র. 'শর্টার অক্‌স্‌-ফোর্ড ডিকশনারি'।) বস্তুত ঐ সময় থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত বিজ্ঞানের অব্যাহত জয়যাত্রায় প্রকৃতির উপর মানুষের অধিকার যতই নিশ্চিত হয়েছে ততই প্রগতির এই ধারণাটি গড়ে উঠেছে। এই ধারণা বলতে মানবজাতির ভবিষ্যৎ তথা মানুষের সর্বাত্মক বিকাশ বিজ্ঞান ও যুক্তির প্রয়োগেই বাস্তবায়িত হবে, এই বিশ্বাস। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে গণতন্ত্রের আদর্শ ও সাধনা শাসনতন্ত্রের স্তরে প্রগতির সমার্থক হয়ে ওঠে। পাশাপাশি জ্যাকোমো লেওপার্দি'র (১৭৯৮-১৮৩৭) মতো কবিরা মানুষের এই বিশ্বাসকে মানুষের অহেতুক দম্ভের পরিচায়ক বিবেচনা করেছেন। 'লা জিনেসত্রা' নামে তাঁর বিখ্যাত কবিতায় তিনি ভিসুভিয়স আগ্নেয়গিরির গায়ে জিনেসত্রা ফুলের ঝোপ লক্ষ করে তাদেরই সম্বোধন করে ভিসুভিয়সের বৈনাশিক শক্তিকেই যেন আরাধনা করেন। অগ্ন্যুৎপাতে বিনষ্ট নগরীর ধ্বংসস্তূপের উপর মরুভূমির বিস্তারে তিনি দেখতে পান

'মানবজাতির চমৎকার প্রগতিশীল নিয়তি'। এই মানবজাতিকে সম্বোধন করে তিনি বলেন : 'তাকিয়ে দেখ, দেখ দর্পণে নিজেকে, আত্মগর্বী, নির্বোধ শতাব্দী, তোমরা সেই পথ ত্যাগ করেছ যা এতকাল তোমাদের নিয়ে গেছে সম্মুখের দিকেই। · · তোমরা স্বপ্ন দেখ মুক্তির, তোমরা চাও তোমাদের চিন্তা কেবল এই একই যুগের বশ হবে, যে-চিন্তার ক্ষেত্রেই কেবল আমরা বর্বর যুগের চেয়ে আজ সামান্য ঊর্ধ্বে'।··· অথচ নির্মম নিয়তি আর প্রকৃতি যে নিম্নাসনে বসিয়েছে তোমাদের, তার সত্য কী ক্লেশবহ !' এন্-লাইটেনমেণ্ট-এর পথ ধরেই বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিকাশ এগিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল, জর্মনি, ইতালি ও স্পেনে ফ্যাশিবাদ মাথা চাড়া দিয়েছিল, তখনও কিন্তু গ্রামশি 'প্রগতি'র সম্ভাবনা বা 'যুক্তির প্রয়োগে প্রকৃতি ও দুর্দৈবকে শাসন করার সম্ভাবনায়' আস্থা হারান না। বরং যে-শ্রেণী তখন প্রগতির 'সরকারি ধ্বজাবাহী' তাদেরই মতাদর্শগত অপারগতাকে দায়ী করেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরই ব্যর্থতার কারণে প্রগতির ধারণার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদী প্রচার ও রক্ষণশীলতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে তিনি 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও স্বার্থবুদ্ধিসঞ্জাত' বলে চিহ্নিত করেন।

প্রগতির আদি ধারণা বা বিশ্বাসের যে-শক্তি বিংশ শতাব্দীর এই পর্বে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংকটে হীনবল হয়ে পড়ছিল, তাকে পুনর্বলীয়ান করার একটা পথ গ্রামশি দেখতে পান প্রগতির সঙ্গে 'হয়ে ওঠা'র দার্শনিক কল্পনাকে যুক্ত করার মধ্যে। কারণ 'হয়ে ওঠা'র মধ্যে নিহিত আছে 'প্রগতির সবচেয়ে প্রমূর্ত অংশ—গতি এবং বস্তুত দ্বান্দ্বিক গতি'। মনুষ্য-প্রকৃতি কোনো নির্দিষ্ট লক্ষণাবলির সমাহার নয়, বরং 'ভবন' বা 'হয়ে ওঠা'র এক ক্রমাগত পারম্পর্যের মধ্যে বিধৃত, এই বোধ প্রগতির সম্ভাবনাকে তুলে ধরে, সেই সম্ভাবনা ও বর্তমান বাস্তবের মধ্যে যে ফাঁক, তাকেও প্রকট করে ('মানুষ যে খিদের তাড়নায় মারা যাবে না এই বস্তুগত সম্ভাবনা আর মানুষ যে বস্তুত খিদের তাড়নায় মারা যায়') মানুষের ধারণার মধ্যে যে 'স্বাধীনতার মাত্রা' এনে দেয়, তাই 'বিমূর্ত ইচ্ছা বা একান্ত প্রণোদনা'-রূপে মানুষকে তাড়না করে, যার মধ্য দিয়ে মানুষ বৈপ্লবিক ভূমিকায় অঙ্গীকার-বদ্ধ মানবগোষ্ঠী তথা 'প্রমূর্ত ইচ্ছাশক্তি' হয়ে ওঠে। 'ভবন' বা 'হয়ে ওঠা' থেকে প্রগতির এই উন্মেষ দেখাতে গিয়ে গ্রামশি আবার বের্গসঁ-র 'একান্ত প্রণোদনা বা ইচ্ছা'কে নিয়ে আসেন, এই প্রক্রিয়ার সাংস্কৃতিক বা সামূহিক আবেগগত মাত্রাটি স্পষ্ট করে তুলতে। একটু হয়ত বেশি সরল করে বলতে গেলে, 'ভবনের' বা 'হয়ে ওঠা'র অন্তহীন সম্ভাবনা মানুষের মনে মানুষের ভবিষ্যৎকে আরো মানবিক এক আকাঙ্ক্ষা বা আর্তি'র মাত্রা দেয়। তাকে বাস্তবায়িত করার তাগিদেই মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে সংঘ-বদ্ধ হয়। অন্য মানুষের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের 'রূপান্তরিত করে নির্দিষ্ট দিকে চালিত করতে গিয়ে মানুষ 'রাজনৈতিক' ভূমিকা গ্রহণ করে

এবং সেই 'রাজনৈতিক' ভূমিকার মধ্য দিয়েই সে তার 'নিজের "মানবতা", তার "মনুষ্যপ্রকৃতি"কে অর্জন করে।'

ইয়োরোপীয় নবজাগৃতির কালে 'মানবতা' ও 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল, দুয়েরই ভিত্তি ছিল এক নব-বিশ্ববোধ যা পৃথিবীর বাইরে কল্পিত কোনো নীতি বা প্রণোদনায় ইতিহাসের চালিকাশক্তির সন্ধান না করে পৃথিবীর মধ্যেই সেই চালিকাশক্তিকে খুঁজতে চেয়েছে। ধর্মসংঘ, ধর্মীয় নীতিবোধ ও পরলোকমোহ ইয়োরোপীয় মধ্যযুগে যে ত্রাসে জনগণকে নিমজ্জিত করেছিল, তা থেকে মুক্তির প্রথম উদ্দীপনায় নবজাগৃতি ব্যক্তি-মানুষকে যে নতুন মর্যাদা দেয় তাতেই লোকোত্তরবাদ থেকে নিহিতার্থবাদে উত্তরণের সূচনা ঘটে। পিকো দেলা মিরানদোলা (১৪৬৩-৯৪) প্রাণীদের ঊর্ধ্বাধঃ ক্রমসারণীতে মানুষকে স্থাপন করেছিলেন সারণীর মধ্যপ্রদেশে, যেখানে মানুষের রয়েছে সেই স্বাধীনতা তথা সম্ভাবনা যাতে সে পশুর স্তরে অধোগামী হতে পারে, আবার ঊর্ধ্বগামী হয়ে 'সেই উন্নততর স্তর যা দেবাংশী সেখানে পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে।' পিকো বলেন, মানুষ এমনভাবেই 'তার আপন সত্তার নির্মাতা ও রূপায়ক যে সে তার ইচ্ছামতো যে-কোনো রূপে নিজেকে পালটে গড়ে নিতে পারে।' এইভাবে ঊর্ধ্ব-গমনের চরম বিন্দুতে পৌঁছে মানুষ যে 'আলোকদ্যুতি' ও 'মাদকতায়' আচ্ছন্ন হয় তা-ই তাকে দেবত্বে পৌঁছে দেয়। 'বর্ণনাতীত সেই প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে, দৈবশক্তির বলে বলীয়ান আমরা আর আমরা থাকব না, আমরা হয়ে যাব স্বয়ং তিনি যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন।' [দ্র. পিকো দেলা মিরানদোলা, 'মানুষের মর্যাদা বিষয়ে ভাষণ', আর্নস্ট্ কাসিরার, পল অস্কার ক্রিসটেলর ও জন হারমান র‍্যানডাল সম্পাদিত 'দ্য রেনেসাঁস ফিলজফি অফ ম্যান', শিকাগো ১৯৬৩।] পরবর্তীকালে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদ পুঁজিবাদের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। খ্রিস্টধর্ম ইহলোককে কেবল-মাত্র পাপস্খালন ও অনুতাপের জন্য নির্দিষ্ট করে মানুষকে পরলোকমুখী করে তুলেছিল। রেনেসাঁস ও রেফরমেশন সেই সংস্কারকে নাড়া দিতে পেরেছিল। তাতেই প্রথম অঁত্রপ্রেনর-রা এগিয়ে আসতে পেরেছিলেন। তারপর যখন 'ধনের উৎপাদন ক্রমশ আরো বেশি করে সামাজিক প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে' তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তার ঐতিহাসিক ভূমিকা হারিয়ে ইতি-হাসের স্বাভাবিক ধারায় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ঐহিক ঝোঁককে ইতালীয় ক্যাথলিকেরা আক্রমণ করলে গ্রামশি স্মরণ করিয়ে দেন যে রোমক ক্যাথলিক ধর্মসংঘ যখন শুধু ইতালিতে নয়, ইয়োরোপের বিরাট অংশ জুড়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত তখনই তাঁরা মেনে নিয়েছেন যে কেবলমাত্র সম্পত্তির অধিকারেই মানুষ ভোটদানের অধিকার পাবে; অর্থাৎ, তাঁরা মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন পার্থিব সম্পত্তির অধিকারে। তাঁরা এইভাবে মেনে নিয়েছেন যে মানুষের পূর্ণতা তার মানস-সত্তার অর্জনে বা গুণে নয়, বরং সমাজে তার স্থানের

গুণে, মানুষ ও তার বহিঃস্থ 'জড়শক্তিগুলির ঐক্যবোধের মধ্যে'। এই ক্যাথলিক অবস্থান থেকে গ্রামশি যুক্তি আহরণ করেন ; সেই যুক্তির প্রস্থানভূমি থেকে পৌঁছে যান তাঁর সিদ্ধান্তে : 'তাই ব্যক্তিত্ব জয় করবার পথে জড়শক্তির উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা তো একটা উপায়, হয়তো সর্বোত্তম উপায়।'

মানুষের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পর্যায়ের মধ্য থেকে উঠে এসেছে। ইয়োরোপীয় নবজাগৃতি ও পুঁজি সঞ্চয়ের কালে যেমন মানুষের ঊর্ধ্বগমন ও অধোগমনের অবাধ সম্ভাবনা মানুষের সংজ্ঞার ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি আবার অষ্টাদশ শতকে যখন অঁত্রেপ্রেনররা বাজারে প্রথম নেমেছেন, ভূম্যধিকারী অভিজাতদের ক্ষমতায়-অধিকারে চিড় ধরিয়ে রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে নিতে চাইছেন, তখন ফরাসি বস্তুবাদীরা জীববিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়েছেন, মানুষকে 'সাম্যের' মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে। তখনই তৈরি হয়েছে সেই যুক্তি যে, সব মানুষই জন্মকালে উলঙ্গ হয়েই জন্মায়, তখন মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। তারপর যখন সেই উলঙ্গ শিশুর গায়ে পোশাক চড়ানো হয়, তখনই ধরা পড়ে তার জনক-জননীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান। যুক্তিবিচারের সহজাত যে ক্ষমতা সকল মানুষেরই আয়ত্ত, তাকে এই বস্তুবাদী দার্শনিকেরা স্বীকৃতি দিয়ে যখন তাকে মানবলক্ষণ বলেই চিহ্নিত করেন, তখন স্বভাবতই দর্শন গণতন্ত্রের ধারক হয়ে ওঠে ও অভিজাত শ্রেণীর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে ওঠে। আমরা আমাদের অনুবাদে যাকে 'প্রাচীন জমানা' বলছি, গ্রামশি তাকে খুব নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করেছেন 'আঁসিয়ঁ রেজীম' বলে, অর্থাৎ ফ্রান্স্-এ ১৭৮৯-র ফরাসি বিপ্লবের আগের পর্ব।

গুণ ও পরিমাণ, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, নিতান্তই বাঁচা বা জীবনধারণ ও 'দার্শনিকতা', এই বিভাজনের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ম গুণ, স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বয়ম্ভূ মাহাত্ম্য ও শুদ্ধ চিন্তনকে আর্থ-সামাজিক জীবনপ্রক্রিয়ার তথা সামূহিক জনজীবনের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাকে গ্রামশি 'অর্থহীন' বলেই ক্ষান্ত থাকেন না, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের কাঠামো তথা স্থিতাবস্থাকে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখবার মতাদর্শগত প্রয়াস বলে চিহ্নিত করেন। এই বিভাজনকে অস্বীকার করেও গ্রামশি বলেন, ক্রমাগত ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে পরিমাণ বা সমষ্টির জীবনধারণের প্রশ্নটিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে ; কারণ ঐ ক্ষেত্রটিই 'বেশি নিয়ন্ত্রণসাধ্য' ও 'বেশি সহজে পরিমাপযোগ্য'। ঐ ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গেই গুণগত বিকাশের ওপর জোর অর্থাৎ জীবনধারণের প্রাথমিক শর্তগুলি পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো সমাজের সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষে উদ্যোগী হলে তবেই নিম্নবর্ণ শ্রেণীর অগ্রগমন বা 'আধিপত্যে'র দিকে এগোবার পথ পরিষ্কার হয়।

এই প্রসঙ্গেই এক সার উদ্ধৃতি সাজিয়ে গ্রামশি ধরিয়ে দেন তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিভাজনের বিরুদ্ধে চিন্তার এক পরম্পরা বহুদিন ধরেই বহতা

আছে। তাঁর আদিতম সাক্ষ্য তিনি আহরণ করেছেন সন্ত তোমাস আক্‌উইনস্ (আনু. ১২২৫-৭৪) থেকে। তাঁর পরবর্তী সাক্ষী জর্মন দার্শনিক গট্‌ফ্রীড ভিলহেল্‌ম্ ভন লাইব্‌নিটস্ (১৬৪৬-১৭১৬) ও ইতালীয় কবি, ইতিহাসবিদ, আইনজ্ঞানী ও দার্শনিক জিয়ামবাত্তিস্‌তা ভিকো (১৬৬৮-১৭৪৪)—এবং সবশেষে ক্রোচে যিনি তাঁর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে কার্যত ভিকো-কে আবিষ্কার করেন। ভিকো-র মতে মানুষের ক্রিয়া হতে যে কর্ম সাধিত কেবল তা-ই যথার্থভাবে জানা যায়; কারণ প্রকৃতিলোকে আমরা যা দেখি বা পাই তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যাদি আমাদের অজ্ঞাত; মনুষ্য-সাধিত কর্ম বা কৃতকর্মেই কেবল বিষয় ও বিষয়ীর প্রত্যক্ষ সংযোগ তথা জ্ঞানলাভ ঘটে। অর্থাৎ সমাজে কোনো ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েই মানুষ জ্ঞান লাভ করে। ভিকো কর্মের মধ্য দিয়েই যথার্থ জ্ঞানের যে সম্ভাবনা তুলে ধরে-ছিলেন, ক্রোচে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাকে কিছুটা বা উলটেই দিয়ে-ছিলেন যাতে জ্ঞানলাভই কর্মের সমার্থক হয়ে যায়, অর্থাৎ শুদ্ধ জ্ঞান আহরণ করতে পারলে তা-ই কর্মের স্থান নিতে পারে।

তত্ত্ব ও কর্মের গভীর দ্বিমুখী সম্পর্কের এই তত্ত্বভাবনা থেকে গ্রামশি নিজে যে আরো দ্বান্দ্বিক চরিত্র উন্মোচন করেন, তাকে কর্মকাণ্ডের দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে তিনি দেখান, ইতিহাসে বৈপ্লবিক রূপান্তরের সন্ধিক্ষণগুলিতে যখন নানা শক্তির অভ্যুদয় ঘটে (এখানে শক্তি বলতে প্রবণতা ও সংগঠিত জনসম্প্রদায় দুইই বোঝায়), তখন তত্ত্বের আলোকে ঐ শক্তিগুলির যথার্থ মূল্যায়ন ও বিচার সমাধা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ঐ তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ঐ শক্তিগুলি সম্পর্কে আধিপত্যমুখী শ্রেণী তার অবস্থান স্থির করবে, ঐ শক্তিগুলিকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় তাও নির্ধারণ করবে। অন্যদিকে ঐ সন্ধিক্ষণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই পূর্বতন তাত্ত্বিক অবস্থান বা নতুন তত্ত্বচিন্তা যাচাই করে নেওয়া যাবে। তত্ত্ব ও কর্মের অব্যাহত সংশ্লেষের এই ধারণা কর্মকাণ্ডের দর্শনের অন্যতম অবলম্বন। বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় এমন সংকটকাল আসতেই পারে যখন তত্ত্ব বাস্তব ঘটনা তথা পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না; তাই বলে বিপ্লবী কর্মী বা গ্রামশি যাঁকে 'বুদ্ধিজীবী' বলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তত্ত্ব ফেলে বিলাপ করতে বসবেন না; বরং আবার নতুন করে তত্ত্ব ও প্রয়োগ বা কর্মকে পরস্পরের কাছে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হবেন। তত্ত্ব ত্যাগ করে কর্মপ্রবাহে ঝাঁপ দিলে বা তার স্বতঃস্ফূর্ততাকে মেনে নিলে কর্মের উপর বা ইতিহাসের ধারার উপর বিপ্লবী শ্রেণীর আর কোনো অধিকারই থাকে না। তত্ত্ব-কর্মের সংশ্লেষের এই অপরিহার্যতাকে প্রতিষ্ঠা করে তবেই গ্রামশি কাঠামো-পরিকাঠামোর সম্পর্কের বিশ্লেষণের দিকে এগোন। কারণ, আর্থ-সামাজিক বাস্তব যদি কাঠামো হয়, তবে মতাদর্শের পরিকাঠামোর সঙ্গে তার সম্পর্ক তথা অনিবার্য সংশ্লেষ নির্ধারিত হবে তত্ত্ব-কর্মের দ্বান্দ্বিক সংশ্লেষের মাত্রাতেই।[১]

কাঠামো ও পরিকাঠামোর সম্পর্কের প্রশ্নটি মার্কসীয় চিন্তার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রশ্নটি তুলেও মার্কস ও এঙ্গেল্‌স এই সম্পর্ক কখনই বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেননি। তাঁদের জোর পড়েছে কাঠামোর ওপরেই অর্থাৎ 'বস্তুগত জীবনের উৎপাদনের ধরনের' ওপরে। ২১-২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯০ জে. ব্লখ-কে লেখা চিঠিতে এঙ্গেল্‌স বলেন যে, 'বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন'কে ইতিহাসে 'শেষ পর্যন্ত নিয়ামক ভূমিকায়' দেখলেও মার্কস ও তিনি কখনই 'অর্থনৈতিক উৎপাদনকে একমাত্র নিয়ামক' বলতে চাননি। 'অর্থনৈতিক পরিস্থিতি' ইতিহাসের ধারার 'ভিত্তি' হতে পারে, কিন্তু 'পরিকাঠামোর বিভিন্ন উপাদান ঐতিহাসিক সংগ্রামগুলির ধারাকে প্রভাবিত করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ রূপ নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।' চিঠির শেষে এঙ্গেল্‌স বলেন, 'তরুণতর সম্প্রদায় যে অর্থনৈতিক দিকটাতেই কখনও কখনও প্রাপ্যাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন, তার জন্য মার্কস ও আমি অংশত দায়ী। আমাদের প্রতিপক্ষের অস্বীকৃতির মুখে আমাদের মূল সূত্রটির ওপর জোর দিতে গিয়ে এই যৌথ ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় নিযুক্ত অন্য উপাদানগুলিতে প্রাপ্য গুরুত্ব দেবার সময়, স্থান বা সুযোগ আমরা সবসময় পাইনি।' কাঠামো বা পরিকাঠামো, গ্রামশি কোনোটিকেই অন্যটির উপরে স্থান দিতে চাননি। বরং এই দুইয়েরই দ্বান্দ্বিক ও জৈব সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটি 'ঐতিহাসিক জোট' সৃষ্টি হয়। 'এই ঐতিহাসিক জোট-এর মধ্যে বস্তুগত উপাদানগুলিই হল বিষয়বস্তু এবং মতাদর্শগুলো হল তার রূপকাঠামো, যদিও বিষয়বস্তু ও রূপকাঠামোর মধ্যেকার এই বিভাজন নিতান্ত শিক্ষাগত তাৎপর্যের কথা ভেবেই করা হয়েছে ; কারণ, বস্তুগত উপাদানগুলিকে ঐতিহাসিক দিক থেকে রূপকাঠামো বাদ দিয়ে কল্পনা করা অসম্ভব আর মতাদর্শগুলোও বস্তুগত শক্তিগুলির সঙ্গে সংশ্লেষ ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত খেয়ালি কল্পনার নামান্তর হয়ে দাঁড়াবে।' নিম্নবর্গ শ্রেণী যখন আধিপত্যের স্তরে পৌঁছায়, তা কেবল কাঠামো অর্থাৎ উৎপাদিকা ও সামাজিক শক্তিসমূহের সমবায়ে রূপান্তরের পরিণামস্বরূপ নয়, বরং যে পরিকাঠামোগত প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্গ শ্রেণী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আত্মশক্তি বা চৈতন্যের বিকাশে অগ্রসর হয় তারও পরিণামস্বরূপ বটে। গ্রামশি অন্যত্র বলেন, 'কাঠামো ও পরিকাঠামো মিলে সৃষ্টি করে এক ঐতিহাসিক জোট। অর্থাৎ পরিকাঠামোর জটিল, বিরোধ-সমাকীর্ণ ও বিবাদী সমবায় উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কসমূহের সমবায়ের প্রতিফলন।' কাঠামোর স্তরে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাকে অন্ধভাবে মেনে নিয়ে বা তাকে অনুসরণ করে গেলে এক ধরনের নিয়তিবাদে মজে যাওয়ার আশংকা থেকে যায়। বিপ্লবের ধারাকে অব্যাহত রাখতে গেলে কাঠামোকে অবিরত পরিকাঠামোর স্তরে অর্থাৎ মতাদর্শের স্তরে যাচাই করে নিয়ে এগোতে হবে। অন্যদিকে কাঠামো যেভাবে পরিকাঠামোকে ক্রমাগত প্রভাবিত করে যায় তাতে কাঠামোর স্তরে কোনো আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিকাঠামোর স্তরেও সমানে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়।

পরিকাঠামোর স্তরে কাঠামোর চরিত্রকে আয়ত্ত করা অর্থাৎ 'বস্তুগত'কে 'মনোগত' করে নেওয়ার বৈপ্লবিক উত্তরণকে গ্রামশি 'কাথারসিস্' আখ্যা দেন। গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রে আদি প্রয়োগে বা 'পোয়েটিকস্'-এ আরিস্ততল্-এর প্রয়োগে কাথারসিস্-এর প্রচলিত অর্থ—শরীরের মধ্যে বা মনের মধ্যে কোনো প্রবল সংক্ষোভ সৃষ্টি করে কোনো স্বাস্থ্যহানিকর উপাদানকে নিষ্কাশন করা। এই আদি অর্থে কাথারসিস্-এর মধ্যে সমগ্র মন বা শরীরের এক প্রচণ্ড টালমাটাল ও তার মধ্য দিয়ে তার রূপান্তরণের যে ইঙ্গিত আছে তা-ই গ্রামশি-কে এই শব্দটির দিকে আকর্ষণ করেছে মনে হয়। বস্তুত মন যেখানে কাঠামোর শাসনের মধ্যে আবদ্ধ বা তারই মধ্যে সীমিত সেখানে বৈপ্লবিক রূপান্তরে ব্যক্তি বা মানবগোষ্ঠীর ভূমিকাও স্বভাবতই অবরুদ্ধ বা সংকুচিত। কর্মকাণ্ডের দর্শনের চর্চা (যে চর্চা কেবলমাত্র পাঠ বা বৌদ্ধিক চর্চা নয়, বরং রাজনৈতিক আন্দোলনেরই অভিন্ন অঙ্গ) এই 'আবশ্যিকতা' থেকে মানুষকে 'স্বাধীনতায়' পেঁছে দিতে পারে, অর্থাৎ তাকে একটা সক্রিয় সচেতন ভূমিকার দায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। মানুষের এই রূপান্তরকে গ্রামশি 'কাথারসিস্'-এর সমগোত্রীয় মনে করেন।

ইয়োরোপীয় দর্শনচিন্তায় সমকালীন যাবতীয় প্রবণতার সঙ্গে মিলিয়ে 'কর্মকাণ্ডের দর্শনের' বিচার-বিবেচনায় গ্রামশি ইমানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) কেও টেনে আনেন—নব্যকাণ্টীয় ধারার দর্শনের সমকালীন উন্মেষের পরিপ্রেক্ষিতেই।

কাণ্টীয় দর্শনে ফেনোমেনন বা ফেনোমেনা অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগতে বর্তমান তথা ইন্দ্রিয়গোচর যাবতীয় বস্তু যেমন চেয়ার, টেবিল, বাড়িঘর ইত্যাদি এবং প্রভাব, পরিণাম ইত্যাদি থেকে অনুমেয় যাবতীয় বস্তু (অণু পরমাণু ইত্যাদি, সুদূরতম নক্ষত্রাদি) ; এবং নুমেনন বা নুমেনা অর্থাৎ অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়ানুভবে অগোচর অথচ বুদ্ধিধার্য যাবতীয় বস্তুর মধ্যে প্রভেদ জ্ঞানতত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি। 'আমাদের জ্ঞান বলতে ইন্দ্রিয়গোচর এবং তা থেকে প্রায়োগিক অগ্রগমনের মাধ্যমে আর যে-সব সম্ভবপর সিদ্ধান্তে পেঁছিনো যায় তা ছাড়া আর কিছুই নেই।' অন্যদিকে নুমেনন 'কোনো বস্তুর প্রত্যয় নয়', বরং আমাদের বোধের সীমাবদ্ধতার সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িত সমস্যাবিশেষ। হুমায়ুন কবির তাঁর 'ইমানুয়েল কাণ্ট' গ্রন্থে (কলকাতা, নতুন সংস্করণ ১৯৪০) নুমেনন-এর অনুবাদ করেছেন 'ব্রহ্ম', সংজ্ঞা দিয়েছেন 'অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সত্তা', ফেনোমেনন-এর অনুবাদ করেছেন 'প্রকৃতি', তার সংজ্ঞা দিয়েছেন 'জ্ঞানের বিষয়বস্তু'। যদিও গ্রামশি বলেন, মার্কস ও এঙ্গেল্স 'দ্য হোলি ফ্যামিলি'-তে বলেছেন যে ফেনোমেনা-র মধ্যে (আমরা যার অনুবাদ করেছি 'প্রকাশিত ঘটনাবলি')সমগ্র বাস্তব বর্তমান, ফেনোমেনা-র বাইরে কিছুই নেই, গ্রামশির ইংরেজি অনুবাদের টীকাকার এরকম কোনো কথা মার্কস ও এঙ্গেল্স-এ খুঁজে পাননি। বরং তিনি বলেন, ক্যাপিটাল-এ মার্কস স্পষ্টভাবেই বিষয়বস্তুর বাস্তব ও তার ফেনোমেনাল

রূপের [এরশাইনুংসফর্ম] মধ্যে পার্থক্য করেছেন, সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য এও বলেছেন যে এই বাস্তব কেবলমাত্র ফেনোমেনা থেকেই আহরণীয়, তার বাইরে এই বাস্তবের কোনো অস্তিত্ব নেই।' কাণ্ট-এর নুমেনা-র আধিভৌতিক তাৎপর্যে গ্রামশির কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু প্রকাশিত ঘটনাবলির বাইরে সম্ভাবনার যে-ক্ষেত্র রয়েছে, যে-ক্ষেত্র সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই মানুষের চেতনায় স্থান করে নেয়, অথচ স্থান-কাল-কার্যকারণপরম্পরার কোনো অমোঘ যুক্তিজালে এখনই গ্রাহ্য নয়, তাকেই নুমেনা-র মর্যাদা দিতে গ্রামশি দ্বিধা বোধ করবেন না। অর্থাৎ, ফেনোমেনাও যেমন সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিচ্ছিন্ন নয়, বরং মানুষের চেতনার প্রয়োগে সৃষ্ট পরিকাঠামোগত প্রতিষ্ঠানাদিও তার অন্তর্গত, তেমনই নুমেনা-র অন্তর্গত হবে বাস্তবেরই এমন অনেক উপাদান যা এখনও মানুষের অজানা, কিন্তু কোনোদিন মানবজাতির বৌদ্ধিক ও 'প্রাকৃতিক' প্রকরণ বা কৃৎকৌশলের উন্নতি ঘটলে যা প্রকাশিত ঘটনাবলির অন্তর্গত হয়ে যাবে। ফেনোমেনা-র বাইরে নুমেনা-র এই অস্তিত্ব মানলে তাকে ফেনোমেনা-র আয়ত্ত করবার তাগিদ ও প্রয়াস সক্রিয় হবে।

যেমন ফেনোমেনন-নুমেনন-এর বিভেদ থেকে তেমনই ইতিহাস ও প্রতি-ইতিহাসের বিতর্ক থেকে গ্রামশি আবার ঐ একই ঐতিহাসিকতার সূত্র পান। ইয়োরোপীয় এনলাইটেনমেণ্ট-এর একেবারে কেন্দ্রেই যে-প্রশ্নটা বারবারই উঠে পড়ত তা ছিল ইতিহাসের ধারা নিয়ে। শান্ত ক্রমবিবর্তন না বৈপ্লবিক রূপান্তর, না দুয়েরই কোনো ঐতিহাসিক সমন্বয়, ইতিহাসে কীভাবে পরিবর্তন আসে, তার ডারউনীয় ছক প্রতিষ্ঠিত হবার আগে জর্জ কুভিয়ে (১৭৬৯-১৮৩২) মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী জীবাশ্মবিজ্ঞানের চর্চায় বা হেগেল তাঁর ইতিহাসদর্শনে এই প্রশ্ন তুলেছেন, তার সমাধানের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। শান্ত, প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত ক্রমবিবর্তনের প্রবক্তারা আসলে রক্ষণশীল বা স্থিতাবস্থাপন্থীদের প্রবক্তা। অন্যদিকে বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রবক্তারা 'জাকোব্যাঁ' অর্থাৎ জঙ্গি চেতনারই প্রবক্তা। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই বিপদের বীজ আছে। বিশেষত জঙ্গিপনার মধ্যে নীটশেপন্থী চালবাজদের দাপট বিষয়ে বা ঐ আপাত অতিবিপ্লবী হামবড়াইপনার মধ্যে 'বিমূর্ত চিন্তাভাবনার' আস্ফালন বিষয়ে গ্রামশি যে অত্যন্ত জরুরি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, তার তাৎপর্য সম্প্রতি আরোই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে— যখন দেখি প্রতিবাদী বামপন্থা তার ঐতিহাসিক, দ্বান্দ্বিক মাত্রা পরিহার করে উত্তর-আধুনিকতার চটকদার নৈতিবাদ অবলম্বন করে ঘোরাপথে কর্মকাণ্ডের দর্শনকেই আঘাত করছে। ফিউচারিজম্-পন্থীদের অশুভ অথচ অবশ্যম্ভাবী একাকার হয়ে যাওয়া দেখেই গ্রামশি মৌখিক বিদ্রোহ থেকে সব-কিছু মেনে নেওয়ার প্রবণতার চরিত্র ধরতে পেরেছিলেন। গ্রামশি কী গভীর অন্তর্দৃষ্টির স্তরে ধরতে পারেন যে এই বৌদ্ধিক নৈতিবাদ আসলে কোনো তত্ত্ব নয়, 'শৈলী' মাত্র, কিন্তু এই শৈলী একটা বিশেষ মানসিকতার মাত্রা পরিগ্রহ করে যা ইচ্ছাশক্তিকে নির্জীব করে দেয়। ভারতে

ও তৃতীয় বিশ্বের অন্য দেশেও ইদানীং বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে বার্থ, ফুকো, দেরিদা, লিওতার্দ প্রমুখের চিন্তা-পদ্ধতি তথা কোনো কোনো সিদ্ধান্তের অনুপ্রবেশে একটা অনৈতিহাসিক প্রতিবাদিতার সংস্কৃতি তথা আন্দোলনবিমুখ বিপ্লবীপনার মানসিকতা গড়ে উঠছে। যে দার্শনিক পরম্পরার ঐতিহাসিকতার মধ্যে এই চিন্তকদের দেখতে পারলে তাঁদের অনেক সিদ্ধান্তকেই অন্য ভাবাদর্শের প্রকল্পের মধ্যে গ্রহণ করা যেতে পারত, উত্তর-আধুনিকতার ইতিহাসবিমুখ মাত্রার আকর্ষণে সেই সম্ভাবনা এখানে গড়ে উঠছে না, বরং প্রতিবাদী চেতনা কর্মকাণ্ডবিচ্যুত এক ধরনের ভাববাদেই রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তবুও আবার গ্রামশির ইতিহাস-বোধই স্মরণ করিয়ে দেয় যে বারবার নির্ধারণবাদের প্রবল প্ররোচনায় 'সঙ্ঘ-বদ্ধ ইচ্ছাশক্তি'ই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

স্পেকুলেটিভ বা 'কল্পনামুখী' দর্শন বিষয়ে গ্রামশি-র আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে মার্ক্স ও এঙ্গেল্স-এর যৌথ রচনা 'দ্য হোলি ফ্যামিলি' (১৮৪৫) বা 'পবিত্র পরিবার-এর অন্তর্গত 'অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি এনলাইটেনমেন্ট, এবং বিশেষত ফরাসি জড়বাদ' সম্পর্কে বিশ্লেষাত্মক আলোচনা। কর্মকাণ্ডের দর্শন তথা আধুনিক জড়বাদকে মার্ক্স ও এঙ্গেল্স দেখেছেন দার্শনিক কল্পনামুখীনতার ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই 'পূর্ণতা-প্রাপ্ত' রূপে, মানবিকবাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী রূপে। ইংলণ্ড-এ বেকন-এর রচনায় জড়বাদের সূচনা হলেও হব্স্-এর হাতে তার 'কাব্যময় ইন্দ্রিয়গত দীপ্তি' বিলুপ্ত হয়, যান্ত্রিকতায় নিমজ্জিত হয়ে 'জড়বাদ মানবতার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।' লক্ জড়বাদকে আবার 'সুস্থ মানবিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও তারই উপর নির্ভরশীল যুক্তি'র আয়ত্তে নিয়ে আসেন। লক্‌কে গ্রহণ করে, কল্পনামুখী দর্শনের মধ্যে নিহিত শক্তির সাযুজ্যেই ফরাসিরা 'ইংরেজ জড়বাদ'কে 'সভ্য করে তোলে।' মার্ক্স ও এঙ্গেল্স-এর এই বিশ্লেষণকে অবলম্বন করেই গ্রামশি কর্মকাণ্ডের দর্শন ও 'কল্পনামুখী' দর্শনের মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক লক্ষ করেছেন যা কর্ম-কাণ্ডের দর্শনের মানবিকবাদী বিকাশে সহায়ক হয়েছে ও হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এ বিষয়েও সচেতন যে কল্পনামুখী দর্শনকে এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে তা 'ধর্মতাত্ত্বিক' মাত্রায় পৌঁছে সমাজবিকাশের ধারায় অকেজো হয়ে যেতে পারে। অয়গেন কার্ল ড্যুরিং (১৮৩৩-১৯২১) ১৮৭৫ সালে এক নব্য সমাজতান্ত্রিক দর্শনের প্রবক্তা হয়ে উঠলে ১৮৭৭ সালে লাইপ্‌ৎসিগ থেকে প্রকাশিত 'ফোরভ্যের্ট্স' পত্রিকায় এঙ্গেল্স এক দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধমালায় তার অন্তঃসারশূন্যতা ব্যাখ্যা করে দেখান। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' নামে পরিচিত এই রচনা শেষ পর্যন্ত মার্ক্সীয় দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি, ও সমাজ-তন্ত্রের (বইটি এই তিন অংশে বিভক্ত) এক সুদীর্ঘ মৌলিক বিবৃতির রূপ পরিগ্রহ করে। গ্রামশি ইঙ্গিত করেন, ক্রোচে-র মার্ক্সবাদ ব্যাখ্যার

অনুরূপ এক বিবাদী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কর্মকাণ্ডের দর্শনের যথার্থ চরিত্র উন্মোচিত হতে পারে। এঙ্গেলস-এর 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'-এর মতোই রচিত হতে পারে এক 'অ্যান্টি-ক্রোচে'। গ্রামশির 'জেলখানার নোটবই'-এর মধ্যে ছড়ানো ছিটোনো ভাবে এই 'অ্যান্টি-ক্রোচে-র অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায়। এ ছাড়াও গ্রামশি ইনস্টিটিউট প্রকাশিত গ্রামশি রচনাবলির মধ্যে 'লা ফিলোসোফিয়া দি বেনেদেত্তো ক্রোচে' (বেনেদেত্তো ক্রোচের দর্শন) ও 'বেনেদেত্তো ক্রোচে এ ইল মাতেরিয়ালিজমো স্তোরিকো' (বেনেদেত্তো ক্রোচে ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ) এই শিরোনামে দুটি বড় রচনা পাওয়া যায়। মোট প্রায় ১১০ পৃষ্ঠা। এই খণ্ডের প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৪০-এ প্রকাশিত, পুনর্মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৪০। 'জেলখানার নোটবই'-এর কুইনটিন হোর ও নোয়েল স্মিথ সম্পাদিত ও অনূদিত সংস্করণে (প্রথম সং. ১৯৪০) এই অংশটা নেই।

গ্রামশির মতে, 'ক্রোচের চিন্তায় যা-কিছু স্বাস্থ্যকর ও প্রগতিশীল তা কল্পনামুখী ভাষায় উপস্থাপিত কর্মকাণ্ডের দর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।' (দ্র. মরিস ফিনোচ্চিয়ারো, 'গ্রামশি অ্যান্ড দ্য হিস্টরি অফ ডায়ালেকটিকাল থট', কেমব্রিজ ১৯৪০, উদ্ধৃত)। গ্রামশি ক্রোচে-কে সাধুবাদ জানান, কারণ তিনি দর্শনের এমন এক ধারণা প্রতিষ্ঠা করেছেন যাতে, তিনি দর্শনের কোনো তন্ত্রের ধারণার বিপরীতে জোর দিয়েছেন দার্শনিক সমস্যার ধারণার ওপর; চিন্তাই বস্তুবিচ্ছিন্নভাবে অন্য চিন্তা উৎপাদন করে, এই ধারণা তিনি অস্বীকার করেছেন: তিনি ঘোষণা করেছেন, যে-সমস্ত সমস্যা দার্শনিকদের সমাধান করতে হয় তা কোনো পূর্বতন দার্শনিক চিন্তার নির্বস্তুক উত্তরফল নয়, বরং বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরা থেকে উৎসারিত। গ্রামশি-র মতে, সেইজন্যই কর্মকাণ্ডের দর্শনের ধারণাগুলিকে অনুধাবন করতে হবে নিহিতার্থবাদী ধারায়, কল্পনামুখী ধারায় নয়। যেমন, কাঠামোকে কোনো 'লুকনো ঈশ্বর' রূপে না দেখে দেখতে হবে 'সমাজসম্পর্কের' এমন এক 'বিন্যাস রূপে যার মধ্যে বাস্তব মানুষ তার আচার-আচরণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সক্রিয়', বাস্তব পরিস্থিতি'র এমন এক 'বিন্যাস রূপে যা শব্দতত্ত্বের পদ্ধতির প্রয়োগে বিচার-বিবেচনা করে দেখা যায়, এবং সেভাবেই তা দেখতে হবে।' (দ্র. ফিনোচ্চিয়ারো)।

এক এক করে দর্শনের বিভিন্ন ধারা ও প্রবণতার সঙ্গে কর্মকাণ্ডের দর্শনের সম্পর্ক পরীক্ষা করতে করতে গ্রামশি এবার একবাদের ('মনিজম') প্রসঙ্গে আসেন। একবাদের দুটি ধারা ইয়োরোপীয় দার্শনিক পরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত আছে, যদিও দুটি ধারাকেই নানাভাবে নানা সময়ে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা হয়েছে। স্পিনোজা (১৬৩২-৭৭) যেমন বস্তুজগৎকে একমাত্র সত্তা বলে নির্দেশ করেছেন, জগৎ ও বিধাতার মধ্যে সত্তার দ্বিধা-বিভাজন অস্বীকার করে জগৎকে নিজেই নিজের কারণ ও সৃষ্টি রূপে দেখেছেন, তেমনি আবার হেগেল মানুষের জ্ঞেয় জগৎকেই একমাত্র জগৎ বলে নির্দেশ করেও তাকে শেষ পর্যন্ত এক পরম সত্তার বা পরম ভাবের প্রকাশ

রূপে দেখেছেন। জগৎকে এমনি কোনো একক উপাদানের সঙ্গে সমার্থক করে দেখার পাশাপাশি রয়েছে একবাদের অন্য ধারণা যাতে জগতে কেবলমাত্র একটিই মৌলিক প্রকৃতির উপাদানের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয়; যেমন জড়বাদ মানে বস্তুগতকে, ভাববাদ ভাবগতকে, প্লেটনিক বাস্তববাদ মানে নির্বস্তুককে। দ্বান্দ্বিক জড়বাদকে প্রায়শই 'বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিতে স্থির জড়বাদী একবাদ' বলে বর্ণনা করা হলেও (দ্র. রোসেনতাল ও ইয়ুদিন, 'এ ডিকশনারি অফ ফিলজফি', মস্কো ১৯৬৭), কর্মকাণ্ডের দর্শনকে গ্রামশি নিতান্তই একবাদী মাত্রায় সীমিত রাখতে প্রস্তুত নন। ভাববাদী বা জড়বাদী কোনো ধরনের একবাদই কর্মকাণ্ডের দর্শনের চরিত্র নির্ধারণ করতে পারে না। ঐতিহাসিক কর্মের মধ্যে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্যে কাঠামো ও পরিকাঠামোর বিপরীতের একত্বই কর্মকাণ্ডের দর্শনের প্রস্থানবিন্দু, যেখানে ইতিহাস ও মানসসত্তা, বিবর্তমান তথা পরিবর্তনশীল 'জড়' ও মানবপ্রকৃতি অনিবার্য, অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট হয়ে আবর্তিত হয়। জেনতীল তাঁর 'তেওরিয়া দেলো স্পিরিতো কোমে আত্তো পুরো ('শুদ্ধ কর্ম' রূপে মানসসত্তার তত্ত্ব,' ১৯১৬) গ্রন্থে সমাজগত বা বস্তুগত চেতনা বা আত্মবোধ বিরহিত 'শুদ্ধ' কর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন। গ্রামশি যখন কর্মকে 'কর্মকাণ্ড, বিকাশ' বলে নির্দেশ করে 'শুদ্ধ' কর্ম থেকে তার পার্থক্য সূচনা করেন, তখন জেনতীল-এর সেই চিন্তা বা সংজ্ঞা সম্পর্কেই তাঁর সংশয় প্রকাশ করছেন। ঐতিহাসিক কর্ম তথা ইতিহাসের প্রক্রিয়া এমনই বাস্তব ও জাগতিক যে তা জটিল ও বিচিত্র নানা ক্রিয়া ও সম্পর্কের সমাহার এবং স্বভাবতই লোকোত্তর কোনো ধর্মীয় বিধি বা অনুশাসনের অধীন নয়।

একবাদ থেকে গ্রামশি আসেন ব্যবহারিকতাবাদে। 'কর্মকাণ্ড' বা 'কর্ম'কে গ্রামশি যে বিশেষ তাৎপর্য দেন তা স্পষ্ট করতেই যেন তিনি ধরিয়ে দেন যে ব্যবহারিকতাবাদের তাৎক্ষণিক ও অতিপ্রত্যক্ষ বাস্তবদর্শন ও বাস্তববিচার বস্তুত 'একেবারেই মোটা দাগের'। ইংরেজিভাষী দেশগুলিতে ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তথা ব্যবস্থা ও সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক জীবন এমনই ভাবে জড়িয়ে আছে, সেখানে ধর্মের উপস্থিতি এমনই অনৌপচারিক যে কেবলমাত্র ঐ ধরনের পরিস্থিতিতেই ব্যবহারিকতাবাদের মতো একেবারেই 'হিতবাদী' জীবনদর্শনের উদ্‌ভব হতে পারে। কার্যত এটা এক 'জনপ্রিয়' দর্শনের রূপ পরিগ্রহ করেছে যা আর ঠিক দর্শনের পর্যায়েই পড়ে না হয়ে ওঠে এক মতাদর্শগত গোষ্ঠী, যেন এক তাৎক্ষণিক কর্মসূচিনির্ভর রাজনৈতিক দল। ফ্রান্সে বা জর্মনিতে ধর্ম ও দৈনন্দিন সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধানের পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসি বা জর্মন ব্যক্তি দার্শনিকেরা দর্শনকে কখনোই ব্যবহার বা প্রয়োগের সঙ্গে ঐভাবে জড়িয়ে ফেলেন না: অর্থাৎ তাঁদের দর্শনকে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনকর্মে অত সহজে যাচাই করে নেওয়া যায় না। তাঁদের দর্শন অনেক স্তরের মধ্য দিয়ে এসে, সমাজেতি-

হাসের অনেক ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়ে সংস্কৃতির মধ্যে আত্মস্থ হয়, জীবনে যুক্ত হয়। ঐভাবেই হেগেল-এর ভাববাদী দর্শন উনবিংশ শতাব্দীর উদারনীতিক আন্দোলন বা সমাজরূপান্তরের তাত্ত্বিক ভিত্তি হয়ে যায়। আর ব্যবহারিকতাবাদ বড় জোর রোটারি ক্লাবের মতো সমাজসেবী কর্মসূচির প্রেরণা জোগাতে পারে। হেগেল (১৭৭০-১৮৩০) তাঁর সমকালীন প্রুশীয় রাজতন্ত্রের অগণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির সপক্ষে এসে দাঁড়িয়েছেন, এমন মনে হলেও পীটার সিংগার ('হেগেল', লণ্ডন, অক্সফোর্ড ১৯৮৩) দেখিয়েছেন যে প্রুশীয় রাজতন্ত্রের চরিত্রলক্ষণের সঙ্গে হেগেল প্রস্তাবিত যুক্তিচালিত আদর্শ রাষ্ট্রের লক্ষণাবলির এমন অনেকগুলি প্রভেদ বর্তমান যে ঐ মিলের প্রচলিত ধারণাটি সম্ভবত কোনো তাত্ত্বিক বিতর্কে জোর করে হেগেলকে দলে টানবার চেষ্টার পরিণাম। হেগেল স্বাধীনতার আদর্শকে যে গুরুত্ব দিয়েছেন (তিনি 'ডী ভেরনুনফ্‌ট্ ইন ডেএর গেশিখ্‌টে' বইতে লিখেছেন : 'মন স্বাধীন, এবং এই [তত্ত্বকে] বাস্তবায়িত করতে, তার অন্তঃসার—এই অত্যুৎকর্ষ—আয়ত্ত করাই বিশ্ব-ইতিহাসের মধ্যে বিশ্বমানসের প্রয়াস'), প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এ নিম্নতম শ্রেণীর যে স্বাধীনতা তাকে 'বস্তুগত স্বাধীনতা' বলে নির্দেশ করে হেগেল তার বিপরীতে 'বিষয়ীগত স্বাধীনতা' তথা ব্যক্তি মানুষের সচেতন স্বাধীনতাবোধের যে আদর্শ তুলে ধরেন, তার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর যাবতীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের আদর্শ নিহিত আছে। যথার্থ দর্শন বা জর্মন-ফরাসি ঘরানার দর্শনের মধ্যে ফলন্ত হয়ে উঠবার মতো বীজ এইভাবেই প্রোথিত থাকে, আপাতদৃষ্টে প্রয়োগবাদী বা 'হিতবাদী' দর্শনের মধ্যে সেই সম্ভাবনা নেই।

কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)-এর যে সুবচনটিকে উদ্ধার করে গ্রামশি 'নীতিশাস্ত্র' প্রসঙ্গের আলোচনা শুরু করেন তার অন্তর্নিহিত নীতিটি ক্যাটেগরিকাল ইমপেরেটিভ' নামে দার্শনিক মহলে পরিচিত। উদ্ধৃতিটি কান্ট-এর যে বাণীর সরলীকৃত ভাষ্য তার যথার্থ রূপ এই রকম : 'কেবলমাত্র এই নীতি ধরেই যাবতীয় আচরণ কর যাতে তুমি সঙ্গে সঙ্গেই এই তীব্র ইচ্ছাশক্তি অনুভব করতে পার যে [ঐ আচরণ] হয়ে উঠবে সর্বজনীন বিধিস্বরূপ।' ('একই রকম অবস্থায়' বলে যে বাক্যবন্ধটি গ্রামশি ব্যবহার করছেন, তা কান্ট-এ নেই বলে ইংরেজি সংস্করণের টীকাকার দাবি করেছেন) অর্থাৎ ব্যক্তিগত নীতিবোধ বা কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তিমানুষ তাঁর নৈতিক দায়িত্ব বলে যা বিবেচনা করেন তাকে কান্ট সর্বজনীন আইন বা বিধির মর্যাদা দিতে চান। অর্থাৎ ঐ মানুষটি নিজের কর্তব্য স্থির করতে গিয়ে সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি বা তাৎক্ষণিক বিবেচনার দ্বারা চালিত না হয়ে বিশ্বমানবসমাজের পক্ষেই বিধেয় কর্তব্য নির্ধারণ করবেন। এ ধরনের নৈতিক সিদ্ধান্তের অনৈতিহাসিকতার প্রতি গ্রামশি ইংগিত করেছেন।

'আকাঁড়া বস্তুবাদ' থেকে কর্মকাণ্ডের দর্শনের মৌলিক দূরত্ব তথা প্রভেদ

প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গ্রামশি সন্দেহবাদের প্রসঙ্গও নিয়ে আসেন। সব-কিছু সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলবার, প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান সম্পর্কে সংশয়ের যে প্রবণতা সন্দেহ-বাদের অন্তর্নিহিত, তা মধ্যযুগে একটা বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বস্তুবাদী এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু সন্দেহবাদ শেষ পর্যন্ত সন্দেহবাদীকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিকৃষ্ট করে দেবে। এমনকী কোনো বিতর্কে অংশগ্রহণ করলেও তো সন্দেহবাদী মেনে নিচ্ছেন যে, মানুষের মতামতকে প্রভাবিত করে যথার্থ জ্ঞান বা সত্যের দিকে তাকে চালিত করা যায়--যা তাঁর দর্শন মানতে পারে না। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে এলিস-এর পিরো (মৃ. খ্রিস্টপূর্ব ২৭৫) ও তাঁর শিষ্য ফ্লিউস্-এর টাইমন ও তৎপরবর্তী কালে পিতানে-র আরসিসিলাউস, সেক্সতুস্ এমপিরিকুস্ ও কারনিয়াদিস্ সন্দেহ-বাদের পত্তন করেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পিরো আলেকজান্দারের ভারত অভিযানে সহযাত্রী ছিলেন, এবং সম্ভবত ঐ অভিযানে সহযাত্রী আরেক দার্শনিক আনাক্সারকুস্-এর কাছ থেকে দেমোক্রিতুস্-এর ইন্দ্রিয়ানুভব-লব্ধ জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সংশয়ের শিক্ষা লাভ করেই সন্দেহবাদের দিকে এগোতে প্রবৃত্ত হন।) গ্রিক সন্দেহবাদ প্রচলিত জ্ঞানের যাথার্থ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করতে করতে, শুদ্ধ নিরপেক্ষ, বিষয়ীমুক্ত জ্ঞানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছে যায় যে মনে হয় যে, যেহেতু কোনো জ্ঞানই শেষ বিচারে সত্য নয়, যা বর্তমান তাকে মেনে নিয়ে জীবন কাটিয়ে গেলেই মনের শান্তি থাকে। গ্রামশি তাঁর সম-কালেও সন্দেহবাদের মধ্যে ঐ একই তাৎক্ষণিকতামোহ লক্ষ করেন, জীবন-যাপনকে সহজ ও সহনীয় করে তুলতে যে-কোনো কাজ-চলা গোছের ভাবনা তুলে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করেন। ইতালীয় প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক রোবের্তো আরদিগো (১৮২৮-১৯২০) যখন বের্গস-এর 'স্বেচ্ছাবাদের' সমর্থক হয়ে ওঠেন, তখন সন্দেহবাদ পৌঁছে গেছে সমস্ত জ্ঞান ও তত্ত্বের বিষয়ে এক অনীহার স্তরে। তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে এই বিভাজন, যা তত্ত্বকে অস্বীকার করে প্রয়োগ বা কর্মকে আশু মর্যাদা দেয়, এরই বিরুদ্ধে মার্কস এর প্রতিবাদ ফয়্যারবাখ্ বিষয়ে তাঁর রচনাবলিতে। ১৮৪৫ সালে রচিত এই সূত্রাবলির শুরুতেই মার্কস-এর অনুযোগ, ফয়্যারবাখ্-সহ যাবতীয় বস্তুবাদী দর্শনেই বাস্তব বা ইন্দ্রিয়ানুভবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে 'মানবিক ইন্দ্রিয়গত ক্রিয়া' বা 'কর্মকাণ্ড' রূপে না দেখে কেবলমাত্র ধ্যানের 'বিষয়' রূপে দেখা হয়। মানুষ পরিস্থিতি বা ঘটনাপরম্পরার পরিণাম, এইটুকুর ওপর জোর দিতে গিয়ে সাবেকি বস্তুবাদীরা ভুলে যান যে, মানুষই ঐ পরিস্থিতিকে পালটায়, ঐ ঘটনাপরম্পরাকে প্রভাবিত করে, চালনা করে।

এই পর্বের শেষ অংশে গ্রামশি যখন 'মতাদর্শের' প্রশ্নে আসেন, তখন মার্কসবাদী চিন্তাধারায় 'আইডিঅলজি' বা 'মতাদর্শের' দুটি স্বতন্ত্র বা

সমান্তরাল ধারণার বিভাজন করেই তিনি ক্ষান্ত হন না, 'মতাদর্শের' ধারণাটিরই উৎস সন্ধানে সচেষ্ট হন। এই সূত্রেই দেতু দ্য ত্রাসি-র কথা আসে। রেমণ্ড উইলিয়মস্ দেখান, ১৭৯৬ সালে দ্য ত্রাসি 'ইদেঅলজি' শব্দটি ফরাসিতে ব্যবহার করেই তার অর্থ নির্দেশ করেন 'ধারণাসমূহের বিজ্ঞান' (দ্র. উইলিয়মস্, 'কীওয়র্ডস্', লণ্ডন ১৯৪০)। 'দ্য জর্মন আইডিঅলজি' (১৮৪৫-৪৭) গ্রন্থে মার্কস 'আইডিঅলজি' শব্দটিকে মিথ্যা সচেতনতা বা বাস্তব আর্থ-সামাজিক অন্তর্বিরোধকে আড়াল করে বা অস্বীকার করে কেবলমাত্র ধারণার মায়াজাল রচনার প্রবণতার সমার্থক করে নিয়ে 'আইডিঅলজি'কে আক্রমণ করেন। 'গ্রুণ্ডরিসে' (১৮৫৭-৫৮) গ্রন্থেও মার্কস দেখান 'সমতা ও স্বাধীনতা'র 'আইডিঅলজিকাল' বা 'মতাদর্শগত' ধারণাকে তুলে ধরে বুর্জোয়া শ্রেণী কীভাবে আড়াল করে সেই প্রক্রিয়া 'যার মধ্যে এই আপাত ব্যক্তিক সমতা ও স্বাধীনতা অদৃশ্য হয়ে গিয়ে অসমতা ও পরবশতা হয়ে দাঁড়ায়'। মার্কস-এর মৃত্যুর পর 'আইডিঅলজি' শব্দটি 'মার্কসীয়' প্রয়োগে যে অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ মাত্রা পরিগ্রহ করে তারও উৎস মার্কস-এর রচনাতেই নিহিত ছিল। 'কনট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটীক অফ পোলিটিকাল ইকনমি' (১৮৫৯) গ্রন্থে মার্কস-ই লিখেছিলেন : 'উৎপাদনের অর্থনৈতিক মাত্রার বস্তুগত রূপান্তর ··· এবং যে আইনগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নান্দনিক বা দার্শনিক, অর্থাৎ যে-সব মতাদর্শগত অবয়বে মানুষ এই বিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে লড়াই করে তার নিষ্পত্তি ঘটায়, এই দুইয়ের মধ্যে সর্বদাই তফাৎ করতে হবে।' লেনিন, লুকাচ, গ্রামশি শেষ পর্যন্ত এই অর্থটিকেই গ্রহণ করে তার পূর্ণতর বিকাশ ঘটান, ফলে মার্কস্-এর আদি সংজ্ঞাটি ক্রমেই হারিয়ে যেতে থাকে। অন্য দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'আইডিঅলজি' বা 'মতাদর্শ' শব্দটিকে 'রাজনীতি' তথা 'বাম রাজনীতি'রই আরেক নাম বলে খাড়া করে সাহিত্যবিচারে বা সমাজতত্ত্বে মতাদর্শনিরপেক্ষ শুদ্ধ অবস্থানের পরিপন্থী রূপে তাকে আক্রমণ করা হতে থাকে (মার্কসীয় প্রয়োগের বাইরে 'আইডিঅলজি'র এই সমান্তরাল প্রয়োগের ইতিহাসের জন্য দ্র. ফ্র্যাংক্ লেনট্রিচ্চিয়া ও টমাস ম্যাক্‌লাফলিন সম্পাদিত 'ক্রিটিকাল টার্মস্ ফর লিটেরারি স্টাডি', শিকাগো ১৯৯০ গ্রন্থে জেমস্ ত্রচ ক্যাভানাগ-এর 'আইডিঅলজি' প্রবন্ধ)। মার্কিন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও মদতে পুষ্ট নব্য বাম ভাবধারায় অনেক সময় সুকৌশলে মার্কিন মিডিয়া-র 'মতাদর্শবিরাগ' ও মার্কস-এর আদি 'মতাদর্শ' ব্যাখ্যা মিলিয়ে 'মতাদর্শের' ধারণার বিরুদ্ধে একটা মত খাড়া করা হয়। অন্যদিকে মার্কস-এর আদি প্রয়োগকে হটিয়ে অন্য তাৎপর্যটি মার্কসীয় চিন্তাপরম্পরায় কী করে স্থান করে নিল তার সহজ ব্যাখ্যা দিয়েছেন জে. ল্যারেন—'মার্কস-এর পর দুই প্রজন্ম জুড়ে মার্কসবাদী চিন্তকেরা "দ্য জর্মন আইডিঅলজি" বইটির কোনো হদিস পাননি—এটি ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল' (টম বটোমোর সম্পাদিত 'এ ডিকশনারি অফ মার্কসিস্ট থট', লণ্ডন ১৯৪০)।

গ্রামশি বলেন, দ্য ত্রাসি যখন 'মতাদর্শ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন, তখনও 'ধারণার বিশ্লেষণ' শেষ হয় ধারণার মূলে নিহিত 'ইন্দ্রিয়ানুভূতি' তথা সংবেদনের উদ্ঘাটনে। এই প্রসঙ্গে তিনি বিখ্যাত ইতালীয় কবি আলেসান্দ্রো মানৎসোনি (১৭৮৫-১৮৭৩)-র উল্লেখ করেন, যিনি ধর্মীয় কবিতায়, ক্যাথলিকবাদের অনুপ্রেরণায় রচিত কবিতা ও নীতিবোধের ধর্মীয় ভিত্তি বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থে ইতালীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, অথচ কখনোই ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ পরিহার করেননি ; তাঁর নাটকে, নাটকান্তর্গত কবিতায় এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসে সব-কিছুর মূলে তিনি ইন্দ্রিয়ানুভূতিরই লীলা দেখেছেন (মানৎসোনি-র 'ইন্নি সাক্রি'র রচনাকাল ১৮১২-২২, তার ঐতিহাসিক উপন্যাস 'ই প্রোমেসি স্পোসি' বা 'বাগদত্তা'র প্রথম ভাষ্য তিনি লেখেন ১৮২৭ সালে, শেষ ভাষ্য ১৮৪০ সালে)। শেষ জীবনে মানৎসোনি আনতোনিও রসমিনি-সেরবাতি বা রসমিনি (১৭৯৭-১৮৫৫)-র দর্শনে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে 'অস্তিত্বে'র অন্য এক মানে পেয়েছিলেন। ১৮৩০ সালে ইতালীয় ভাষায় প্রকাশিত এবং ১৮৮৩-৮৪ সালে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত 'ধারণার উৎস বিষয়ে নূতন প্রবন্ধ' ও ১৮৪৬-৪৮ সালে ইতালীয় ভাষায় লিখিত এবং ১৮৮৪-৮৮ সালে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত 'মনস্তত্ত্ব' গ্রন্থে রসমিনি বস্তু ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে বিশেষ বলে চিহ্নিত করে ধারণাকে অবিশেষ সর্বজনীনতা ও অবশ্য-ভাবিতার মর্যাদা দেন ; বস্তুলোক বা অভিজ্ঞতায় ধারণার উৎস তিনি মানতে চাননি, ঈশ্বরের দান হিসেবেই ধারণার আবির্ভাব নির্দেশ করেছেন।

ধারণার এই ধরনের বিশ্লেষণ বা উৎসসন্ধান যদি 'মতাদর্শে'র ইতিহাসে প্রথম পর্ব হয়, তবে তার দ্বিতীয় পর্ব মার্কস-এর সংজ্ঞায়নে বিধৃত 'মতাদর্শ' অর্থাৎ উৎপাদনের আর্থসামাজিক জটিলতা তথা অন্তর্বিরোধকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র শুদ্ধ ধারণার জাল বচনা—যার দৃষ্টান্ত হিসেবেই গ্রামশি ক্রচেড ও বেলজিয়ান সোশাল-ডেমোক্র্যাট তাত্ত্বিক অঁরি দে মান-কে চিহ্নিত করেন। ক্রোচে-র তাত্ত্বিক অবস্থানের দূরত্ব সত্ত্বেও ক্রোচে যে দে-মান-কে নিয়ে 'উদ্দীপিত' হন তা একটু বিচিত্র ঠেকলেও গ্রামশি তার 'বাস্তব যুক্তি' ধরে ফেলেন বিপ্লবী-মার্কসবাদের প্রতি তাঁদের বিরুদ্ধতায় একত্র হবার তাগিদে। মার্কস যাকে তাঁর আদি রচনায় 'মতাদর্শ' বলেছেন, সেই 'মতাদর্শে'রই শিকার হিসেবে গ্রামশি দেখেছেন নিকোলাই বুখারিন (১৮৮৮-১৯৩৮)-কে-তাঁর 'থিওরি অফ হিস্টরিকাল মেটিরিয়লইজমু : এ পপুলার ম্যানুয়াল অফ মার্কসিস্ট সোশিঅলজি' (১৯২১) গ্রন্থে—যা নিয়ে 'জেলখানার নোটবই'-এর অন্যত্র গ্রামশি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

'মতাদর্শ' শব্দটির ইতিহাসের তৃতীয় পর্বে শব্দটি 'পরিকাঠামো'র অন্তর্গত হয়ে যায়—'ইতিহাসগত' বিশ্লেষণ দাবি করে। বস্তুত গ্রামশি 'মতাদর্শ'-কে যে মর্যাদা ও তাৎপর্য দেন তাতে দেখা যায়, জনসাধারণ আর্থ-সামাজিক 'কাঠামোর' অন্তর্দ্বন্দ্বকে মতাদর্শের রূপকাঠামোয় উপলব্ধি

করেই একাধারে তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে যেমন দেখতে পান, তেমনই তাকে যেন আয়ত্ত করতে পেরেই বৈপ্লবিক তৎপরতা বা ক্রিয়ায় প্রবৃদ্ধ হন। আর্থসামাজিক বাস্তব থেকে মতাদর্শগত মূল্যায়ন, আবার তা থেকেই বৈপ্লবিক কর্মের প্রণোদনা—এই ক্রমান্বয়ই 'ঐতিহাসিক জোট'-এর চারিত্র্য লাভ করে।—শ. ব.]

বৈজ্ঞানিক আলোচনা

ইতিহাস-সমালোচনাত্মক সমস্যাগুলোকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে মামলার ধাঁচে দেখাটা ভুল—যেন একপক্ষে রয়েছে এক অভিযুক্ত আসামী আর অন্যপক্ষে সরকারি কৌঁসুলি, যার কাজ অভিযুক্তের দোষ প্রমাণ করা এবং পারলে তাকে বন্দীশালার আড়ালে সরিয়ে রাখা। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এ-কথাটা তো ধরেই নেওয়া হয় যে আলোচনার লক্ষ্য হল সত্যের সন্ধান ও বিজ্ঞানের প্রগতি, তাই তিনিই বোধ হয় সবচেয়ে 'উন্নতমান'-এর বৈজ্ঞানিক যিনি মনে করেন যে, প্রতিপক্ষের বক্তব্যের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে যা পারলে, হয়তো গৌণ অংশ হিসেবেই, তাঁর নিজস্ব নির্মাণের মধ্যেও গ্রহণ করা উচিত। ঐ প্রতিপক্ষের অবস্থানটা ও তাঁর যুক্তিগুলোকে বোঝা (কখনো কখনো এই প্রতিপক্ষ মানে কিন্তু সমগ্র অতীত চিন্তাই) এবং বাস্তবসম্মতভাবে মূল্যায়ন করার অর্থই হল মতাদর্শের (অবশ্যই শব্দটার খারাপ অর্থে) বেড়াজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করা—অর্থাৎ অন্ধ মতাদর্শগত আতিশয্য থেকে নিজেকে বাঁচানো। এটার মানেই হল এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যেটা 'সমালোচনাত্মক', যা বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে একমাত্র ফলপ্রসূ দৃষ্টিভঙ্গি।

দর্শন ও ইতিহাস

দর্শন বলতে কী বোঝায় বা কোনো বিশেষ যুগের দর্শন বলতে কী বোঝা উচিত, আর এইসব বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক যুগে দার্শনিকদের দর্শনের তাৎপর্যই বা কতখানি এইসব প্রশ্ন।

ক্রোচে ধর্মের সংজ্ঞা দিচ্ছেন এইভাবে: জীবনের সাধারণ মান হিসেবে গৃহীত কোনো এক বিশ্ববোধ (জীবনের সাধারণ মান এই কথাটা বর্তমানে কোনো কেতাবি অর্থে নিলে চলবে না, বাস্তব জীবনে বস্তুত অনুসৃত এই অর্থে নিতে হবে)। এই সংজ্ঞা মেনে নিলে বলা চলে যে, বেশির ভাগ মানুষই দার্শনিক, কারণ তারা সকলেই তো জীবনের বাস্তব কর্মে লিপ্ত হয় এবং এই বাস্তব কর্মে (অথবা তাদের আচার-আচরণের মধ্যে) একটা ধরনের বিশ্ববোধ, অর্থাৎ কিনা একটা দর্শন জড়িয়ে থাকেই। দর্শনের ইতিহাস, অর্থাৎ দার্শনিকদের দর্শনের ইতিহাস বলতে সাধারণত যা বোঝায় তা হল কোনো বিশেষ যুগে বর্তমান কোনো বিশ্ববোধকে বদলাতে, শোধরাতে বা তার পূর্ণতা সাধন করতে কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণী যে-সব প্রচেষ্টা চালায় ও যে-সব মতাদর্শগত আন্দোলনের সূচনা করে তার

ইতিহাস ; এই বদলানোর প্রক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু আচার-আচরণের যে সাধারণ মান তার বদলও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় ; অর্থাৎ, বাস্তব ক্রিয়াকর্মকে সমগ্রভাবে বদলানোই তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ধরনের দার্শনিকদের দর্শনের ইতিহাস ও যুক্তিন্যায় অনুধাবন করাই যথেষ্ট নয়। অন্তত পদ্ধতিগত দিকনির্দেশ হিসেবে দর্শনের ইতিহাসের অন্যান্য দিকেও নজর দেওয়া দরকার ; যেমন বিশাল কোনো জনগোষ্ঠীর চেতনায় ধৃত বিশ্ববোধ, খুব সংকীর্ণ কোনো শাসক (কিংবা বুদ্ধিজীবী) গোষ্ঠীর বিশ্ববোধ এবং শেষমেশ, দার্শনিকদের দর্শনের ইতিহাস ও এইসব নানা রকমের সাংস্কৃতিক বিন্যাসের মধ্যেকার সম্পর্কের দিকেও নজর দেওয়া দরকার। কোনো একটা যুগের দর্শন তো শুধুমাত্র কোনো কোনো বিশেষ দার্শনিকের দর্শন নয়, বা কোনো কোনো বিশেষ বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর দর্শনও নয়, বা জনগোষ্ঠীর কোনো কোনো বিশেষ বিস্তৃত অংশের দর্শনও নয়। এই সমস্ত উপাদান-গুলির সংযোগের এক প্রক্রিয়াই হল যুগের দর্শন, যার মধ্যে কোনো একটা সামগ্রিক প্রবণতা হয়তো তার পরিণতি খুঁজে পায়, এই পরিণতিই তখন সংঘবদ্ধ কর্মকাণ্ডের এক ধরনের সাধারণ মান হিসেবে দাঁড়িয়ে যায় আর একইভাবে তা হয়ে ওঠে মূর্ত ও পূর্ণাঙ্গ (সমাহৃত) 'ইতিহাস'।

কোনো এক ঐতিহাসিক যুগের দর্শন তাই সেই যুগেরই 'ইতিহাস' ছাড়া আর কিছু নয়, বিগত যুগের বাস্তবের ওপর এ-যুগের অধিনায়ক গোষ্ঠী যে ভূরি পরিমাণ পরিবর্তন চাপাতে পেরেছে তারই ইতিহাস বৈ আর কিছু নয়। এই অর্থে ইতিহাস ও দর্শন অবিভাজ্য : দুইয়ে মিলে একটা জোট। কিন্তু প্রকৃত দার্শনিক উপাদানগুলিকে 'পৃথক' করা যেতে পারে, সব স্তরেই তা করা দরকার : দার্শনিকদের দর্শন হিসেবে এবং অধিনায়ক গোষ্ঠীগুলির বিশ্ববোধ হিসেবে (দার্শনিক সংস্কৃতি) এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ধর্ম হিসেবেও। এবং এটাও দেখা যেতে পারে কীভাবে এর প্রত্যেকটা স্তরে আমরা বিভিন্ন রকমের মতাদর্শগত 'সংযোগ'-এর বিচার-বিশ্লেষণ করছি।

'সৃজনশীল' দর্শন

দর্শন কাকে বলে ? এটা কি শুধুমাত্র কোনো কিছু নেহাত গ্রহণ করার ব্যাপার, নাকি বড়জোর ঝাড়াই-বাছাই করে একটা বিন্যাসের ব্যাপার ? নাকি পুরোপুরি সৃজনশীল কোনো কাজ ? প্রথমে অবশ্য 'গ্রহণ', 'বিন্যাস', 'সৃজনশীল' এ-সব বলতে কী বোঝায় তার সংজ্ঞা দিতে হবে। 'গ্রহণোন্মুখ' কথাটার মধ্যে একটা বহির্জগতের নিশ্চিতির ধারণা লুকোনো রয়েছে, যেন সেটা একেবারে অপরিবর্তনীয়, যেটা 'সাধারণভাবে' বিদ্যমান, খুব মোটা দাগে, বস্তুগত অর্থে। 'বিন্যাস' কথাটাও 'গ্রহণোন্মুখ'-এর খুব কাছাকাছি। যদিও এর মধ্যে চিন্তাকর্মের একটা ইঙ্গিত রয়েছে, তবুও

সে-কর্ম খুব সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ। কিন্তু 'সৃজনশীল' বলতে কী বোঝায়? এর মানে কি তবে এই যে বহির্জগৎ চিন্তার সৃষ্টি? কোন চিন্তার এবং কার চিন্তার? এখানে স্বজ্ঞাবাদ-এর ফাঁদে পড়ে যাবার একটা বিপদ আছে এবং বস্তুত যে-কোনো রকমের ভাববাদ এই স্বজ্ঞাবাদের ফাঁদে পড়ে। স্বজ্ঞাবাদ ও চিন্তাকে মূলত গ্রহণ করার ব্যাপার ও ঝাড়াই-বাছাই করে বিন্যাস করার ব্যাপার বলে ভাববার মধ্যে যে যান্ত্রিকতার ধারণা লুকোনো আছে সে দুই বিপদকে একসঙ্গে এড়াতে গেলে প্রশ্নটাকে একটা 'ইতিহাসগত' ধাঁচে সাজাতে হবে এবং এই একই সঙ্গে 'ইচ্ছাশক্তি'কে দর্শনের একেবারে মূলে স্থাপিত করতে হবে। (এই 'ইচ্ছাশক্তি' অবশ্য শেষমেশ বাস্তব অথবা রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।) কিন্তু এ ইচ্ছাশক্তিকে অবশ্যই হতে হবে যুক্তিসহ, নিতান্ত খেয়ালখুশির ব্যাপার নয়; বস্তুগত অর্থে ঐতিহাসিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলেই এই ইচ্ছাশক্তি বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে, অথবা এ ইচ্ছাশক্তি নিজেই সার্বিক ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্ত, যখন তার ক্রম বাস্তবায়ন ঘটছে। শুরুতে যদি এই ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ কোনো ব্যক্তিবিশেষের মাধ্যমে ঘটে থাকে, তাহলে এর যুক্তিগ্রাহ্যতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এ ইচ্ছাশক্তি অনেকের মধ্যে সঞ্চারিত হল কিনা, স্থায়ীভাবে সঞ্চারিত হল কিনা তাই দিয়ে। এইভাবে এটা একটা সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হতে পারে, অর্থাৎ 'শুভবোধ'-এর একটা রূপ, বিশ্ব সম্বন্ধে এমন এক ধারণা যার নৈতিকতা তার কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ধ্রুপদী জর্মন দর্শনের উদ্ভবের আগে দর্শনকে মনে করা হত নিতান্ত গ্রহণোৎসুক কোনো ব্যাপার হিসেবে, বড়জোর একটা সাজানো-গোছানোর ব্যাপার হিসেবে, অর্থাৎ এমন একটা প্রক্রিয়া বিষয়ে জ্ঞানলাভের প্রশ্ন যেটা মানুষের বাইরে বস্তুগত অর্থে সক্রিয়। চিন্তার 'সৃজনশীলতা'র যে ধারণা তার সূচনা ধ্রুপদী জর্মন দর্শনে, তবে তার ধরনটা ছিল ভাববাদী, কিছুটা যেন কল্পচারী।

মনে হয় যে একমাত্র কর্মকাণ্ডের দর্শনই দর্শনকে এক পা এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। এটা করা সম্ভব হয়েছে ধ্রুপদী জর্মন দর্শনের ভিত্তিতে, অথচ স্বজ্ঞাবাদ-এর প্রবণতা এড়িয়ে; এবং এই প্রক্রিয়াতে চিন্তাকে ইতিহাসগত করে তুলতে হয়েছে, চিন্তাকে বিশ্ববিষয়ে ধারণারই একটা রূপ হিসেবে কল্পনা করে তা করা সম্ভব হয়েছে, আর সেই সঙ্গে ব্যাপক জন-সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া 'শুভবোধ'-এরও ধারক এই চিন্তা (যুক্তিগ্রাহ্যতা বা ইতিহাসময়তা ছাড়া এই ব্যাপক ছড়িয়ে পড়া ব্যাপারটা কল্পনাই করা যেত না); আর এই শুভবোধ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যাতে করে সে নিজেই সক্রিয় আচরণের একটা মান-এ রূপান্তরিত হতে পেরেছে। তাই 'সৃজনশীল' কথাটাকে ভাবতে হবে এক 'আপেক্ষিক' অর্থে, এমন এক চিন্তা প্রক্রিয়া হিসেবে যাতে করে বহু মানুষের অনুভব পরিবর্তিত হয়, আর সেই সূত্রে পরিবর্তন ঘটে বাস্তবেরও, যে বাস্তবকে এই বহু-র থেকে আলাদা করে

দেখা চলে না। সৃজনশীল এই অর্থেও যে, এর থেকে এমন একটা শিক্ষা পাওয়া যায় যে বাস্তবের অস্তিত্ব নিতান্ত স্বনির্ভর নয়, সে শুধুই নিজে নিজে বা নিজের জন্যই বিকশিত হয় না, যে-সমস্ত মানুষেরা এই বাস্তবকে পরিবর্তন করতে সক্ষম তাদের সঙ্গে এক সম্পর্কের মধ্যেই শুধু এই বাস্তবের অস্তিত্ব ও বিকাশ, ইত্যাদি।

দর্শনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

বিভিন্ন দর্শনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিয়ে প্রচুর চর্চা ও গবেষণা নিতান্ত অ-ফলপ্রসূ ও খানিকটা শখের ব্যাপার, কারণ এতে করে এই কথাটাই খেয়াল করা হয় না যে অনেক দার্শনিক-তন্ত্রই কেবলমাত্র বা অনেকটাই ব্যক্তিগত প্রকাশমাত্র। এইসব তন্ত্রে যে-অংশটাকে ঐতিহাসিক বলে ভাবা যেতে পারে সেটা অনেক সময়ে অতি সামান্য এবং প্রায়শ এমন সব বিমূর্ত জটিলতার আবর্তে তা নিমজ্জিত থাকে যার উৎস শুদ্ধ মননচারিতায়। এমনও বলা যেতে পারে যে কোনো একটা দর্শনের ঐতিহাসিক মূল্যের হিসাব করা যেতে পারে তার ব্যবহারিক কার্যকারিতা থেকে। এখানে 'ব্যবহারিক' শব্দটা আমরা তার প্রশস্ততম অর্থে ব্যবহার করেছি। এ-কথা যদি ঠিক হয় যে প্রত্যেক দর্শনই কোনো একটা সমাজের প্রকাশ তাহলে সেই দর্শনের কিছু প্রতিক্রিয়া তো ঐ সমাজের উপর থাকবে, ভালো হোক, মন্দ হোক ঐ দর্শনের কিছু প্রতিফল তো সমাজে দেখা যাবে। সমাজের উপর এই যে প্রতিক্রিয়া এটাই ঐ দর্শনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ধারণ করে। তাতেই বোঝা যায় ঐ দর্শন ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা থেকে কতটা পরিমাণে 'ঐতিহাসিক তথ্য' হয়ে উঠেছে।

দার্শনিক

এই সূত্রটাকে প্রথমেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে সব মানুষই 'দার্শনিক', অর্থাৎ, পেশাগত বা 'নির্দিষ্ট' অর্থে দার্শনিক আর বাকি সব মানুষের মধ্যে তফাৎটা 'গুণগত' নয়, কেবলমাত্র 'পরিমাণগত'। ('পরিমাণ' কথাটাকে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে বিশেষ এক অর্থে, পাটিগণিতে কথাটাকে যে-অর্থে ব্যবহার করা হয় তার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না; এখানে এর মানে হচ্ছে বেশি বা কম মাত্রায় 'সমতা', 'সঙ্গতি', 'যুক্তিসিদ্ধি', ইত্যাদি, অর্থাৎ কতগুলো গুণগত প্রকরণের পরিমাণ।) কিন্তু এই সূত্র প্রতিষ্ঠা করার পরেও দেখতে হবে তফাৎটা ঠিক কোথায়। চিন্তার যে-কোনো প্রবণতাকে, যে-কোনো সাধারণ ভঙ্গিমা ইত্যাদিকে, বা এমনকী 'বিশ্ব বা জীবন বিষয়ে ধারণা' মাত্রকেই 'দর্শন' বলে চিহ্নিত করা কিন্তু ঠিক হবে না। দার্শনিককে বলা যেতে পারে অ-কুশলী শ্রমিকের তুলনায় এক 'বিশেষজ্ঞ কর্মী', কিন্তু এটাও খুব ঠিক হবে না, কারণ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞ কর্মী ছাড়াও থাকে এঞ্জিনীয়ার, যে শুধু ব্যবহারিক দিক থেকে তার বৃত্তিটাকে জানে তাই না, তাকে তত্ত্বগত বা ঐতিহাসিক দিক

থেকেও জানে। পেশাগত বা ঐ নির্দিষ্ট অর্থের দার্শনিক যিনি তিনি যে শুধু নিশ্ছিদ্র যুক্তিসিদ্ধভাবে 'চিন্তা' করেন তাই না, অন্য লোকেদের থেকে তাঁর চিন্তার সঙ্গতি যে আরো গূঢ় এবং তাঁর চিন্তা যে আরো সুশৃঙ্খল শুধু তাই নয়, তিনি চিন্তার সমস্ত ইতিহাসটাও জানেন। অর্থাৎ, তাঁর সময় পর্যন্ত চিন্তার বিকাশের কার্যকারণ তাঁর জানা এবং কোনো একটা সমস্যা এতদিন পর্যন্ত সমাধানের সমস্ত চেষ্টার ফলে আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তিনি সেখান থেকে জেনে বুঝে সেটাকে বাগিয়ে ধরতে পারেন। বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের যা করণীয় চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁর করণীয় তা-ই।

অবশ্য, বিশেষজ্ঞ দার্শনিক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একটা তফাৎ আছে; তা এই যে, বিশেষজ্ঞ দার্শনিকেরা অন্যান্য বিশেষজ্ঞের তুলনায় একটু বেশি রকম যেন অন্য মানুষদের মতোই। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের বিশেষজ্ঞদের মতোই বিশেষজ্ঞ দার্শনিককেও ঐ একই রকম ছাঁচে ফেলে দেখা হয়েছে আর দার্শনিকের যে বিকৃত ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে তাও এই জন্যেই। প্রত্যেক মানুষ কীটপতঙ্গবিদ্যায় কিছু একটা প্রায়োগিক জ্ঞানে জ্ঞানী না হতে পারেন, কিন্তু কীটপতঙ্গবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ কেউ একজন থাকতেই পারেন, তেমনি সাধারণ মানুষজনের বেশির ভাগেরই হয়ত ত্রিকোণমিতির সঙ্গে কোনো সংস্রব নেই, তবু ত্রিকোণমিতির একজন বিশেষজ্ঞ থাকতেই পারেন। অত্যন্ত পরিশীলিত, অতীব বিশেষজ্ঞ জ্ঞান-নির্ভর এমন বিজ্ঞান নিশ্চয়ই আছে যা খুব প্রয়োজনীয়, তবে সেই কারণে যে তা খুব সাধারণের আয়ত্ত তা নয়। কিন্তু এমন মানুষের কল্পনা করা সম্ভব নয় যে দার্শনিকও নয়, যে চিন্তা করে না, কারণ চিন্তা মানুষেরই প্রকৃষ্ট স্বভাব, অন্তত যে-মানুষ জন্ম-বুদ্ধু নয়।

'ভাষা', ভাষাসমূহ ও কাণ্ডজ্ঞান

সাধারণভাবে যাকে 'কাণ্ডজ্ঞান' বা 'শুভজ্ঞান' বলা হয় তার আসল গুণটা কী? নিশ্চয়ই শুধুই এটুকু নয় যে, অন্তত নিহিতভাবে হলেও কাণ্ডজ্ঞান কার্যকারণ সূত্রের প্রয়োগ করে; বরঞ্চ আরো অনেক ছোট এই কথাটা খুব জরুরি যে, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের একটা বড় অংশ জুড়ে কাণ্ডজ্ঞান ঠিকমতো কারণটাকে চিহ্নিত করতে পারে, হাতেনাতে খুব সরলভাবে; মনগড়া সব আজগুবি সূক্ষ্ম তর্ক, আপাতগভীর, আধা-বৈজ্ঞানিক, আধিভৌতিক সব হাবিজাবির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। এটা খুব স্বাভাবিক যে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'কাণ্ডজ্ঞান'-কে খুব বড় করে দেখা হয়েছিল, কারণ তখন আরিস্ততল ও বাইবেল যার প্রতিভূ সেই গুরুবাদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া চলছিল। একথা তখনই স্বীকৃত হল যে বস্তুত 'কাণ্ড-জ্ঞান'-এর মধ্যেই এক রকমের 'নিরীক্ষাবাদ' রয়েছে এবং বাস্তবের প্রত্যক্ষ অবেক্ষণ, যদিও তা হয়ত নিতান্ত বস্তুভিত্তিক এবং খুব সীমাবদ্ধ। এমনকী আজও, ঐ ধরনের পরিস্থিতিতে কাণ্ডজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা একই অনুকূল

মনোভঙ্গি দেখতে পাই, যদিও আজকের অবস্থা সত্যিই অনেক বদলে গেছে এবং আজকের 'কাণ্ডজ্ঞান'-এর নিজস্ব জোর অনেক কম।

এ কথাটা প্রতিষ্ঠা করা গেছে যে, দর্শন হল বিশ্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা এবং দার্শনিক ক্রিয়াকর্মকে শুধুমাত্র 'ব্যক্তিমানুষ'-এর তরফে কিছু প্রত্যয়ের সুসঙ্গত শৃঙ্খলাপূর্ণ উপস্থাপনা হিসেবে দেখাও ঠিক না ; দর্শন হল সর্বোপরি এক সাংস্কৃতিক সংগ্রাম, চালু 'জনমানস'-কে রূপান্তরিত করবার এক সংগ্রাম এবং দার্শনিক উদ্ভাবনাগুলিকে ছড়িয়ে দেবার এক আয়োজন— এই উদ্ভাবনাগুলি নিজেরাই প্রতিপন্ন করবে যে তারা 'ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্য', অন্তত যতটুকু পরিমাণে তারা সরাসরি, অর্থাৎ ঐতিহাসিক এবং সামাজিকভাবে, সর্বজনীনতা লাভ করছে ততটুকু। এ সবের জন্যই সাধারণভাবে ভাষার প্রশ্ন এবং নির্দিষ্ট ভাষাসংক্রান্ত প্রশ্নাবলিকে সামনে রাখতে হবেই। এ প্রশ্নে ব্যবহারিকতাবাদীরা কী লিখেছিলেন তা পুনর্বিবেচনার[১] প্রয়োজন রয়েছে।

সাধারণত যেমন যে-কোনো দর্শনকে জৈবভাবে সুশৃঙ্খল করে উপস্থাপনার বেলায় দেখা যায়, তেমনি ব্যবহারিকতাবাদীদের ক্ষেত্রেও আলোচনার লক্ষ্যটা গোটা তন্ত্রটিই না কি তার নিতান্ত অপরিহার্য মর্মবস্তুটুকু এ কথাটা খুব পরিষ্কার করে বলা হয় না। আমার মনে হয় এটুকু নিরাপদে বলা যেতে পারে যে, ভাইলাতি ও অন্যান্য ব্যবহারিকতাবাদীদের কল্পনায় ভাষার যে-ধারণা তা গ্রাহ্য নয়। কিন্তু এ কথাও মনে হয় যে তাঁরা প্রকৃত প্রয়োজন ঠিকই বুঝেছিলেন এবং তা এমন যথার্থভাবে 'বর্ণনা' করেছিলেন যে তা প্রায় নির্ভুল ছিল, যদিও তারা হয়ত সমস্যাগুলিকে পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত করতে পারেন নি কিংবা সমাধানও ঠিক মতো দিতে পারেন নি। এটা বোধ হয় বলা চলে যে 'ভাষা' প্রকৃত অর্থে সামগ্রিক, এবং এর পেছনে স্থানে ও কালে কোনো একক বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে হবে এমন কোনো মানে নেই। ভাষার দ্যোতনার মধ্যে সংস্কৃতি ও দর্শনও এসে পড়ে (হয়ত মাত্র কাণ্ডজ্ঞানের স্তরেই), আর তাই 'ভাষা' বলতে যে তথ্য বোঝায় তা বস্তুত অনেক রকমের তথ্যের সমাহার যা কমবেশি জৈবভাবে সুসঙ্গতভাবে বিন্যস্ত। আরো খানিকটা এগিয়ে এরকমও বলা যায় যে বাঙ্ময় প্রতিটি সত্তারই রয়েছে এক নিজস্ব ভাষা, সেটাই হল বিশেষভাবে তার নিজের চিন্তা ও অনুভবের ভঙ্গি। বিভিন্ন স্তরে সংস্কৃতি এটাকে থাকে থাকে সাজিয়ে একত্রিত করে, কারণ ঐ বিভিন্ন মানুষেরা তো পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে, কখনো অনেক, কখনো বা কিছু কম ব্যক্তি মানুষেরা পরস্পরের প্রকাশভঙ্গিটা তো বুঝতে পারছে, হয়ত বিভিন্ন মাত্রায় ইত্যাদি। এই সেই সামাজিক-ঐতিহাসিক পার্থক্য ও প্রভেদ যেগুলো সাধারণ ভাষার মধ্যে

১। দ্রষ্টব্য : জিওভানি ভাইলাতি-র রচনাবলি (ফ্লরেন্স, ১৯১১),-র অন্তর্গত প্রবন্ধ : 'ইল্ লিংগুয়াদ জিও কোমে অস্তাকোলো আল্লা এলিমিনাৎসিয়োনে দি কনত্রাস্তি ইলুসরি' [অপাত অসঙ্গতি অপনোদনে বাধা হিসেবে ভাষা]

প্রতিফলিত হয়, এবং এর থেকেই উৎপন্ন হয় সেই সব 'বাধা' এবং 'ভুলের উৎস' যেগুলো আমরা ব্যবহারিকতাবাদীদের আলোচনায় পাই।

এর থেকে এমনকী বাস্তব (সংঘবদ্ধ) কাজকর্মের মধ্যেও 'সাংস্কৃতিক দিক'-এর গুরুত্বটা অনুধাবন করা যায়। ঐতিহাসিক কোনো কর্ম কিন্তু ঐ 'সংঘবদ্ধ মানুষের' পক্ষেই করা সম্ভব, আর তার পূর্বশর্ত হল এমন এক 'সাংস্কৃতিক-সামাজিক' ঐক্য যার মধ্যে নানা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বহু বিচিত্র বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাশক্তি সংহতি পায় এক অনন্য লক্ষ্যে ; এক সমধর্মী সামান্য বিশ্ববীক্ষা এই ঐক্যের ভিত্তি, তার প্রয়োগক্ষেত্র সাধারণও বটে, নির্দিষ্টও বটে, তা প্রকাশ পায় ক্ষণিক স্ফুরণের মতো (আবেগাপ্লুত পথে) অথবা বেশ স্থায়ীভাবে (যেখানে বৌদ্ধিক ভিত্তিটা এত দৃঢ়মূল, আত্মীকৃত এবং অভিজ্ঞতায় পোক্ত যে সেই চকিত আবেগ তখন দীপ্ত বাসনায় উত্তীর্ণ)। যেহেতু এরকমভাবেই ব্যাপারস্যাপারগুলো ঘটে থাকে তাই সাধারণভাবে ভাষার প্রশ্নটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ, সংঘবদ্ধভাবে এক অনন্য সাংস্কৃতিক 'আবহ' অর্জন করবার প্রশ্নটা।

এ সমস্যাকে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ও পদ্ধতির সঙ্গে মিশিয়ে দেখতে হবে এবং তা সম্ভব ; এই শিক্ষাচিন্তায় শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক হল সক্রিয় ও পারস্পরিক, যাতে প্রত্যেক শিক্ষকই সব সময়েই ছাত্র, আর প্রত্যেক ছাত্র সব সময়েই শিক্ষক। কিন্তু এই শিক্ষাগত সম্পর্ককে শুধুমাত্র 'বিদ্যাচর্চা'-র ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখলে চলবে না ; এই বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেই নতুন প্রজন্ম পুরনোর সংস্পর্শে আসে ও তাদের অভিজ্ঞতাকে ও ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধগুলিকে আত্মসাৎ করে এবং এইভাবে ঐ নতুন প্রজন্ম 'পরিণত' হয় ও তার নিজের এমন এক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় যা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে উন্নততর। এই ধাঁচের সম্পর্ক কিন্তু সমাজের সর্বত্র বিদ্যমান এবং অন্যদের সঙ্গে তুলনায় যে-কোনো ব্যক্তির বেলাতেই এ ধরনের সম্পর্কের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। এ সম্পর্ক বর্তমান বুদ্ধিজীবী ও অ-বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে, এলীট্ ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে, অগ্রগামী অনুগামীদের মধ্যে, পুরোগামী ও সেনাবাহিনীর বাকি অংশের মধ্যে। 'আধিপত্য'-এর প্রত্যেকটি সম্পর্কই নিশ্চিতভাবে এক শিক্ষাগত সম্পর্ক ; আর এর প্রকাশক্ষেত্র যে শুধুমাত্র কোনো এক জাতির অভ্যন্তরে তাই নয়, শুধু যে এক জাতির মধ্যেকার বিভিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে তাই নয়, এর প্রতিরূপ দেখতে পাওয়া যায় বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, দেশীয় ও মহাদেশীয় সভ্যতার জটিল আবর্তের মধ্যে।

তাহলে একথাও বলা যায় যে, কোনো বিশেষ দার্শনিকের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বও আসলে নির্ধারিত হয় তাঁর ও তিনি যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিবর্তন করতে চাইছেন এ দুয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা এক সক্রিয় সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে। ঐ পরিবেশ দার্শনিকের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এমনিভাবে তাঁর ওপরে আরোপ করে ক্রমাগত আত্মসমালোচনার এক প্রক্রিয়া।

এই পরিবেশই তাঁর 'শিক্ষক'। এই কারণেই আধুনিক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সব দাবি তুলেছেন তার মধ্যে অন্যতম জোরালো দাবি হল তথাকথিত 'চিন্তা ও চিন্তাপ্রকাশের স্বাধীনতা' ('সংবাদপত্রের স্বাধীনতা', 'সংঘ সংগঠনের স্বাধীনতা')। কারণ খুব সাধারণ অর্থে গুরু শিষ্যের যে-সম্পর্কের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে পারে একমাত্র তখনই যখন এই রাজনৈতিক অবস্থা বর্তমান, এবং তখনই কেবল আমরা এক নতুন ধরনের দার্শনিকের 'ঐতিহাসিক' উদ্ভব পেতে পারি। এঁকেই আমরা বলতে পারি 'গণতান্ত্রিক দার্শনিক', এই অর্থে যে তিনি এমন একজন দার্শনিক যিনি মনে করেন যে তাঁর ব্যক্তিত্ব শুধু তার নিজেরই শারীরিক ব্যক্তিসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, সাংস্কৃতিক পরিবেশের রূপান্তরে তা এক সক্রিয় সম্পর্ক। 'চিন্তাবিদ' যখন তাঁর নিজের চিন্তা নিয়েই তৃপ্ত, যখন তিনি 'মনোগতভাবে', অর্থাৎ বিমূর্তভাবে, স্বাধীন, তখন আজকাল কিন্তু তিনি এক ঠাট্টার পাত্র হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞান ও জীবনের ঐক্য বস্তুত এক সক্রিয় ঐক্য, এই ঐক্যের মধ্যেই কেবল চিন্তার স্বাধীনতা বাস্তব রূপ পেতে পারে; দার্শনিক ও তিনি যে সাংস্কৃতিক পরিবেশে কাজ করেন এবং যে-পরিবেশ থেকে তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় সমস্যা ও তার সমাধান সূত্রের সন্ধান পান এ দুয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক। অন্যভাবে বলতে গেলে এটাই তো দর্শন ও ইতিহাসের মধ্যেকার সম্পর্ক।

মানুষ কী?

দর্শনের আলোচনায় এটাই তো প্রাথমিক ও প্রধান প্রশ্ন। কীভাবে এর উত্তর দিতে হবে? এই সংজ্ঞা মানুষের নিজের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের মধ্যে। কিন্তু সেটা কি ঠিক? প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে 'ব্যক্তিমানুষ' কী তা আবিষ্কার করা সম্ভব। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ কী তা তো আর আমরা জানতে চাইছি না, সেটা জানতে গেলে জানতে হয় প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা মুহূর্তে প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ কী। ভাবতে গেলে মনে হয় যে 'মানুষ কী?' এই প্রশ্নের মধ্যে আমরা যা জানতে চাই তা এই: মানুষ কী হতে পারে? অর্থাৎ, মানুষ কি তার নিয়তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে কি 'নিজেকে গড়ে তুলতে পারে', সে কি তার নিজের জীবন নিজেই সৃষ্টি করতে পারে? অতএব আমাদের বক্তব্য এই যে মানুষ একটি প্রক্রিয়া, এবং ঠিক ঠিক বলতে গেলে, তার কর্মধারার এক প্রক্রিয়া। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে 'মানুষ কী?' এই প্রশ্নটা কোনো বিমূর্ত বা 'বস্তুগত' প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটার সূত্রপাত আমাদের চিন্তায়, আমাদের নিজেদের বিষয়ে এবং অন্যদের বিষয়ে চিন্তায়, এবং আমরা জানতে চাই, যা কিছু ভেবেছি ও দেখেছি তার প্রসঙ্গেই জানতে চাই, আমরা কী এবং আমরা কী হতে পারি; আমরা কি সত্যিই, এবং সত্যি হলে কতটুকু

পরিমাণে, আমরা 'নিজেদেরকে নিজেরাই গড়ে তুলি', আমাদের জীবন ও আমাদের নিয়তির কতদূর পর্যন্ত আমরা নিয়ন্তা। এবং আমরা জানতে চাই 'আজ', আজকের যা-কিছু পরিস্থিতি তারই মধ্যে এবং আমাদেরই দৈনন্দিন জীবনের পরিস্থিতিতে—যে-কোনো লোকের বা যে-কোনো জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নয়।।

জীবন ও মানুষ বিষয়ে ভাবনার কতগুলো বিশেষ ধরন থেকে প্রশ্নটার সূচনা এবং সেখানে এর মর্মার্থও নিহিত। তার মধ্যে প্রধান হল ধর্ম, একটা বিশেষ ধর্ম, তা হল ক্যাথলিক ধর্ম। বস্তুত আমরা যখন নিজেদেরকে প্রশ্ন করি 'মানুষ কী?' 'তার নিজেকে সৃষ্টি করায় বা তার যাপিত জীবনে তার নিজের ইচ্ছাশক্তি বা তার কর্মধারার গুরুত্ব কতটা?' তখন যা জানতে চাই তা হল: ক্যাথলিক ধর্ম কি জগৎ ও জীবন বিষয়ে এক সঠিক ধারণা? ক্যাথলিক হিসেবে, ক্যাথলিক ধর্মকে জীবনের মান হিসেবে গ্রহণ করে আমরা কি ঠিক করছি না ভুল করছি? প্রত্যেকের ভিতরে এরকম একটা অস্পষ্ট বোধ কাজ করে যে ক্যাথলিক ধর্মকে জীবনের মান হিসেবে গ্রহণ করে তারা ভুল করেছে, বোধটা এতদূর প্রবল যে কেউ নিজেকে ক্যাথলিক বলে ঘোষণা করলেও একেবারে জীবনযাপনের মান হিসেবে ক্যাথলিক ধর্মকে ঠিক গ্রহণ করে না। সর্বতোভাবে যিনি ক্যাথলিক, অর্থাৎ যিনি জীবনের প্রত্যেকটা কাজে ক্যাথলিক মান প্রয়োগ করেন তাঁকে মনে হবে খুব বিদ্ঘুটে। ভাবলে দেখা যাবে যে ক্যাথলিক ধর্মের এটাই সবচেয়ে কঠোর ও অনিবারণীয় এক সমালোচনা।

ক্যাথলিকরা অবশ্য বলবেন যে অন্য কোনো বিধানও পুঙ্খানুপুঙ্খ পালন করা হয় না, আর সে কথাটা তো ঠিকই। কিন্তু এর থেকে যা পাওয়া যায় তা এই যে ঐতিহাসিক দিক থেকে এমন কোনো বিশ্ববীক্ষার ধরন বা কাজের ধারা নেই যা সবার পক্ষে সমান। এটাই হল মোদ্দা কথা। এটা ক্যাথলিক ধর্মের পক্ষে কোনো যুক্তি নয়, যদিও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ক্যাথলিক বীক্ষা বা তার কর্মসূচিকে ঠিক এই উদ্দেশ্যেই সংগঠিত করা হয়েছে। অন্য আর কোনো ধর্মের ঠিক এই ব্যাপারটা নেই, যদিও তাদেরও হাতে একই পন্থা ছিল, একই শৃঙ্খলার প্রবণতা ছিল, একই ধরনের ধারাবাহিকতা ও কেন্দ্রিকতার ঝোঁকও ছিল। 'দার্শনিক' দৃষ্টিকোণ থেকে ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে যেটা অসন্তোষজনক সেটা হল এই যে সবকিছু সত্ত্বেও এই ধর্মমত ব্যক্তিমানুষের মধ্যেই পাপের মূল প্রবলভাবে নির্দেশ করে, অর্থাৎ এই ব্যক্তিমানুষকে পুরোপুরি সংজ্ঞাবদ্ধ ও সীমাবদ্ধ এক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করে। এ পর্যন্ত সব দার্শনিক মত সম্বন্ধেই একথাটা বলা চলে যে তারা ক্যাথলিক ধর্মের এই অবস্থানটাকেই বার বার প্রতিষ্ঠিত করে গেছে, তাদেরও মতে মানুষ তার নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আর তার মানসসত্তাই হল তার ব্যক্তিত্ব। ঠিক এই জায়গাতেই মানুষ সম্পর্কে ধারণার সংস্কারসাধন প্রয়োজন। আমি বলতে চাই যে মানুষকে দেখা দরকার সক্রিয়

সম্পর্কের একটা পর্যায় (একটা প্রক্রিয়া) হিসেবে যাতে ব্যক্তিত্ব হয়তো সবচেয়ে জরুরি, কিন্তু কখনোই একমাত্র উপাদান হিসেবে গ্রাহ্য হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রকাশিত যে মানবতা তার অনেক উপাদান: ১. ব্যক্তি; ২. অন্য ব্যক্তিরা; ৩. প্রাকৃতিক জগৎ। শেষের দুটি উপাদান যত সরল মনে হয় আসলে তত সরল নয়। কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে যে সম্পর্কে আবন্ধ হয় তা তো শুধুমাত্র ঘেঁষাঘেঁষি করে লেপটে থাকার ফল নয়. সম্পর্ক স্থাপিত হয় জৈবভাবে; সরলতম থেকে জটিলতম জৈব প্রকরণগুলির সঙ্গে ব্যক্তি যতটা লিপ্ত হয়ে যেতে পারে ততটাই ঐ জৈব সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই মানুষ প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্কে আবন্ধ হয় শুধুমাত্র প্রাকৃতিক জগতের অংশ হিসেবে নয়, সক্রিয়ভাবে, কাজ এবং কৃৎকৌশলের মধ্য দিয়ে। আরো: এই সম্পর্কগুলো যান্ত্রিক নয়। সম্পর্কগুলো সক্রিয় ও সচেতন। প্রত্যেক মানুষের ঐ সম্পর্কগুলো সম্বন্ধে যে বোধ আছে. তা সে গভীর বা অগভীর যাই হোক না কেন, সম্পর্কগুলোও বস্তুত তদনুরূপ হয়ে ওঠে। অতএব একথা বলা চলে যে আমরা প্রত্যেকে যতদূর পর্যন্ত নিজেরা যে-সব সম্পর্কের বেলায় মধ্যমণি হয়ে সম্পর্কগুলোকে পরিবর্তন করছি বা রূপান্তরিত করছি ততদূর পর্যন্তই আমরা প্রত্যেকে নিজেদেরকে পরিবর্তনও করছি। এই অর্থে প্রকৃত দার্শনিক তিনিই যিনি রাজনীতিবিদ. তা ছাড়া আর কেউই তা হতে পারেন না; দার্শনিক তিনি যিনি একজন সক্রিয় মানুষ হিসেবে পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করেন: পরিবেশ বলতে বোঝাবে সম্পর্কের সেই বুনোট যার মধ্যে আমরা সবাই অংশ নেবার জন্যে স্বতঃপ্রবিষ্ট হই। এই সম্পর্কের বুনোটই যদি হয় কারো ব্যক্তিসত্তা, তাহলে কারো ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলতে বোঝাবে ঐসব সম্পর্কের বিষয়ে তার চৈতন্য জাগ্রত হওয়া। আর তাহলে কারো ব্যক্তিত্বের রূপান্তর সাধন করা মানে হল ঐ সম্পর্কের বুনোটটাকেই রূপান্তরিত করা।

কিন্তু আগেই যেমন বলা হয়েছে, এ সম্পর্কগুলো তো সরল নয়। কিছু কিছু সম্পর্ক আবশ্যিক, আর কিছু স্বেচ্ছামূলক। উপরন্তু ঐ সম্পর্কগুলো সম্বন্ধে সচেতন হলেই, তা সে যতটুকুই গভীর হোক না কেন (অর্থাৎ কীভাবে রূপান্তর সাধন করতে হবে সেটা কম হোক বেশি হোক জানতে পারা) তা খানিকটা রূপান্তরিত হয়ে যায়। এমনকী ঐ আবশ্যিক সম্পর্কগুলোও, আবশ্যিক বলে জানলেই তাদের ধরন ও গুরুত্ব বদলে যায়। এই অর্থে জ্ঞানে নিহিত আছে ক্ষমতা। কিন্তু সমস্যাটা অন্য আর এক দিক থেকেও জটিল। সম্পর্কের বুনোটটাকে কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে এক নির্দিষ্ট তন্ত্র হিসেবে জানাটাই যথেষ্ট নয়। জানতে হবে তাদের ঠিকুজি সমেত, তাদের গড়ে ওঠার বৃত্তান্তের ভিতরে। কারণ কোনো ব্যক্তিই শুধুমাত্র বর্তমান সম্পর্কগুলোর সংশ্লেষ তো নয় শুধু, এই সব সম্পর্কের ইতিহাসেরও সমবায় বটে। সে যেন সমস্ত অতীতের সারসংক্ষেপ। কেউ হয়তো বলবেন যে একজন ব্যক্তির যা ক্ষমতা তা দিয়ে অতি সামান্য পরিবর্তনই

সে করতে পারে। খানিকটা দূর পর্যন্ত কথাটা সত্যি। কিন্তু একজন ব্যক্তি যদি এমন সবার সঙ্গে মিশতে পারেন যাঁরা ঐ একই পরিবর্তনটা চাইছেন, এবং কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনগুলো যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তি কিন্তু তখন বেশ অনেক গুণ বড় হয়ে দেখা দিতে পারেন এবং এমন একটা পরিবর্তন তিনি সাধন করতে পারেন যেটা আদৌ সম্ভব হবে বলে প্রথমে বুঝতে পারা যায় নি, অর্থাৎ সে তুলনায় পরিবর্তনটা অনেক বেশি মৌলিক।

একজন একক ব্যক্তি কিন্তু অসংখ্য সব 'সমাজের' অংশ হয়ে উঠতে পারেন, সাধারণভাবে যা মনে হয় তার থেকে অনেক বেশি। এই সব 'সমাজের' মধ্য দিয়েই কিন্তু ব্যক্তি মানবজাতির অংশ হয়ে ওঠেন। তাই যে-সব উপায়ে একক ব্যক্তি প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ হন তা সংখ্যায় যেমন অনেক, প্রকৃতিতেও তেমনি জটিল, কারণ কৃৎকৌশল বলতে তো শুধু শিল্পে প্রযুক্ত বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার সমষ্টিকেই বোঝায় না (সেটাই অবশ্য শব্দটির সাধারণ অর্থ), 'মানসিক' প্রকরণ এবং দার্শনিক জ্ঞানও তো এর অন্তর্ভুক্ত।

সমাজে বসবাসকারী হিসেবে ছাড়া যে মানুষকে কল্পনা করা যায় না এটা খুব একটা সাধারণ কথা। কিন্তু এমনকী ব্যক্তির স্তরেও, এ কথাটার সবগুলো আবশ্যিক তাৎপর্য খুঁজে বার করা হয় নি। কোনো নির্দিষ্ট মানবসমাজের পূর্বশর্ত যে কোনো নির্দিষ্ট 'বস্তুসমাজ', এবং কোনো নির্দিষ্ট বস্তুসমাজ থাকলেই যে তবে কোনো নির্দিষ্ট মানবসমাজের অস্তিত্ব সম্ভব এটাও খুব সাধারণ কথা। এ কথা সত্যি যে এখনো পর্যন্ত এই সব ব্যক্তি-অতিক্রান্ত অবয়বগুলির (মানবসমাজ ও বস্তুসমাজ দুইই) উপর যে-তাৎপর্য আরোপ করা হয়েছে তা খুবই যান্ত্রিক ও নির্ধারণধর্মী: এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও সেই কারণে। এ রকম একটা তত্ত্ব দাঁড় করানো খুব প্রয়োজন যেখানে এই সম্পর্কগুলোকে দেখা হবে সক্রিয় ও গতিশীল রূপে, যাতে এ কথা যথেষ্ট স্পষ্ট করে প্রতিপন্ন হয় যে, এই সব ক্রিয়াকর্মের উৎস হল ব্যক্তিমানুষের চৈতন্য, যে-মানুষ জানে, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করে, তারিফ করে, সৃষ্টি করে (যতদূর পর্যন্ত জানা, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করা, তারিফ করা, সৃষ্টি করা সম্ভব ইত্যাদি) এবং নিজেকে যে কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসেবে দেখে না, বরঞ্চ সে জানে যে অন্য সব মানুষের মাধ্যমে এবং যে-সব বস্তুর কিছুটা জ্ঞান সে স্বভাবতই আয়ত্ত করে সে-সব বস্তুরও মাধ্যমেও কি বিপুল সম্ভাবনায় সে ঋদ্ধ। ঠিক যেমন প্রত্যেক মানুষই দার্শনিক তেমনি প্রত্যেক মানুষই বৈজ্ঞানিকও বটে (ইত্যাদি)।

ফয়ারবাখ-এর সেই উক্তি 'মানুষ তো তাই যা সে খায়', বিচ্ছিন্নভাবে নিলে নানারকমে ব্যাখ্যা করা যায়। বোকা ও মোটা দাগের একটা ব্যাখ্যা হল: যে-কোনো একটা সময়ে মানুষ যে-সব জিনিসপত্র খাচ্ছে তাই দিয়ে তার প্রকৃতি নির্ধারিত হচ্ছে অর্থাৎ, মানুষের চিন্তাভাবনার ওপরে খাদ্যদ্রব্যের প্রভাব সরাসরি ও নির্ধারণধর্মী। আমাদেও (বোর্দিগা)-র মন্তব্যটা স্মরণ

করা যাক : কেউ বক্তৃতার আগে কী খেয়ে এসেছে জানা থাকলে বক্তৃতাটাকেই বুঝতে সুবিধা হয়। ছেলেমানুষের মতো কথা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গেও এর কোনো সম্পর্ক নেই ; কারণ মগজের পুষ্টি তো আর বীন্‌ বা ট্রাফ্‌ল্‌ থেকে হয় না, বরঞ্চ খাদ্যদ্রব্য যখন ভেঙে গিয়ে নির্গলিত গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পেঁছিয় তখন তার থেকে মগজের পরমাণুগুলো পুনর্গঠিত হয়— ঐ নির্গলিত খাদ্য আর পরমাণুর স্বরূপ মূলত 'একই প্রকৃতির'। ঐ কথাটা যদি সত্যি হত তাহলে ইতিহাসের দিকনির্দেশী উৎসমুখ হয়ে দাঁড়াত রান্নাঘর এবং বিপ্লবও তখন দেখা দিত জনগণের খাদ্যতালিকার মৌলিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। ঐতিহাসিক দিক থেকে বিপরীতটাই সত্য। বিপ্লব ও ইতিহাসের জটিল বিকাশই খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং মানুষের খাদ্য 'রুচির' নব নব পর্যায় সৃষ্টি করেছে। গমের নিয়মিত চাষের ফলে যাযাবরবৃত্তি শেষ হয়েছিল তা তো নয়, বরঞ্চ ঠিক উল্টো। যাযাবর-বৃত্তির পক্ষে প্রতিকূল পরিবেশের উদ্ভব হয়েছিল বলেই নিয়মিত কৃষির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।[২]

অন্যদিকে এ কথাও কিন্তু সত্যি যে 'মানুষ তো তাই যা সে খায়' ; অন্তত এটা তো ঠিক যে খাদ্যতালিকা সমগ্র সামাজিক সম্পর্কের অন্যতম একটা প্রকাশ, এবং প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠীরই আছে নিজস্ব মৌলিক খাদ্যাভ্যাস। কিন্তু ঠিক তেমনি একই রকমভাবে বলা যেত 'মানুষ তো তার পরিচ্ছদ', 'মানুষ তো তার বাসস্থান' অথবা 'মানুষ তো তার বিশেষ প্রজননের ধরন অর্থাৎ তার পরিবার'। কারণ, খাদ্যের সঙ্গে বাসস্থান, পরিচ্ছদ এবং প্রজনন হল সামাজিক জীবনের সেই সব উপাদানের অন্যতম যার মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে স্পষ্ট করে এবং সবচেয়ে ব্যাপ্তভাবে (অর্থাৎ, জনগণের স্তরে) প্রকাশিত হয়।

অতএব মানুষ কী এই সমস্যা সব সময়েই তথাকথিত 'মনুষ্যপ্রকৃতি'-র সমস্যা অথবা 'সাধারণভাবে মানুষের' সমস্যা। তাই এটা হল মানুষের বিজ্ঞান (দর্শন) গড়ে তোলবার একটা চেষ্টা এবং এর শুরু গোড়াতে একটা 'একত্ব'-এর ধারণা থেকে, এমন একটা বিমূর্ত ধারণা থেকে যার মধ্যে যা-কিছু 'মানবিক' তাই ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু ধারণা হিসেবে বা একত্বের কোনো তথ্য হিসেবে 'মানবিক' এই ধারণা কি যাত্রার শুরু না যাত্রার শেষ ? অথবা মানবিককে যাত্রার শুরু বলে ভাবলে গোটা প্রচেষ্টাই কি 'ধর্মতত্ত্ব' বা 'অধিবিদ্যা'-র তলানিতে পর্যবসিত হবে না ? দর্শনকে প্রাকৃতিক 'নৃতত্ত্ব'-এ দাঁড় করানো চলে না : মানুষ প্রজাতির প্রকৃতি তো মানুষের 'জীব-বৈজ্ঞানিক' প্রকৃতি থেকে প্রাপ্য নয়।

ইতিহাসের দিক থেকে জরুরি মানুষের যে-সব ভেদাভেদ তা কিন্তু জীব-

২। ফরাসিবাথের উক্তির সঙ্গে স্প্যাগেটি-র বিরুদ্ধে মারিনেত্তির প্রচার এবং তার পক্ষে বনু-তেম্পেল্লির বিতর্কমূলক সমর্থন তুলনীয়। এ সবই ১৯৩০-এর ঘটনা, বিশ্বসংকট যখন চরমে।

বৈজ্ঞানিক নয়—জাতি, মাথার খুলির আকার, চামড়ার রং ইত্যাদি। (কারণ 'মানুষ তো তাই যা সে খায়' এই বক্তব্য থেকেই ঐ ধরনের ভেদাভেদে পেঁছে যাওয়া যায়—ইয়োরোপে খায় গম, এশিয়ায় চাল ইত্যাদি—এবং বস্তুত আরো একটু এগিয়ে 'মানুষ তো তার বসতভূমিরই অনুরূপ' এই বক্তব্যেও দাঁড় করানো যায়, কারণ খাদ্যাভ্যাসের বেশির ভাগটাই কিন্তু সাধারণভাবে বাসভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।) 'জীববৈজ্ঞানিক ঐক্য'-ও কিন্তু ইতিহাসে খুব বড় কিছু হয়ে দেখা দেয় নি : মানুষই তো সেই প্রাণী যা নিজেকেই সবচেয়ে বেশি করে খেয়েছে তখনই যখন সে 'প্রকৃতির অবস্থা'-র খুবই কাছাকাছি ছিল এবং যখন সে কৃত্রিমভাবে প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির উৎপাদন বাড়াতে পারে নি। এখনও পর্যন্ত 'বিচারক্ষমতা' বা 'মন'ও সেই ঐক্য গড়ে তুলতে পারে নি ; তাদেরকে ঠিক 'একত্ববাচক' হিসেবেও মেনে নেওয়া চলে না, কারণ তারা তো বিশুদ্ধভাবে 'বিমূর্ত' এবং অনৈতিহাসিক ধারণা মাত্র। 'চিন্তাক্ষমতা' নয়, মানুষ প্রকৃত যা চিন্তা করে তাই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে বা তাদের মধ্যে ভেদাভেদও গড়ে তোলে।

'মনুষ্যপ্রকৃতি' যে 'সামাজিক সম্পর্কের জটিল বিন্যাস' এটাই সবচেয়ে সন্তোষজনক উত্তর। কারণ, হয়ে উঠতে পারার ধারণাটা এর অন্তর্গত (মানুষ 'হয়ে ওঠে', সে সামাজিক সম্পর্কের বদলের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত বদলায়), আর এ ছাড়া 'সাধারণভাবে মানুষ' এ ধারণাটা ঐ উত্তরের মধ্যে অস্বীকৃত। বস্তুত সামাজিক সম্পর্ক বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর দ্বারা প্রকাশিত হয়, প্রত্যেক গোষ্ঠীই অন্যের অস্তিত্ব পূর্বশর্ত হিসেবে মেনে নেয় এবং তাদের ঐক্য দ্বন্দ্বমূলক, বিমূর্ত নয়। মানুষ অভিজাত, কারণ মানুষ ভূমিদাসও বটে। এ কথাও বলা চলে যে মানুষের প্রকৃতিই হল 'ইতিহাস' (এবং এই অর্থে ইতিহাসকে যদি মানসসত্তা বলে ধরে নেওয়া যায়) তাহলে এও বলা চলে যে মানুষের প্রকৃতিই হল মানসসত্তা। তাহলে অবশ্য ইতিহাসের এই 'হয়ে ওঠা'-র তাৎপর্য মেনে নিতে হবে, যে-প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটে 'বিসদৃশ সাদৃশ্য (corcordia discors)-এর মধ্যে, আর এর সূত্রপাত কিন্তু ঐক্য থেকে নয়, সম্ভাব্য ঐক্যের কারণসমূহ এর মধ্যে আত্মস্থ থাকে মাত্র। এই কারণে 'মনুষ্য-প্রকৃতি'-র সন্ধান তো কোনো বিশেষ মানুষের মধ্যে মিলবে না, তাকে খুঁজে পেতে হবে মনুষ্য প্রজাতির সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে (এখানে লক্ষ করতে হবে যে আমরা যে 'প্রজাতি' শব্দটা ব্যবহার করছি, তা একটা প্রকৃতিগত শব্দ, এটা তাৎপর্যপূর্ণ) ; প্রত্যেক একক ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে-সব চরিত্রলক্ষণ সে-সব অন্য ব্যক্তিদের চরিত্রলক্ষণের প্রতিতুলনায় আরো স্পষ্ট ফুটে ওঠে। প্রচলিত দর্শনে যে 'মানসসত্তা'-র ধারণা পাওয়া যায় এবং জীববিজ্ঞানের 'মনুষ্য-প্রকৃতি'-র যে-ধারণা এ দুইই 'বৈজ্ঞানিক কল্পলোক' হিসেবে ব্যাখ্যা করা উচিত ; এই বৈজ্ঞানিক কল্পলোকই তো মনুষ্যপ্রকৃতির সেই বৃহত্তর কল্প-লোকের জায়গা নিয়েছিল, যে মনুষ্যপ্রকৃতিকে খুঁজে পেতে হয় ঈশ্বরের মধ্যে (অথবা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে মানুষের মধ্যে)। 'মানসসত্তা' ও 'মনুষ্য-

প্রকৃতি' এই দুই ধারণার মধ্যেই আছে ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন জন্মযন্ত্রণার প্রকাশ, এক যুক্তিবাদী ও অনুভূতিপ্রবণ কাঙ্ক্ষা যেন, ইত্যাদি। এ কথাও সত্যি যে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে মানুষের সদ্‌গুণের স্বীকৃতি আছে যে দুই ধর্মে এবং যুক্তি-বিচার ক্ষমতায় অংশীদার হিসেবে মানুষের সাম্যের স্বীকৃতি আছে যে দুই দর্শনে তারা সবই কিন্তু জটিল বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রকাশ (যথাক্রমে ধ্রুপদী যুগ ও মধ্যযুগের রূপান্তর); এই সব আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল ঐতিহাসিক বিকাশপরম্পরার সবচেয়ে জোরালো সংযোগসূত্র।

হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদই যে এই সব ঐতিহাসিক সংযোগমুহূর্তগুলির শেষ প্রতিফলন এবং ঐ দ্বান্দ্বিকতায় যে সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ সেই দ্বন্দ্বের নিরসনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ দ্বন্দ্ববাদও যে রূপান্তরিত হবে এক শুদ্ধ ধারণাগত দ্বন্দ্ববাদে, এই চিন্তাই সম্ভবত রয়েছে ক্রোচের মতো সেইসব আধুনিক দর্শনের মূলে যাদের ভিত্তি হলো কল্পধর্মীয়।

ইতিহাসে প্রকৃত 'সাম্য' অর্থাৎ 'মনুষ্যপ্রকৃতি'-র ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া 'মানসসত্তা'র বিকাশে কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে সেটা বুঝে নিতে হবে 'ব্যক্তিগত ও জন্মগত', 'প্রকাশ্য ও অন্তঃস্থ' সঙ্ঘ-সংগঠনের সেই তন্ত্রের মধ্যে যার সূত্রগুলো গাঁথা হয়ে আছে 'রাষ্ট্র'-এর মধ্যে ও বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। আমরা এখানে আলোচনা করছি 'সাম্য'-এর সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে যা কোনো সঙ্ঘের সদস্যারা নিজেদের মধ্যে অনুভব করেন এবং 'অসাম্য'-এর সেই বোধ যা এক সঙ্ঘের সদস্যারা অনুভব করেন অন্য সঙ্ঘের প্রসঙ্গে। এ হল সাম্য ও অসাম্যের সেই বোধ যা ব্যক্তিগতভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে সচেতন হলেই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এ ভাবেই আমরা পৌঁছে যেতে পারি 'দর্শন ও রাজনীতি', চিন্তা ও কর্ম, অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের দর্শনের সামান্য ধর্মে অথবা তাদের সমীকরণে। সবকিছুই রাজনৈতিক এমনকী দর্শন অথবা দর্শনসমূহ (তু. মতাদর্শের চরিত্র সম্বন্ধে টীকা) এবং ক্রিয়াশীল ইতিহাস, অর্থাৎ জীবনই হল একমাত্র 'দর্শন'। জর্মন শ্রমিকশ্রেণী যে জর্মন ধ্রুপদী দর্শনের উত্তরাধিকারী, এ-তত্ত্বকে এই অর্থেই ব্যাখ্যা করা চলে— এবং এ কথা বলা চলে যে ইলিচ (লেনিন)-এর আধিপত্যের তত্ত্ব ও তা প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা ছিল খুব বড় মাপের 'আধিভৌতিক' ঘটনা।

প্রগতি এবং ভবন ('বিকামিং')

এ দুটো কি আলাদা জিনিস না কি একই ধারণার বিভিন্ন দিক? প্রগতি একটা মতাদর্শ: ভবন ('বিকামিং') দার্শনিক ধারণা। 'প্রগতি' এক নির্দিষ্ট মানসিকতার উপর নির্ভরশীল, যে-মানসিকতা গড়ে উঠেছে ইতিহাস-নির্ধারিত কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান অবলম্বন করে: 'ভবন' এমন এক দার্শনিক ধারণা যার মধ্যে 'প্রগতি' অনুপস্থিত থাকতে পারে। প্রগতির ধারণার মধ্যে পরিমাণগত ও গুণগত পরিমাপের এক সম্ভাবনা নিহিত থাকে,

'আরো বেশি', 'আরো ভালো' কিছুর সম্ভাবনা। তাই কোনো একটা 'স্থির' বা স্থির করে নেওয়া সম্ভব এমন মানদণ্ড কল্পনা করে নিতেই হয়, কিন্তু এই মানদণ্ড অতীত থেকে পাওয়া, অতীতের কোনো একটা পর্যায় থেকে, অথবা কোনো কোনো পরিমাপযোগ্য বিশেষ দিক থেকে, ইত্যাদি। (প্রগতির একটা মেট্রিক পদ্ধতি কল্পনা করতে হবে তা অবশ্যই নয়)।

প্রগতির ধারণার সূত্রপাত হয়েছিল কীভাবে? এর সূত্রপাত কি কোনো মৌলিক ও যুগান্তকারী ঘটনা? তা-ই বলেই মনে হয়। প্রগতির ধারণার উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন একটা ব্যাপক চেতনা যে সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের সম্পর্কে পৌঁছনো গেছে (প্রকৃতির ধারণার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে আকস্মিকতা ও 'অযৌক্তিকতা'), যাতে করে সমগ্র মানবসমাজ তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক বেশি নিশ্চিত হতে পারে এবং তার সমগ্র জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এমন সব পরিকল্পনা 'যুক্তি-সিদ্ধ'ভাবে গ্রহণ করতে পারে। প্রগতির ধারণাকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে লেওপার্দি'কে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের আশ্রয় নিতে হয়েছিল, অর্থাৎ সেই সব প্রাকৃতিক ঘটনার কথা ভাবতে হয়েছিল যেগুলো এখনো পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য ও প্রতিকারহীন। কিন্তু অতীতে এই ধরনের অপ্রতিরোধ্য শক্তি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এ সবের প্রকোপ আরো অনেক বেশি ছিল, খানিকটা দূর পর্যন্ত তো এগুলোকে এখন জয় করা গেছে।

এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে প্রগতি বেশ একটা গণতান্ত্রিক মতাদর্শ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ কথাতেও কোনো সন্দেহ নেই যে আধুনিক নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠনে এই প্রগতির ধারণার একটা রাজনৈতিক ভূমিকাও ছিল, ইত্যাদি। এটাও নিশ্চিত যে এই ধারণা আজ আর তার মধ্যগগনে নেই। কিন্তু এ কথাটাকে বুঝব কীভাবে? এ-অর্থে নয় যে বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতি ও আকস্মিকতাকে জয় করতে পারার সম্ভাবনার ওপর মানুষের বিশ্বাস আজ চলে গেছে, এ কথাটাকে বুঝতে হবে 'গণতান্ত্রিক' অর্থে। অন্যভাবে বলতে গেলে প্রগতির স্বীকৃত 'ধ্বজাধারী'রা এই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় আজ অপারগ কারণ বর্তমানের সংকট ও বেকারি ইত্যাদি বিনাশী শক্তিগুলির বিকাশের জন্য তারাই দায়ী, এর প্রত্যেকটিই অতীতের বিনাশী শক্তিগুলির মতোই বিপজ্জনক। (অতীতের ঘটনাবলি ইতিমধ্যে 'সামাজিক ভাবে' বিস্মৃত, সমাজের সব অংশের কাছে হয়তো নয়: কৃষকেরা 'প্রগতি' ব্যাপারটা এখনো বোঝে না; তারা নিজেদেরকে এখনো অনেকটাই প্রাকৃতিক শক্তি ও আকস্মিকতার বশ বলে মনে করে, আর তাই 'জাদু', মধ্যযুগীয় ও ধর্মীয় এক ধরনের মানসিকতা এখনো তাদের মধ্যে বর্তমান।) তাই প্রগতির ধারণা নিয়ে যে-সংকট তা কিন্তু ধারণাটির নিজস্ব কোনো সংকট নয়, ঐ ধারণার ধ্বজাধারীদের সংকট, যাঁরা নিজেরাই 'প্রকৃতি'-র অংশ হয়ে উঠেছেন, যাঁদের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই অবস্থায় প্রগতির ধারণার ওপর কোনো আক্রমণ নিতান্ত মতলবী ও স্বার্থ-প্রণোদিত।

ভবন [বা হয়ে ওঠা]-এর ধারণার থেকে কি প্রগতির ধারণাকে আলাদা রাখা যায়? মনে হয় না। তাদের জন্মলগ্ন একই, রাজনীতি হিসেবে (ফ্রান্স) ও দর্শন হিসেবে (জর্মনিতে: কালক্রমে ইতালিতেও)। 'ভবন'-এর ধারণায় 'প্রগতি'-র ধারণার সবচেয়ে প্রমূর্ত অংশটাকে বাঁচাবার চেষ্টা আছে—গতি, এবং বস্তুত দ্বান্দ্বিক গতি। এটার মধ্যে বিকাশের গভীরতাও খানিকটা নিহিত আছে কারণ প্রগতিকে বিবর্তনের মতো আরো আকাঁড়া ধারণার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার একটা ঝোঁক রয়েছে।

১৯৩২-এর ৪ ডিসেম্বরের **ল' ইতালিয়া লেতেরারিয়াতে** প্রকাশিত আলদো কাপাসো-র একটা ছোট নিবন্ধ থেকে আমি দু-একটা অংশ উদ্ধৃত করছি যেখানে এই সব সমস্যা নিয়ে প্রচলিত সন্দেহের কথা আছে:

> এখানেও উনিশ শতকের ধাঁচের মানবিকতাবাদী ও গণতান্ত্রিক আশাবাদের প্রতি এক ধরনের বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গির সাক্ষাৎ মেলে, এবং 'প্রগতিময় ভবিতব্য'-এর কথা বলায় লেওপার্দি তো একা নন। কিন্তু ভাববাদী 'ভবন'-এর ধারণার মধ্যে 'প্রগতি'-র জন্য বেশ জবর গোছের একটা ছদ্মবেশ বানানো গেছে, এই ভবনের ধারণা আমাদের মতে যতটা না জর্মন তার চেয়ে বেশি ইতালীয় হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কিন্তু অনন্তকাল ধরে বিকাশমান যে হয়ে ওঠা তার অর্থটা কী দাঁড়াবে, এমন একটা উন্নতি যা কখনোই কোনো প্রকৃত বস্তুর সঙ্গে তুলনীয় হবে না? 'চূড়ান্ত' স্থির কোনো পর্বের লক্ষণচিহ্ন কিছু না থাকায় এই 'উন্নতি'-র এককও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। উপরন্তু, অস্তিতায় আস্থা রাখার বিলাসিতার মতো কোনো স্তরেও আমরা পৌঁছতে পারি না—আমরা যারা বস্তুত বেঁচে আছি—ধরা যাক রোমক বা আদি খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের চেয়ে ভালো, কেননা উন্নতি কথাটাকে শুদ্ধ ভাববাদী অর্থে নিলে, এটা খুবই সম্ভব যে আমরা সবাই 'অবক্ষয়ী' আর সেই অতীতে তাঁরা সবাই প্রায় ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ বা এমনকী সব দিব্য পুরুষ। অতএব, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, অনন্তকালব্যাপী ঊর্ধ্বারোহণের যে-ধারণা ভবনের ধারণার মধ্যে অন্তর্নিহিত হয়ে আছে সেটা কিন্তু খানিকটা অযৌক্তিক, কারণ যদি ধরে নেওয়া যায় যে নৈতিক 'উন্নতি' হল ব্যক্তিস্তরের ঘটনা তাহলে ব্যক্তিস্তরে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিচার করে এটা দেখানো খুবই সম্ভব যে পরবর্তী যুগটা খারাপ ·· আর তখন হয়ে ওঠার আশাবাদী ধারণাটা ভাববাদী বা বাস্তব দুই স্তরেই অলীক হয়ে যায় ··· একথা তো সুবিদিত যে ক্রোচে চিন্তাবিদ হিসেবে লেওপার্দিকে কোনো মূল্যই দেন নি, তাঁর বক্তব্য ছিল যে নৈরাশ্যবাদ ও আশাবাদ হল সেণ্টিমেণ্টাল ব্যাপার, কোনো দার্শনিক মনোভঙ্গি নয়। কিন্তু নৈরাশ্যবাদীর দিক থেকে এ কথা মনে হতে পারত যে ভবন-এর ভাববাদী ধারণাও তো আশাবাদ ও সেণ্টিমেণ্টের ব্যাপার, কেননা নৈরাশ্যবাদ ও আশাবাদ দুইই ইতিহাসকে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে

দেখে (যদি না অবশ্য আশাবাদ লোকোত্তরের প্রতি কোনো আস্থায় প্রাণিত হয়) : যেন নদীর এক প্রবাহ যেখানে নদীমুখ কিছু নেই আর তারপর মনের ঝোঁক অনুসারে তারা কেউ জোরটা দেয় 'নদী' এই শব্দের ওপর, আর কেউ 'নদীমুখ কিছু নেই' এই শব্দগুচ্ছের ওপর। এক পক্ষের মতে : নদীমুখ কিছু নেই, কিন্তু সঙ্গতিময় কোনো নদীতে যেমনটি হয়, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের নিরবচ্ছিন্ন ধারা এবং গতকাল থেকে আজ ক্রমোন্নত এক রূপে নিরন্তর বেঁচে থাকা ··· আর অন্য পক্ষের মতে : নদীর নিরবচ্ছিন্নতা আছে বটে, কিন্তু নদীমুখ কিছু নেই ··· সংক্ষেপে বলতে গেলে, আশাবাদও নৈরাশ্যবাদের মতো একটা সেন্টিমেন্ট একথা যেন ভুলে না যাই। কাজেই শেষ পর্যন্ত এটা দাঁড়ায় যে প্রত্যেক দর্শনেই তার মনোভঙ্গিকে সেন্টিমেন্টালভাবেই দাঁড় করাতে হয়, 'নৈরাশ্যবাদ বা আশাবাদ' এই হিসেবে ইত্যাদি।

কাপাসোর চিন্তা খুব সঙ্গতিপূর্ণ নয়, কিন্তু তাঁর চিন্তার ধরনটা খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটা মনোভঙ্গির পরিচায়ক, খুব নাকউঁচু গোছের আর অনিশ্চিত, খুব ছাড়া ছাড়া আর পল্লবগ্রাহী আর প্রায়শ বৌদ্ধিক সততাহীন, আনুগত্যহীন এবং এমনকী প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিক যুক্তি-কাঠামো বঞ্চিতও বটে।

প্রশ্নটা তাই সেই একই : মানুষ কী? মনুষ্যপ্রকৃতির স্বরূপ কী? মনস্তাত্ত্বিক বা কাল্পনিক দিক থেকে মানুষের সংজ্ঞা যদি হয় ব্যক্তিমানুষ, তাহলে এই প্রগতি ও ভবনের সমস্যাগুলো আদৌ সমাধানসম্ভব নয়, সমস্যাগুলো তখন নিতান্ত শাব্দিক। কিন্তু মানুষের ধারণাটা যদি সামাজিক সম্পর্কের বুনোট হিসেবে নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে মানুষে মানুষে সময়ান্তরের তুলনা অসম্ভব, কারণ তখন সংলগ্ন মানুষগুলি তো, বৈসাদৃশ্যের কথা ছেড়ে দিলেও নিতান্ত ভিন্ন বস্তু। উপরন্তু মানুষ যেহেতু তার বাস্তব জীবনের অবস্থার সমষ্টিও বটে, তাই অতীত ও বর্তমানের সংখ্যাগত পরিমাপও সম্ভব, কারণ প্রকৃতি ও আকস্মিকতার ওপর মানুষ কতটা প্রভুত্ব স্থাপন করতে পেরেছে সেটা তো পরিমাপ করা সম্ভব। সম্ভাবনা বাস্তব নয়; কিন্তু তা নিজেই তো একটা বাস্তব। মানুষ একটা কিছু করতে পারে বা পারে না এটা কিন্তু বাস্তবে প্রকৃত কী করা গেল তার মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জরুরি। সম্ভাবনা মানে 'স্বাধীনতা'। স্বাধীনতার মাত্রা মানুষের ধারণার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। মানুষ যে খিদের তাড়নায় মারা যাবে না এই বস্তুগত সম্ভাবনা আর মানুষ যে বস্তুত খিদের তাড়নায় মারা যায় এ কথা দুটোর কিন্তু তাৎপর্য আছে, অন্তত তাই তো মনে হয়। কিন্তু বস্তুগত অবস্থার অস্তিত্ব, সেই সম্ভাবনা বা স্বাধীনতার অস্তিত্ব এটাও এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট নয় : এই অস্তিত্বগুলোকে 'জানা' প্রয়োজন এবং কী করে তাদের ব্যবহার করতে হবে সেটাও জানা প্রয়োজন। আর সেগুলোকে ব্যবহার করতে চাইতেও হবে। এই অর্থে মানুষ প্রমূর্ত ইচ্ছাশক্তি, অর্থাৎ বিমূর্ত

ইচ্ছা বা একান্ত প্রণোদনা-র এমন কার্যকর প্রয়োগ যাতে করে প্রত্যক্ষ উপায়ে ঐ সব ইচ্ছার বাস্তব রূপগ্রহণ সম্ভব হয়। মানুষ তার নিজের ব্যক্তিত্ব নিজেই সৃষ্টি করে : ১. নিজের একান্ত প্রণোদনা বা ইচ্ছাশক্তিকে নির্দিষ্ট এবং প্রমূর্ত ('যুক্তিসিদ্ধ') কোনো দিকে চালিত করে ; ২. যে-সব উপায়ে এই ইচ্ছাশক্তিকে অনির্দেশ্য না রেখে প্রমূর্ত ও নির্দিষ্ট করে তোলা যাবে সেই সব উপায়গুলিকে চিহ্নিত করে ; ৩. নিজের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে সবচেয়ে ফলপ্রসূভাবে সেই অবদানের চেষ্টা করে যার মধ্যে দিয়ে ঐ ইচ্ছা-শক্তির বাস্তব রূপায়নের উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টিতে সক্ষম সেই বুনোট রূপান্তরিত হতে পারে। মানুষের ধারণাটাকে গ্রহণ করতে হবে এমন এক ঐতিহাসিক জোট হিসেবে যার মধ্যে বিশুদ্ধ ব্যক্তি ও তার মনোগত উপাদান-সমূহ এবং জনসমষ্টি ও বস্তুগত উপাদানগুলি এক সক্রিয় সম্পর্কের বিন্যাসে নিবদ্ধ থাকে। বাইরের পৃথিবীকে, সাধারণ সম্পর্কের ঐ বিন্যাসকে রূপান্তরিত করতে গেলে নিজেকে অন্তঃক্ষমতাসম্পন্ন করে তুলতে হয়, নিজের বিকাশসাধন করতে হয়। নৈতিক 'উন্নতি' যে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এ ধারণা অলীক এবং ভ্রান্ত : ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার পেছনে বিভিন্ন উপাদানের যে-সংশ্লেষ তা 'ব্যক্তিগত' , কিন্তু সেই ব্যক্তিগত সংশ্লেষ বাস্তব রূপ গ্রহণ করতে পারে না বা বিকশিত হতে পারে না যদি না সক্রিয় রূপান্তরকামী কোনো বহির্মুখী সম্পর্ক স্থাপিত হয় প্রকৃতিরও সঙ্গে এবং ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় অন্য মানুষজনের সঙ্গে, বিচিত্র সব সামাজিক বৃত্তের মধ্যে যেখানে বাঁচতে হয় একজন মানুষকে, এবং এমনিভাবে পেঁছে যেতে হবে সর্বব্যাপ্ত সেই সম্পর্কে যা ধারণ করে সমগ্র মানব প্রজাতিকেই। এই কারণেই বলা চলে যে মানুষ একান্তভাবে 'রাজনৈতিক' কেননা সচেতনভাবে অন্য মানুষকে রূপান্তরিত করে তাকে নির্দিষ্ট দিকে চালিত করেই তবে মানুষ তার নিজের 'মানবতা', তার 'মনুষ্যপ্রকৃতি'-কে অর্জন করে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

তথাকথিত 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ'-এর প্রশ্নে, অর্থাৎ ইতিহাসের প্রত্যেক পর্বেই জগতে ও ঐতিহাসিক জীবনে ব্যক্তির স্থান সম্পর্কে যে মনোভাব দেখা গেছে আজ যাকে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ' বলে তার সূত্রপাত হয় মধ্যযুগ-পরবর্তী সাংস্কৃতিক বিপ্লবে (রেনেসঁস ও রেফরমেশন) এবং এর মধ্যে ঐশ্বরিকতা ও সেই কারণে ধর্মসংঘের প্রতি এক নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত আছে ; এখানেই ঘটল লোকোত্তরবাদ থেকে নিহিতার্থবাদ-এ বিবর্তন।

ক্যাথলিক এবং প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার সমালোচনার বদলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের বিরুদ্ধে বিরূপতা যা প্রায় এক তিক্ত দীর্ঘ বিলাপের পর্যায়ে পেঁছে যায় ; 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের' যে-রূপ আজ ইতিহাস-বিরোধী হয়ে উঠেছে, সেটাই প্রকাশ পায় ধনের ওপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠায়, অথচ যে-ধনের উৎপাদন ক্রমশ আরো বেশি করে সামাজিক প্রক্রিয়া হয়ে উঠছে। ব্যক্তি-

স্বাতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে হাহুতাশ করার অধিকার যে ক্যাথলিকদের সবচেয়ে কম এ কথাটাকে বোঝা যাবে এই থেকে যে রাজনৈতিকভাবে তারা বরাবর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি মেনেছে একমাত্র সম্পত্তির জোরে ; অর্থাৎ মানুষ তার নিজের গুণে যথেষ্ট মর্যাদাবান নয়, তার পূর্ণতা ঘটে একমাত্র পার্থিব দ্রব্য সম্ভারে। জনগণনা কর দেন এই কারণে নির্বাচক হবার অধিকার দিলে বা একজন লোকের যতগুলো রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সম্প্রদায়ে সম্পত্তির মালিকানা আছে ততগুলো সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হবার অধিকার দিলে 'বস্তু'-র কাছে 'মানসসত্তা'র অবমূল্যায়ন ঘটে, এ ছাড়া এর আর কী মানে হতে পারে? সম্পত্তির অধিকারী মানুষকেই যদি একমাত্র 'মানুষ' বলে মেনে নিতে হয়, আর সবার পক্ষে সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যদি অসম্ভব হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সম্পত্তির এমন কোনো ধরনের সন্ধান করা কেন মানসসত্তা-বিরোধী হবে যেখানে জড় শক্তিগুলি ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা দেয় ও তাকে গড়ে তোলে? বস্তুতপক্ষে, যদিও একথা কার্যত মেনে নেওয়া হয়েছে যে মনুষ্য 'প্রকৃতি'-র অবস্থান ব্যক্তির মধ্যে নয় তাকে খুঁজে পেতে হবে মানুষ এবং জড় শক্তিগুলির ঐক্যবোধের মধ্যে। তাই ব্যক্তিত্ব জয় করবার পথে জড়শক্তির উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা[৩] একটা উপায়, হয়তো সর্বোত্তম উপায়।

মনুষ্যপ্রকৃতির ধারণার বিচার

'সাম্য' বোধের উৎস : ধর্ম ও তদন্তর্গত পিতৃপ্রতিম-ঈশ্বর এবং সন্তান-প্রতিম মানুষ, এই ধারণা, এবং সেইহেতু তারা সমান, এই ধারণা দর্শনের এই সূত্র—[মানুষের চিন্তাক্ষমতার সামান্য ধর্মে আবেদন জানায় বলে দর্শন একান্তভাবে গণতান্ত্রিক ; তাই অভিজাততন্ত্র যে একে পরম শত্রুভাবাপন্ন বলে মনে করে তার মধ্যে ভুল কিছু নেই। জীববিজ্ঞানে মানুষ 'প্রজাতির' সমস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'প্রাকৃতিক' (মনো-শারীরিক) সমতা মেনে নেওয়া হয়েছে ; প্রত্যেকেই একই ভাবে জন্মগ্রহণ করে, ইত্যাদি : মানুষ মরণশীল : জন একজন মানুষ ; জন মরণশীল। জন সমস্ত মানবজাতির সমার্থক। এখান থেকেই পাওয়া যায়, 'আমরা সবাই নগ্নঅবস্থায় জন্মগ্রহণ করি' এই সূত্রের তথ্যভিত্তিক-বৈজ্ঞানিক (লোককথা ইব তথ্য বিজ্ঞান) উৎস।

'দি ইনোসেন্স অফ ফাদার ব্রাউন'-এ ডাকহরকরা ও সেই ছোট মানুষটি যে কিনা ধুরন্ধর সব যন্ত্র বানাত তাদের নিয়ে চেস্টারটনের গল্পটা স্মরণ করা যাক। গল্পটাতে এই ধরনের একটা কথা আছে ; 'এক বৃদ্ধা এক

৩। সম্প্রতি তরুণ ফরাসি ক্যাথলিক লেখক দানিএল রোপস্-এর 'ল্যো মঁদ স' আম' (পারী, প্লোঁ, ১৯৩২) বইটির ওপর অজস্র প্রশংসা বর্ষিত হয়েছে ; বইটি ইতালীয়তেও অনূদিত। এই প্রসঙ্গে বিচার করে দেখা দরকার সেই সমগ্র ধারণার পরম্পরা, যার মধ্য দিয়ে এক ধরনের চুলচেরা বিতর্কের মধ্য দিয়ে অতীতের অবস্থানগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে, যেন তারা সমকালের বিচারেও গুরুত্বপূর্ণ।

পুরনো প্রাসাদে কুড়িজন পরিচারক নিয়ে বসবাস করেন। আর এক মহিলা এই বৃদ্ধার কাছে বেড়াতে আসেন এবং বৃদ্ধা আগন্তুককে বলেন, "সব সময়ে এত একলা লাগে'। এইবার ডাক্তারবাবু জানান দেন যে;প্লেগ ছড়াচ্ছে, রোগ সংক্রমণের ভয় আছে, ইত্যাদি আর তখন মহিলা বলেন, এখানে এত লোকে গাদাগাদি করে থাকি।' (চেস্টারটন এটাকে নেহাতই তাঁর উপন্যাসের প্লটের কারণেই ব্যবহার করেন)।

দর্শন ও গণতন্ত্র

আধুনিক গণতন্ত্র ও আধিভৌতিক বস্তুবাদ এবং ভাববাদের নির্দিষ্ট কয়েকটি রূপের সমান্তরাল বিবর্তন লক্ষ করা যেতে পারে। আঠারো শতকের ফরাসি বস্তুবাদীরা সাম্যের সন্ধান করেছিলেন মানুষকে প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটা পর্যায়ে নামিয়ে এনে, সে যেন জীববিজ্ঞানের কোনো প্রজাতির এক ব্যষ্টি মাত্র; সামাজিক ও ঐতিহাসিক কোনো চরিত্রে যেন তাকে আলাদা করে চেনা যাবে না, যদি কোনো ফারাক থাকে তবে তা সহজাত প্রতিভায়, আর তাই সে নিজেরই প্রজাতির অন্যদের সঙ্গে একান্তভাবে সমান। এই ধারণাটাই প্রচলিত কাণ্ড-জ্ঞানের মধ্যে ঢুকে গেছে, যেখানে আমরা হামেশাই এই উক্তিটা পাই যে 'আমরা তো সবাই নগ্ন অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করি' (যদি না অবশ্য কাণ্ড-জ্ঞানের এই কথাটা বুদ্ধিজীবীর মতাদর্শগত আলোচনার পূর্ববর্তী হয়ে থাকে)। ভাববাদে দর্শনকে সর্বোত্তম গণতান্ত্রিক বিজ্ঞান বলে ঘোষণা করা হয়, কারণ দর্শন সব মানুষের মধ্যেই সামান্য ধর্মরূপে নিহিত যুক্তিক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেয়। এই থেকেই বোঝা যায় কেন অভিজাতবর্গ দর্শনের প্রতি একটা ঘৃণার মনোভাব পোষণ করতেন এবং কেনই বা প্রাচীন জমানার শ্রেণীবর্গ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর আইনগত বাধানিষেধ আরোপ করেছিলেন।

গুণ ও পরিমাণ

কোনো গুণ ছাড়া যেহেতু পরিমাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, অথবা পরিমাণ ছাড়া গুণের (সংস্কৃতি ব্যতিরেকে অর্থনীতি, বুদ্ধিমত্তা ব্যতিরেকে বাস্তব কাজ-কর্ম বা উল্টো করেও) তাই এই দুই পদের বিরোধাভাস প্রকৃত অর্থে অর্থ-হীন। বস্তুত, গুইলিয়েলমো ফেরেরো ও তাঁদের গুষ্টি যেভাবে গুণ ও পরিমাণের বিরোধ কল্পনা করেন ও তার ওপর যৎপরোনাস্তি বোকা বোকা রদবদলগুলো যখন চালিয়ে যান তখন বুঝতে পারা যায় যে আসলে যে-দুইয়ের মধ্যে বিরোধ তৈরি করা হচ্ছে তা হল গুণের এক রূপ ও গুণের অন্য আর এক রূপ, পরিমাণের এক রূপ ও পরিমাণেরই অন্য আর এক রূপ। অন্যভাবে বলতে গেলে, ব্যাপারটা রাজনীতির, কোনো দার্শনিক প্রতিজ্ঞা নয়। পরিমাণ-গুণ সম্পর্কটা যদি অবিভাজ্য হয়, তাহলে প্রশ্নটা এই: পরিমাণ অথবা গুণ-এর কোনটাকে বিকশিত করার জন্য ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ কোথায়

বেশি উপযুক্ত হবে ? এ দুটো দিকের কোনটা সহজে বেশি নিয়ন্ত্রণসাধ্য ? কোনটা বেশি সহজে পরিমাপযোগ্য ? কোনটার ভিত্তিতে ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং কর্মসূচি প্রণয়ন করা সম্ভব ? এর উত্তরটা নিয়ে কোনো দ্বিধা আছে বলে তো মনে হয় না এবং তা অবশ্যই ঐ পরিমাণগত দিক। কিন্তু পরিমাণ নিয়েই ব্যস্ত থাকা বা বাস্তবের শারীরিক দিকটাকে বিকশিত করতে চাওয়া মানে তো এই নয় যে 'গুণগত' দিকটাকে অবহেলা করতে হবে ; বরঞ্চ এরকম বলা চলে যে সেভাবেই গুণের সমস্যাটাকে আরো প্রমূর্তভাবে ও বাস্তব রূপে তুলে ধরা হচ্ছে, অর্থাৎ, গুণগত দিকটাকে সেই পথেই বিকশিত করে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে যে-একমাত্র পথে তা নিয়ন্ত্রণসম্ভব ও পরিমাপযোগ্য।

এই প্রশ্নটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরেকটা প্রশ্ন যার প্রকাশ ঘটেছে সেই প্রবাদে : 'প্রিমুম ভিভেরে দেইন্দে ফিলোসোফারি' [আগে বাঁচো, দার্শনিকতা পরে কোরো]। বাস্তবে কিন্তু বাঁচাকে দার্শনিকতা করার থেকে আলাদা করা সম্ভব না. কিন্তু প্রবাদটার তা সত্ত্বেও একটা বাস্তব মানে আছে—বাঁচা মানে নিজেকে বিশেষভাবে বাস্তব অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে জড়িয়ে রাখা ; দার্শনিকতা করা মানে নিজেকে ওতিয়ুম লিতেরাতুম [শিক্ষিত অবসর]—এর বৌদ্ধিক কাজকর্মের মধ্যে নিবিষ্ট করে রাখা। অবশ্যই, এমন মানুষ আছে যারা নেহাতই 'বাঁচে' এবং দাসসুলভ কঠোর কায়িক শ্রমের কাজ গ্রহণে বাধ্য হয় এবং যা না হলে অন্যেরা দার্শনিকতা করবার জন্য অর্থনৈতিক কাজের চাপ থেকে মুক্তি পেত না। পরিমাণের বিপরীতে 'গুণ'-কে সমর্থন জানানোর শাদা মানে এই : সামাজিক জীবনের যে-অবস্থায় কেউ কেউ শুদ্ধ পরিমাণ আর অন্যেরা গুণ সেই অবস্থাটাকেই অক্ষত বাঁচিয়ে রাখা। আর নিজেকে গুণ, সৌন্দর্য, চিন্তা ও ইত্যাকার সব ব্যাপারের স্বীকৃত প্রতিভূ ভাবতে কী চমৎকারই না লাগে। শৌখিন জগতের এমন একজনও মহিলা বোধ হয় নেই যিনি একথা মনে করেন না যে তিনি যা-কিছু করছেন তা দুনিয়াতে গুণ ও সৌন্দর্য বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই !

তত্ত্ব ও কর্ম

মানুষের চিন্তার ইতিহাসে তত্ত্ব ও কর্মের ঐক্যের ধারণাকে যত বিভিন্ন রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেগুলোকে সব সন্ধান করা, বিশ্লেষণ করা, সমালোচনা করা কাজটি জরুরি, কারণ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে পৃথিবী বিষয়ক যে-কোনো ধারণা বা যে-কোনো দর্শনেই এই সমস্যাটি ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে। আক্উইনস্ ও স্কলাস্টিসিজ্মের প্রতিপাদ্য ঃ 'ইন্তেলেক্তুস্ স্পেকুলাতিভুস এক্স্তেন্সিয়োনে ফিত্ প্রাক্তিকুস' (তত্ত্বকে টেনে নিয়ে গেলেই কর্মের রূপ পায়—অর্থাৎ, ধারণার জগৎ ও কর্মের জগতের পরম্পরার মধ্যেকার আবশ্যিক সংযোগের স্বীকৃতি)। লাইব্নিৎস্-এর সূত্র, বিজ্ঞান প্রসঙ্গে ইতালীয় ভাববাদীরা যা প্রায়শই উদ্ধৃত করেন ঃ 'কুয়ো মাগিস স্পেকুলাতিভা, মাগিস প্রাক্তিকা' [যত বেশি তত্ত্ব-কল্পনামূলক ততই

বাস্তব]। জি. বি. ভিকো-র বক্তব্য : 'ভেরুম ইপসুম ফাকতুম [কৃতকর্মই সত্য], এই কথাটাকে নিয়ে এতই আলোচনা করা হয়েছে এবং এর এত রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে (ভিকো-র ওপর ক্রোচের বই এবং ক্রোচের নিজস্ব অন্যান্য বিতর্কমূলক রচনা দ্রষ্টব্য); ক্রোচে এই কথাটাকেই বিস্তারিত করেছেন এক ভাববাদী অর্থে—জ্ঞান কর্মেরই একটা রূপ এবং যা করা হয় তাই মাত্র জানা সম্ভব। ('করা' কথাটার এখানে এক বিশেষ অর্থ আছে অর্থটা এতই বিশিষ্ট যে আসলে শেষমেশ এর মানে 'জানা'-র বেশি আর কিছু নয় আর কথাটা নিতান্ত এক পুনরুক্তিতে দাঁড়ায়। অবশ্য এ ধারণা-টাকে বিচার করতে হবে কর্মকাণ্ডের দর্শনের ধারণার প্রসঙ্গেই।)

যেহেতু প্রত্যেক কর্মই বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছাশক্তির পরিণাম, এবং এইসব ইচ্ছাশক্তির তীব্রতা ও সচেতনতায় যেহেতু বৈচিত্র্য প্রচুর এবং সামূহিক ইচ্ছা-শক্তির যে সমগ্র বিন্যাস তার সঙ্গেও ঐ ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছাশক্তির সমধর্মিতার তারতম্যও যেহেতু লক্ষণীয়, তাই একথা পরিষ্কার যে এর সঙ্গে সংলগ্ন যে-তত্ত্ব যা এর মধ্যেই নিহিত, তাও কিন্তু এমন সব বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির সংশ্লেষ যা ঐ একই রকম অবিন্যস্ত ও অসমধর্মী। তবুও এই অবস্থায় এবং এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কর্মের সঙ্গে তত্ত্বের সংশ্লেষ বর্তমান থাকে। তত্ত্ব ও কর্মের সমতাসাধনের সমস্যাটাকে যদি তোলাই হয়, তাহলে ব্যাপারটা এভাবে ভাবা যায় : কোনো এক নির্দিষ্ট কর্মের ভিত্তিতে এমন কোনো তত্ত্ব নির্মাণ করা সম্ভব, যা ঐ কর্মেরই নিয়ামক যাবতীয় উপাদানের সঙ্গে সংলগ্ন-ভাবে একাত্ম থেকে বহমান ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে, যাতে কর্ম আরো সমমাত্রিক রূপ ধারণ করে, আরো সংহত এবং তার প্রতিটি উপাদানে সে তখন আরো সার্থক হয়ে ওঠে, এবং এইভাবেই ঐ কর্ম তার সমস্ত সম্ভাবনার চূড়ান্ত বিকাশ সাধন করে ; অথবা এর বিকল্পে, যখন কোনো একটা তাত্ত্বিক অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে তখন তা ধরে নিয়ে কর্মের সেই উপাদানগুলোকে এমনভাবে সংগঠিত করা সম্ভব যাতে তত্ত্বটা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। তত্ত্ব ও কর্মের সমতা সাধন কাজটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ; কারণ, এই সমতার মধ্যে দিয়েই কর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় যুক্তিসিদ্ধ ও আবশ্যিক হিসেবে আর তত্ত্বকে বাস্তব ও যুক্তিনিষ্ঠ হিসেবে। এই কারণেই তত্ত্ব ও কর্মের সাযুজ্যের সমস্যা-টাকে তোলা হয়, বিশেষত ইতিহাসের তথাকথিত ক্রান্তিমুহূর্তগুলিতে, অর্থাৎ, সেইসব মুহূর্তে যখন রূপান্তরের গতি সর্বাধিক। কারণ তখনই যেসব বাস্তব শক্তির প্রকাশ ঘটে সেগুলোর জন্য তত্ত্বভিত্তির প্রয়োজন দেখা দেয়, যাতে ঐ শক্তিগুলি আরো সার্থক ও দূরপ্রসারী হয়ে উঠতে পারে ; এবং তখন তাত্ত্বিক প্রকল্পও সংখ্যায় অনেক বেশি হয়ে দেখা দেয়, এবং তাদেরও জন্য প্রয়োজন বাস্তবসিদ্ধির ; যাতে এইসব তত্ত্ব বাস্তব আন্দোলনে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়ে আন্দোলনগুলোকেই আরো বাস্তব ও প্রকৃত অর্থে আরো সার্থক করে তোলে।

কাঠামো ও পরিকাঠামো

'প্রিফেস টু আ কনট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটীক অব পোলিটিক্যাল ইকনমি'-র অন্তর্গত এই যে বক্তব্য যে, মানুষ কাঠামোগত সংঘর্ষের বিষয়ে চেতনা অর্জন করে মতাদর্শের স্তরে, এটাকে শুধুমাত্র কোনো মনস্তাত্ত্বিক বা নৈতিক মূল্য-বোধ হিসেবে গ্রহণ না করে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এখান থেকে এ কথাটাও বেরিয়ে আসে যে, আধিপত্যের তত্ত্ব-কর্মসূত্রেরও জ্ঞানতাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে, আর কর্মকাণ্ডের দর্শনে ইলিচ [লেনিন]-এর মহত্তম অবদানের সন্ধান এখানেই করা উচিত। এই অর্থে বলতে গেলে এ কথা বলা চলে যে, ইলিচ রাজনৈতিক মতবাদ ও কর্মসূচিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে সম মাত্রায়ই দর্শন হিসেবে দর্শনের অগ্রগতিতেও সাহায্য করেছিলেন।

কোনো আধিপত্যমূলক প্রয়োগব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই তা নতুন এক মতাদর্শগত ক্ষেত্র প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্যের ও জ্ঞানচর্চার পদ্ধতির সংস্কার নির্দেশ করে : এটা জ্ঞানেরই এক স্বরূপ, এক দার্শনিক প্রস্তাবনা। ক্রোচের সূত্র প্রয়োগ করে বলা যায়, যখন বিশ্ববিষয়ে এক নতুন বোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো নতুন নৈতিক মানের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তখনই কিন্তু ঐ বিশ্ববোধও প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় ; অর্থাৎ, সমগ্র দর্শনেরই এক সংস্কার সাধিত হয়।

কাঠামো ও পরিকাঠামো মিলে তৈরি হয় একটা 'ঐতিহাসিক জোট'। অর্থাৎ, পরিকাঠামোর জটিল দ্বন্দ্বময় ও বিবাদী সেই বিন্যাস উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাসেরই প্রতিফলন। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব : কাঠামোর অন্তর্গত দ্বন্দ্বের যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিফলন মতাদর্শের কোনো সার্বিক তন্ত্রেই সম্ভব এবং কর্মকাণ্ডের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উপযুক্ত কোনো বস্তুগত অবস্থা তৈরি আছে কিনা তার ঠিকমতো নিশানা একমাত্র এরকম কোনো তন্ত্রই দিতে পারে। এমন কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর যদি উদ্ভব হয় যা মতাদর্শের স্তরে শতকরা একশো ভাগ সমপ্রকৃতির, তাহলে বুঝতে হবে যে এ রকম বৈপ্লবিক অবস্থার জন্য পরিস্থিতি একশো ভাগ প্রস্তুত। অর্থাৎ যা 'যুক্তিগ্রাহ্য' তা সক্রিয়ভাবে প্রকৃতই বাস্তব। এই যুক্তি কাঠামোর ভিত্তি হল কাঠামো ও পরিকাঠামোর মধ্যেকার আবশ্যিক অন্যোন্যক সম্পর্ক, এই অন্যোন্যক সম্পর্কটা প্রকৃত অর্থে এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

'কাথারসিস'

'কাথারসিস' শব্দটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে শুদ্ধ অর্থনৈতিক (অথবা আত্মমুখী-আবেগপ্রবণ) থেকে নৈতিক-রাজনৈতিক মুহূর্তে উত্তরণের পর্যায়টাকে নির্দেশ করবার জন্য, অর্থাৎ জনমানসে কাঠামোর ধারণা যখন পরিকাঠামোর স্তরে আরো উন্নততরভাবে বিশদীকৃত হয়। এর আরো

একটা মানে হল 'বস্তুগত থেকে মনোগত'-পর্যায়ে এবং 'আবশ্যিকতা থেকে স্বাধীনতা'-য় উত্তরণ। কাঠামো এখন আর শুধুমাত্র এমন এক বহিরঙ্গ শক্তি হিসেবে থাকে না যা মানুষকে নিষ্পেষণ করে, মানুষকে অঙ্গীভূত করে তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়; বরং কাঠামো এরই মধ্য দিয়ে স্বাধীনতারই এক পন্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়, এমন এক যন্ত্রে পরিণত হয় যার মধ্যে দিয়ে নতুন নৈতিক-রাজনৈতিক রূপের সৃষ্টি সম্ভব এবং যা এক নতুন উদ্দীপনার উৎস হিসেবে দেখা দেবে। আমার মনে হয় এই কাথারসিস্‌-এর মুহূর্তটা তৈরি করাই সমস্ত কর্মকাণ্ডের দর্শনের প্রস্থানবিন্দু, এবং এই কাথারসিস্‌-প্রক্রিয়া দ্বন্দ্ববাদেরই বিবর্তন[৪] থেকে পাওয়া সেইসব সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সঙ্গেও মিলে যায়।

কান্টীয় 'নুমেনন'

'বস্তুর 'স্ব-ত্ব' ও কান্টীয় 'নুমেনন'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টভাবে বাস্তবের বহিরঙ্গ বস্তুময়তা'-র প্রশ্নটা বিবেচ্য। 'স্ব-ত্ব'-এর ধারণা যে 'বাস্তবের বহিরঙ্গ বস্তুময়তা' এবং তথাকথিত গ্রেকো-খ্রিস্টান বাস্তববাদ (আরিস্ততল, অ্যাকুইনাস) থেকে পাওয়া এ অঙ্গীকার অস্বীকার করা মনে হয় শক্ত। এটা যে ওখান থেকেই পাওয়া গিয়েছে সে কথাটা এ তথ্যের মধ্যেও ধরা পড়ে যে আকাড়া বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের একটা গোটা ধরন থেকেই উদ্ভব হয়েছে নব্য কান্টীয় ও এক নব্য-সমালোচনাত্মক ঘরানার।

আমরা তাকে যেমন জানি বাস্তব যদি তাই হয় আর আমাদের জ্ঞান যদি ক্রমাগত পরিবর্তমান হয়—অর্থাৎ, যদি এমন হয় যে কোনো জ্ঞানই আদতে সম্পূর্ণ নয়, ইতিহাস-নির্দিষ্ট—তাহলে তখন তো একথা কল্পনা করা শক্ত যে, আমাদের নিজেদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবও বস্তুগত অর্থে বদলে বদলে যাচ্ছে। শুধু কান্ডজ্ঞানে নয় একথা তো বৈজ্ঞানিক চিন্তাতেও মেনে নেওয়া একটু শক্ত। 'পবিত্র পরিবার' ['দ্য হোলি ফ্যামিলি'] গ্রন্থে এ কথা বলা হয়েছে যে বাস্তবের সবটুকুই প্রকাশিত ঘটনাবলির মধ্যে নিহিত এবং ঐ প্রকাশিত ঘটনাবলির অন্তরালে আর কিছুই নেই, আর এ কথাটা নিশ্চিত-ভাবে ঠিক। কিন্তু এর প্রমাণ দেওয়া খুব সহজ কাজ নয়। প্রকাশিত ঘটনাবলির স্বরূপ কী? সেসব কি বস্তুগত কোনো কিছু, নিজেরই মধ্যে এবং নিজেরই জন্য যাদের অস্তিত্ব? না কি সেসব এমন কোনো গুণ যা মানুষ তার নিজের বাস্তব স্বার্থের জন্য (তার অর্থনৈতিক জীবনের নির্মাণ) এবং বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের জন্য (পৃথিবীতে কোনো এক রকমের শৃঙ্খলা

৪। যে-দুই বিন্দুর মধ্যে এই প্রক্রিয়াটা দোলাচল অবস্থায় থাকে তা সব সময়ে মনে রাখা দরকার একদিকে, কোনো সমাজেই এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব কখনো হয় না যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত অবস্থা তখনো তৈরি হয় নি অথবা তৈরি হচ্ছে না; আর অন্যদিকে কোনো সমাজই তার সমস্ত সুপ্ত সম্ভাবনা পূর্ণ বিকশিত হবার আগে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তার জন্য এবং ঘটমান বস্তুকে বর্ণনা করা ও তাদের শ্রেণীবিভাজন করার জন্য, এটা অবশ্য এমন একটা প্রয়োজন যা নিজেই মধ্যাস্থিত ও ভবিষ্যৎ বাস্তব স্বার্থের সঙ্গে জড়িত) বিশ্লিষ্ট করে নিয়েছে।

এ কথাটা যদি মেনে নেওয়া যায় যে, বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আমাদের নিজেদের থেকে, আমাদের প্রয়োজনের থেকে, আমাদের স্বার্থের থেকে আলাদা কিছু না, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান হল পরিকাঠামো (অথবা অ-নির্দিষ্ট দর্শন), তাহলে এ রকম মনে না করে পারা শক্ত যে এই জ্ঞানের পেছনেও তাহলে আরো প্রকৃত বাস্তব কিছু আছে —'নুমেনন-'এর মতো আধিভৌতিক অর্থে নয়, বা 'অজানা ঈশ্বর' বা 'অজ্ঞেয়'-এর অর্থে নয়,— বরঞ্চ বাস্তব সম্বন্ধে 'আপাতঃ' অজ্ঞতাব এক প্রমূর্ত অর্থে ; বাস্তব যেন এমন-কিছু যা এখনো অজানা, যা হয়তো কোনো একদিন জানা যাবে যখন মানুষের অধিগত 'যন্ত্রপাতি' ও বৌদ্ধিক কুশলতা আরো বৃদ্ধি পাবে, পূর্ণতর হবে, অর্থাৎ যখন মানুষের প্রযুক্তিগত ও সামাজিক অবস্থাটা প্রগতি-শীলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বস্তুত তখন আমরা এমন একটা ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী করছি যেটা আসলে হল এমন এক চিন্তাকর্ম যা অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সমস্ত বিকাশের প্রক্রিয়াকে ভবিষ্যতে আরোপিত করে। যাই হোক কান্ট চর্চা করা দরকার এবং যথাযথভাবে তাঁর প্রত্যয়গুলোকে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ইতিহাস ও প্রতি-ইতিহাস

এটা লক্ষণীয় যে প্রকৃতি ও ইতিহাস 'লাফ' দিয়ে দিয়ে এগোয় না কি ক্রম-প্রগতিশীল বিবর্তনের পথে এগোয়, এই নিয়ে গত শতাব্দীর শেষের দিকে প্রকৃতিবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের ভাষায় যে তর্ক চলেছিল, 'ইতিহাস ও প্রতি-ইতিহাসের' বর্তমান বিতর্কটি আধুনিক দার্শনিক সংস্কৃতির ভাষায় তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এই একই বিতর্ক দেখা যাবে, আগের প্রজন্মেও হয়েছে, সে প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই হোক (কুভিয়ের-এর প্রতীতি) অথবা দর্শনের ক্ষেত্রেই হোক (সেখানে হেগেলের মধ্যে এ-সমস্যা আছে)। এ সমস্যার ইতিহাস বিবেচনা করতে হবে তার সমস্ত প্রমূর্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশের পরি-প্রেক্ষিতে। দেখা যাবে যে এই তর্ক প্রায় সবসময়েই সমসাময়িক হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ সবসময়েই রক্ষণশীল ও জাকোব্যাঁ, প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীলরা তো ছিলেনই। কিন্তু আমার মনে হয় এ বিতর্কের 'তাত্ত্বিক' তাৎপর্য এখানেই : এটা হল 'যুক্তিন্যায়'-এর দিক থেকে সেই বিন্দু যেখান থেকে বিশ্ব বিষয়ে প্রত্যেক ধারণার উত্তরণ ঘটে তার উপযুক্ত নৈতিকতায়, সেই বিন্দু যখন অনুধ্যান পর্যবসিত হয় কর্মে আর প্রত্যেক দর্শনেরই পরিণতি ঘটে তার উপর নির্ভরশীল রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে। অর্থাৎ এ হল সেই বিন্দু যখন বিশ্ববোধ, অনুধ্যান, দর্শন 'বাস্তব' রূপ গ্রহণ করে, কারণ এই পর্যায়েই তার লক্ষ্য হল পৃথিবীর পরিবর্তন সাধন এবং কর্মকাণ্ডের বৈপ্লবিক রূপান্তর।

অতএব বলা চলে যে, এটাই হল কর্মকাণ্ডের দর্শনের মূল সম্পর্কসূত্র, এই যে বিন্দু যেখানে দর্শন হয়ে ওঠে প্রকৃত বাস্তব এবং সে তখন ঐতিহাসিক-ভাবে জীবন্ত (অর্থাৎ সামাজিকভাবে, এবং তখন আর তার অবস্থান শুধুমাত্র কিছু ব্যক্তির মস্তিষ্কে নয়), যেখানে দর্শন আর নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত নয়, তা এখন আবশ্যিক—যুক্তিসহ—বাস্তব।

সমস্যাটা আসলে সমস্ত ঘটনাবলিকে ঐতিহাসিকভাবে দেখবার। যা-কিছুর অস্তিত্ব আছে তার বিরুদ্ধে, প্রথাসিদ্ধির বিরুদ্ধে ইত্যাদি, নীটশে-পন্থী চালবাজদের যে মৌখিক বিদ্রোহ তার পরিণতি যে সেইসব কিছুই মেনে নেওয়া, আর এরই জন্য যে কিছু কিছু মনোভঙ্গিকে নিতান্ত হালকা বলে মনে হয়, এটা তো হতেই পারে, কিন্তু নিজের বিচারবুদ্ধির ব্যাপারে চালবাজদের পাত্তা না দিলেই তো হয়। শৌখিন হামবড়াই নয়, ইচ্ছা-পূরণের বা বিমূর্ত চিন্তাভাবনার মেজাজ নয়, কথায়বার্তায় এবং বাইরের ভাবভঙ্গিতে 'সংযত' প্রকৃতির প্রয়োজনীয়তার দিকে নজর দেওয়া দরকার. যাতে চরিত্রের ও নির্দিষ্ট ইচ্ছাশক্তির জোরটা আরো বেশি করে আয়ত্তে থাকে। কিন্তু এটা শৈলীর কথা, 'তত্ত্ব'-র নয়।

আমার মনে হয় তারই মধ্যে দেখা যায় বিশ্ববোধ থেকে বাস্তব আচরণ-বিধির কোনো মান্য-এ উত্তরণের ধ্রুপদী রূপ। যেভাবে ক্যালভিনীয় প্রাক্‌গন্তব্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল বাস্তব উদ্যমের এমন এক প্রেরণা যার তুল্য কোনো-কিছু পৃথিবী বোধ হয় আজও দেখে নি। অনুরূপভাবে, নির্ধারণবাদের অন্য যাবতীয় রূপই তাদের বিকাশের কোনো না কোনো পর্বে জন্ম দিয়েছে এক উদ্যমী মেজাজের আব তার থেকেই দেখা দিয়েছে সঙ্ঘবদ্ধ ইচ্ছাশক্তির এক সুতীব্র আর্তি।

কল্পনামুখী দর্শন

কিছু কিছু দার্শনিক তন্ত্রের 'কল্পনামুখী' চরিত্রের আলোচনা ও সমা-লোচনার অসুবিধা এবং দার্শনিক ধারণার 'কল্পনামুখী রূপ'-এর তাত্ত্বিক 'বর্জন'-এর অসুবিধাগুলো চেপে যাওয়া ভুল হবে।

এই প্রশ্নগুলো উঠে পড়ে: ১. সব দর্শনেই কি এই কল্পনামুখী উপাদান সংগত এবং সব তাত্ত্বিক নির্মাণই কি এই একই রূপবন্ধ হতে হবে? অর্থাৎ, 'কল্পনামুখীনতা' কি দর্শন ও তত্ত্বের সঙ্গে সমার্থক? ২. নাকি প্রশ্নটা 'ঐতিহাসিক'? সমস্যাটা কি তাত্ত্বিক নয়, শুধুই ঐতিহাসিক এই অর্থে যে ইতিহাসের কোনো নির্দিষ্ট পর্বে বিশ্ব সম্বন্ধে প্রত্যেক ধারণাই একটা 'কল্পনামুখী' রূপ পরিগ্রহণ করে আর সেটাই তার সর্বোচ্চ বিন্দু এবং সেখানেই বিনষ্টির সূত্রপাত?

রাষ্ট্রের বিকাশের সঙ্গে তুলনীয়তা ও সংযোগ লক্ষণীয়; রাষ্ট্রের যেমন উত্তরণ ঘটে 'অর্থনৈতিক-সমবায়ী' পর্ব থেকে 'আধিপত্যমূলক' (সক্রিয় সম্মতির) পর্বে। অর্থাৎ বলা যায় যে, সব সংস্কৃতিরই আছে এক কল্পনা-

মুখী ও ধর্মীয় মুহূর্ত ; ঐ সংস্কৃতি যে সামাজিক গোষ্ঠীর প্রকাশ তার আধিপত্য সম্পূর্ণ হবার কালপর্বের সঙ্গে মিলে যায় ঐ মুহূর্ত এবং সম্ভবত এই মিলটা ঘটে তখন যখন সত্যিকারের আধিপত্যটা নিচুতলায়, আণবিকভাবে, মিলিয়ে যেতে থাকে : কিন্তু এই মিলিয়ে যাবার জন্যেই এবং তারই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিন্তাতন্ত্র তখন নিজেকে এক পূর্ণ অনুশাসনে পর্যবসিত করে আর এমনিভাবে সে অতীন্দ্রিয় 'বিশ্বাস'-এর রূপ পরিগ্রহ করে। এই কারণে দেখা যায় যে প্রত্যেকটি তথাকথিত অবক্ষয়ী পর্বে (যখন পুরনো পৃথিবীর ভাঙন চলছে) দানা বেঁধেছে খুব পরিশীলিত ও অতি 'কল্পনামুখী' চিন্তার এক রূপ।

সমালোচনার মধ্যে দিয়ে অবশ্য এই কল্পনামুখীনতাকে তার প্রকৃত দুই উপাদানে ভেঙে ফেলতে হবে—রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে ও বাস্তব কর্মের হাতিয়ার হিসেবে। কিন্তু এই সমালোচনেরও অবশ্য এক নিজস্ব কল্পনামুখী পর্ব থাকবে, এটাই হবে তার সর্বোচ্চ বিন্দু। প্রশ্নটা এই : এই সর্বোচ্চ বিন্দু কেন এক নতুন ঐতিহাসিক পর্বের সূচনা হিসেবে দেখা দিতে পারে না, যেখানে আবশ্যিকতা ও স্বাধীনতা নিতান্ত জৈবভাবে একে অন্যের ভেতরে অনুপ্রবিষ্ট আর তখন কোনো সামাজিক দ্বন্দ্বও থাকবে না ; এই পর্বে যে একমাত্র দ্বান্দ্বিকতার অস্তিত্ব থাকবে তা হল ধারণার স্তরে ; এখন আর অন্য কোনো ঐতিহাসিক শক্তির ক্ষেত্রে নয়, শুধু ধারণার দ্বন্দ্বই এখনকার দ্বান্দ্বিকতা।

আঠারো শতকের ফরাসি জড়বাদের ওপর 'পবিত্র পরিবার' গ্রন্থের অংশটুকুর মধ্যে পাওয়া যাবে কর্মকাণ্ডের দর্শনের উৎপত্তি বিষয়ে এক অতি সুঠাম ও প্রাঞ্জল আলোচনা। এ হল সেই জড়বাদ যা পূর্ণতা পেয়েছে কল্পনামুখী দর্শনেই এবং যা ওতপ্রোত হয়ে গেছে মানবিকবাদে। এ কথাও সত্য যে পুরনো জড়বাদের এই পূর্ণতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে দার্শনিক বাস্তবতাবাদের আর কোনো পার্থক্য থাকে না।

আর একটা কথা যা নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার তা এই : কল্পনামুখী দর্শনের 'মানসসত্তার' ধারণা 'মনুষ্যপ্রকৃতি'-র যে পুরনো ধারণা তারই রূপান্তরিত ও আধুনিক রকমফের কিনা ; এই মনুষ্যপ্রকৃতির ধারণাটা অতীন্দ্রিয়ের দর্শন ও আঁকাড়া জড়বাদের এ দুয়ের পক্ষেই বেশ মানানসই। অর্থাৎ, দেখা দরকার 'মানসসত্তা'র ধারণা পুরনো 'পবিত্র আত্মা'র কল্পনামুখী কোনো প্রকরণ ছাড়া আর কিছু কিনা। এ কথা সত্যি হলে বলা যাবে যে ভাববাদ মূলত ধর্মতাত্ত্বিক।

নিহিতার্থবাদী ধারণার পথে দর্শনের যে সংস্কার-সাধন, 'কল্পনামুখীনতা' (ভাববাদী অর্থে) কি তার মধ্যে এক নতুন ধরনের অতীন্দ্রিয়তার মাত্রা যোগ করে নি? মনে হয় যেন কর্মকাণ্ডের দর্শনই একমাত্র সঙ্গতিপূর্ণ 'নিহিতার্থবাদী' ধারণা। কল্পনামুখী চরিত্রের সমস্ত ইতিহাসবাদী তত্ত্বকেই পুনর্বিবেচনা করা বিশেষভাবে দরকারি। এক নতুন 'অ্যান্টি-ড্যুরিং' লেখা

যেতে পারে, যেটা এ ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়াবে 'ক্রোচে-র বিরুদ্ধে' এবং যেখানে একই সঙ্গে কল্পনামুখী দর্শনের বিরুদ্ধে তো বটেই, প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে, যান্ত্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে, এবং কর্মকাণ্ডের দর্শনেরও সব রকম অবসন্ন রূপের বিরুদ্ধে বিতর্কটা এক সঙ্গে জুড়ো করা যেতে পারত।

জ্ঞানের 'বস্তুময়তা'

ক্যাথলিকদের মতে '...ভাববাদের সমস্ত তত্ত্বটা আমাদের জ্ঞানের বস্তুময়তার অস্বীকৃতি এবং 'মানসসত্তা'র ভাববাদী একবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত (এই একবাদ ঐ সরাসরি অর্থে 'বস্তু'র প্রত্যক্ষবাদী একবাদের অনুরূপ)। এই ধারণায় ধর্মের ভিত্তি হিসেবে ঈশ্বরের ধারণারই আমাদের অন্তরের বাইরে কোনো বস্তুগত অস্তিত্ব নেই, এ ধারণা আমাদেরই মানসসৃষ্টি। অতএব ভাববাদ জড়বাদের মতোই ধর্মের নিতান্ত পরিপন্থী।'[৫]

কর্মকাণ্ডের দর্শন অনুসারে 'জ্ঞানের বস্তুময়তা'-র প্রশ্নটা 'আ কনট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটীক অব পলিটিক্যাল ইকনমি'-র ভূমিকার এই বক্তব্য থেকে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে: 'মানুষ মতাদর্শগত স্তরে (বস্তুগত উৎপাদনশক্তিসমূহের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের) আইনি, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শৈল্পিক ও দার্শনিক রূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়।' কিন্তু এই সচেতনতা কি বস্তুগত উৎপাদনশক্তিসমূহের এবং উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—লাইনগুলোর আক্ষরিক অর্থে হয়তো তাই—নাকি এর উদ্দিষ্ট সমস্ত সচেতন জ্ঞান? এটাই হল বিচার্য বিষয় এবং এটা আলোচনা করতে হবে পরিকাঠামোর তাৎপর্য বিষয়ক সমস্ত দার্শনিক প্রসঙ্গের সঙ্গে একই সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে 'একবাদ' শব্দটার মানেই বা কী হবে? ভাববাদী বা জড়বাদী একবাদ যে হবে না এটা নিশ্চিত, এটা হবে প্রমূর্ত ঐতিহাসিক কর্মের ক্ষেত্রে বিপরীতের একত্ব, অর্থাৎ, প্রমূর্তভাবে মানবিক ক্রিয়াকর্ম (ইতিহাস—মানসসত্তা), এক ধরনের সংগঠিত (ইতিহাস-অন্বিত) 'বস্তু' এবং রূপান্তরিত মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। কর্মের দর্শন (কর্মকাণ্ড, বিকাশ), তবে 'শুদ্ধ' কর্মের নয়, বরং বস্তুত খুবই 'অ-শুদ্ধ' কর্মের, আর এই কথাটা বলা হল খুবই অ-পবিত্র ও জাগতিক অর্থে।

ব্যবহারিকতাবাদ ও রাজনীতি

মনে হতে পারে যে, যে-অ্যাংলো-স্যাক্সন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ধারাটার জন্ম ও বিকাশ হয়েছিল তার বিচার-বিবেচনা ভালো মতো না করে 'ব্যবহারিকতাবাদ' (জেমস ইত্যাদির মধ্যে যে-ভাবে তা বর্তমান)-এর সমালোচনা করা উচিত না। একথা সত্যি যে প্রত্যেকটা দর্শনই 'রাজনীতি'

৫। 'লা চিভিলতা কাত্তোলিকা' ১ জুন ১৯২৯-এর অন্তর্ভুক্ত ফাদার মারিও বারবেরা-র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

এবং এটাও ঠিক যে প্রত্যেক দার্শনিকই মূলত রাজনীতিজ্ঞ। এ কথাটা ব্যবহারিকতাবাদীর ক্ষেত্রে আরো বেশি করে সত্য, কারণ তিনি তো এক এমন দর্শন খাড়া করেন যা খুব প্রত্যক্ষভাবে 'হিতবাদী'। এরকম একটা ব্যাপার ক্যাথলিক দেশগুলোতে অচিন্তনীয় (আন্দোলন হিসেবে); সেসব দেশে ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক জীবন বিচ্ছিন্ন, রেনেসাঁস ও কাউণ্টার-রিফর্মেশন-এর সময় থেকেই; কথাটা কিন্তু অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশগুলিতে খুবই প্রযোজ্য, সেসব দেশে তো ধর্ম দৈনন্দিন সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ আর তা আমলাতান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূতও নয় অথবা বৌদ্ধিক দিক থেকে জপমন্ত্রেও পরিণত হয় নি। সে যাই হোক ব্যবহারিকতা-বাদ কিন্তু প্রত্যক্ষ ধর্মীয় ক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে এক ধর্মোত্তর নৈতিকতা সৃষ্টির দিকে এগোয় (তা হয়তো ফরাসি ধাঁচের নয়); কাণ্ডজ্ঞানের চেয়ে উন্নততর এক 'জনপ্রিয় দর্শন'-এর বিকাশসম্ভাবনাও এর মধ্যে রয়েছে, বস্তুত এ যেন যতটা না এক দার্শনিক তন্ত্র, তার চেয়েও বেশি সরাসরি এক 'মতাদর্শগত দল'।

জেম্‌স্‌-এর ব্যাখ্যামতো ব্যবহারিকতাবাদী সূত্রটা ধরা যাক: 'যে-কোনো তত্ত্বের বিভিন্ন দিক আলোচনায় সবচেয়ে ভালো পন্থা হল আলোচ্য তত্ত্ব বা তার অন্য কোনো বিকল্প তত্ত্ব সত্য হলে কী কী তফাৎ হত সেটা আগে প্রতিষ্ঠা করা।' ব্যবহারিকতাবাদীদের কাছে দার্শনিক রাজনৈতিকতা ব্যাপারটা যে কত প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক তা এখান থেকে বোঝা যায়। ইতালীয় বা জর্মন ধাঁচের 'ব্যক্তি' দার্শনিকের 'ব্যবহার'-এর সঙ্গে সম্পর্ক অপ্রত্যক্ষ ভাবে মধ্যস্থতার শৃঙ্খলে বহু ঘের ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে ব্যবহারিকতাবাদীর অভীপ্সা থাকে ব্যবহারের সঙ্গে সরাসরি অন্বিত হবার। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, ইতালীয় ও জর্মন ধাঁচের দার্শনিকই ব্যবহারিকতা-বাদীর তুলনায় বেশি বাস্তববুদ্ধিনির্ভর; ব্যবহারিকতাবাদী তো সরাসরি-ভাবে প্রত্যক্ষ বাস্তব থেকে বিচার করেন, যা প্রায়শ খুব মোটা দাগের, কিন্তু জর্মন বা ইতালীয় ঘরানার দার্শনিকের লক্ষ্য থাকে অনেক উঁচুতে। তিনি উন্নততর মানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বর্তমানের সাংস্কৃতিক স্তরটাকে আরো ওপরে তুলবার চেষ্টা করেন (যখনই কোনো না কোনো দিকে তিনি পদক্ষেপ করেন)। উনিশ শতকের উদারনৈতিক বিপ্লবের তাত্ত্বিক পুরোধা হিসেবে হেগেলকে ভাবা যেতে পারে। ব্যবহারিকতাবাদীদের সম্বন্ধে বড়জোর বলা যেতে পারে যে রোটারি ক্লাব আন্দোলনের বিকাশে এবং রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল সব আন্দোলনের সমর্থন জোগানোয় তাঁদের অবদান রয়েছে—আর এই সমর্থন জোগানোর ব্যাপারটা প্রকৃত অর্থেই খুব বাস্তব, হেগেল ও প্রুশিয়ার রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেমনটা ঘটেছিল তা নয়, অর্থাৎ শুধু বিতর্কের বিকৃতি নয়।

নীতিশাস্ত্র

'এমনভাবে কাজ করো, যাতে তোমার আচরণ যেন একই রকম অবস্থায় অন্য

মানুষের আচরণের মান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে': কান্টের এই সুবচনের তাৎপর্য কিন্তু প্রথমেই যেমন মনে হয় অতটা সরল ও সহজবোধ্য নয়। 'একই রকম অবস্থায়' কথাটার মানে কী? প্রত্যক্ষ যে-সব অবস্থার মধ্যে কাজকর্ম করতে হচ্ছে তা-ই না কি সেইসব জটিল ও সাধারণ অবস্থার সমবায় যার বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতে গেলে দীর্ঘ ও অনুসন্ধানী গবেষণা প্রয়োজন? সোক্রাতেসীয় নীতিসূত্রের মূল কথা, যেখানে 'নৈতিক' ইচ্ছার ভিত্তি হল মননশক্তি, প্রজ্ঞা, যাতে কিনা বলা যায় যে অন্যায় কর্মের কারণ অজ্ঞানতা এবং সমালোচনাত্মক জ্ঞানের সন্ধিৎসাই হল উচ্চতর নৈতিকতা (বা morality *tout court*)-এর ভিত্তি।)

কান্টের সুবচনটিকে একটি সতত সত্য বাক্য হিসেবে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কারণ, এ রকম কোনো ব্যক্তিব সন্ধান পাওয়া শক্ত যিনি এইমতো কোনো বিশ্বাসে কাজ না করেন যে অন্য যে কেউ এই অবস্থায় পড়লে এই রকম কাজ করতেন। যে ব্যক্তি খিদেয় চুরি করে সে তো মনে করে যে খিদেয় মানুষ চুরি করে, যে ব্যক্তি তার বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে খুন করে সে তো মনে করে যে-স্বামীর বিশ্বাস হনন করা হয়েছে তার পক্ষে খুন করাই উচিত কাজ, ইত্যাদি। একমাত্র ডাক্তারি অর্থে 'পাগলরাই' তাদের আচার-আচরণ যে ঠিক তা বিশ্বাস না করেও ওরকম করে। এ-প্রশ্নটা অন্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট: ১. প্রত্যেকেই নিজের বেলায় একটু বেশি সহিষ্ণু, কারণ ব্যতিক্রমী কোনো আচরণের বেলায় নিজের অনুভূতি, বিচার এবং কার্যকারণ সম্পর্কের যে-পরম্পরায় কাজটা সংঘটিত হচ্ছে তার সব অন্ধি-সন্ধিই তো জানা আছে; কিন্তু অন্যের বেলায় আমরা অনেক বেশি কঠোর, কারণ তাদের অন্তর্জীবন তো জানা থাকে না। ২. প্রত্যেকেই তার সংস্কৃতি অনুসারে আচরণ করে, অর্থাৎ তার পরিবেশের সংস্কৃতি অনুসারে; আর 'সব লোক' কথাটার মানেও ঐ পরিবেশ, সেইসব লোকেরা যারা আমাদের নিজেদের মতো চিন্তাভাবনা করে। কান্টের সুবচনের পূর্বশর্ত হল একটাই সংস্কৃতি, একটাই ধর্ম, 'বিশ্বব্যাপী' এক সহমতের আবহাওয়া।

যে-আপত্তিটা ঠিক নয় তা এই: 'একই অবস্থা'-র অস্তিত্ব যে পাওয়া যায় না তার কারণ ঐ অবস্থা-র মধ্যে তো কর্মের কর্তা, তার ব্যক্তিত্ব, ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যে কথাটা বলা যায় তা এই যে কান্টের সুবচন তাঁর সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সর্বজাগতিক আলোক-উদ্ভাসের সঙ্গে এবং লেখকের সমালোচনাত্মক মনোভঙ্গির সঙ্গেও। সংক্ষেপে, এক সর্বজাগতিক স্তর হিসেবে বুদ্ধিজীবীর দর্শনের সঙ্গে জড়িত এ ব্যাপার। অতএব ঐ যে কর্তা তিনিই ঐ 'একই অবস্থা'-র বাহক, বস্তুত তিনিই এর স্রষ্টা। অর্থাৎ, তাঁকে 'অবশ্য'ই সেই 'প্রতিকল্প' অনুযায়ী কাজ করতে হবে যা তিনি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক এটা চাইবেন, তাঁকে কাজ করতে হবে সভ্যতার এমন একটা ধরন অনুসারে যে-সভ্যতাকেই তিনি আনতে চাইছেন

তাঁর কাজকর্মের ভেতর দিয়ে অথবা যে-সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তিনি 'প্রতিরোধ' করে চলেছেন বিলোপকারী সমস্ত রকম প্রতিস্পর্ধী শক্তিকে।

সন্দেহবাদ

সন্দেহবাদের বিরুদ্ধে নেহাত কাণ্ডজ্ঞানের দিক থেকে যে আপত্তি তোলা যেতে পারে তা এই : নিজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণের জন্য সন্দেহবাদীর পক্ষে জড়বৎ অস্তিত্ব বজায় রাখা ছাড়া আর কিছুই করা চলে না, দৈনন্দিন জীবনযাপনের কোনো কিছুর মধ্যেই তো তিনি লিপ্ত হতে পারেন না। কোনো সন্দেহবাদী যদি কোনো বিতর্কে অংশ নেন তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি মনে করেন যে তিনি অন্য লোককে তাঁর নিজের মতে বিশ্বাসী করে তুলতে পারেন। অর্থাৎ, তিনি কিন্তু আর সন্দেহবাদী রইলেন না, এখন তার স্পষ্ট নির্দিষ্ট মতামত রয়েছে, যে-মতামত হয়তো প্রায়শ খারাপ, এবং সে মতামতের প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ওঁকে এটা তুলে ধরতে হবে যে অন্যগুলো আরো খারাপ, কারণ সে সব মতামত কোনো কাজের না। সন্দেহবাদের সম্পর্ক রয়েছে আকাঁড়া বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে রোবের্তো আরদিগো-র একটা বক্তব্য বেশ উল্লেখযোগ্য। যেখানে তিনি বলছেন যে স্বেচ্ছাবাদের জন্য বের্গ্সঁ-কে প্রশংসা করা উচিত। কিন্তু এ কথাটার মানে কী? যেখানে বাস্তব জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপাদানের সন্ধানে বিপ্রতীপ কোনো চিন্তাতন্ত্রের আশ্রয় নিতে হয় সেটা কি জগৎকে ব্যাখ্যা করায় নিজের দর্শনের ব্যর্থতারই স্বীকৃতি নয়? আরদিগো-র এই কথাটা (জি. মারকেসিনি সংকলিত ও বিন্যস্ত তাঁর 'স্ক্রিত্তি ভারি' [নানা লেখা], ফ্লোরেন্স, লে মন্নিয়ের, ১৯২২-এর অন্তর্গত) মার্ক্স-এর ফয়েরবাখ প্রাসঙ্গিক বচনগুলির প্রতিস্পর্ধী হিসেবে স্থাপিত করা উচিত এবং এর থেকে বুঝতে পারা যাবে আকাঁড়া বস্তুবাদের দার্শনিক অবস্থানের থেকে মার্ক্স কত দূরে সরে যেতে পেরেছিলেন।

মতাদর্শ'-এর ধারণা

ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদ', অথাৎ আঠারো শতকী ফরাসি বস্তুবাদের একটা দিক ছিল 'মতাদর্শ'। এর মূল অর্থ ছিল 'ধারণার বিজ্ঞান', এবং যেহেতু বিশ্লেষণই বিজ্ঞানে ব্যবহৃত এবং স্বীকৃত একমাত্র পদ্ধতি, এর মানে দাঁড়াল 'ধারণার বিশ্লেষণ', অর্থাৎ 'ধারণার উৎপত্তি বিষয়ে অনুসন্ধান'। ধারণাকে তার মৌলিক 'উপাদানসমূহে' ভেঙে ফেলতে হবে, আর তখন দেখা যাবে যে তারা 'ইন্দ্রিয়ানুভূতি' ছাড়া আর কিছু না। ধারণা ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে নিষ্পন্ন। কিন্তু ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও 'মানসসত্তার ক্ষমতা' এবং তার 'অবিনশ্বর ভবিতব্য'-এর ওপর বিশ্বাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে দেখতে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়; বস্তুত ক্যাথলিকবাদে তাঁর দীক্ষাগ্রহণ ও প্রত্যাবর্তনের পরেও, এমনকী যখন তিনি 'ইন্নি সাক্রি' [পবিত্র স্তোত্র] রচনা করছিলেন তখনও মানৎসোনি নীতিগতভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতি-

বাদের প্রতি অনুগত ছিলেন ; যতদিন না তিনি রস্‌মিনি-র[৫] দর্শন সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন ততদিন এ ব্যাপারটা চলেছিল।

মতাদর্শের ধারণাটা কীভাবে 'ধারণার বিজ্ঞান' এবং 'ধারণার উৎপত্তি বিষয়ক বিশ্লেষণ' এই অর্থ থেকে বদলে গিয়ে এক নির্দিষ্ট ধারণাতন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করল সেটা ইতিহাসগতভাবে বিচার করে দেখা দরকার। নিতান্ত যুক্তিবিজ্ঞানের হিসাবে প্রক্রিয়াটা ধরতে পারা এবং বুঝতে পারা বেশ সহজ।

এমন কথা বলা যেতে পারে যে ফ্রয়েডই হলেন শেষ মতাদর্শধারী এবং দে মান-ও একজন 'মতাদর্শধারী'। এ কারণেই দে মান-কে নিয়ে ক্রোচে ও ক্রোচেপন্থীদের 'উদ্দীপনা' আরো বিচিত্র ঠেকে—কিংবা বলা যায় বিচিত্র ঠেকত যদি-না তাঁদের উদ্দীপনার একটা 'বাস্তব' যুক্তি থাকত। 'পপুলার ম্যানুয়াল'-এর লেখক [বুখারিন] মতাদর্শে কীভাবে রুদ্ধ হয়ে ছিলেন তা বিচার করে দেখা দরকার ; কর্মকাণ্ডের দর্শন তা থেকে বেশ স্পষ্ট এক ধাপ এগিয়ে ঐতিহাসিকভাবে মতাদর্শের বিপরীতে স্থান নিয়েছে। বস্তুত মার্কসবাদী দর্শনে 'মতাদর্শ' কথাটার যে মানে দাঁড়িয়ে গেছে তার মধ্যেই এক নঞর্থক মূল্যানুশাসন আছে এবং সেইজন্যেই এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতাদের কাছে ধারণার উৎস সন্ধানে ইন্দ্রিয়ানুভূতির শরণাপন্ন হবার, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত শারীরবৃত্তের শরণাপন্ন হবার সম্ভাবনা খারিজ হয়ে যায়। 'মতাদর্শ'-কে ইতিহাসগতভাবেই বিশ্লেষণ করতে হবে, কর্মকাণ্ডের দর্শনের ভাষায়, পরিকাঠামো হিসেবে।

মতাদর্শের মূল্যায়নে একটা সম্ভাব্য ভুলের আশঙ্কা থেকে গেছে বলে আমার মনে হয়, কারণ (খুব যে সেটা হঠাৎ ঘটেছে তা মনে হয় না) 'মতাদর্শ' শব্দটা দুটো ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়—কোনো একটা বিশেষ কাঠামোর আবশ্যিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে, আবার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বেলায় তাদের খেয়ালী মস্তিষ্কচর্চার ক্ষেত্রে। শব্দটার খারাপ অনুষঙ্গ খুব ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবার ফলে মতাদর্শ ধারণাটির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

৫। তাঁর রচনার প্রাঞ্জলতা ও জনপ্রিয়তার জন্য দেতু দ্য ত্রাসি (১৭৫৪-১৮৩৬)-কেই বলা চলে মতাদর্শের সবচেয়ে জোরালো প্রবক্তা। আর একজন ছিলেন 'রাপোর্ত দু ফিজিক্ এ দু মরাল'-এর লেখক ড. কাবানিস। (কঁদিলাক, এল্‌বেতিয়ুস, ইত্যাদি এঁরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক।) ক্যাথলিকবাদ ও মতাদর্শের মধ্যে সংযোগ : মান্‌ৎসোনি, কাবানিস্, বুর্গে, তাইনে (মাউরাস ও ক্যাথলিক প্রবণতার অন্যদের বেলায় তাইনে-কে বলা চলে শোফ্ দেকোল) : 'মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস'ও (স্তাঁদাল ছিলেন দ্য ত্রাসির ছাত্র ইত্যাদি)। দেতু দ্য ত্রাসি-র প্রধান গ্রন্থ 'এলেমাঁৎস দ'ইদিয়োলগি (পারী, ১৮১৭-১৮)। ইতালীয় অনুবাদ আরো পূর্ণাঙ্গ ('এলিমেন্তি দি ইদিয়োলগিয়া দেল্ কোন্তে দেতু দ্য ত্রাসি', জি. কম্পানোনি অনূদিত, মিলান, ১৮১৯)। ফরাসি বইতে একটা গোটা অংশই নেই, মনে হয় প্রেমের ওপর অংশটা, যেটা স্তাঁদাল জানতেন এবং ইতালীয় অনুবাদের ভিত্তিতে যেটা তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

প্রভাবিত হয়েছে ও প্রকৃত অবস্থান থেকে তা অপসৃত হয়েছে। যে-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই ভুলটা গড়ে উঠেছে সহজেই সেটার পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব :

১. মতাদর্শকে কাঠামো থেকে খুব পরিষ্কারভাবে আলাদা করা হয় এবং তারপর বলা হয় যে, মতাদর্শের জন্য তো কাঠামোর পরিবর্তন হয় না বরং উল্টোটা হয় ;

২. কোনো একটা রাজনৈতিক সমাধানকে হয়তো বলা হল 'মতাদর্শগত' -অর্থাৎ, কাঠামোর পরিবর্তনটা যথেষ্ট নয়, যদিও [ঐ রাজনৈতিক সমাধান তা-ই সমাধা করতে পারে বলে মনে করে বলা হয় যে ওটা নিরর্থক, বোকামি, ইত্যাদি ;

৩. এর পরেই এসে যায় ঐ বক্তব্যটা যে প্রত্যেক মতাদর্শই 'বিশুদ্ধ' প্রতিভাস, নিরর্থক, বোকামি, ইত্যাদি।

অতএব, ইতিহাসগতভাবে জৈব প্রকৃতির যে-মতাদর্শ, অর্থাৎ, যা কোনো একটা কাঠামোর জন্য আবশ্যিক তাকে সেই সব মতাদর্শ থেকে আলাদা করতে হবে যেগুলো খানিকটা চাপানো, চিন্তাপ্রসূত বা 'ইচ্ছাশক্তি'-নির্ভর। যে-সব মতাদর্শ ঐতিহাসিক দিক থেকে আবশ্যিক তাদের খানিকটা 'মনস্তাত্ত্বিক' সিদ্ধি রয়েছে ; তারা মানুষজনকে 'সংগঠিত' করে, এবং সেই ক্ষেত্রটা প্রস্তুত করে যার ওপরে ক্রিয়াশীল থেকে মানুষ তাদের নিজেদের অবস্থান, সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করে। যখন ব্যাপারটা চাপানো হয়ে ওঠে তখন সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত 'আন্দোলন'-এর, বিতর্কের এবং এই ধরনের সব ব্যাপারের (অবশ্য এগুলোও পুরোপুরি নিরর্থক নয়, কারণ এদের এক ধরনের ভূমিকা থাকে ভুল হিসেবে সত্যের বিপরীতে প্রতিস্থাপিত হবার এবং সেইভাবে এরা সত্যকে প্রতিভাত করে তুলতে পারে)।

মার্কস যে বারবার বলতেন 'জনপ্রিয় বিশ্বাসের শক্ত ভূমি'-কে কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতির আবশ্যিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে সেটা খেয়াল করা দরকার। উনি যা বলতে চান, তার আসল অর্থ হল : ব্যাপার-স্যাপার বিচার করার একটা বিশেষ ধরন যখন জনপ্রিয় বিশ্বাসের শক্তি পরিগ্রহ করে, ইত্যাদি। মার্কসের আর একটা বক্তব্য যে জনপ্রিয় প্রত্যয়-গুলোর এমন একটা শক্তি আছে যেটা প্রায় বস্তুগত শক্তি বা তারই মতো কোনো কিছু যেন, একথাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সব বক্তব্যগুলোর বিশ্লেষণ করলে আমার মনে হয় ঐ ঐতিহাসিক জোট-এর ধারণাটা আরো জোরদার হবে ; এই ঐতিহাসিক জোট-এর মধ্যে যথার্থই বস্তুগত উপাদান-গুলি হল বিষয়বস্তু এবং মতাদর্শগুলো হল তার রূপকাঠামো, যদিও বিষয়বস্তু ও রূপকাঠামোর মধ্যেকার এই বিভাজন নিতান্ত শিক্ষাগত তাৎপর্যের কথা ভেবে করা হয়েছে ; কারণ, বস্তুগত উপাদানগুলিকে ঐতিহাসিক দিক থেকে রূপকাঠামো বাদ দিয়ে কল্পনা করা অসম্ভব আর মতাদর্শগুলোও বস্তুগত শক্তি ব্যতিরেকে দাঁড়িয়ে যাবে ব্যক্তিগত খেয়ালী কল্পনায়।

কর্মকাণ্ডের দর্শন আলোচনায় কিছু সমস্যা

[**সম্পাদকীয় ভূমিকা।** আগের অংশটির মতো এই অংশটিও 'জেলখানার নোটবই'-এর পাণ্ডুলিপি থেকে 'সম্পাদিত' অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন অংশাবলির সংহত ও পুনর্বিন্যস্ত রূপ। ফলে সূত্রাকারে লিখিত অসম্পূর্ণ বাক্যও এসে পড়ে প্রায়ই। ইংরেজি সংস্করণেব সম্পাদকেব মতে, 'এই টীকাগুলিতে দুটি মৌল বিষয় ভিত্তিস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত। একটি হল মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর রচনাবলি থেকে শুরু করে মার্কসবাদের প্রথম উন্মেষের ইতিহাসেব পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন। দ্বিতীয়টির লক্ষ্য. এঙ্গেলস্-এর মৃত্যুর পর থেকেই সাবেকি মার্কসবাদের অনেকটা জুড়েই যা একটা লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই পজিটিভিস্ট বা প্রত্যক্ষবাদী এবং/অথবা নব্য-কাণ্টীয় ধারা থেকে বিচিত্র সংগ্রহণ তা থেকে মার্কসীয় পরম্পরাকে মুক্ত করা। এই টীকাগুলিতে গ্রামশি জোর দিযেছেন ইংলণ্ড-এর রাজনীতিক অর্থনীতি ও হেগেল-এ পৌঁছে জর্মন দর্শনের যে ভাববাদী পরম্পরার পরিণতি ঘটে, সেই দুই পরম্পবার কাছে মার্কস-এর ঋণেব উপব ; তিনি মার্কসবাদকে দেখেছেন এই দুই ধারার সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবেব রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সমন্বয়ের পরিণাম রূপে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদের মৌলিকতা ততটা জডবাদে নয় যতটা সব ধরনেব অতীন্দ্রিযবাদের চূড়ান্ত পরিহারে। এর থেকেই গ্রামশি এগিযে যান ভাববাদের সমালোচনার এক নবভাষ্যে। যদিও তিনি ক্রোচে-র তত্ত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিরোধ গডে তুলবার কাজে 'নোটবইয়ের' অনেকটা অংশই ব্যয় করেন, তথাপি তিনি শেষ পর্যন্ত কর্মকাণ্ডের দর্শনের প্রধান শত্রুরূপে ভাববাদকে চিহ্নিত না কবে অতীন্দ্রিয়বাদ ও মেটাফিজিক্স্ (বা অধিবিদ্যাকে) চিহ্নিত করেন ; আডলার ও হিলফারডিং-এর অস্ট্রো-মার্কসবাদে নব্য-কাণ্টীয় বিচ্যুতি এবং প্লেখানভ ও বুখারিন-এর 'জডবাদী' গোঁড়ামির উপর তাঁব দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।'

মার্কস-এর মূল চিন্তা থেকে তার লেনিনীয় প্রয়োগের ইতিহাসকে গ্রামশি দেখেছেন এক ঐতিহাসিক অনিবার্যতার ক্রমান্বয়ে। বিবর্তমান এক সমাজের সামূহিক চিন্তায় যে কল্পজগৎ গড়ে উঠেছিল তাকে এক বৈজ্ঞানিক দর্শনের রূপ দিয়েছিলেন মার্কস। এই দর্শন যেহেতু আব ইউটোপিয়া বা কল্পচিন্তা নয়, ববং গ্রামশি যাকে বলেন 'কর্মকাণ্ডের দর্শন', স্বভাবতই এই দর্শনের যথার্থ ও অনিবার্য বিকাশ ঘটবে ইতিহাসের ধারায়—যাতে একটি শ্রেণী এই দর্শনকে গ্রহণ করে, অবলম্বন করে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এই দর্শনের 'প্রকৃত দ্বান্দ্বিকতায়' তার উত্তরণ ঘটাবে। মার্কস ও লেনিনের তুলনায় গ্রামশি গুরু-শিষ্যের তুলনা বা স্রষ্টা-নির্মাতা ও অধস্তন অনুসারী বা প্রয়োগকর্তার সম্পর্ক টেনে আনেননি। বরং সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষার আধিপত্যে (যা ঘটানোর কৃতিত্ব লেনিনের) মার্কসীয়

দর্শনের 'ঐতিহাসিক ভূমিকা'র পরীক্ষা তথা 'সত্যিকার সমালোচনা' শুরু হয়ে যায়। গ্রামশির এই বিচার গ্রহণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়নে মার্কসীয় দর্শনের 'প্রয়োগ'কে আর নিতান্ত কিছু সুনির্দিষ্ট বিধি বা সূত্রের ঠিক বা ভুল প্রয়োগ রূপে বিবেচনা করা যায় না, কর্মকাণ্ড ও দর্শনকে এক অবিচ্ছিন্ন দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে দেখতে হয়, যাতে দর্শন ও ইতিহাসের প্রক্রিয়া ক্রমাগত যুগপৎ মূল্যায়িত হয়।

মার্কস ও লেনিনের মধ্যে অনিবার্য ক্রমান্বয়তার এই বোধ গ্রামশি শেষ পর্যন্ত তুলনা করেন যিশু খ্রিস্ট-এর জীবন, কর্ম ও ধর্মোপদেশের প্রয়োগে সন্ত পল-এর ভূমিকার সঙ্গে। ক্রুসোপরি খ্রিস্ট-এর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর সন্ত মার্ক-এর গসপেল বা 'পুণ্যবাণী' থেকে যে খ্রিস্টধর্মের উন্মেষ পরবর্তী গসপেল তথা মঙ্গলাখ্যানগুলিতে খ্রিস্ট-এর দৈবলক্ষণ ও তাঁর ধর্মোপদেশের বিস্তারে-বিকাশে তা ক্রমেই পুষ্ট হতে থাকলেও ৪৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সন্ত সল (অচিরেই যিনি পল নামেই বেশি পরিচিত হন) খ্রিস্টধর্ম প্রচারে ও শহরে শহরে ছোট ছোট গির্জা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হতেই খ্রিস্টধর্ম একটা ধর্মীয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে ও তার নিজের আচরণবিধি ও সংগঠন লাভ করে। খ্রিস্ট-এর কর্মে ও ধর্মোপদেশের প্রচলিত স্মৃতিতে যে বীজ নিহিত ছিল, পল-এর প্রয়াসেই তা বিশ্ববীক্ষা ও তার প্রাতিষ্ঠানিক-সাংগঠনিক প্রয়োগে পরিণতি লাভ করে। খ্রিস্ট ও পল-এর অবদানের যোগফলে তথা পারম্পর্যেই খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়—গ্রামশি তাই খ্রিস্টধর্মকে 'ঐতিহাসিক দিক থেকে' 'খ্রিস্ট-পলবাদ' বলবেন। মার্কস-লেনিন ও খ্রিস্ট-পল-এর এই অপরিহার্য ধারাবাহিকতার মধ্যে যে সাদৃশ্য, তার ইঙ্গিত গ্রামশি আহরণ করেছেন ১৯১৮ সালে মিলান-এ প্রকাশিত অলজিয়াতি-র 'কারলো মার্কস' নামে বই থেকে। ১৯২১ সালে ইতালীয় সমাজবাদী দলের (পি. এস. আই—পার্তিতো সোসিয়ালিস্তা ইতালিয়ানো) সপ্তদশ কংগ্রেসে যখন কমিউনিস্টরা দল ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে লিভোর্নো-তেই ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন, তখন কাউন্ট আনতোনিও গ্রাৎসিয়াদেই (১৮৭৩-১৯৫৩) নতুন পি. সি. আই (পার্তিতো কমুনিস্তা দিতালিয়া)-তে যোগ দেন, ও ১৯২৮ সালে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন। গ্রাৎসিয়াদেই ১৯২৩ সালে মিলান-এ প্রকাশিত তাঁর 'প্রেৎসো এ সোপ্রাপ্রেৎসো' গ্রন্থে যখন মার্কস-কে কেবলমাত্র 'বিজ্ঞানের মহামনীষীদের পরম্পরায় অন্যতম এক ব্যক্তিত্ব' রূপে দেখেন, তখন গ্রামশি তাঁর বিচারকে 'গোড়াতেই ভুল' বলে সমালোচনা করেন। তাঁর মতে মার্কস-এর বিশ্ববীক্ষা এমনই ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাত্মক যে কমিউনিজ্‌ম্ বা সাম্যবাদের আবির্ভাব পর্যন্ত তা 'বিশ্ববিধান' রূপে অবিচল থাকবে।

'রাজনৈতিক সমাজ' থেকে 'নিয়ন্ত্রিত সমাজে' উত্তরণ, 'আবশ্যিকতা' থেকে 'স্বাধীনতায়' উত্তরণ এবং তখনই মার্কসবাদের 'কালাবসান'—গ্রামশি-র এই তত্ত্বের উৎস রয়েছে এঙ্গেল্‌স্-এর 'সমাজবাদ। কল্পজাগতিক ও

বিজ্ঞানাত্মক' গ্রন্থে, যেখানে প্রোলেতারীয় বিপ্লবের সার্থকতায় তিনি রাষ্ট্রের বিলয় ও মানুষের চূড়ান্ত স্বাধীনতার সম্ভাবনা দেখতে পান: 'প্রোলেতারিয়ত জনশক্তি আয়ত্ত করে তার সাহায্যে উৎপাদনের সামাজিকীকৃত পন্থার রূপান্তর সাধন করে, বুর্জোয়াজির হাত থেকে তাকে জনসম্পদে পরিণত করে। এই ক্রিয়ার দ্বারা প্রোলেতারিয়ত শ্রেণী উৎপাদনের পন্থাকে এতাবৎকাল প্রচলিত পুঁজি-চরিত্র থেকে মুক্ত করে তার সামাজিকীকৃত চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ উন্মোচিত করে দেয়। এইবার পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনানুসারে সামাজিকীকৃত উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদনের এই বিকাশে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্বই অবাস্তব হয়ে যায়। সামাজিক উৎপাদনে স্বেচ্ছাচার যতই অপসৃত হয়, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্বও ততই মুছে যেতে থাকে। মানুষ অবশেষে তার নিজস্ব সমাজ-সংগঠনের নিয়ন্তারূপে যুগপৎ প্রকৃতিরও নিয়ন্তা হয়ে ওঠে, তার নিজের নিয়ন্তারূপে মুক্ত হয়ে যায়।'

মার্ক‌স-এর বিশ্ববীক্ষার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের ওপর গ্রামশি যেমন জোর দিয়েছেন, তেমনই জোর দিয়েছেন সেই বিশ্ববীক্ষার যথার্থ পাঠের উপর। 'পদ্ধতির প্রশ্নে' তিনি মার্ক‌স-এর যাবতীয় 'রচনার' (যার অন্তর্গত তাঁর জীবৎকালে তারই পরিণত ও সম্পূর্ণ পাঠে প্রকাশিত প্রবন্ধ, গ্রন্থ, ইশতেহার; তাঁর মরণোত্তর প্রকাশিত এমন অনেক রচনা যা হয়তো তিনি নিজেই প্রকাশযোগ্য মনে করতেন না বা ইচ্ছে করেই অসম্পূর্ণ রেখে গেছলেন; তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এঙ্গেলস্-এর দ্বারা সম্পূর্ণকৃত বা দুজনের মধ্যে ভাগাভাগি করে লেখা কোনো রচনা, চিঠিপত্র বা বক্তৃতা যার মধ্যে 'যুক্তির ভুলভ্রান্তি অনেক বেশি থেকে যেতে পারে' ইত্যাদি) যাথার্থ্যের যথোচিত মূল্যায়ন করে তবেই মার্ক‌সীয় চিন্তার এক চালচিত্র রচনার দিকে এগোবার পরামর্শ দিয়েছেন। মার্ক‌স ও এঙ্গেলস্-এর যৌথ কাজের মধ্য থেকে মার্ক‌স-এর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তাকে আলাদা করে চিনে নেবার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি মার্ক‌স-এর রচনাবলির একটি 'কূটনৈতিক' সংস্করণ সংকলনের প্রস্তাব করেন। 'কূটনৈতিক' সংস্করণ বলতে তিনি যা বোঝেন তা হল এমন এক সংকলন যা কেবল মার্ক‌স-এর যাবতীয় লেখা-কেই আদি, অবিকৃত, 'অ-সম্পাদিত' আকারে গ্রথিত করবে, অর্থাৎ মার্ক‌স নিজে যা যতটুকু যেভাবে লিখে রেখে গেছলেন তা-ই এই সংস্করণের অন্তর্গত হবে।

বস্তুত মার্ক‌স-এর চর্চার ক্ষেত্রে জটিলতার দুটি সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন গ্রামশি। একটি, মার্ক‌স-এর রচনার সম্পাদনায় ও বিস্তারে এঙ্গেলস্-এর যোগদান ও অবদান। গ্রামশি এ বিষয়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন; 'কথাটা হল যে [এঙ্গেলস্] তো [মার্ক‌স] নন এবং কেউ যদি [মার্ক‌স]-কেই জানতে চান তাহলে সবচেয়ে আগে তাঁকে তাঁরই প্রামাণিক রচনাবলিতে যেতে হবে, সেইসব রচনা যা তাঁর নিজস্ব দায়িত্বে সরাসরি প্রকাশিত।' দ্বিতীয়টি,

মার্কসের বৌদ্ধিক বা মননচর্চার চরিত্রে নিহিত। মার্কস-এর মধ্যে গ্রামশি দেখেছেন এক 'বীরের আক্রোশ'। কথাটা ইয়োরোপীয় নবজাগৃতির অন্যতম মহামনীষী জিওরদানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০)-র। কথাটার মধ্যে দু'-ধরনের জ্ঞান বা জ্ঞানাহরণের ইঙ্গিত আছে—শুদ্ধ মনস্বিতার মধ্য দিয়ে বা সাধনার মানসিকতায় জ্ঞানাহরণ এবং 'বীরের আক্রোশে' অর্থাৎ কর্মমুখী প্রবল আবেগের তাড়নায় জ্ঞানাহরণ। এই দ্বিতীয় ধরনের জ্ঞানাহরণে জ্ঞানার্থী স্বভাবতই কোনো একটা নতুন তত্ত্ব বা ধারণায় পৌঁছে সাময়িক-ভাবে তার প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারেন, তাঁর রচনাকেও তা তখন আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে, আবার আরেকটা নতুন ধারণা এসে পড়ে তা তাঁকে ঐ ধারণা থেকে একেবারেই সরিয়ে দিতে পারে। এই ধরনের টাল-মাটাল মার্কস-এর চিন্তার বিবর্তনে বারবারই ঘটেছে। তার মধ্যে আরো যা কাজ করেছে তা হল মার্কস-এর 'ব্যক্তিত্বের মধ্যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রয়োগের এক অঙ্গাঙ্গি সম্মিলন', এমন এক 'মননের জগৎ' যা 'সদাপরিবর্ত-মান ও বিকাশশীল' এবং এক 'আত্মসমালোচনার বোধ' যা 'যেমন তীব্র তেমন ক্ষমাহীন।'

ফলে মার্কস-এর চিন্তার ধারা বা তাঁর তত্ত্বের বিকাশ সুনির্দিষ্ট সরল-রৈখিক বিবর্তনের পথে চলেনি। একদিকে পুঁজিবাদের বিকাশ তখন অত্যন্ত দ্রুত, ও ক্রমশই নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সাংগঠনিক দায় মার্কসকে তাড়িত করছে, তাছাড়াও বাধা ও প্রতিরোধ আসছে নানা দিক থেকে, এরই মধ্যে মার্কস অনেক কিছু পড়ছেন, সমকালীন তথ্য সংগ্রহ করছেন আত্যন্তিক নিষ্ঠায়, সেই তথ্যের নিরিখে যাচাই করছেন পড়ে শুনে পাওয়া তত্ত্বধারণা, তাতে তাঁর চিন্তার আকার নানা রূপে পালটে পালটে চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সময়ানুক্রম ধরে মার্কস পাঠের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যেখান সেখান থেকে যা-কিছু মার্কস-এর বাণী বলে আহরণ করে তাকেই মার্কসবাদ বলে খাড়া করার প্রবণতা সম্পর্কে গ্রামশি-র সতর্কবাণী আজও সমান প্রযোজ্য। মার্কস-এর চিন্তার বিবর্তনে অন্যদের রচনার পাঠ ও চর্চায় যা আহরিত হয়েছে (তার সবটাই হয়ত গ্রহণে নয়, কতক বা বর্জনেও), তা থেকে মার্কস-এর স্বাধীন চিন্তার নিজস্ব সংগঠনের যে স্বাতন্ত্র্য তার ওপর জোর দেওয়া গ্রামশি প্রস্তাবিত একটা পদ্ধতিসূত্র। সেই পদ্ধতিসূত্র যেন গ্রামশি তাঁর নিজের রচনা ও চিন্তার ক্রমবাহিক বিচারেও প্রস্তাব তথা প্রত্যাশা করছেন।

তাই স্বভাবতই তাঁর নিজের মার্কসবাদ চর্চায় দুই ইতালীয় মার্কসবাদী রোবের্তো মোনদোলফো ও আন্তোনিও লাব্রিয়োলা-র অবদান বা ভূমিকার স্বীকৃতি এসে পড়ে। 'কর্মকাণ্ডের দর্শন' শব্দবন্ধটি ইতালীয় ভাষায় লাব্রিয়োলা-ই (১৮৪৩-১৯০৪) প্রবর্তন করেন। ১৮৭৪-১৯০৪ খ্রি. লাব্রি-য়োলা রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করেন, ১৮৯০ সালে ইতালীয় ভাষায় সর্বপ্রথম 'কমিউনিস্ট ইশতেহার'-এর অনুবাদ করেন। ১৯০০ সালে

প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধসংকলন 'লা কনচেৎসিওনে মাতেরিয়ালিস্তা দেল্লা স্তোরিয়া' ('ইতিহাসের জড়বাদী ধারণা') ১৯০৮ সালে ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে শিকাগো থেকে প্রকাশিত হয়। ডুর্কহাইম এই বইটির সমালোচনায় মার্কসবাদের অন্তর্নিহিত সমাজবিজ্ঞানের মূল্য ও গভীর তাৎপর্য লক্ষ করেন। লুচিও কোলেত্তি থেকে শুরু করে লেশেক কোয়াকোভস্কি লাব্রিয়োলা-র গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। কোয়াকোভস্কি লিখেছেন: 'রুশদেশে প্লেখানভ ও ফ্রান্স-এ লাফার্গ যে ভূমিকা পালন করেছেন আন্তোনিও লাব্রিয়োলা ইতালিতে অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছেন; তাঁর দেশে তিনিই প্রথম মার্কসবাদকে একটা বিন্যাসরূপে ব্যাখ্যা করেছেন এবং যে আকারে তা ঐ দেশে গৃহীত হয়েছে তার ওপর তাঁর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ।' দীর্ঘ সময় ধরে দর্শনচর্চার মধ্য দিয়ে ১৮৯০-এর দশকে তিনি মার্কসবাদ গ্রহণ করেন। পূর্বোক্ত 'ইতিহাসের জড়বাদী ধারণা', ১৯০৬ সালে তাঁর ছাত্র ক্রোচে কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত তাঁর 'দর্শন ও রাজনীতি বিষয়ক বিভিন্ন রচনা' ('স্ক্রিত্তি ভারি দি ফিলসফিয়া এ পোলিতিকা') এবং ১৯২৫ সালে লুইজি দাল পানে কর্তৃক সংকলিত তাঁর অবশিষ্ট টীকাদি ও ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত সোরেল-কে লেখা পত্রগুচ্ছে তাঁর মার্কসবাদী চিন্তার যেমন পরিচয় আছে তেমনই আবার মার্কসবাদী বিচার পদ্ধতির প্রয়োগবিহীন ইতালীয় প্রগতিশীল চিন্তার মূল প্রবাহের অন্তর্গত ভাবনারও প্রমাণ আছে। মার্কসবাদী তত্ত্ব ও পদ্ধতির প্রয়োগে এক ধরনের এই শিথিলতাই, এই পদ্ধতির প্রয়োগে-অপ্রয়োগে এই দোলাচলই ত্রত্স্কি-কে লাব্রিয়োলা প্রসঙ্গে 'দিলেত্তাঁত' কথাটি ব্যবহারে প্ররোচিত করেছে—যাতে গ্রামশি উষ্মা প্রকাশ করেন। আসলে মার্কস-এর চেয়ে হেগেল-ই লাব্রিয়োলা-কে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন। বিশেষত হেগেল-এর ধারণা যে, সভ্যতার কোনো বিশেষ পর্বের অন্তর্নিহিত অন্তর্বিরোধ থেকেই যে পরিবর্তিত ঐতিহাসিক চাহিদা উদ্ভূত হয়, তারই প্রকাশ ঘটে নতুন দার্শনিক চিন্তায় বা বোধে। হেগেল থেকেই যে ঐতিহাসিকতাবোধ লাব্রিয়োলা লাভ করেছিলেন, মার্কস-এর যোগে তা পুষ্ট হয়েছিল, কিন্তু কখনোই পুরোপুরি মার্কসীয় চারিত্র্য পরিগ্রহ করেনি। কোয়াকোভস্কি বলেন, 'লাব্রিয়োলা মার্কসবাদকে একটি সুসংহত, আত্মসম্পূর্ণ বিন্যাসে পরিণত করতে চাননি, বরং অনির্দিষ্টতার এমন এক মাত্রা রাখতে চেয়েছিলেন যাতে এই তত্ত্ব আত্মতৃপ্তি ও বিশ্বজ্ঞানের উপর সর্বের কর্তৃত্ব কল্পনা করে জড়ত্বে নিমজ্জিত না হয়। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদকে যে "সমালোচনাত্মক" তত্ত্ব বলে বর্ণনা করা হয়, সেই বর্ণনাকে তিনি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছিলেন—এই অর্থে নয় যে তা অন্য তত্ত্বকে ক্রমাগত আক্রমণ করে, বরং এই অর্থে যে তা কোনো সত্যকেই চিরস্থায়ী বলে মানে না, সব প্রতিষ্ঠিত নীতিকেই কালানুশ্রয়ী বিবেচনা করে, এবং অভিজ্ঞতার শাসনে তার যে-কোনো সিদ্ধান্ত পরিহার করতে বা পালটে নিতে প্রস্তুত।' লাব্রিয়োলা মার্কসবাদকে সমাজতাত্ত্বিক বিচার বা বিশ্লেষণের

পদ্ধতি হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ধারাকে বুঝবার উপায় হিসেবে। তাই বলে ইতিহাসের ধারাকেও তিনি কোনো যান্ত্রিক, অমোঘ পারম্পর্যরূপে দেখেননি: জাতিগত স্বাতন্ত্র্য, ধর্মীয় আবেগের অবিনশ্বরতা, প্রগতির ক্রমভঙ্গ, এবং ভবিষ্যতের অনির্দেশ্যতা ইতিহাসের ধারার যে-কোনো ক্রমিকতাকে বিঘ্নিত বা ব্যাহত করতে পারে। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো সুনির্দিষ্ট বিবর্তনসূত্র তিনি স্বীকার করেন না: 'বিশেষ বিশেষ সম্পর্কের অন্বয়ে যুক্ত সভ্যতাগুলি তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসারে ও বিভিন্ন মূল্যবোধের বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বিকাশলাভ করে; তাই আমাদের মানতেই হবে যে আদি লক্ষণগুলি পরবর্তী প্রভাবগুলিকে প্রভাবিত করে। ...এতগুলি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ঘটনাপরম্পরা, এতগুলি লক্ষণ যা কোনো সরলীকরণের ধার ধারে না, এত অননুমেয় সমাপতন বিবেচনা করতে হয় যে সব-কিছুর মূলে একটা যথার্থ উন্নতি বর্তমান বা আদিতম কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত যাবতীয় প্রেরণা বা ক্রিয়ার পেছনে অভিজ্ঞতার একটা স্থায়ী বিষয় বর্তমান, এমন একটা ধারণা অত্যন্ত অযৌক্তিক মনে হয়, একটা বিভ্রান্তি বলে বোধ হয়।' ইতিহাসের অমোঘ ধারা প্রগতিরই পথে, এমন কোনো ধারণাকে লাব্রিয়োলা প্রশ্রয় দেন না। এমনকী সমাজতন্ত্রের কোনো 'ঐতিহাসিক অনিবার্যতা'য়ও তাঁর ভরসা নেই। তিনি বলেন, পুঁজিবাদ সমাজতান্ত্রিক সমাজের 'অভিমুখে পথ' নির্মাণ করে, সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা পুঁজিবাদী শোষণের কোনো নৈতিক ধিক্কার নয়, বরং একটি ঐতিহাসিক প্রবণতার স্বীকৃতি মাত্র; সমাজতন্ত্র 'বাস্তবের কোনো বিষয়ীগত সমালোচনা নয়, বরং তার মধ্যে নিহিত আত্মসমালোচনার আবিষ্কার।' প্রবল বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সমাজতন্ত্র আসবে, এমন সম্ভাবনাও তিনি মানেন না: ১৯২২-এর বক্তৃতামালায় তিনি বলেন, 'উদারনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের' ভিতের ওপরই ধীরে ধীরে নতুন সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাস প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া যাবে।

কোওয়াকোভস্কির বিবরণ অনুসরণ করে লাব্রিয়োলার এই-যে দৃষ্টিভঙ্গি আমরা এখানে উন্মোচন করলাম, তার সঙ্গে গ্রামশি-র মার্কসবাদের খুব একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে না। মার্কসবাদ বা সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সমকালীন সমান্তরাল ধারাগুলির সঙ্গে প্রতিতুলনায় তিনি যখন লাব্রিয়োলা-কে গুরুত্ব দেন, তখন তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে 'দার্শনিক প্রশ্ন উপস্থাপনার' লাব্রিয়োলার 'যে-ধরন' সেইটিই; কারণ নিম্নবর্গ শ্রেণীর 'প্রাধান্যে' পৌঁছবার সংগ্রামকালে তত্ত্বের ক্ষেত্রে যে তাৎক্ষণিকতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, 'প্রাধান্যে' পৌঁছে 'আধিপত্যের' স্তরে উন্নীত হবার প্রয়াসে তাতে কাজ চলে না। নতুন সমাজের জন্য তখনই প্রয়োজন হয় 'আরো বিশ্বজনীন সব ধারণার ও আরো সূক্ষ্ম ও লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ মতাদর্শগত অস্ত্রশস্ত্রের।' এই পরিপ্রেক্ষিতে প্লেখানভের সঙ্গে লাব্রিয়োলার প্রতিতুলনা এবং বিপ্লবের 'স্টুর্ম উন্ড্ ড্রাং' পর্বের ইঙ্গিতটিও অর্থপূর্ণ।

জর্মন নাট্যকার ফ্রীডরিশ মাক্সিমিলিয়ান ভন ক্লিংগার (১৭৫২-১৮৩১)-এর তরুণ বয়সের লেখা একটি নাটকের নাম 'স্টুর্ম উন্ড্ ড্রাং' ('ঝড় ও ঈপ্সা', ১৭৭৬) থেকেই জর্মনিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত সক্রিয় একটি রোম্যানটিক সাহিত্যপ্রবণতার নাম চিহ্নিত হয়ে যায়। বিপ্লবের একেবারে প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্বে উদ্দীপনী আবেগের দ্বারা চালিত যে তত্ত্বভাবনা ও তার যে আবেগদীপ্ত প্রচার, তাকেই গ্রামশি বিপ্লবের 'স্টুর্ম উন্ড্ ড্রাং' পর্ব বলে বর্ণনা করলেও সাহিত্যে 'স্টুর্ম উন্ড ড্রাং'-এর অন্যতম লক্ষণই ছিল নিওক্ল্যাসিসিজ্ম্ বা নব্যধ্রুপদীতন্ত্রের নিয়মানুসারিতা পরিহার করে ঐতিহাসিক মাত্রায় সাহিত্যকে স্থাপন করার চেষ্টা, পরিবেশগত শক্তিসমূহের প্রভাব স্বীকার ও গ্রহণ করা—যা হয়তো একদিক থেকে দেখতে গেলে বৈপ্লবিক প্রকল্পের প্রথম পদক্ষেপও বটে। রুশদেশে মার্কসবাদের প্রথম ব্যাখ্যাতা জিঅর্জি ভালেনতিনোভিচ প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮) জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নারোদনিকদের পুরোভাগে তাঁর বিপ্লবী জীবন আরম্ভ করে ক্রমে মার্কসবাদের দিকে চলে আসেন। ১৮৮২ সালে তিনিই প্রথম রুশ ভাষায় 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' অনুবাদ করেন, যার প্রকাশকালে মার্কস এই সংস্করণের জন্য একটি বিশেষ ভূমিকা লেখেন। পরে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনার অনুবাদ করে তিনি রুশভাষায় মার্কসচর্চার ভিত তৈরি করে দেন। নীল হার্ডিং দাবি করেছেন যে, প্লেখানভই 'মার্কস-এর পরিণত চিন্তাকে সর্বপ্রথম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলে চিহ্নিত করেন' (দ্র টম বটোমোর সম্পাদিত 'এ ডিকশনারি অফ মার্কসিস্ট থট', লন্ডন ১৯৮৩)। দেশে-দেশান্তরে পলাতক উদ্বাস্তু জীবনযাপনের মধ্যে তত্ত্বব্যাখ্যায়, সংগঠন নির্মাণ ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন ও সবাসরি প্রচারকর্মের ব্যস্ততায় ও চাপে প্লেখানভ দ্বান্দ্বিক পন্থায় অর্থনৈতিক নির্ধারণের মূলনীতির প্রয়োগকেই বিশ্ববীক্ষারূপে যথেষ্ট বিবেচনা করে মার্কসবাদের সম্ভাবনাকেই সীমিত করেন, অন্য কোনো দার্শনিক পরম্পরা বা গ্রামশি যাকে 'ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের' উত্তরাধিকার বলেন তার সঙ্গে কোনোভাবেই মার্কসবাদকে যুক্ত করতে প্লেখানভের সম্মতি ছিল না। এই শুদ্ধ মার্কসবাদের সাধনাই শেষ পর্যন্ত প্লেখানভকে রুশ বৈপ্লবিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ১৯১৭য় বোলশেভিকদের ক্ষমতাভিমুখে অগ্রগমন তাঁর কাছে মনে হয়েছিল অকালীয়, যথোচিত প্রস্তুতিবিহীন; অথচ তাঁর শেষ জীবনের (যখন দীর্ঘ প্রবাসান্তে ১৯১৭য় তিনি আবার রুশদেশে ফিরে এসেছেন) লেখায় বিপ্লব তথা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিষয়ে তাঁর সংশয় আজ পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

প্লেখানভের যে মার্কসবাদ-পাঠকে গ্রামশি 'গোঁড়া ধারার' প্রতিনিধিস্থানীয় বিবেচনা করছেন, তার ঠিক 'বিপরীত একটা ধারা'ও তিনি লক্ষ করছেন সমকালীন অস্ট্রো-মার্কসবাদের মধ্যে। উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে মাক্স্ আডলার, অটো বাউআর, রুডল্ফ্ হিল-

ফেরডিং ও কার্ল রেনার-এর নেতৃত্বে অস্ট্রো-মার্কসবাদ অস্ট্রিয়ায় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'র (এস. পি. ও.) অভ্যুদয়ে তাত্ত্বিক ভিত্তি জোগায়। আডলার (১৮৭৩-১৯৩৭)-ই নব্য-কাণ্টবাদের সঙ্গে এই ধারার যোগ রচনা করেন। তাঁর মতে মার্কস-এর সমাজধারণার মূল তত্ত্বই হল 'সামাজিকীকৃত মানবতা' বা 'সামাজিক সংলিপ্ততা' যাকে তিনি নব্য-কাণ্টীয় ধারায় জ্ঞানের প্রাগভিজ্ঞ একটি পদার্থ বলে বিবেচনা করেন, অর্থাৎ মার্কস 'সামাজিকীকৃত মানবতার' এই তত্ত্বটি প্রবর্তন করেই একটি যথার্থ সমাজবিজ্ঞানের সূচনা করেন। অস্ট্রিয়ার রাজনীতিতে বিশের দশকের খোলামেলা পরীক্ষাপ্রবণ সাংস্কৃতিক আবহে নিজেদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অস্ট্রো-মার্কসবাদীরা মার্কসবাদ ও সমাজবাদী ধ্যানধারণাকে ইয়োরোপীয় সাংস্কৃতিক পরম্পরার অভিন্ন অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠা করায় আগ্রহী ছিলেন; মার্কসবাদের স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব প্রমাণের চেয়ে ইয়োরোপীয় দর্শন ও সমাজচিন্তার বিভিন্ন প্রবণতার সঙ্গে তার সংযোগবিন্দু আবিষ্কারেই তাঁরা বেশি উৎসাহী ছিলেন। এই লক্ষ্যানুসরণেই তাঁরা ১৮৬০-এর দশকে উদ্ভূত নব্য কাণ্টচর্চা থেকে প্রেরণা আহরণ করেন। অন্ধ তথ্যনির্ভরতা তথা 'বিজ্ঞানবাদ'-এর সর্বাত্মক কার্যকারণ-পারম্পর্যের মধ্যে নব্য-কাণ্টবাদীরা একটা ঘোরতর অসংগতি লক্ষ করেই মানুষের যুক্তিচিন্তার প্রয়োগেই এক মূল্যমান নির্দেশ এবং সেই মূল্যমান প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ব্যক্ত করেন। কোনো অমোঘ প্রকৃতিবিজ্ঞান বা জীববিজ্ঞানের সূত্রে মানবসমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের সামগ্রিক ছবি খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রাগভিজ্ঞ স্বাধীনতাসাধ ছাড়া মানুষের ইতিহাসের একটা অন্যতম মূল প্রবণতার কোনো ব্যাখ্যাই পাওয়া যাবে না।

অস্ট্রো-মার্কসবাদী আন্দোলনে আডলার-এর সহযোগী অটো বাউআর (১৮৮১-১৯৩৮) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আডলার-এর চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ছিলেন। কারাবাস, মন্ত্রিত্ব, নির্বাসন, সবই এসেছে তাঁর কর্মময় জীবনে। সমাজবাদে নীতিবোধ ও মূল্যমানের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় অস্ট্রো-মার্কসবাদীরা যেমন কান্ট-কে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে তাঁকে সাক্ষী মেনেছেন, তেমনই ধর্মীয় বোধ বা চেতনাকে (ধর্মীয় সংঘ-প্রতিষ্ঠানাদি, পুরোহিত সম্প্রদায় ও তাঁদের নানাবিধ ধর্মনীতি নয়) গুরুত্ব দিয়েছেন। 'সোৎসিয়াল-ডেমোক্রাটী, রেলিগিয়ন, উন্ড কিরখে' ('সমাজবাদী গণতন্ত্র, ধর্ম ও ধর্মসংঘ', ১৯২৭) গ্রন্থে বাউআর সমাজবাদীদের বোঝাতে চান যে এই প্রাগভিজ্ঞ ধর্মীয় বোধ নির্যাতিত জনগণকে সান্ত্বনা দেয়, জীবনে আস্থা দেয়; তাই বৈপ্লবিক আন্দোলনকালেও ধর্মবিরোধী কোনো প্রচার বা অভিযান সমাজবাদী দলের কর্মসূচির অন্তর্গত হতে পারে না। (যে বিশেষ প্রসঙ্গক্ষেত্রে মার্কস ধর্মকে 'জনতার আফিম' বলে বর্ণনা করেন, সেখানেও—'ক্রিটীক অফ হেগেলস্‌ ফিলসফি অফ রাইট', ১৮৪৩-৪—এই ধরনের ইঙ্গিত আছে, যদিও মার্কস-ই অন্যত্র ধর্ম বিষয়ে আরো কড়া মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, দ্র. 'ক্যাপিটাল',

প্রথম অধ্যায়, শেষ অংশ)। বাউআর ধরে নেন, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হলেও ধর্মের প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে না। কারণ, বিশ্বপ্রকৃতি বা বিশ্বের যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডের পেছনে একটা কোনো গোপন তাৎপর্য বা মানস বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, এমন একটা ধারণা এবং সেই তাৎপর্য সন্ধান বা আবিষ্কারের তাগিদ মানুষের সহজাত। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হলেও শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ-সাধনে ধর্মের ব্যবহার বন্ধ হলে, মানুষের সেই প্রাগভিজ্ঞ চেতনা বা আর্তি ধর্মকে অন্য মাত্রা দেবে।

ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার বিভিন্ন শাখার সঙ্গে মার্কসবাদের যোগ সন্ধানের প্রয়াসে যে সন্ত টমাস আকুইনস্ (১২২৫-৭৪)-এর দার্শনিক চিন্তা তথা টোমিজম্-এর কথা উঠে পড়বে, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ, সন্ত টমাস মধ্যযুগীয় খ্রিস্টধর্মে এক বৈজ্ঞানিক মাত্রা সংযোজন করেছিলেন। জ্ঞান ও মানব অস্তিত্ব এই দুয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও নির্ভরতার উপরই তাঁর দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। সর্ব বিষয়ে জ্ঞান আহরণ তথা বিজ্ঞানকে এক সংহতির মধ্যে ধারণ করার যথার্থ বোধি, এই বোধিতেই উদ্ঘাটিত হয় পরম কারণের আলোকে বস্তুলোকের জ্ঞান। প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত দু ধরনের বোধি স্বীকার করেছেন সন্ত টমাস, দুইকেই সমান মূল্য দিয়েছেন, পরস্পরের পরিপূরক বিবেচনা করেছেন—উচ্চতম যুক্তিবিচারের কারণ-নির্দেশে বোধগম্য বস্তুজ্ঞানকে তিনি বলেন প্রাকৃত বোধি, আর দৈব রহস্যের উদ্ঘাটনে যে বস্তুজ্ঞান অন্তর্নিহিত তাকে তিনি বলেন অতিপ্রাকৃত বোধি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মধ্যেই চিন্তার যাবতীয় বিষয় আবিষ্কার করে, ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতাবিষয়ক তথা অভিজ্ঞতাশ্রয়ী মানব-চিন্তাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে আকুইনস একদিক থেকে মার্কসবাদের পূর্বসূরি। বেলজিয়ান সোশাল-ডেমোক্র্যাট হেনড্রিক দে মান (১৮৮৫-১৯৫৩) মার্কসবাদী কর্মকাণ্ডের দর্শনের মধ্যে নিহিত 'সচেতন নেতৃত্বের' ভূমিকা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে যখন সমাজের লোকবিশ্বাস বা লৌকিক সংস্কারের প্রচণ্ড টান বা চাপের উপর জোর দেন, তখন গ্রামশি তা মেনে নেন না, অথচ 'লোকমনের উপাদানসমূহের অধ্যয়ন ও বিকাশের' প্রয়োজনের উপর যে গুরুত্ব দে মান আরোপ করেছেন, তাকে গ্রামশি স্বাগত জানিয়ে মার্কসবাদের অন্তর্গত করে নিতে আগ্রহ বোধ করেছেন (দ্র. গ্রামশি, 'আধুনিক নৃপতি')।

লাব্রিয়োলা-র গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে গ্রামশি লিঅন ত্রত্স্কির যে উক্তিটি উল্লেখ করে তাকে 'জর্মন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর আধা-বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতির অসচেতন প্রকাশ' বলে তিরস্কার করেন, সেই উক্তিটি এখন পড়তে গিয়ে দেখা যায়, ত্রত্স্কি লাব্রিয়োলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে গ্রামশি-র মতোই সম্ভ্রমশীল। এই প্রসঙ্গে ত্রত্স্কির 'আমার জীবন' ('মাই লাইফ', ইংরেজি অনুবাদ, হারমণ্ডসওয়র্থ, ১৯৭৫, মূল রচনা : ১৯২৯) থেকে উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলানো যায় না : 'আমার কারাকক্ষে বসে আমি

সানন্দে পড়েছিলাম আন্তোনিও লাব্রিয়োলা নামে এক প্রবীণ ইতালীয় হেগেলীয়-মার্কসবাদীর দুটি সুপরিচিত প্রবন্ধ যা কারাগারে এসে পৌঁছেছিল ফরাসি অনুবাদে। লাতিন জগতের অধিকাংশ লেখক যা পারেননি, লাব্রিয়োলা তা পেরেছিলেন ; রাজনীতিতে—যাতে তিনি অসহায় ছিলেন—না পারলেও অন্তত ইতিহাসের দর্শনে তিনি জড়বাদী দ্বান্দ্বিকতা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর বয়ানের চমকদার দিলেতান্তইজ্‌ম্‌-এর আড়ালে প্রচ্ছন্ন ছিল এক সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি। ইতিহাসের কোনো স্বর্গীয় তুঙ্গশিখরে অবস্থিত বহু বিচিত্র উপাদান আমাদের ভবিতব্য নিয়ন্ত্রণ করছে, এই তত্ত্ব তিনি অবলীলায় খারিজ করে দেন, এবং কী চমৎকার ভঙ্গিতে ! ঐ প্রবন্ধ দুটি পড়ার পর তিরিশ বছর কেটে গেছে, তবু এখনও আমার স্মৃতিতে অটল হয়ে রয়েছে তাঁর যুক্তিবিন্যাস, আর তারই সঙ্গে তাঁর বারম্বার উচ্চারিত সেই ধুয়া : "ধ্যানধারণা আকাশ থেকে পড়ে না"। লাব্রিয়োলা পড়বার পর লাভ্‌রভ, মিখায়লোভস্কি, কারেইয়েভ এবং অন্য যত রুশ উপাদানের বহুত্বের প্রবক্তা হয়েছেন, তাঁদের সকলকেই আমার একেবারেই অচল মনে হল।'

সমাজবাদী আন্দোলনের পর্বভেদে সমাজবাদী চিন্তার লক্ষ্যের বৈচিত্র্য বিষয়ে 'স্টুর্ম উন্ড্ দ্রাং'-এর যে-উপমাটি গ্রামশি ব্যবহার করেন, তা তিনি আহরণ করেছেন আরেক মার্কসবাদী মনস্বী রোজা লুক্‌সেমবুর্গ (১৮৭১-১৯১৯)-এর 'মার্কসবাদে অচলাবস্থা ও প্রগতি' নামে ('স্টিল্‌স্টান্ড উন্ড্ ফোর্টশ্রিট্ ইম্ মার্কসিস্‌মুস্', 'ফোরভের্ট্‌স' পত্রিকায় ১৯০৩ সালের ১৪ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত) একটি প্রবন্ধ থেকে। শুধু সমাজবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই নয়, মতাদর্শ ও সংস্কৃতির সার্বিক ইতিহাস জুড়েও মার্কসবাদের ক্রমাগত 'সংস্কার', 'শোধন', অন্য মতাদর্শে সাঙ্গীকরণও যেমন ঘটে চলেছে, তেমনই আবার কট্টরপন্থীরা মার্কসবাদের শুদ্ধতা রক্ষায় অত্যাগ্রহী হয়ে তার যথার্থ ঐতিহাসিক বিকাশে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছেন, তাকে কার্যত 'প্রথাগত বস্তুবাদের' সঙ্গে 'একাকার' করে দিয়েছেন। একেই গ্রামশি বলেন 'দু-দুবার সংশোধন' বা দ্বৈত সংশোধন। এই সূত্রে 'সংশোধন' প্রবণতার প্রথম ধারায় গ্রামশি যাঁদের নামোল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ক্রোচে, জেনতীল, সোরেল ও বের্গস*-র কথা আমাদের এই 'রচনাসংগ্রহ'-এ আগেই এসেছে। এই প্রবণতার তৃতীয় ধারায় অস্ট্রো-মার্কসবাদী আডলার-এর সঙ্গে গ্রামশি দুজন ইতালীয় সোশাল-ডেমোক্র্যাটিক তাত্ত্বিক আলফ্রেদো পোজ্জি ও আদেলচি বারাতোনো-র নাম যুক্ত করেছেন। বারাতোনো (১৮৭৫-১৯৪৭) সম্পর্কে 'অর্দিনে নুওভো' পত্রিকায় (১৭ জানুয়ারি ১৯২২) গ্রামশি লিখেছিলেন : 'বারাতোনোর অন্তর্জীবন, তাঁর বোধশক্তি, তাঁর কল্পনার ক্রিয়া অনুধাবন করলে যা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় তা হল বই ও সংবাদপত্র পাঠে আহরিত এক রাজনৈতিক ও দার্শনিক সংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চরমান এক কৃমিকীট।'

গ্রামশি যখন কর্মকাণ্ডের দর্শনকে আধুনিক সংস্কৃতির একটি 'মুহূর্ত' বলে বর্ণনা করেন, তখন ইতালীয় 'মোমেন্‌তো' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দুটি অর্থের সমবায়ে—'ক্ষণকাল' বা 'এক মুহূর্ত সময়' অর্থে, আবার কোনো পরিস্থিতির শেষের কোনো বাস্তব দিক বা লক্ষণ, এই হেগেলীয় অর্থেও। শুধু মার্কসবাদের উৎস সন্ধানেই গবেষণা চালালে চলবে না, মার্কসবাদকে দেখতে হবে আধুনিক সংস্কৃতি ও চেতনার সেই বিকাশের মধ্যে যেখানে অন্য মতাদর্শ, বিরোধী মতাদর্শও, মার্কসবাদ থেকে শক্তি আহরণ করছে, মার্কসবাদের নানা উপাদান আত্মসাৎ করে নিচ্ছে, সুবিধামতো বিকৃত রূপে পুনঃপ্রচার করছে, আবার সরলীকৃত করে জনমানসে ছড়িয়ে দিয়েছে; আবার অন্যদিকে কট্টর মার্কসবাদীরা মার্কসবাদের বিকাশের সম্ভাবনাকে অবরুদ্ধ করছেন। গ্রামশি আরো একবার প্রস্তাব করছেন, মার্কসবাদকে দেখা হোক, এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিধৃত ক্রমপ্রসারণশীল মতাদর্শ রূপে, কোনো অটল অনড় দর্শন রূপে নয়। ক্রোচে, সোরেল, বের্গস* এবং ব্যবহারিকতাবাদীরা মার্কসবাদ তথা কর্মকাণ্ডের দর্শনকে ব্যবহার করেছেন আধুনিক চিন্তার এক একটি নতুন প্রদেশের বিস্তারে। তাতে মার্কসবাদের নিজস্ব কোনো রূপান্তর ঘটেনি। কিন্তু আধুনিক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে। সামগ্রিকভাবে 'আর্থ-আইনি' ইতিহাসচর্চা, সমাজ-মনস্তত্ত্ব, ব্যবহারিকতাবাদী শিক্ষানীতি বা রাজনীতিক প্রয়োগদর্শন, এই সবই মার্কসবাদী চিন্তা আশ্রয় করেই বা তাকে ভিত্তি করেই বিবর্তিত হয়েছে। তাই বলে এদের কোনোটিকেই মার্কসবাদ বলে গ্রহণ করার প্রশ্ন ওঠে না।

আধুনিক ইয়োরোপীয় দর্শনের একাধিক তাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের দর্শন থেকেই উপাদান আহরণ করে শক্তিমান হয়েছেন। ইতালিতে ক্রোচে-র উদ্যোগেই এই দর্শন অবলম্বন করে ইতিহাসচর্চায় এক আর্থ-আইনি ঘরানার উন্মেষ হয়েছে যাতে অর্থনৈতিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বা তারই প্রভাবে আইনের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে মানবগোষ্ঠী-বিশেষের চিন্তার বিবর্তন বোঝা গেছে। গায়েতানো সালভেমিনি, গিওয়াচ্চিনো ভোল্‌পে, নিকোলো রোদোলিকো, রোমোলো কাগেসে প্রমুখ ইতিহাসবিদ্‌দের এই গোষ্ঠী ফ্যাশিবাদের অভ্যুদয়ে ভেঙে যায়। সমাজতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী সালভেমিনি যখন স্বেচ্ছা-নির্বাসন বেছে নেন, আর ভোল্‌পে হয়ে যান ইতালির ফ্যাশিবাদী সরকারের সরকারি ইতিহাসকার, তখন আরোই স্পষ্ট হয়ে যায় যে মার্কসবাদ এঁদের কোনো যথার্থ বিশ্ববীক্ষা দেয়নি, জুগিয়েছে একটি পদ্ধতি মাত্র। অন্যদিকে গ্রামশি তুলে নেন ইতিহাসবিদ, সম্পাদক ও সাংবাদিক মারিও মিসিরোলি (জ. ১৮৮৬)-র একটি সন্দেহ—যেখানে তিনি বলেন যে আধুনিক শিল্পপতিরা বুদ্ধিমান হলে 'ক্যাপিটাল'-কে তাঁদের পাঠ্যপুস্তক বলে গণ্য করা উচিত, হয়তো করছেনও তাই! গ্রামশি লক্ষ করেছেন, বামপন্থী মহলের বাইরেকার শ্রেষ্ঠ মনস্বীরা যখন মার্কসবাদের পরিপন্থী বা বিরুদ্ধবাদী মতাদর্শকেও স্পষ্ট করতে মার্কসবাদের স্বারস্থ হচ্ছেন, মার্কসবাদীরা

তখন থেকে গেছেন ইয়োরোপীয় দর্শনের ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলের সমৃদ্ধ ক্ষেত্রের প্রায় বাইরেই। দর্শনের ক্ষেত্রে আধুনিক মতাদর্শগুলির সঙ্গে লড়াইয়ে না নেমে মার্কসবাদীরা কেবলমাত্র জনসাধারণকে দলে টানতে বা দলে রাখতে মার্কসবাদকে ব্যবহার করছেন। অর্থাৎ, গ্রামশি কর্মকাণ্ডের দর্শনের যে 'দুটি কর্তব্য' নির্দেশ করেছেন, তার মাত্র একটিই মার্কসবাদীরা সাধন করতে এগিয়েছেন। মার্কসবাদীরা তাঁদের মতাদর্শকে সংস্কৃতির মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারেননি, একথাও যেমন সত্য, তেমনই সত্য যে ভাববাদে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সংস্কৃতিও এমন কোনো জনসংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি যা তাকে যথার্থই গণগামী করে তুলতে পারে। ১৯২৩ সালে জেনতীল-এর নেতৃত্বে ফ্যাশিবাদী সরকার বিদ্যালয় স্তরে যে সার্বিক শিক্ষাক্রম সংস্কারের উদ্যোগ নেন, তার মধ্য দিয়েও তাঁরা ঐ লক্ষ্য অভিমুখে যতটা এগোতে পারতেন, তাও কিন্তু তাঁরা এগোননি। তাঁরা ইতালির তথাকথিত 'উচ্চমার্গের সংস্কৃতির' একটা পরিচিতি জুগিয়ে ক্ষান্ত থেকেছেন, কিন্তু এমন কোনো সামগ্রিক দার্শনিক, নৈতিক বা বৈজ্ঞানিক মানসভূমি, এমন কোনো চিন্তাপদ্ধতি নির্মাণে সচেষ্ট হননি যাতে একটা প্রজন্ম তার চিন্তার স্বাভাবিক ধরনের মধ্যেই শাসকশ্রেণীর মতাদর্শকে আত্মস্থ করে নেয়। অর্থাৎ, সংস্কৃতির স্তরে ইতালিতে ফ্যাশিবাদ ও মার্কসবাদের কোনো প্রত্যক্ষ সংঘাতই ঘটেনি। দুই মতাদর্শ দুই ভিন্ন সামাজিক অংশের মধ্যেই সীমিত থেকেছে।

এই বর্তমান থেকে অতীতে ফিরে গিয়ে গ্রামশি কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে ইয়োরোপীয় নবজাগরণ, রিফর্মেশন, এনলাইটেনমেণ্ট, ফরাসি বিপ্লব, ধ্রুপদী জর্মন দর্শন, কর্মকাণ্ডের দর্শন, এই পর্যায়ক্রমে যে বৌদ্ধিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা পরিবেষণ করেন, তাতে ক্রোচে-কে সাক্ষী মেনে তিনি দেখান যে, ইতালিতে নবজাগরণ শেষ পর্যন্ত অভিজাত সম্প্রদায় বা ইতালীয় নগররাষ্ট্রের রাষ্ট্রাধিপতিদের সভাসদকুলের বাইরে বৃহত্তর সমাজের চেতনা বা বিশ্বাসকে স্পর্শ করেনি, গ্রামশির অর্থে একটা সংস্কৃতির রূপ পরিগ্রহ করেনি। তুলনায় সনাতনী ধর্মকে শুদ্ধ করে তাকে নবসত্তা ও নবজীবন দানের আত্যন্তিক আগ্রহে, আর-কিছুতে না হোক, তার প্রচারাত্মক প্রণোদনায় রিফর্মেশন গণগামী হতে পেরেছিল, সমাজের চেতনায় প্রবেশ করতে পেরেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য লুথারকে পেয়ে বসেছিল 'লেখাপড়া ও বিদ্যাচর্চার প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ' যার তাড়নায় রিফর্মেশন শেষ পর্যন্ত পায়নি সেই বৌদ্ধিক ভাবলোক, এক সচেতন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সেই চিন্তার আবহ যা তাকে পুষ্ট করে, সমৃদ্ধ করে আরো কিছুকাল স্থায়ী করতে পারত, তার বিকাশ ও বিস্তার ঘটাতে পারত। তবুও যতটা বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছিল রিফর্মেশন বা পুনর্গঠনের পথ ধরে, তা ঘটেছিল অর্থনীতি ও রাজনীতির স্তরে—ধর্মসংঘের প্রভাব ও ক্ষমতার আওতা থেকে রাষ্ট্রশক্তির ক্রমশ মুক্তির মধ্য দিয়ে, এবং পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ে। লুথার থেকে

ক্যালভিনের চিন্তার বিবর্তন এবং ইয়োরোপের আর্থ-রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারার সঙ্গে তার মেলবন্ধনেই অন্তত একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু গ্রামশি লক্ষ করেন যে, এই বিকাশ, তাঁর স্বদেশ ইতালিতে সেভাবে ঘটেনি, ঘটেছে ইংলণ্ড-এ, জর্মনিতে। তাই 'ইল্ রিসর্জিমেনতো' নামে সংকলিত তাঁর গ্রন্থে (মরণোত্তর সংকলন ও প্রকাশ, ১৯৪৯) তিনি রিফর্মেশন প্রসঙ্গে বলেন: 'লক্ষ করা আবশ্যক যে অন্য দেশে যা ঘটেছে তার অন্যথা ঘটেছে ইতালিতে, যেখানে ধর্মও জনগণ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংহতির সুযোগ সৃষ্টি করেনি, এবং এই কারণেই বুদ্ধিজীবীদের দার্শনিক সংকট কোনোদিনই জনগণের কাছে পৌঁছয়নি, কারণ তা জনগণের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়নি, ফলে ধর্মক্ষেত্রে কোনো "জাতীয়-জনপ্রিয় জোট"-এর অস্তিত্ব ছিল না।' অথচ রাষ্ট্র, ব্যবসায়ী সমাজ ও ধর্মভয়ে-ধর্মশাসনে শোষিত বিপুল জনসাধারণের স্বার্থকে একটা নৈতিক বিন্যাসে গ্রথিত করে সংগঠিত ক্যাথলিক ধর্মসংঘের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভাবাদর্শগত ভূমি রচনা করেই প্রটেস্টাণ্টবাদ 'জাতীয়-জনপ্রিয় জোট' তৈরি করতে পেরেছিল।

কর্মকাণ্ডের দর্শনে এক সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক অতীতের উপস্থিতি ক্রোচে দেখেছিলেন। ক্রোচের সেই দেখাই গ্রামশি যখন গ্রহণ করেন, তখন তিনি 'বৌদ্ধিক ও নৈতিক পুনর্গঠনের এক সমগ্র আন্দোলনের তুঙ্গবিন্দরূপে' এই দর্শনকে প্রতিষ্ঠা দেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি লক্ষ করেন যে, গণগামী সংস্কৃতি ও উচ্চমার্গী সংস্কৃতির বৈপরীত্যে যে-দ্বান্দ্বিকতা, সেই দ্বান্দ্বিকতা আত্মস্থ করেই কর্মকাণ্ডের দর্শন তার বিশেষ তাৎপর্য আয়ত্ত করেছে। হেগেল ও মার্কস-এর তুলনা করতে গিয়ে গ্রামশি মার্কস কর্তৃক একাধিকবার ব্যবহৃত হেগেলের একটি বাক্যবন্ধের রকমফের নিয়ে খেলা করেন। হেগেল 'চিন্তা-জীবনের দুটি মুহূর্তে বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদকে' যখন এক ঐক্যে যুক্ত করেন, তখন সেই ঐক্য যেন 'মাথার উপর ভর করে হাঁটছে এমন এক মানুষের' মূর্তির অনুষঙ্গ বা আদল আনে। কিন্তু এই দ্বান্দ্বিক ঐক্য তার অনুগামীদের হাতে বিনষ্ট হলে মার্কসকে আবার নতুন করে সেই দ্বান্দ্বিক ঐক্য নির্মাণ করতে হয়: এবারে দেখা গেল, 'মানুষ হাঁটছে তার পায়ের উপব ভর করেই।' আবার মার্কস-এর পর মার্কস-এর তত্ত্বের অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিক ঐক্য থেকে সরে গিয়ে মার্কসবাদীরা তাঁর দর্শনসারকে 'সংস্কার বা শুচি-বাইয়ে' পরিণত করেছে। এই অন্তঃসারহীন বস্তুবাদিতা কাণ্ডজ্ঞানের যতটা কাছাকাছি ডাইনিতন্ত্রেরও ততটাই কাছাকাছি। কর্মকাণ্ডের ধারা তথা ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বুদ্ধিজীবীরা যখনই বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, শেষ পর্যন্ত শত্রুর প্রতিক্রিয়ার মুখে তাঁরা পিছিয়েই এসেছেন, যেমন ডাচ মানবিকবাদী ইরাসমুস। চিন্তার ইতিহাসে ব্যক্তি-বিশেষের কোনো রোমহর্ষক ঘোষণা বা বৌদ্ধিক আবিষ্কার যদি একবার সমকালীন কিছু মানুষকে চমকিত করেই নিঃশেষিত হয়ে যায় তার গুরুত্ব

সম্পর্কে গ্রামশি সন্দিহান। রেসটোরেশন বা রাজতন্ত্র পুনর্বহালের পর্বে অর্থাৎ নেপোলিয়নের পতন ও ১৮১৫য় ভিয়েনা কংগ্রেস থেকে ১৮৪৮-এর বিপ্লবমালার মধ্যবর্তী ইয়োরোপীয় ইতিহাসকালে যে ইতিহাসবাদী চিন্তাধারার (কর্মকাণ্ডের দর্শনও যার অন্তর্গত) উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে তা ১৮৭০ অবধি ফ্রান্স-এর চিন্তারাজ্যকে একটা শক্ত ভিত জুগিয়েছে। এই ইতিহাসবাদ তার রক্ষণশীল প্রকাশেও তার অব্যবহিত পূর্বসূরিদের বিচার করবার অধিকার অর্জন করেছে। স্বভাবতই কর্মকাণ্ডের দর্শন এই ইতিহাসবাদেরই মহত্তম অভিব্যক্তিরূপে নির্বস্তুক 'মতাদর্শসর্বস্বতা' পরিহার করে ইতিহাসকে প্রভাবিত করার শক্তি অর্জন করেছে।

এই ইতিহাসবাদী অবস্থান থেকেই গ্রামশি কর্মকাণ্ডের দর্শনের সঙ্গে তার তিন উৎস-স্বরূপ ধ্রুপদী জর্মন দর্শন, রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)র ধারায় প্রবাহিত ইংলণ্ডীয় ধ্রুপদী অর্থনীতি ও ফরাসি রাজনীতিদর্শনের ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। হঠাৎ অনেকটা এগিয়ে গিয়ে গ্রামশি একবার বলে বসেন, 'বলা যায়, এক অর্থে হেগেল ও ডেভিড রিকার্ডোর যোগফল হল কর্মকাণ্ডের দর্শন।' কিন্তু তারপর রিকার্ডোর তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি যে একসার প্রশ্ন তোলেন, তাতে ঐ ইতিহাসবাদী পদ্ধতির প্রয়োগই মূর্ত হয়ে ওঠে। দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতির মিথস্ক্রিয়া ও দ্বান্দ্বিক ঘাত-প্রতিঘাতের অনুধাবন-বিচার-বিশ্লেষণেই ইতিহাসবাদী পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটবে। কিন্তু গ্রামশির এই বিশেষ 'নোট'-এ যা লক্ষণীয় তা হল ক্রমাগত পুনরুক্ত একই সতর্কবাণী যে এই পদ্ধতি ধরে 'গবেষণা' চালিয়ে যেতে হবে, 'প্রশ্নটাকে আরো গভীরে পর্যালোচনা করে আরো নির্দিষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে হবে।' এই প্রবন্ধটির শেষদিকে গ্রামশি জোর দিচ্ছেন, গ্রন্থপঞ্জি, রচনাসংগ্রহ ইত্যাদি সংকলন করে ইতালির ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ডের দর্শনের সমাজতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করার উপর। এইভাবেই কর্মকাণ্ডের দর্শন একটা দেশ বা জাতির 'জ্ঞান থেকে বোধ থেকে অনুভবে' উত্তীর্ণ হবে ও 'তার বিপরীত ক্রমে অনুভব থেকে বোধ থেকে জ্ঞানে' উত্তীর্ণ হবে। শ. ব.]

সমস্যার উপস্থাপনা

কোনো ইতিহাস-পর্বের সংস্কৃতির সৃষ্টি ও পরিপোষণে নতুন বিশ্ববীক্ষার জন্মদান, এবং প্রচলিত বিশ্ববীক্ষা অনুসারে দর্শনমুখী উৎপাদন। মার্কস এক বিশ্ববীক্ষার জন্মদাতা। কিন্ত ইলিচ [লেনিন] -এর স্থান কোথায়? শুধুই অধস্তন ও নিম্নস্থ? মার্কসবাদেই এর ব্যাখ্যা মিলবে— বিজ্ঞান ও কর্মসম্পাদন—। কল্পজগৎ (ইউটোপিয়া) থেকে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান থেকে কর্মসম্পাদন এই হল যাত্রাপথ। (কার্লো রাদেক সম্বন্ধে পুস্তিকা স্মর্তব্য।) কোনো অগ্রগণ্য শ্রেণীর (যেমন রাষ্ট্রের) প্রতিষ্ঠা মানেই হল এক বিশ্ববীক্ষার উদ্ভব। জর্মন প্রলেতারিয়ত যে জর্মন ধ্রুপদী দর্শনের উত্তরাধিকারী এই কথাটাকে কীভাবে বুঝতে হবে? একথা নিশ্চিত যে মার্কস বোঝাতে চেয়েছিলেন তাঁর দর্শন যখন একটা শ্রেণীর তত্ত্বে রূপান্তরিত হবে এবং পরে যখন সেই শ্রেণীই (রাষ্ট্র হয়ে উঠবে) তখন সেই দর্শনের ঐতিহাসিক ভূমিকা কী দাঁড়াবে। ইলিচের বেলায় এটা প্রকৃতপক্ষে একটা বিশেষ অঞ্চলে ঘটে গেল। সেই আধিপত্যের ধারণা ও বাস্তব যার দায়িত্ব ইলিচের, তার দার্শনিক গুরুত্বের উল্লেখ আমি আগে অন্যত্র করেছি। আধিপত্য প্রতিষ্ঠা মানেই হল দর্শনের এক সত্যিকার সমালোচনা, তার প্রকৃত দ্বান্দ্বিকতা। **প্রেৎসো এ সোপ্রাপ্রেৎসো** (নেল্লেকনমিয়া কাপিতালিস্তিকা : পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে দাম ও উদ্বৃত্ত দাম)[১] গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রাৎসিয়াদেই কী লিখছেন তা এখানে মিলিয়ে নেওয়া যাক : বিজ্ঞানের মহামনীষীদের পরম্পরায় অন্যতম এক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি মার্কসকে দেখাচ্ছেন। গোড়াতেই ভুল : আর-কেউই বিশ্ববিধানের কোনো মৌলিক ও সংহত ধারণা সৃষ্টি করতে পারেন নি। মার্কসই বৌদ্ধিকভাবে এমন এক ইতিহাস-পর্বের সূচনা করছেন যা খুব সম্ভবত কয়েক শতাব্দী জুড়ে টিঁকে থাকবে, অন্তত যতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক সমাজের অবসানের পরে নিয়ন্ত্রিত সমাজের আবির্ভাব না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত। একমাত্র তখনই বিশ্ববিধান বিষয়ে তাঁর ধারণার কালাবসান হবে, যখন আবশ্যিকতার ধারণার পরিবর্তে জায়গা করে নেবে স্বাধীনতার ধারণা। কে বড় কে ছোট এটা বোঝবার জন্য মার্কস ও ইলিচের তুলনা করা বোকামি ও নিরর্থক। ওঁরা দুটো স্তবকে প্রকাশ করছেন : বিজ্ঞান ও কর্মসম্পাদন, যা একই সঙ্গে

১ মন্‌সিনোর অলজিয়াতির তুলনায় গ্রাৎসিয়াদেই তো অনেক পেছিয়ে আছেন। অলজিয়াতি একমাত্র যিশু ছাড়া আর কারো সঙ্গে মার্কস্‌-এর তুলনা সম্ভব মনে করেন না। আর একজন প্রেলেট-এর এই তুলনামূলক মন্তব্যে যতটা মেনে নেওয়া হল সে কিন্তু সত্যিই অনেকখানি ; মনে রাখতে হবে যে অলজিয়াতি খ্রিস্টের ঐশ্বরিকতায় বিশ্বাস করেন।

একমাত্রিক ও বহুমাত্রিক। যেমন, ঐতিহাসিকভাবে, খ্রিস্ট ও সন্ত পলের মধ্যে তুলনা করাটা এক কিম্ভূত ব্যাপার হবে। খ্রিস্ট—বিশ্ববীক্ষা, সন্ত পল—সংগঠন, কর্মসম্পাদন, বিশ্ববীক্ষার বিস্তার: দুটোই প্রয়োজন, একইরকম ভাবে, আর তাই ঐতিহাসিক গুরুত্বও একই মাত্রার। খ্রিস্টধর্মকে ঐতিহাসিক দিক থেকে বলা যেতে পারে 'খ্রিস্ট-পলবাদ', এবং এটাই হবে যথার্থ অভিধার আরো কাছাকাছি। (খ্রিস্টের ঐশ্বরিকতায় বিশ্বাসের জন্যই এটা হতে পারে নি, কিন্তু ঐ বিশ্বাস নিজেই তো একটা ঐতিহাসিক উপাদান, শুধু কোনো তত্ত্বগত ব্যাপার নয়।)

পদ্ধতির প্রশ্ন

প্রতিষ্ঠাতা নিজে কখনো সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করেন নি এমন কোনো বিশ্ববিধানের ধারণার জন্মকথা বুঝতে গেলে প্রথমেই কিছুটা বিস্তারিত ভাষাতাত্ত্বিক কাজ করে নিতে হবে। (এ কথাটা বিশেষ করে প্রযোজ্য সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে ধারণাটির অন্তর্গত সংহতি খুঁজে নিতে হবে প্রতিটি আলাদা লেখা অথবা কোনো রচনাগুচ্ছের মধ্যে নয়, বহুরূপবিশিষ্ট ঐ মননকর্মের সমগ্র বিকাশের মধ্যে, যেখানে ঐ ধারণার উপাদানগুলি অন্তর্লীন-ভাবে নিহিত রয়েছে।) এ কাজটা করতে হবে একান্ত সতর্ক যত্ন, বৈজ্ঞানিক সততা ও মেধাচর্চার নিষ্ঠার সঙ্গে, কোনোরকম পূর্বধারণা, পূর্বতসিদ্ধতা, বা একদেশদর্শিতা বর্জন করে। সবচেয়ে আগে যেটা প্রয়োজন তা হল আলোচ্য চিন্তাবিদের মননশীলতার বিকাশের প্রক্রিয়াটাকে পুনর্নির্মাণ করা যাতে তাঁর চিন্তার স্থির ও 'স্থায়ী' উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করা যায়—অর্থাৎ, যেসব উপাদান ঐ চিন্তাবিদ তাঁর নিজস্ব চিন্তা হিসেবে গ্রহণ করে-ছিলেন। এখানে তফাত করতে হবে সেইসব 'মালমশলা'র সঙ্গে যা উনি পূর্বে চর্চা করেছিলেন এবং যা তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল, আর এ সবের থেকে ঐ নিজস্ব চিন্তার স্থান একটু ওপরে। ঐ নিজস্ব চিন্তাই বিকাশ-প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অঙ্গ। এ রকম একটা নির্বাচন করতে হবে বিভিন্ন ধরনের কালপর্বের জন্য, যে-কালপর্বের দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হবে ভেতরকার উপাদানের সাহায্যে, বাইরের কোনো সাক্ষ্যে নয় (যদিও তাও হয়তো ব্যবহার করা যেতে পারে)। এতে করে জমে উঠবে 'বর্জিত'-এর এক স্তূপ; তার মানে আংশিক ব্যাখ্যা ও তত্ত্বের এমন এক স্তূপ যার জন্য ঐ চিন্তাবিদের এক ধরনের সহানুভূতি হয়তো ছিল, অন্তত কোনো কোনো সময়ে, এমনকী ঐসব তত্ত্বচিন্তা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণ ও ব্যবহারও করেছেন, বিশেষ করে তাঁর সমালোচনার কাজে এবং এমনকী তাঁর ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিরও কাজে। সব পণ্ডিত মানুষদেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এটা দেখা যায় যে কোনো একটা নতুন তত্ত্ব কিছুকাল ধরে যদি 'বীরের আক্রোশ' (অর্থাৎ, শুধু এক বাইরের কৌতূহল থেকে নয়, গভীর অন্তরঙ্গ আগ্রহ)

নিয়ে চর্চা করা যায়, তাহলে, বিশেষত তরুণ বয়সে, ঐ তত্ত্বের দ্বারা এমন আকৃষ্ট হতে হয় যে চর্চাকারীর সমস্ত ব্যক্তিত্ব তাতে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আবার নতুন একটা তত্ত্বের চর্চা না করা পর্যন্ত এ ঘোর কাটে না, যখন হয়তো দেখা দেয় এক বিচারক্ষম সাম্যাবস্থা এবং ততদিনে শিখে নেওয়া যায় কীভাবে এক তত্ত্বকাঠামো বা তার নির্মাতার গহন আকর্ষণের মোহ কাটিয়েও চিন্তাভাবনার গভীর পর্যালোচনা সম্ভব। আলোচ্য চিন্তাবিদ যত বেশি আবেগার্ত, তাঁর চরিত্র যত বেশি তর্কপ্রবণ, অথবা সামগ্রিক কোনো চিন্তাতন্ত্রের প্রতি বিষয়ে তিনি যত বেশি উদাসীন, এসব কথা তত বেশি করে তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অথবা সে সব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেখানে আলোচ্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রয়োগের একেবারে এক অঙ্গাঙ্গি সম্মিলন হয়েছে এবং যাঁর মননের জগৎ সদাপরিবর্তমান ও বিকাশশীল এবং যাঁর আত্মসমালোচনার বোধ যেমন তীব্র তেমন ক্ষমাহীন। এই পূর্বশর্তগুলো মেনে নিলে আমাদের অনুসন্ধান এই ক্রমানুসারে চালানো যেতে পারে: ১. লেখকের জীবনীর পুনর্নির্মাণ, শুধু তাঁর বাস্তবক্ষেত্রের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধেই নয়, বিশেষত তাঁর মননচর্চা প্রসঙ্গে। ২. তাঁর সমস্ত রচনাবলির কালানুক্রমিক তালিকা প্রণয়ন, বিশেষ করে যেসব রচনা তুলনায় অবহেলিত। তারপর রচনার গূঢ় উদ্দেশ্য অনুসারে ভাগ করে: তাঁর বৌদ্ধিক বিকাশ, তার পরিণতি, চিন্তার নতুন আঙ্গিক অর্জন ও তার প্রয়োগ এবং জীবন ও জগৎকে দেখার নতুন ধরন ইত্যাদি বিষয়ানুসারে। হঠাৎ উচ্চারিত একক কোনো সিদ্ধান্তের চেয়ে বা বিচ্ছিন্ন কোনো সূত্রের উপস্থাপনার চেয়ে চিন্তা বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে অন্তর্গত কোনো স্থায়ীভাবের সন্ধান অনেক বেশি জরুরি।

এই প্রাথমিক কাজটা করতে পারলেই তবে অন্য কোনো সন্ধান সম্ভব হতে পারে। ঐ চিন্তাবিদের রচনার মধ্যে আর একটা তফাত পরিষ্কার করে নির্দেশ করা দরকার—যে-সব রচনা তিনি নিজে সম্পূর্ণ করেছিলেন ও নিজেই জীবদ্দশায় প্রকাশ করেছিলেন আর যে-সব রচনা অপ্রকাশিত থেকে গেছে, হয়তো অসম্পূর্ণ বলে, এবং সেইসব রচনা যা কোনো বন্ধু বা শিষ্যের আয়োজনে প্রকাশিত, কিন্তু সংশোধন পুনর্লিখন ও বর্জন ইত্যাদি ব্যতিরেকে নয়, অর্থাৎ, কোনো প্রকাশকের বা সম্পাদকের স্পষ্ট হস্তাবলেপ ছাড়া যা প্রকাশিত হয় নি। একথা পরিষ্কার যে মরণোত্তর রচনাবলি খুব সাবধানে ও বিচার বিবেচনা করে ব্যবহার করতে হবে, কারণ ঐ সব রচনা কিছুতেই চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল বলে মনে করা যায় না, হয়তো তা আরো বিস্তারিত হত, হয়তো তা তখনো সাময়িক মাত্র; উপরন্তু এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না, বিশেষ করে রচনাটি যদি খুব দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতির স্তরে থেকে থাকে এবং লেখক যদি তা শেষ করার সিদ্ধান্ত কখনোই না নিয়ে থাকেন, যে তাহলে তিনি ঐ রচনার সবটুকু বা অন্তত অংশবিশেষ হয় স্বীকার করতে চান নি অথবা সন্তোষজনক মনে করেন নি।

কর্মকাণ্ডের দর্শনের প্রতিষ্ঠাতার বিশেষ ক্ষেত্রে, তাঁর রচনাবলিকে এই রকম স্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায় :

১. প্রত্যক্ষভাবে লেখকের নিজের দায়িত্বে প্রকাশিত রচনাবলি : এ সবের মধ্যে সাধারণভাবে গণ্য করা উচিত যে সব রচনা তিনি সরাসরি ছাপার জন্য তুলে দিয়েছেন শুধু সেগুলিই নয়, সেই সমস্ত 'প্রকাশনা'ও যা কোনো না কোনো ভাবে লেখক নিজেই প্রচারের জন্য সম্মতি দিয়েছেন, যেমন, চিঠিপত্র বা ইশ্‌তেহার ইত্যাদি (লাগসই উদাহরণ হবে **গঠা কর্মসূচির উপর মন্তব্য এবং পত্রাবলি**) ;

২. প্রত্যক্ষভাবে লেখকের নিজের দায়িত্বে ছাপা নয় যেসব রচনা, যা তাঁর মৃত্যুর পরে অন্যদের দ্বারা প্রকাশিত ; খুব ভালো হয় এই লেখাগুলির জন্য যদি একটা কূটনৈতিক পাঠ প্রস্তুত করা যায়, যা ইতিমধ্যে করা হচ্ছে, অথবা ঐ কূটনৈতিক নিরিখ অনুসারে মূল পাঠের একটা নিখুঁত বর্ণনা।

এই দুই ভাগের রচনাই কালানুক্রমিক পর্যায়ে বিন্যস্ত হওয়া উচিত যাতে করে শুধু যান্ত্রিক এবং খামখেয়ালীভাবে নয়, রীতিমতো গ্রাহ্য তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভব হয়।

রচনার যে সব অংশ লেখক নিজেই পরে ছাপিয়েছেন তার ওপর তিনি নিজে কীভাবে প্রসঙ্গ বিস্তার করেছেন তা নিয়ে খুঁটিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন : অন্যদের দ্বারা সংকলিত মরণোত্তর রচনাবলির সম্পাদনা কতদূর নির্ভরযোগ্য তা অন্তত এইসব অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থেকে বিচার করা সম্ভব হবে। লেখক কর্তৃক সংশোধিত চূড়ান্ত পাঠ এইসব প্রস্তুতিপর্বের মাল-মশলা থেকে যত আলাদা, অনুরূপ রচনার ক্ষেত্রে অন্য কারো সংশোধন তত কম নির্ভরযোগ্য। কোনো রচনা আর তার জন্য সংগৃহীত প্রাথমিক মালমশলা, এ দুটোকে কখনোই এক করা উচিত না : চূড়ান্ত পর্যায়ের এই নির্বাচন, এক একটা অংশকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়, প্রস্তুতিপর্বের সংগৃহীত বিষয়ের মধ্যে কোনটাকে বেশি কোনটাকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়, এ সবের মধ্যেই তো নিহিত থাকে প্রকৃত রচনার আসল চরিত্র।

কোন অংশটার সঙ্গে কোনটা মেলে তা বিচার করার সময়েও কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার : কোনো চিঠিতে কোনো একটা কথা হয়তো খুব জোরের সঙ্গে বলা হল, যা হয়তো কোনো বইতে আর থাকবে না। চিঠিপত্রের শৈলীর যে-তরতাজা ভাব, যা শিল্পগত দিক থেকে বইয়ের মাপাজোকা এবং ভেবেচিন্তে কথা বলার যে-স্টাইল তার থেকে অনেক সময়ে বেশি কার্যকর হলেও কখনো কখনো হয়তো যুক্তির দুর্বলতায় জড়িয়ে যেতে পারে। চিঠিপত্রে, বা বক্তৃতায় বা কথোপকথনে যুক্তির ভুলভ্রান্তি অনেক বেশি ঘটতে পারে : চিন্তাপ্রক্রিয়াটা দ্রুত এগোচ্ছে বলে তার মধ্যে কিছু ফাঁকফোকর থেকে যেতে পারে।

খুব নতুন মৌলিক ধরনের কোনো চিন্তার ক্ষেত্রে একমাত্র দ্বিতীয় পর্যায়ে এই চিন্তার নথিভুক্তিতে অন্য কোনো ব্যক্তির অবদানের সন্ধান করা

উচিত। এইভাবেই, অন্তত একটা সাধারণ সূত্র এবং এক পদ্ধতি হিসেবে প্রশ্নটাকে তোলা উচিত, কর্মকাণ্ডের দর্শনের [মার্কস ও এঙ্গেলস্]—দুই প্রতিষ্ঠাতার মধ্যেকার সমমাত্রিকতার সম্পর্কটাকে এভাবেই বিবেচনা করা উচিত। যখন দু-জনের কেউ একজন কোনো একটা বিষয়ে একজনের উক্তির সপক্ষে অন্যজনের সমর্থন ঘোষণা করেন তখন ঐ সমর্থন শুধুমাত্র ঐ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রেই সিদ্ধ। এমনকী একজনের লেখা কোনো বইয়ের কয়েকটি পরিচ্ছেদও যদি অন্যজন লিখে দিয়ে থাকেন তাহলেও গোটা বইটির ব্যাপারেও যে দুজনেই সহমত এরকম নিশ্চিত মনে করার কোনো কারণ নেই। দ্বিতীয়জনের [এঙ্গেলস্] অবদানকে ছোট করে দেখার যেমন কোনো দরকার নেই, তেমনি দ্বিতীয়জনকে প্রথমজনের সঙ্গে [এঙ্গেলস্‌কে মার্কস-এর সঙ্গে] এক করারও কোনো দরকার নেই, বা এমন মনে করারও কোনো কারণ নেই যে [এঙ্গেলস্] যা কিছু [মার্কস]-এর বলে অভিহিত করেছিলেন তার সবকিছুই তর্কাতীতভাবে গ্রাহ্য এবং তার মধ্যে অন্য হস্তাবলেপ কিছু পড়ে নি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে [এঙ্গেলস্]-এর মধ্যে এমন একটা ধরনের উদাসীনতা ছিল বা এমন একটা ব্যক্তিগত অহং-শূন্যতা ছিল যা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল, কিন্তু কথাটা তো তা নয় : এমনকী [এঙ্গেলস্]-এর বৈজ্ঞানিক সততায় সন্দেহ করার প্রশ্নও নয় এটা। কথাটা হল যে [এঙ্গেলস্] তো [মার্কস] নন, এবং কেউ যদি [মার্কস]কেই জানতে চান তাহলে সবচেয়ে আগে তাঁকে তাঁরই প্রামাণিক রচনাবলিতে যেতে হবে, সেইসব রচনা যা তাঁর নিজস্ব দায়িত্বে সরাসরি প্রকাশিত। এই কথা-গুলো থেকে বেরিয়ে আসে পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটা সাবধানবাণী এবং সংলগ্ন গবেষণার জন্য কিছু পথনির্দেশ। যেমন, ১৯১২-তে ফরমাগিনি কর্তৃক প্রকাশিত ফ্রে[ডেরিক] এ[ঙ্গেলস্]-এর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ওপর রে দোল্‌ফো মোন্‌দোল্‌ফো-র [**মাতেরিয়ালিসমো স্তোরিকো দি ফেদেরিকো এঙ্গেলস্**] বইয়ের মূল্য কী হবে ? ক্রোচেকে লেখা এক চিঠিতে সোরেল সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, এঙ্গেলস্-এর মৌলিক চিন্তাবিদ হিসেবে যে সামান্য ক্ষমতা তাতে করে এরকম একটা বিষয়ে আদৌ গবেষণা সম্ভব কিনা এবং একথা তিনি বারবার বলেছিলেন যে এই দুই লেখককে একাকার করা ঠিক না। সোরেল যে-প্রশ্ন তুলেছিলেন সেটা বাদ দিয়েও, এটা যদি মেনে নেওয়া যায় যে তত্ত্ববিদ হিসেবে দ্বিতীয় বন্ধুর ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ, তাহলে শুধু এই কারণেই (অন্তত আপাতভাবে), (বা অন্তত প্রথম জনের তুলনায় তাঁর অবস্থাটা ছিল অধস্তন পর্যায়ের), মৌলিক চিন্তার জন্য যিনি দায়ী তাঁর চিন্তাভাবনা খুঁটিয়ে অনুধাবন করা একান্ত অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে, (মোন্‌দোল্‌ফোর বই ছাড়া) সংস্কৃতির জগতে এই ধরনের সুষ্ঠু গবেষণার কাজ আর হয়নি। বস্তুত, [এঙ্গেলস্]-এর ব্যাখ্যা, যার কিছু কিছু বেশ বিস্তারিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ, এতদিন বেশ প্রামাণিক উৎস বলে গণ্য হয়েছে ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সত্যি কথা বলতে কী, প্রা

একমাত্র প্রামাণিক উৎস বলে বিবেচিত। এই কারণে মোনদোলফোর বইটা খুবই প্রয়োজনীয়, অন্তত তার মধ্যে যে ধারানির্দেশ আছে তার জন্য।

আনতোনিও লাব্রিয়োলা

কর্মকাণ্ডের দর্শনের ওপর আনতোনিও লাব্রিয়োলা-র সমস্ত রচনাবলির একটা বস্তুভিত্তিক ও সুশৃঙ্খল সারসংক্ষেপ (এমনকী পাণ্ডিতি-বিশ্লেষণমূলক হলেও) করতে পারলে একটা খুব দরকারি কাজ করা হবে। যে-সব বই এখন আর পাওয়া যায় না তার বিকল্প হিসেবে এটা খুব কাজের হবে। লাব্রিয়োলা-র দার্শনিক অবস্থান, যা আজ এক অতি সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে আর বিশেষ পরিচিত নয়, তাকে আবার আলোচনা ও চর্চার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে গেলে এ ধরনের কাজের খুব প্রাথমিক প্রয়োজন রয়েছে। এটা খুব আশ্চর্যজনক যে লেও ব্রনস্টাইন [ত্রৎস্কি] তাঁর স্মৃতিকথায় লাব্রিয়োলার 'দিলেতাঁত' চরিত্রের কথা বলেছেন। (আবার মিলিয়ে দেখতে হবে।) এ মতামতটা অভাবনীয় (যদি না ব্যক্তি হিসেবে লাব্রিয়োলার তত্ত্ববক্তব্য ও ক্রিয়াকর্মের মধ্যেকার ফারাকের কথা মনে রেখে বলা হয়, যদিও তা মনে হয় না); একমাত্র হতে পারে সেই জর্মন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর আধা-বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিতির অসচেতন প্রকাশ, তাদের প্রভাব রাশিয়াতে তো খুব বেশিই ছিল। বস্তুতপক্ষে, লাব্রিয়োলা, যিনি মনে করেন যে কর্মকাণ্ডের দর্শন অন্যান্য দার্শনিক ধারার থেকে স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তিনিই একমাত্র যিনি কর্মকাণ্ডের দর্শনকে বৈজ্ঞানিকভাবে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। প্রধান ধারাটার প্রকাশ হয়েছিল এই দুই দিকে :

১. তথাকথিত গোঁড়া ধারা, যার প্রতিনিধি প্লেখানভ (দ্র. তাঁর [মার্কসবাদের] মৌল সমস্যাবলি), যিনি, বস্তুতপক্ষে স্পষ্টত বিপরীতার্থক কথা বলা সত্ত্বেও, আকাঁড়া বস্তুবাদের মধ্যে আবার জড়িয়ে পড়েন। মার্কস-এর চিন্তার 'উৎপত্তি'-র সমস্যা ঠিকমতো বিবেচনা করা হয় নি : তাঁর দার্শনিক সংস্কৃতির অনুপুঙ্খ বিচার (এবং যে-সাধারণ দার্শনিক পরিমণ্ডলে তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেড়ে উঠেছিলেন) নিশ্চয়ই খুব দরকার, কিন্তু এটার দরকার হচ্ছে অন্য আরো অনেক জরুরি একটা বিচারের পূর্বশর্ত হিসেবে, সেটা হল তাঁর নিজের 'মৌলিক' দর্শনের বিষয়ে গবেষণার জন্য, শুধুমাত্র কিছু কিছু 'উৎস' বা তাঁর ব্যক্তিগত 'সংস্কৃতি'র বিচারের মধ্য দিয়ে তা শেষ হতে পারে না। সবচেয়ে প্রথমে যা দরকার তা হল তাঁর সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক কাজকর্মের কথা মাথায় রাখা। প্লেখানভ যেভাবে সমস্যাটাকে তুলছেন সেটা হল ঠিক প্রত্যক্ষবাদী পদ্ধতিমতো, এতে করে তাঁর নিজের সীমাবদ্ধ কল্পনাশক্তি ও ইতিহাসবীক্ষণের পরিচয়ই শুধু মেলে।

২. এই গোঁড়া ধারাটা দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে এর ঠিক বিপরীত একটা ধারার উৎপত্তি : সেটা হল কর্মকাণ্ডের দর্শনকে কান্টবাদ ও অন্যান্য অ-প্রত্যক্ষবাদী এবং অ-বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে সংযুক্ত করার একটা ঝোঁক।

একই 'অজ্ঞেয়বাদী' সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে অটো বাওয়ার-এর মধ্যে, যিনি 'ধর্মবিষয়ক' তাঁর বইতে লিখছেন যে মার্কসবাদকে সমর্থন করা যায় বা তাকে মিলিয়ে নেওয়া যায় যে-কোনো দর্শনের মধ্যে, এমনকী টোমিজম্-এর মধ্যেও। এই দ্বিতীয় ধারাটা খুব যে একটা নির্দিষ্ট ঝোঁক তা নয়, আসলে নানারকম ঝোঁকের যোগফলে একটা মিলিত চেহারা—এর মধ্যে এমনকী দে মান-এর ফ্রয়েডীয় চিন্তারও স্থান আছে, তথাকথিত জর্মন পণ্ডিতি গোঁড়ামি আবার যে-চিন্তায় গ্রাহ্য নয়।

লাব্রিয়োলা বা তাঁর দার্শনিক প্রশ্ন উপস্থাপনার যে-ধরন তার প্রতি ভাগ্য এমন অপ্রসন্ন হল কেন? রোজা [লুকসেমবুর্গ] অর্থনীতির সমালোচন [ক্যাপিটাল] এবং তার অন্তর্গত সবচেয়ে উচ্চকোটির সমস্যাবলি সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সেটা এখানে আবার পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে: সংগ্রামেব রোম্যাণ্টিক পর্বে, জনপ্রিয় স্টুর্ম উন্ড ড্রাং-এর পর্বে সমস্ত উৎসাহ কেন্দ্রীভূত হয় হাতের কাছে পাওয়া প্রত্যক্ষ অস্ত্রগুলোর ওপর এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কৌশলগত সমস্যার ওপর এবং দার্শনিক ক্ষেত্রে ছোটোখাটো সাংস্কৃতিক সমস্যার ওপব। কিন্তু যে-মুহূর্তে নিম্নবর্গ কোনো গোষ্ঠী সত্যিকার স্বনিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্যের স্তরে উন্নীত হয়, এবং তারই মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় এক নতুন ধরনের রাষ্ট্রেব চেহারা, তখনই আমরা দেখতে পাই যে নতুন বকমের এক বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিন্যাসেব প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, অর্থাৎ, একেবারে নতুন রকমেব এক সমাজ, আর তাই প্রয়োজন দেখা দেয় আরো বিশ্বজনীন সব ধাবণার ও আরো সূক্ষ্ম ও লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ মতাদর্শগত অস্ত্রশস্ত্রের। এই কারণে আবার লাব্রিয়োলার চর্চা প্রয়োজন আর দার্শনিক প্রশ্ন উপস্থাপনায় তাঁর যে-ধরন তাকেও এক মুখ্য ভূমিকায় নিয়ে আসা দরকার। এইভাবেই এক স্বয়ম্ভর ও শ্রেয়তর সংস্কৃতির সংগ্রামটাকে শুরু করা যেতে পারে, এটাই হবে সংগ্রামের ইতিবাচক দিক, যার নেতিবাচক ও বিতর্কমূলক প্রকাশের নামচিহ্ন হবে 'অ'-ব্যক্তিমূলক এবং 'প্রতি'-নিরীশ্বরতা, 'প্রতি'-যাজকতান্ত্রিকতা ইত্যাদি। এইভাবেই প্রথাগত ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদকে রূপান্তরিত করে নেওয়া যায এক আধুনিক ও সমকালীন চেহারায়, এটাই হবে ঐ নতুন ধরনের রাষ্ট্রের[২] নৈতিক ভিত্তি।

কর্মকাণ্ডের দর্শন ও আধুনিক সংস্কৃতি

কর্মকাণ্ডের দর্শন আধুনিক সংস্কৃতির এক 'মুহূর্ত'। কোনো কোনো সাংস্কৃতিক ধারা যে কিছু দূর পর্যন্ত এই দর্শনে নির্ধারিত ও ঋদ্ধ, এই তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়, কিন্তু কথাটা যে এ

২. আনতোনিও লাব্রিয়োলার দার্শনিক ধারণার বিশদ বিশ্লেষণী আলোচনায় সাধারণ কোনো পত্রিকায় ('ভোচে', 'লেওনার্দো', 'অরদিনে নুওভো') দার্শনিক অংশটা ভরা থাকতে পারে। লাব্রিয়োলা বিষয়ক আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জিও ('নয়ে ৎসাইট' ইত্যাদি) সংকলিত হওয়া উচিত।

পর্যন্ত অবহেলিত থেকেছে বা তথাকথিত কট্টরপন্থায় নেহাতই পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে তার কারণ : প্রধান যে-দার্শনিক সংযোগটা তৈরি হয়েছে সেটা হয়েছে কর্মকাণ্ডের দর্শন এবং নানা ধরনের ভাববাদী ঝোঁকের মধ্যে ; এই ব্যাপারটাই ঐ তথাকথিত কট্টরপন্থী চিন্তায় মনে হয়েছে একেবারেই অমূলক, হয়তো বা নিতান্ত প্রতারণা—ঐ কট্টর চিন্তার সঙ্গে তো অন্তর্লীন-ভাবে জড়িয়ে আছে গত শতাব্দীর শেষ বছর পঁচিশেকের এক বিশেষ সাংস্কৃতিক স্রোতোধারা (প্রত্যক্ষবাদ, বিজ্ঞানতাবাদ)। ('মৌলিক সমস্যা-বলি'-র ওপর প্লেখানভের রচনায় কথাটার স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কিন্তু বিশদ আলোচনা বিশেষ নেই, আর খুঁটিয়ে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টাও নেই কিছু।) এই কারণে আন্তোনিও লাব্রিয়োলা সমস্যাটাকে যেভাবে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করেছিলেন তার পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন।

ব্যাপারটা এই রকম : কর্মকাণ্ডের দর্শনের ক্ষেত্রে বস্তুত দু-দুবার সংশোধন ঘটেছে, অর্থাৎ, দুটো আলাদা দার্শনিক সংযোগের মধ্যে একে আত্মসাৎ করা হয়েছে। একদিকে, এর কিছু কিছু উপাদান, সরাসরি অথবা একটু ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে একাধিক ভাববাদী ধারার মধ্যে মিশিয়ে নেওয়া হয়েছে (ক্রোচে, জেনতীল, সোরেল, এমনকী বের্গস, ব্যবহারিকতাবাদ এই নামগুলো উল্লেখ করলেই হবে।)। পক্ষান্তরে, এই তথাকথিত কট্টরপন্থার মূল লক্ষ্য ছিল তাদের একান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এমন এক দর্শনের সন্ধান পাওয়া যার চরিত্র ইতিহাসের কোনো 'সরল' ব্যাখ্যার তুলনায় অনেক বেশি সার্বিক। তারা এই বিশ্বাসে স্থির যে প্রথাগত বস্তুবাদের সঙ্গে এই দর্শনকে নিতান্ত একাকার করে নিলেই তবে তাদের গোঁড়ামি রক্ষা পাবে। অন্য একটা ধারা ফিরে গেছে একেবারে কাণ্টবাদ পর্যন্ত (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভিয়েনার অধ্যাপক মাক্‌স্‌ আডলার ছাড়াও ইতালীয় অধ্যাপক আলফ্রেদো পোজ্জি এবং আদেলচি বারাতোনো-র কথা।)। সাধারণভাবে লক্ষ করা যায় যে, যে-সব ধারায় কর্ম-কাণ্ডের দর্শনকে ভাববাদী প্রবণতার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে তাদের প্রবক্তারা প্রধানত হলেন 'বিশুদ্ধ' বুদ্ধিজীবী, আর কট্টরপন্থী ধারার প্রবক্তাদের মধ্যে আছেন প্রধানত সেইসব বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্ব যাঁরা স্পষ্টত বাস্তব ক্রিয়াকলাপে বেশি উৎসর্গীকৃত এবং তাই বৃহত্তর জনগণের সঙ্গে একটু বেশি করে সংযুক্ত (কম বেশি বাইরের দিক থেকে)। (এর জন্যে অবশ্য ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক তাৎপর্যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয় এমন ডিগবাজি খেতে তাঁদের খুব অসুবিধে হয় নি।)

এ পার্থক্যটার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ঐ 'বিশুদ্ধ' বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের নিজেদের দেশের বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীগুলির নেতৃস্থানীয় এবং প্রধান শ্রেণী-গুলির ব্যাপকতম মতাদর্শের ব্যাখ্যাতারূপে স্বভাবতই কর্মকাণ্ডের দর্শনের অন্তত কিছু কিছু উপাদান ব্যবহার করতে ছাড়েন নি, যাতে করে তাঁদের বিশ্ব-ধারণারই শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে এবং কল্পনাপ্রধান দার্শনিকতার আধিক্য

এই নতুন ইতিহাসভিত্তিক বাস্তবতার সহযোগে খানিকটা সংযত হয়েছে; ফলে তাঁরা যে-সব সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত তাদের তূণে কিছু নতুন অস্ত্র সংযোজন করাও সম্ভব হয়েছে। পক্ষান্তরে, জনসাধারণের মধ্যে মতাদর্শগতভাবে সবচেয়ে যা ব্যাপক, সেই ধর্মীয় লোকোত্তরবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় ঐ কট্টরপন্থী প্রবণতাকে; এই মতের প্রবক্তারা স্থির করে নেন যে খুব মোটা দাগের এক স্থূল প্রকৃতির বস্তুবাদকে কাজে লাগিয়েই তাঁরা ঐ অন্য প্রবণতাকে পরাস্ত করবেন। কিন্তু এই বাস্তববাদও ছিল কাণ্ডজ্ঞানেরই এক স্তর যা খুব একটা অকিঞ্চিৎকর নয়, এবং যাকে টিঁকিয়ে রাখতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিল ধর্মই—এ বিষয়ে তখন যেটুকু মনে করা হত বা এখনও যেটুকু ভাবা হয় তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। জনসাধারণের মধ্যে এই ধর্মীয় বোধের প্রকাশ রয়েছে খুবই গৌণ ও তুচ্ছ স্তরে, যার মধ্যে বোঝাই হয়ে আছে কুসংস্কার ও ডাইনিতন্ত্র, কিন্তু তার মধ্যে বস্তুর ভূমিকাও কিছু কম ছিল না।

কর্মকাণ্ডের দর্শন যে এক স্বাধীন ও মৌলিক দর্শন, আরো বিকাশের উপাদানে তা যে সবীজ এবং ইতিহাসের ব্যাখ্যা থেকে এক সাধারণ দর্শনে উন্নীত হবার সম্ভাবনাময়, তাঁর ইতিবাচক এই বক্তব্যে (স্বীকার করতে হবে যে তা সব সময় খুব দ্বিধাহীন নয়) লাব্রিয়োলা এই দুই ধারা থেকেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। আন্তোনিও লাব্রিয়োলার অবদানকে আরো বিস্তারিত রূপ দিতে গেলে এই দিকে লক্ষ রেখে কাজ করতে হবে। (যতদূর আমার মনে আছে) রোদোলফো মোনদোলফোর বইগুলো খব সংলগ্নভাবে ঠিক এ জিনিসটা করে নি। রবের্তো আরদিগো-র ছাত্র মোনদোলফো তাঁর মৌলিক প্রত্যক্ষবাদ কখনো পরিত্যাগ করেন নি বলেই মনে হয়। আনতোনিও লাব্রিয়োলার দর্শনের ওপর মোনদোলফোর শিষ্য দিয়াম্রিনি পালাদুৎসির বই (মোনদোলফোর ভূমিকা সম্বলিত)-এর মধ্যেই মোনদোলফোর নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সময়কার ধারণা ও নির্দেশসমূহের দুর্বলতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।

কর্মকাণ্ডের দর্শনের ভাগ্যে ঠিক এটা কেন ঘটল যে তার প্রধান উপাদানগুলির সঙ্গে হয় ভাববাদের নতুবা দার্শনিক বস্তুবাদের এক সংযোগ তৈরি হয়ে উঠল তারই মাধ্যমে? এ ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা জটিল হবেই এবং তা করতে হবে খুব সতর্কভাবে; বিশ্লেষণে দরকার হবে সূক্ষ্ম দৃষ্টির ও ঠাণ্ডা মননশীল এক মেজাজ। কেননা বাইরের কতগুলো মিল দেখে খুব সহজেই ভুল করবার সম্ভাবনা আছে; তখন আর ভেতরের মিলগুলো বা প্রয়োজনীয় অথচ তুলনায় ছদ্ম সংযোগগুলো হয়তো চোখে পড়ে না সব সময়ে। কর্মকাণ্ডের দর্শন প্রচলিত দর্শনসমূহকে যে সব ধারণা 'উপহার' দিয়েছে এবং যে-সব ধারণার দৌলতে ঐ সব দর্শন ক্ষণকালের জন্য হলেও কিছুটা উজ্জীবনে দীপ্ত হতে পেরেছিল, তাদের শনাক্ত করতে হবে খুব সজাগ মন নিয়ে সাবধানে এবং এর মানে দাঁড়াবে যে আধুনিক সংস্কৃতির

প্রণেতাদের [মার্কস ও এঙ্গেলস] জীবনকর্মের পরবর্তী পর্যায়ে ঐ সংস্কৃতির গোটা ইতিহাসটা লিখে ফেলতে হবে, এর হেরফের হলে চলবে না। স্পষ্টত, সরাসরি গ্রহণের দু-চারটা ক্ষেত্র খুঁজে বার করা খুব শক্ত নয়, যদিও তাও খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা দরকার। এর একটা বড় উদাহরণ হল ক্রোচে যেভাবে কর্মকাণ্ডের দর্শনকে ঐতিহাসিক গবেষণার এক এম্পিরিকাল সূত্রে দাঁড় করাচ্ছেন সেটা। এই ধারণাটা যা এমনকী ক্যাথলিকদের মধ্যেও [তু. মন্সিনোর অলজিয়াতির বই] সিঁধিয়ে গেছে তার থেকেই জন্ম হয়েছে ইতালীয় ইতিহাসচর্চার আর্থ-আইনি ঘরানার, এবং তা ইতালির বাইরেও বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু সবচেয়ে শক্ত এবং সন্তর্পণে করণীয় গবেষণার প্রয়োজন হচ্ছে সেইসব নিহিত এবং অস্বীকৃত গ্রহণের ক্ষেত্রে যার সূত্রপাত মূলত এই কারণে যে কর্মকাণ্ডের দর্শন হল আধুনিক সংস্কৃতির এমন এক মুহূর্ত, এমন এক ছড়ানো পরিমণ্ডল যা কিনা সহজে প্রতীয়মানও নয়, প্রত্যক্ষও নয় এমন সব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চিন্তার পুরনো ধারণাকেই পাল্টে দিয়েছে। এদিক দিয়ে সোরেল বিষয়ে চর্চা খুবই ফলপ্রসূ হতে পারে কারণ সোরেল ও তাঁর উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে অনেক প্রাসঙ্গিক ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। এ কথা ক্রোচে বিষয়েও প্রযোজ্য। কিন্তু আমার মনে হয় সবচেয়ে জরুরি চর্চার প্রয়োজন হল বের্গসঁর দর্শন ও ব্যবহারিকতাবাদ নিয়ে, যাতে ধরা পড়বে তাঁদের কোনো কোনো অবস্থান কর্মকাণ্ডের দর্শনের সঙ্গে ঐতিহাসিক সংযোগ ছাড়া কতদূর পর্যন্ত ধারণা করা যেত।

এ প্রশ্নের অন্য আর একটা দিক হল রাজনীতির বিজ্ঞানে বাস্তব শিক্ষা বিষয়ে। কর্মকাণ্ডের দর্শন থেকে যে শিক্ষা এর প্রতিপক্ষ পেয়েছে সে বিষয়ে প্রতিপক্ষের এই বিরোধীরা নীতিগতভাবে তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করে, যেমন তত্ত্বগতভাবে জেসুইটরা মাকিয়াভেল্লির বিরোধিতা করেও বাস্তবে ছিলেন তাঁর সবচেয়ে অনুগত শিষ্য। 'লা স্তাম্পা'-তে প্রকাশিত এক 'মতামত'-এ মারিও মিসিরোলি যখন এই পত্রিকার রোম প্রতিবেদক (১৯২৫ সাল নাগাদ) ছিলেন তখন লিখছেন যে এটা জানতে পারলে খুব মজার ব্যাপারই হবে যে মনে মনে তুলনায় একটু বুদ্ধিমান শিল্পপতিরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ কিনা যে 'সমালোচনাত্মক অর্থনীতি' [কাপিটাল]-র মধ্যে তাঁদের কারবার সম্বন্ধে অতি চমৎকার এক অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যায় এবং তাঁরা সেই অর্জিত জ্ঞানের থেকে বেশ সুবিধাও গ্রহণ করেন। এটা কিন্তু কোনো দিক থেকেই খুব আশ্চর্যজনক কিছু নয়, কারণ [মার্কস] যদি বাস্তবকে যথাযথ-ভাবে বিশ্লেষণ করেই থাকেন তাহলে তিনি যা করেছেন তা তো এ ছাড়া আর কিছু না যে, ঐ বাস্তবের যারা ঐতিহাসিক বাহক তারা যা ভাবত বা এখনো হয়তো ভাবে, হয়তো কিছুটা অস্পষ্টভাবে বা ঝোঁকবশত, এবং ঐ বিরূপ সমালোচনার ফলে এখন তারা হয়তো যার সম্বন্ধে আর একটু বেশি সচেতন, সেই সবগুলোকেই তিনি সুসম্বদ্ধভাবে গ্রথিত করেছেন মাত্র।

এ প্রশ্নের আর একটা দিক আছে আরো মজার। এটা কেন হল যে এমনকী তথাকথিত কট্টরপন্থায়ও কর্মকাণ্ডের দর্শনকে অন্য নানা ধারার সঙ্গে মেলানো হয়েছে, বিশেষত, একটা বিশেষ ধারার সঙ্গে? যেটা প্রধানত উল্লেখযোগ্য সেটা হল প্রচলিত বস্তুবাদের সঙ্গে সংযোগ; কান্টবাদের সঙ্গে সংযোগের সাফল্য খুব সীমিত আর তাও সীমাবদ্ধ একটা বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে। এই প্রশ্নে কর্মকাণ্ডের দর্শনের বিকাশে প্রগতি ও স্থিতাবস্থা বিষয়ে রোজা [লুক্সেমবুর্গ]-এর প্রবন্ধটা নজর করা খুব উচিত হবে। এই প্রবন্ধে তিনি দেখাচ্ছেন কীভাবে এই দর্শনের এক একটি উপাদান ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বিকাশ লাভ করেছে, কিন্তু সর্বত্রই বাস্তব ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন অনুসারে। এর অর্থ হল এই যে ঐ নতুন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতারা তাঁদের কালের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিলেন, এবং এমনকী অব্যবহিত পরবর্তীকালের চেয়েও বেশি, এবং তাঁরা এমন সব অস্ত্রে ভরা এক তূণ বানিয়ে গেলেন যা, সময়ের অগ্রবর্তী বলেই, তখনো ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে ওঠে নি, এবং যা আরো বেশ কিছুটা সময় পরে তবে কাজে লাগতে পেরেছিল। এই ব্যাখ্যা কিছুটা মনগড়া, কেননা এখানে যা করা হচ্ছে ত যে-ঘটনাটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে সেটাকেই কিছুটা বিমূর্তভাবে উপস্থিত করা হল ঘটনার ব্যাখ্যা হিসেবে। তবুও এর মধ্যে রয়েছে কণা পরিমাণ এক সত্য যেটা আর একটু গভীরে গিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। কর্মকাণ্ডের দর্শন কেন অন্য নানা বহিরাগত ধারার সঙ্গে মিত্রতা করতে বাধ্য হল তার অন্যতম ঐতিহাসিক কারণ, আমার মনে হয় এই যে, প্রাক্-ধন-তান্ত্রিক জগতের অনেক কিছু অবশেষের সঙ্গে একে লড়াই চালাতে হয়েছিল সেইসব অবশেষ যার রেশ সাধারণ জনগণের মধ্যে, বিশেষত, ধর্মের ক্ষেত্রে এখনো রয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে। কর্মকাণ্ডের দর্শনের দুটো কাজ করবার ছিল: আধুনিক মতাদর্শগুলি সবচেয়ে পরিশীলিত যে আকার পরিগ্রহ করেছে, তার সঙ্গে লড়াই চালানো, যাতে করে তার সপক্ষে এক স্বাধীন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গড়ে তোলা যায়; এবং সাধারণ জনগণকে, যাদের সংস্কৃতি মধ্যযুগীয় তাদের, শিক্ষিত করে তোলা যায়। এই দ্বিতীয় কাজ, যেটা ঐ নতুন দর্শনের চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে একান্তভাবেই মৌলিক, সেটাতেই তার সব শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেছে, পরিমাণগত দিক থেকে শুধু নয়, গুণগত দিক থেকেও। 'জ্ঞানবিস্তার'-এর তাগিদে এই নতুন দর্শন এমন এক সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল যেটা জনগণের গড়পড়তা মান (যা ছিল খুব নিচু স্তরের)-এর চেয়ে কিছুটা উঁচু বটে, কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীর মতাদর্শের সঙ্গে লড়াই চালাবার পক্ষে যা একেবারে অনুপযুক্ত। অথচ এই নতুন দর্শনের উদ্ভবই তো হয়েছিল সে-যুগের সবচেয়ে উন্নত সাংস্কৃতিক প্রকাশ যে ধ্রুপদী জর্মন দর্শনে তারই বিকল্প হিসেবে, এবং এই নতুন দর্শনে যে-সামাজিক গোষ্ঠীর বিশ্বদর্শন প্রতিভাত তাদেরই জন্য নির্দিষ্ট এক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। অন্য দিকে

আধুনিক সংস্কৃতি, বিশেষত ভাববাদ প্রভাবিত যে-সংস্কৃতি, জনসংস্কৃতি বিকাশে তার কোনো ভূমিকা নেই, বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাসূচিতে দেবার মতো বৈজ্ঞানিক কিংবা নৈতিক তার কোনো বস্তু নেই, এবং ঐ সূচির চরিত্র তাই হয়ে দাঁড়ায় বিমূর্ত ও তাত্ত্বিক কিছু গড়ন সর্বস্ব। খুব সীমিত এক অভিজাত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সংস্কৃতিতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় এ দর্শন, যুব সম্প্রদায়ের ওপর এর প্রভাবও খুব বিরল, নিতান্ত দু-একটা প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে কখনো কখনো, বা কখনো খুব প্রান্তিক কোনো বিষয়ে।

এটা ভেবে দেখতে হবে এই ধরনের সাংস্কৃতিক সংযোগের পেছনে কোনো ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা কাজ করছে কিনা, আর অতীত ইতিহাসেও এ ধরনের সংযোগের নজির পাওয়া যাবে কিনা সেটাও দেখা দরকার, অবশ্যই বিশেষ স্থান ও কালের নির্দিষ্ট পরিস্থিতির কথা স্মরণে রেখেই এটা করতে হবে। আধুনিক কালের আগেকার পর্বের মোক্ষম উদাহরণ হল নিঃসন্দেহে ইতালির রেনেসাঁস ও প্রটেস্টাণ্ট দেশগুলির রিফর্মেশন। **স্তোরিয়া দেল্লেতা বারোক্কা ইন্ ইতালিয়া** নামের বইয়ের ১১ পৃষ্ঠায় ক্রোচে লিখছেন :

> 'রেনেসাঁস আন্দোলন বরাবরই উচ্চবর্গের অভিজাত আন্দোলনই থেকে গিয়েছিল, এবং এমনকী ইতালিতেও, যে-ইতালি ছিল এই আন্দোলনের জননী ও ধাত্রী দুইই, সেখানেও কিন্তু তা প্রাসাদচক্রের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে নি, জনগণের মধ্যে সিঁধিয়ে যেতে পারে নি, রূপান্তরিত হতে পারে নি তাদের প্রথা ও 'বিশ্বাস'-এ, একটু অন্যভাবে বলতে গেলে, তাদের সমবেত অভিমত ও বিশ্বাসে পর্যবসিত হতে পারে নি। পক্ষান্তরে, রিফর্মেশনের এই জোরটা ছিল সিঁধিয়ে যাবার, জনমানসে মিশে যাবার, কিন্তু তাকেও এর জন্য দাম দিতে হয়েছিল নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বিকাশের গতি রুদ্ধ করে, এর জীবনদায়ী যে-বীজ তার বিকাশ ছিল খুব শ্লথ ও ব্যাহতগতি।

আবার ৮ পৃষ্ঠায় লিখছেন :

> 'ঐ সব মানববাদীদের মতো লুথার বিষাদকে নিন্দা করেন এবং আনন্দের অভ্যর্থনাই করেন ; তিনি আলস্যকে তিরস্কার এবং কর্মোদ্যমের প্রশস্তি করেন : কিন্তু, অন্যদিকে, লেখাপড়া ও বিদ্যাচর্চার প্রতি তাঁর ছিল এক ধরনের বিদ্বেষ ও আত্মবিশ্বাসের অভাব, যাতে করে এরাস্‌মুস্ বলতে পেরেছিলেন, '*ubicumque regnat lutheranismus, ibi literarum est inte1itus*' [যেখানেই লুথারবাদের জয়জয়কার সেখানেই বিদ্যাচর্চার মৃত্যু।] হয়তো প্রতিষ্ঠাতার বিরাগই তার একমাত্র কারণ নয়, তবে একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে, দু-শতাব্দী ধরে জর্মন প্রটেসটাণ্ট ধর্ম বিদ্যাচর্চা, সমালোচনা, দর্শন ইত্যাদি ব্যাপারে ছিল নিতান্ত নিরেশ। ইতালীয় সংস্কারকেরা, বিশেষ করে জ্যওভান্নি দে ভাল্‌দেস্ ও তাঁর বন্ধুগোষ্ঠী খুব জোরজার না করেও কোনো এক রকমে মানবিকবাদ, মরমীয়া ধর্ম,

জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা এবং নৈতিক কৃচ্ছ্রতা এসবকে মেলাতে পেরেছিলেন। ক্যালভিনবাদ, দেবানুগ্রহ ও নিয়মানুবর্তিতা বিষয়ে তার কঠোর ধারণা-বশত জ্ঞানের স্বাধীন সাধনা এবং সৌন্দর্যচর্চার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখায় নি কখনো, কিন্তু দেবানুগ্রহের ধারণাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে, তাকে আরো বিকশিত করে, শোধন-বর্জন করে একটা প্রায় বৃত্তির স্তরে উন্নীত করা হয়েছিল তাতে অর্থনৈতিক জীবনের প্রসার এবং উৎপাদন ও ধনবৃদ্ধির ব্যাপারে তার এক বড় ভূমিকা ছিল।'

লুথারীয় সংস্কার ও ক্যালভিনবাদ এক বিরাট জাতীয়-জনপ্রিয় আন্দোলনের সূচনা করেছিল এবং তারই মধ্য দিয়ে ঐসব মতবাদের প্রভাব বিস্তারলাভ করেছিল : অনেক পরবর্তীকালেই মাত্র এর থেকে কোনো উন্নততর সংস্কৃতির সূচনা হতে পেরেছিল। বড় মাপের কোনো ঐতিহাসিক সাফল্যের বিচারে ইতালীয় সংস্কারকেরা ছিলেন বন্ধ্যাপ্রকৃতির। এ কথা ঠিক যে তার উচ্চ পর্যায়ে এমনকী রিফমেশ'ন আন্দোলনও আবশ্যিক শর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিল রেনেসাঁস শৈলী এবং এভাবেই তা ছড়িয়ে পড়েছিল অ-প্রটেসটাণ্ট দেশের মধ্যেও, যেখানে জনমানসে এর বীজ ঠিকমতো উপ্ত হতে পারে নি। কিন্তু জনগণ স্তরের বিকাশের এই পর্বটার জন্যই ঐ প্রটেসটাণ্ট দেশসমূহ ক্যাথলিক বাহিনীর ধর্মযুদ্ধের বিরুদ্ধে ধৈর্যসহকারে লড়াই চালিয়ে বিজয়ী হতে পেরেছিল। এই ভাবেই আধুনিক ইয়োরোপের এক অন্যতম শক্তিমান দেশ হিসেবে জর্মন জাতির উদ্ভব। ধর্মযুদ্ধে ফ্রান্স ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল এবং ক্যাথলিকবাদ অন্তত আপাতবিজয়ী হতে পেরেছিল, কিন্তু ফ্রান্সে আঠারো শতকে দেখা দিল এক মহান জনপ্রিয় পুনর্গঠন—এনলাইটেনমেণ্ট, ভলতেয়ারবাদ ও এনসাইক্লোপিডিয়ার মধ্যে দিয়ে। এই পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় এবং এরই সহগামী হিসেবে দেখা দিয়েছিল ১৭৮৯-এর বিপ্লব। এটা কিন্তু ফরাসি জনগণের দিক থেকে ছিল প্রকৃত অর্থেই এক বিরাট বৌদ্ধিক ও নৈতিক পুনর্জাগরণের ব্যাপার; জর্মন লুথারীয় পুনর্জাগরণের থেকেও যা অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী, কারণ এর অন্তর্গত হতে পেরেছিল গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক কৃষি জনতা এবং এর একটা স্পষ্ট সেকুলার ভিত্তি ছিল। জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের বন্ধনে চিহ্নিত পূর্ণাঙ্গ সেকুলার মতাদর্শের সাহায্যে ধর্মের এক বিকল্প উপস্থিত করাই ছিল এর অন্যতম প্রচেষ্টা। এই পুনর্জাগরণের ফলেও কিন্তু উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতির কোনো তৎপর বিকাশ ঘটেনি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্গত অধিকার বিষয়ক প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞানের চর্চাই হয়তো এর একমাত্র ব্যতিক্রম। (ফরাসি বিপ্লবের সময়কালে ফ্রান্সে ও জর্মনিতে একই সংস্কৃতির বিশিষ্ট জাতীয় রূপ নিয়ে হেগেলের তুলনামূলক আলোচনা এখানে দ্রষ্টব্য : এক দীর্ঘ পরম্পরার শেষে এই হেগেলীয় ধারণার প্রেরণাতেই কারদুচ্চির বিখ্যাত কবিতা। *'accomunati nella stessa fe', decapitaro Emmanuel Kant iddio, Massimiliano Robespierre il re'* [বিপ্রতীপ ধারণার বশবর্তী হয়েও

এমানুয়েল কাণ্ট ঈশ্বরের মাথা কেটে ফেলেছিলেন আর মাক্‌সিমিলিয়ান রোব্‌স্‌পিয়ের কেটেছিলেন রাজার মাথা।]

কর্মকাণ্ডের দর্শনকে এক ধরনের আধুনিক জনপ্রিয় পুনর্জাগরণ হিসেবে দেখার একটা ইঙ্গিত গেয়র্গ সোরেলের মধ্যে ছিল: (যাঁরা ইতালিতে এক ধর্মীয় পুনর্জাগরণের প্রত্যাশা করছেন, মিসিরোলি ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের মতো যাঁরা ক্যালভিনবাদের এক ইতালীয় সংস্করণের কথা ভাবেন তাঁরা অবশ্য এক অলৌকিক মেঘলোকে বাস করছেন।) সোরেলের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য ছিল কিছুটা আংশিক এবং নিতান্ত মননসঞ্জাত, এর কারণ সংসদীয় প্রথার দৈন্য ও রাজনৈতিক দলগুলির সম্বন্ধে তাঁর তীব্র জানসেনী আক্রোশ। বৌদ্ধিক ও নৈতিক পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তার ধারণা সোরেল পেয়েছিলেন রেনাঁ-র কাছ থেকে; তিনি এ কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন (মিসিরোলি-র কাছে লেখা এক চিঠিতে) যে বড় বড় ঐতিহাসিক আন্দোলনের পরিণতিতে অনেক সময়েই দেখা দেয় এক আধুনিক সংস্কৃতি, ইত্যাদি। যদিও আমার অবশ্য মনে হয় যে, সোরেল যখন আদিম খ্রিস্টধর্মকে প্রায় কষ্টিপাথরের মতো ব্যবহার করছেন তখনই তাঁর মধ্যে এ রকমের একটা ধারণা নিহিত রয়েছে; ওঁর এই ব্যবহার কিছুটা আলঙ্কারিক বটে, কিন্তু অনেকটাই সত্য আছে এর মধ্যে; হয়তো যান্ত্রিক, প্রায়ই উদাহরণগুলো হয়তো বানানো, কিন্তু গভীর অন্তর্বোধের পরিচায়ক।

কর্মকাণ্ডের দর্শন এই সমস্ত সাংস্কৃতিক অতীতকে অঙ্গীকার করে নেয়: পুনর্জাগরণ ও পুনর্গঠন, জর্মন দর্শন এবং ফরাসি বিপ্লব, ক্যালভিনবাদ ও ইংরেজ ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতি, ধর্মনিরপেক্ষ উদারনীতি এবং এই ইতিহাসবাদ যা কিনা সমগ্র আধুনিক জীবনবোধের মূলে রয়েছে। বৌদ্ধিক ও নৈতিক পুনর্গঠনের এই সমগ্র আন্দোলনের এক তুঙ্গ মুহূর্ত হল কর্মকাণ্ডের দর্শন। জনসংস্কৃতি ও উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতির বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে এই দর্শন তার দ্বান্দ্বিকতায় উত্তীর্ণ। এর সমীপবর্তী সংযোগ হল প্রটেস্টাণ্ট পুনর্গঠন+ফরাসি বিপ্লব: এ এমন এক দর্শন যা রাজনীতিও বটে আবার এমন এক রাজনীতি যা দর্শনও বটে। এ দর্শন এখনো তার লৌকিক পর্ব উত্তীর্ণ হয় নি। স্বনির্ভর এক বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গড়ে তোলা অত সোজা কাজ নয়; এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কাছে আসা, দূরে সরে যাওয়া এবং অতি জটিল ও অসংখ্য সব পরম্পরার মধ্য দিয়ে তবে এর উত্তরণ ঘটে: এমন এক নিম্নবর্গীয় সামাজিক গোষ্ঠীর ধারণায় এ দর্শন বিধৃত, যার হাতে ঐতিহাসিক উদ্যম নেই, কিছুটা অসংলগ্ন হলেও যা এক ক্রমবিস্তৃতির স্তরে রয়েছে, অথচ গুণগত দিক থেকে উৎকর্ষের একটা স্তর ছাড়িয়ে যেতে অসমর্থ, এবং সেই স্তরে রাষ্ট্রিক অধিকার অর্জন করা তখনো এই গোষ্ঠীর অনায়ত্ত; অথচ ঐ আধিপত্যই একমাত্র স্তর যার মধ্য দিয়ে ঐ বৌদ্ধিক গোষ্ঠী তার জৈব সাম্য খুঁজে পেতে পারে। কর্মকাণ্ডের দর্শন নিজেই খানিকটা 'পক্ষপাতদুষ্ট' 'কুসংস্কার'-এ পরিণত; বস্তুত যা দাঁড়িয়েছে

তাতে এ হল আধুনিক ইতিহাসবাদের জনপরিচিত একটা দিক, কিন্তু এর নিজেরই মধ্যে নিহিত আছে এই ইতিহাসবাদ থেকে উত্তরণের সূত্র। কিন্তু সংস্কৃতির ইতিহাস, যা কিনা দর্শনের ইতিহাস থেকে অনেক ব্যাপকতর, সেখানে বারবার দেখা গেছে যে যখনই কোনো বৈপ্লবিক পর্বের মধ্য দিয়ে যাবার জন্য জনসংস্কৃতির উন্মেষ ঘটেছে, এবং যখনই জনগণের মধ্য থেকে গড়ে উঠেছে কোনো নতুন সামাজিক শ্রেণী তখনই বিকশিত হয়েছে 'বস্তুবাদ' : পক্ষান্তরে, সনাতনী শ্রেণীর লোকেরা এইসব সময়ে আঁকড়ে ধরে থাকে অন্তর্মননের দর্শনসমূহকে। ফরাসি বিপ্লব ও পুনর্গঠন পর্বের মধ্যস্থিত অবস্থায় হেগেল চিন্তার এই দুই মুহূর্তকে এক দ্বান্দ্বিক রূপ দিয়েছিলেন, বস্তুবাদ ও অন্তর্মননবাদ, কিন্তু তাঁর সংশ্লেষের চেহারা ছিল যেন 'মাথার ওপরে ভর দিয়ে হাঁটা কোনো মানুষ'। কিন্তু তাঁর অনুগামী দার্শনিকেরা এই সংশ্লেষের বিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন, তাতে একদিকে বস্তুবাদী তন্ত্র-সমূহের আর অন্যদিকে অন্তর্মননবাদী চিন্তার পুনরাবর্তন দেখা দিয়ে-ছিল। হেগেলীয় দর্শন, ফয়ারবাখের দর্শন এবং ফরাসি বস্তুবাদ—এই সমস্ত অভিজ্ঞতা কর্মকাণ্ডের দর্শনের প্রতিষ্ঠাতার হাতে আবার সঞ্জীবিত হয়েছিল এবং এই প্রক্রিয়াব মধ্য দিয়েই দ্বান্দ্বিক ঐক্যের সেই সংশ্লেষ, 'পায়ের ওপরে ভর দিয়ে হাঁটা মানুষ' পুনরায সম্ভব হতে পেরেছিল। হেগেলীয় দর্শনের ক্ষেত্রে যে ক্ষয়ক্ষতি দেখা দিয়েছিল তা কর্মকাণ্ডের দর্শনেব বেলাতেও পুনরাবৃত্ত, অর্থাৎ, ঐ দ্বান্দ্বিক ঐক্যের থেকে পেছিয়ে গিয়ে একদিকে যেমন দেখা দিয়েছে দার্শনিক বস্তুবাদ, তেমনি অন্যদিকে আধুনিক ভাববাদী উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতি কর্মকাণ্ডের দর্শনের সেই সব অংশ আত্মসাৎ করে নিয়েছে যা তার নিজের প্রয়োজনে সঞ্জীবনী হিসেবে অপরিহার্য মনে হয়েছিল।

'রাজনৈতিক'ভাবে বস্তুবাদী ধারণা জনগণের কাণ্ডজ্ঞানের কাছাকাছি। অনেক বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে এই ধারণা খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, বিশেষত লোকপ্রচলিত প্রায সব রকম কুসংস্কারের সঙ্গেই (ডাইনিবিদ্যা, ভূতপ্রেত ইত্যাদি)। প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে এর পরিচয় মেলে, আরো বেশি করে মেলে বাইজানৃতিনীয় সনাতনবাদে। সাধারণ্যে প্রচলিত ধর্ম খুব মোটা দাগে বস্তুবাদী, কিন্তু তবুও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সরকারি ধর্মের স্তরে একটা স্পষ্ট চেষ্টা দেখা যায় যাতে দুটো আলাদা ধর্ম, স্বতন্ত্র দুটো স্তর গড়ে না ওঠে, সরকারি স্বীকৃতিতে এবং বাস্তবেও, যেন সীমাবন্ধ কোনো গোষ্ঠীর মতাদর্শে তা রূপান্তরিত না হয়। কিন্তু এ দিক থেকে এটা দেখা খুব জরুরি যাতে কর্মকাণ্ডের দর্শনের যে ঝোঁক তার সঙ্গে ক্যাথলিকবাদের ঝোঁক যেন গুলিয়ে না যায়। কর্মকাণ্ডের দর্শনের ঝোঁক হল জনসাধারণের সঙ্গে এক গতিময় সংযোগ রক্ষা করে চলা এবং তার মধ্য দিয়ে ক্রমশ জনসাধারণের নতুন নতুন স্তরকে উচ্চতর সাংস্কৃতিক পর্যায়ে উত্তরণ করা, কিন্তু ক্যাথলিকবাদে এক নিতান্ত যান্ত্রিক সংযোগ মাত্র রক্ষা করে চলা হয়, খুব বহিরঙ্গ এক সংযোগ, যার ভিত্তি হল গির্জার পুজা-অর্চনা

ও চোখ-ধাঁধানো সমারোহ। অনেক প্রতিস্পর্ধী আন্দোলনেই খ্রিস্টান ধর্ম-সংঘের সংস্কারসাধন করে তাকে উন্নততর মর্যাদা দিয়ে জনসাধারণের কাছাকাছি নিয়ে আসার আদর্শে উদ্বুদ্ধ গণশক্তির প্রকাশ। খ্রিস্টীয় ধর্মসংঘের দিক থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ছিল অনেক সময়ে খুব উগ্র: এমনিভাবে তৈরি হয়েছিল সোসাইটি অফ জীসাস, এমনিভাবে গড়ে উঠেছিল ট্রেন্ট সংঘের নিরাপদ আশ্রয়, যদিও এ কথাও অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে ধর্মীয় 'গণতান্ত্রিক' পদ্ধতিতে নিজের পক্ষভুক্ত বুদ্ধিজীবী সংগ্রহ করায় এক চমকপ্রদ কৌশল উদ্ভাবন করেছিল এই খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান; এই বুদ্ধিজীবীদের নির্বাচন করা হত একক ব্যক্তি হিসেবে, কোনো জনপ্রিয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক অভিব্যক্তির জন্য নয়।

সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাসে সংস্কৃতির সংগঠনের দিকে ও সেই সংগঠন যে-সব ব্যক্তিবর্গের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট রূপ পাচ্ছে তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। 'নবজাগরণ ও পুনর্গঠন' বিষয়ে জি. দে রুজেরে-র গ্রন্থের মধ্যে এরাসমুস্ প্রমুখ অনেক বুদ্ধিজীবীর মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে: দমনপীড়ন ও দগ্ধ হয়ে মরার ভয়ে তাঁরা নতি স্বীকার করেছিলেন। এই পুনর্গঠনের বাহক তাই ছিল গোটা জর্মন জনগণ, স্তরবিন্যস্ত ভাবে নয়, তাদের সমগ্রতায়; শুধু বুদ্ধিজীবীরা কখনোই নয়। বস্তুত শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুদ্ধিজীবীদের এই পলায়নের ফলেই উচ্চাঙ্গ সংস্কৃতির অব্যবহিত ক্ষেত্রে পুনর্গঠন অত 'বন্ধ্যা,' এবং এই বন্ধ্যাত্ব চলেছিল ততদিন পর্যন্তই যতদিন না জনগণ, যারা তাদের মূল উদ্দেশ্য থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি, আবার এক ঝাড়াই বাছাইয়ের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আর এক নতুন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর জন্ম দিতে পেরেছিল যাদের পরিণতি ঘটে ক্ল্যাসিকাল দর্শনে।

আপাতত এখন পর্যন্ত কর্মকাণ্ডের দর্শনেও ঐ একই ধরনের একটা ঘটনা ঘটছে। এই দর্শনের ভূমিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন যে সব মহান দার্শনিকেরা, তাঁদের সংখ্যা অবশ্য কখনোই খুব বেশি ছিল না, তবু তাঁরা কেউই জনসাধারণের সঙ্গে অন্বিত ছিলেন না, তাঁরা কেউই জনসাধারণের মধ্য থেকে উঠে আসেন নি, তাঁরা সব ছিলেন সনাতনী মধ্যবর্তী শ্রেণীসমূহের অভিব্যক্তি এবং ইতিহাসের বড় বড় 'বাঁকের' মুখে দাঁড়িয়ে তাঁরা আবার ফিরে গিয়েছিলেন সেই সব পুরনো শ্রেণীতেই। কেউ কেউ থেকে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে তো এই দর্শনের স্বপ্রতিষ্ঠ নতুন রকমের বিকাশ ঘটানোর জন্য নয়, বরঞ্চ এই নতুন দার্শনিক ধারণার ক্রমাগত পরিশোধনের জন্য। কর্মকাণ্ডের দর্শন যদিও পৃথিবীর ঐতিহাসিক বিকাশের একটা মুহূর্ত তবুও এ দর্শন যে নতুন, স্বতন্ত্র ও মৌলিক এক ধারণা এ কথার স্বীকৃতির মধ্যে এ স্বীকৃতিও নিহিত আছে যে এটা হল স্বতন্ত্র ও মৌলিক এক নব সংস্কৃতির ভ্রূণাবস্থা, যা সমাজ-সম্পর্কের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরো বিকশিত হবে। যে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে যা কিছু

বর্তমান থাকে তা হল পুরনো ও নতুনের এক পরিবর্তমান মিশ্রণ, সামাজিক সম্পর্কের স্থিতাবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের এক তাৎক্ষণিক স্থিতাবস্থা মাত্র। নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরেই কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক সমস্যাটা তার সমস্ত জটিলতা নিয়ে উপস্থিত হয়, এবং একমাত্র তখনই এ সমস্যার কোনো সংগত সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। যাই হোক না কেন, নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে একমাত্র যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যেতে পারে তা হল সমালোচনামূলক ও তর্কমুখর, তা কখনোই খুব কট্টরপন্থী হওয়া উচিত নয়; এ দৃষ্টিভঙ্গি খুব রোম্যান্টিক হবেই, কিন্তু এ এমন এক ধরনের রোম্যান্টিকতা যা সচেতনভাবে ক্ল্যাসিকাল সংশ্লেষের জন্য সচেষ্ট।

টীকা ১. সমস্ত আধুনিক ইতিহাসবাদী তত্ত্বের বিকাশপর্যায় হিসাবে রাজশক্তির পুনর্বহালের কালপর্বটাকে চর্চা করা উচিত; ইতিহাসবাদী ঐসব তত্ত্বের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল কর্মকাণ্ডের দর্শনে, যার বিকাশ ঘটেছিল ঠিক ১৮৪৮ সালের প্রাক্কালে যখন চারিদিকে পুনর্বহাল রাজতন্ত্র ভেঙে পড়ছে, ভেঙে পড়ছে পবিত্র ঐক্যও। এ কথা সুবিদিত যে পুন-র্বহাল কথাটা কেবলমাত্র আলঙ্কারিক; বস্তুত পুরানা জমানা আর তেমন করে কোনোদিনই পুনর্বহাল হয়নি, যা হয়েছিল তা কেবল সামাজিক শক্তিগুলির নববিন্যাস যার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীসমূহের বিপ্লবী জয়কে একদিকে যেমন সীমাবদ্ধ করা গিয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করাও সম্ভব হয়েছিল। ফ্রান্সের রাজা এবং রোমের পোপ তাঁদের নিজ নিজ দলের প্রধান হয়ে উঠলেন, কিন্তু ফরাসি দেশের বা খ্রিস্টধর্মের আর অবিসংবাদিত প্রতিনিধি রইলেন না তাঁরা। পোপের অবস্থা বিশেষ করে দুর্বল হয়ে গেল। 'উগ্র ক্যাথলিকদের' স্থায়ী সংগঠন গড়ে উঠতে লাগল এই সময়ে; বেশ কিছু মধ্যবর্তী স্তর পার হয়ে—যেমন ১৮৪৮-৪৯, ১৮৬৯ (এমিলীয় বৈদেশিক মিশনের সংযুক্তির মধ্য দিয়ে পোপ রাষ্ট্রের প্রথম ভাঙনের বছর), ১৮৭০ এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকাল—ঐ উগ্র সংগঠনগুলি ক্যাথলিক কর্মসূচির জবরদস্ত বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠেছিল, জবরদস্ত বটে তবে খানিকটা রক্ষণাত্মক। পুনর্বহাল পর্বের ইতিহাসবাদী তত্ত্বসমূহ আঠারো শতকের মতাদর্শগুলির বিরোধিতাই করেছিল। কিছুটা বিমূর্ত, ইউটোপিয়া-ধর্মী এই মতাদর্শ-গুলি প্রলেতারীয় দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতি হিসেবে ১৮৭০ পর্যন্ত ফ্রান্সে বেশ ব্যাপকভাবেই ছড়িয়ে ছিল। কর্মকাণ্ডের দর্শন ছিল আঠারো শতকের এইসব জনপ্রিয় ধারণাকে জনগণের দর্শন হিসেবে বিবেচনা করার বিরোধী, তাদের বিশিষ্ট রূপপ্রকৃতি যাই হোক না কেন, নিতান্ত বালখিল্য ধারণা থেকে একেবারে প্রুধোঁ পর্যন্ত সবাই। প্রুধোঁ-র ধারণার মধ্যে কিছুটা প্রভাব পড়েছিল রক্ষণশীল ইতিহাসবাদের এবং তাঁকে সম্ভবত ফরাসি জ্যাবের্তো বলে ভাবাই সংগত হবে—অবশ্যই জনশ্রেণী সম্ভূত—ইতালীয় ইতিহাস তো

ফরাসি ইতিহাস থেকে পশ্চাৎপদ, ১৮৪৮-এর সময়কাল থেকেই তো এটা প্রতীয়মান। বস্তাপচা জাকোব্যাঁ মতাদর্শের ইউটোপীয় চরিত্রের সমালোচনা করার জন্য পুরনো আমলের তাত্ত্বিকেরা, রক্ষণশীল ইতিহাস-বাদীরা, যদি উপযুক্ত বিবেচিত হন, নতুন ফরাসি জাতির গঠনের অন্যতম উপাদান হিসাবে জাকোব্যাঁবাদের যে প্রকৃত মূল্য ছিল, শুধু কোনো বিমূর্ত গুণপনা নয়, তার স্বরূপ অনুধাবনে কর্মকাণ্ডের দর্শন তবে আরো বেশি উপযুক্ত। (প্রকৃত মূল্য, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কাটাছাঁটা কিছু কাজকর্মের প্রকৃত তথ্য, শুধুমাত্র মতাদর্শ গড়ে তোলার ব্যাপার নয় কিছু।) কর্মকাণ্ডের দর্শন ঐ রক্ষণশীলদের ঐতিহাসিক ভূমিকার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্যও বেশি উপযুক্ত ; ঐ রক্ষণশীলরা তো ছিলেন প্রকৃত অর্থে ঐ জাকোব্যাঁদেরই লজ্জায় নতমুখ সন্ততিমাত্র, ও'রা জাকোব্যাঁদের বাড়াবাড়ির নিন্দা করতেন বটে, কিন্তু সযত্নে তাদের উত্তরাধিকারটাকে লালন করতেন। কর্মকাণ্ডের দর্শন শুধু যে সমস্ত অতীতকে ব্যাখ্যা করা এবং তার যুক্তিবত্তা প্রতিষ্ঠার দাবি করে তাই তো নয়, সে নিজেকেও ইতিহাসসম্মত এক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা ও তার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করারও চেষ্টা করে। অর্থাৎ, এই দর্শনই ছিল 'ইতিহাসবাদ'-এর সর্বোত্তম রূপ, যে-কোনো রকম বিমূর্ত 'মতাদর্শবাদ'-এর থেকে পূর্ণ মুক্তি, ইতিহাসময় জগতের ওপর প্রকৃত অর্থে এক বিজয়-বার্তা, এক নতুন সভ্যতার সূত্রপাত।

* * *

মননজাত অন্তঃসার ও ইতিহাসবাদী অথবা বস্তুবাদী অন্তঃসার

এই রকম বলা হয় যে, কর্মকাণ্ডের দর্শনের জন্ম হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সাংস্কৃতিক বিকাশের একেবারে তুঙ্গ মুহূর্তে, এই সংস্কৃতির প্রতিভূ ছিল ধ্রুপদী জর্মন দর্শন, ইংরেজ ধ্রুপদী অর্থনীতি এবং ফরাসি রাজনৈতিক রচনাবলি ও ক্রিয়াকর্ম। কর্মকাণ্ডের দর্শনের বিকাশের মূলে এই তিনটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। কিন্তু এই যে কথাটা বলা হয় একে কীভাবে বুঝব আমরা? এই অর্থে কি যে কর্মকাণ্ডের দর্শনের দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতির বিকাশে এই তিনটি ধারার আলাদা আলাদা অবদান রয়েছে? না কি কর্মকাণ্ডের দর্শন এই তিনটি আন্দোলনকেই নিজের মধ্যে সংশিলষ্ট করে নিয়েছে? অর্থাৎ, একটা যুগের গোটা সংস্কৃতিটাকেই, এবং এই নতুন সংশ্লেষের যে-কোনো মুহূর্তই আলোচনা করা যাক না কেন, তত্ত্বদর্শন, অর্থনীতি বা রাজনীতি, দেখা যাবে যে এর প্রত্যেকটার মধ্যেই ঐ তিন আন্দোলনের প্রত্যেকটাই একটা প্রস্তুতির 'মুহূর্ত' হিসেবে উপস্থিত রয়েছে? আমার কাছে মনে হয় কথাটা এভাবেই বোঝা উচিত। এবং আমার এটাও মনে হয় যে, ঐ সংশ্লেষের সেই একক 'মুহূর্ত'টিকে খুঁজে নিতে পারা দরকার অন্তঃসার-এর এই নতুন ধারণার মধ্যে—এবং অন্তঃসারের

এই ধারণা ধ্রুপদী জর্মন দর্শনের মননজাত রূপ থেকে ফরাসি রাজনীতি ও ইংরেজ ধ্রুপদী অর্থনীতির সাহায্যে রূপান্তরিত ইতিহাসবাদী এক রূপ।

জর্মন দার্শনিক ভাষা ও ফরাসি রাজনৈতিক ভাষার মধ্যে প্রভৃতি মিলের বিষয়ে মন্তব্যের জন্য ওপরের টীকা দ্রষ্টব্য। কিন্তু এ কথা আমার মনে হয় যে, জর্মন দর্শন, ফরাসি রাজনীতি ও ইংরেজ ধ্রুপদী অর্থনীতির সম্পর্ক নিয়ে একটা অত্যন্ত মূল্যবান ও সম্ভাবনাময় গবেষণার ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। এ কাজ এখনো খুব বেশি হয় নি। আমার মনে হয় কোনো এক অর্থে এও বলা যায় যে কর্মকাণ্ডের দর্শন সমান হেগেল+ডেভিড রিকার্ডো। শুরুতেই সমস্যাটা এইভাবে উপস্থিত করা দরকার : ধনবিজ্ঞানে রিকার্ডো যে-সব নতুন পদ্ধতিগত সূত্রের অবতারণা করেছেন সেগুলোকে কি কেবল সহায়ক হিসেবেই মূল্যবান মনে করতে হবে (অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, রূপবন্ধ যুক্তি-শাস্ত্রের কোনো নতুন অধ্যায় হিসেবে দেখতে হবে), না কি নতুন কোনো দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচক হিসেবে তাৎপর্য রয়েছে তাদের? 'প্রবণতার সূত্র' নামে রূপবন্ধ যুক্তিশাস্ত্রের এই তত্ত্বটির আবিষ্কারের জন্যই 'হোমো ইকনমিকুস' এবং 'নির্ধারিত বাজার' এই দুই ধারণার বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হল, এই আবিষ্কারের কি জ্ঞানতাত্ত্বিক মূল্যও ছিল না? এর মধ্যে কি নতুন অর্থে একটা অন্তঃসারের ধারণা কাজ করছে না, 'আবশ্যিকতা' ও 'স্বাধীনতা' ইত্যাদির নতুন ধারণা? আমার মতে কর্মকাণ্ডের দর্শনের প্রধান কৃতিত্বই হল এই ভাষাতে কথা বলা, এরই মধ্য দিয়ে রিকার্ডোর আবিষ্কার সর্বজনীন হয়ে উঠছে, সমগ্র ইতিহাসের দিকে তাকে উপযুক্তভাবে বিস্তৃত করা সম্ভব হচ্ছে আর এর থেকে খুব মৌলিক এক ধরনে বিশ্ব বিষয়ে নতুন একটা ধারণাও পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

গোটা এক গুচ্ছ প্রশ্ন আলোচনা করতে হবে :

১. রিকার্ডোর রূপবন্ধ বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলিকে বস্তুজগতের নিয়ম হিসেবে সাজাতে হবে।

২. এইসব রিকার্ডো সূত্রাবলির ঐতিহাসিক উৎসের দিকে তাকাতে হবে, ধনবিজ্ঞান বিষয়টির বিকাশও ঐ উৎসের সঙ্গে জড়িত, এরই সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে 'স্পষ্টত বিশ্বব্যাপী' এক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের এবং তারই অনুগামী বিশ্বময় বাজারের ব্যাপ্তির; ঐ বাজার তখনই তার বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে এতটাই 'ঘননিবদ্ধ' হয়ে গড়ে উঠেছিল যে নিত্য কোনো সূত্রের সন্ধানে বিভিন্ন অংশকে আর আলাদা করে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এ কথাটা বলা দরকার যে এইসব সূত্র কিন্তু কেবল প্রবণতার সূত্র, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সূত্রের অর্থে বা কল্পনাভিত্তিক নির্ধারণবাদের অর্থে নয়; এই সব সূত্রকে গ্রহণ করতে হবে এক 'ইতিহাসবাদী' অর্থে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত 'নির্ধারিত বাজার' বলে কিছু আছে, বা একটু অন্যভাবে বলতে গেলে, যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কোনো পরিবেশের অস্তিত্ব রয়েছে যা জৈব অর্থে সজীব এবং বিকাশের স্তরে স্তরে যা অন্তঃসম্পর্কিত ততক্ষণই ঐসব সূত্র গ্রাহ্য।

(এইসব প্রবণতার মধ্যে ঘটনাবলির পরিমাণগত প্রকাশ ঘটে এবং সেটাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় ; অর্থনীতি থেকে সাধারণ ইতিহাসের যাত্রাপথে পরিমাণের ধারণা গুণবাচক ধারণার মধ্যে গৃহীত হয়ে যায় এবং গৃহীত হয় সেই দ্বান্দ্বিকতার মধ্যেও যেখানে পরিমাণ গুণে পরিণত হয় ; পরিমাণ= আবশ্যিকতা ; গুণবাচকতা=স্বাধীনতা। পরিমাণ-গুণের দ্বান্দ্বিকতা হল বস্তুত আবশ্যিকতা-স্বাধীনতার দ্বান্দ্বিকতার সমার্থক) ;

৩. রিকার্ডোর সঙ্গে হেগেলের এবং রোবস্পীয়র-এর সম্পর্কস্থাপন করতে হবে।

৪. বিবেচনা করতে হবে কীভাবে কর্মকাণ্ডের দর্শন ঐ তিন সজীব ধারার এক সংশ্লেষ থেকে অন্তঃসারের এমন এক নতুন ধারণায় এসে পৌঁছতে পেরেছে যার থেকে লোকোত্তরতা ও ধার্মিকতা সম্পূর্ণভাবে অপসৃত।

(১) যে-ধারণাগুলিকে খুব গভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার তার পরম্পরা : এম্পিরিকাল-বাস্তববাদী ইতিহাসবাদ—কল্পনাভিত্তিক দর্শন।

(২) উপরে যে গবেষণার কথা বলা হল তার পাশাপাশি আর একটা দিকেও নজর দেওয়া দরকার—কর্মকাণ্ডের দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রিকার্ডোর দিকে যেভাবে দেখা হয়েছে এবং ক্রোচে ও জেনতীলে-এর মধ্যে আধুনিক ইতালির ভাববাদী দর্শনের ধারায় যেভাবে ধ্রুপদী জর্মন দর্শনের ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে তার দিকেও বা কর্মকাণ্ডের দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি কী তা বিচার করা দরকার। ধ্রুপদী জর্মন দর্শনের উত্তরাধিকার বিষয়ে এঙ্গেলস-এর বক্তব্যটাকেই বা আমরা কীভাবে বুঝব ? এটাকে কি এভাবে বুঝব যে একটা যেন ঐতিহাসিক বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে, যার মধ্যে হেগেলীয় তত্ত্বের মূল অংশ নিশ্চিতভাবে পুরোপুরি গৃহীত হয়ে গেছে ? না কি এটা একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যা এখনো গতিময় এবং যার মধ্যে দার্শনিক সাংস্কৃতিক সংশ্লেষের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ নতুন করে দেখা দিচ্ছে ? আমার কাছে দ্বিতীয় উত্তরটাই মনে হয় ঠিক। বাস্তবে কিন্তু বস্তুবাদ ও ভাববাদের বৈপরীত্য বিষয়ে অন্যোন্যক একমুখী যে-অবস্থানের সমালোচনা করা হয়েছে ফয়ারবাখের ওপর প্রথম বক্তব্যে তারই পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে, এবং তখনকার মতো এখনও কর্মকাণ্ডের দর্শনের এক উচ্চতর স্তরে সংশ্লেষের প্রয়োজন রয়েছে, হয়তো ইতিহাসের আরো এক অগ্রবর্তী মুহূর্তে।

মার্কসবাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার ঐক্য

মানুষ ও বস্তুর বৈপরীত্যের দ্বান্দ্বিক বিকাশের মধ্য দিয়েই ঐক্য সাধিত হয় (প্রকৃতি—উৎপাদনের বস্তুগত শক্তিসমূহ)। অর্থনীতিতে একান্ত কেন্দ্র হল মূল্য, ওরফে শ্রমিক ও শিল্পের উৎপাদনী শক্তির মধ্যেকার সম্পর্ক (যাঁরা এ তত্ত্ব অস্বীকার করেন তাঁরা আকাঁড়া মোটা দাগের বস্তুবাদের ফাঁদে পড়েন, তাঁরা মনে করেন যন্ত্রপাতি নিজে নিজেই বুঝি মূল্য উৎপাদন করে, যে-সব মানুষেরা যন্ত্রপাতিগুলোকে চালনা করে তাদের নিরপেক্ষভাবে

ধ্রুব ও কারিগরি অর্থে মূলধন হিসেবে যন্ত্রপাতিই বুঝি যথেষ্ট)। দর্শনে —কর্মকাণ্ড—ব্যাপারটা হল মানুষের ইচ্ছাশক্তি (উপরিকাঠামো) ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেকার সম্পর্ক। রাজনীতিতে—ব্যাপারটা হল রাষ্ট্র ও জনসমাজের মধ্যেকার সম্পর্ক—অর্থাৎ কিনা রাষ্ট্রের (কেন্দ্রীয় ইচ্ছাশক্তির) তরফে হস্তক্ষেপ, শিক্ষককে শিক্ষিত করবার জন্য, এবং সাধারণভাবে সামাজিক পরিবেশে। (প্রশ্নটাকে আরো একটু খুঁটিয়ে এবং পরিষ্কার করে বিবেচনা করা দরকার।)

দর্শন—রাজনীতি—অর্থনীতি

এই তিন ধরনের কাজই যদি একই বিশ্ববোধের প্রয়োজনীয় অঙ্গ হয়, তাহলে অবশ্যই তাদের তত্ত্বসূত্রের মধ্যে একটা থেকে আর একটাতে যাবার সম্ভাব্যতা থাকবে এবং প্রত্যেকটি অঙ্গের নিজস্ব নির্দিষ্ট ভাষায় পারস্পরিক অনুবাদযোগ্যতাও থাকা দরকার। যে কোনো একটা অন্যটার মধ্যে নিহিত এবং সব কিছু মিলে একত্রে একটি সমমাত্রিক বৃত্তের চেহারা ধারণ করে। (বৈজ্ঞানিক ভাষার ক্ষেত্রে পারস্পরিক অনুবাদসম্ভাব্যতার বিষয়ে ওপরের টীকা দ্রষ্টব্য।) [১১ নং এবং অংশত ১০ নং নোটবইয়ের অন্তর্গত **ব্রাদুচীবিলিতা দেই লিংগুয়াদ্জি শিয়েন্তিফিচি এ ফিলোসফিচি** এই শিরোনামের অংশটির উল্লেখ করছেন এখানে গ্রামশি। স.]

এই সব বক্তব্য থেকে (আরো বিশদ করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে অবশ্য) সংস্কৃতি ও চিন্তার ঐতিহাসিকের জন্য একটা জরুরি কর্মসূচি ও খুব গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনার মান প্রণয়ন করা সম্ভব। খুব বড় মাপের কোনো ব্যক্তিত্ব তাঁর সবচেয়ে সবীজ চিন্তার প্রকাশ ঘটাবেন এমন কোনো একটা অংশে যেটা মনে হবে খুব যুক্তিসংগত তা নাও হতে পারে, অন্তত বাইরের দিককার কোনো কোনো শ্রেণীবিন্যাস থেকে এরকম মনে হতেই পারে; তাঁর ঐ চিন্তার প্রকাশ ঘটতে পারে অন্য কোনো অংশে, যেটাকে মনে হবে হয়তো বহিরঙ্গ। রাজনীতির কোনো মানুষ দর্শন বিষয়ে লিখছেন : এমন হতে পারে যে তাঁর 'প্রকৃত' দর্শনকে খুঁজে নিতে হবে তাঁর রাজনৈতিক রচনাবলির মধ্যেই। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে তাঁর কাজকর্মের একটা দিক থাকে যেটা সর্বপ্রধান : এই অংশের মধ্যেই তাঁর চিন্তাকে খুঁজে নিতে হয়; এই চিন্তা অনেক সময়ে খুবই সংগোপনে থাকে, এমনকী কখনো কখনো এমনভাবে থাকে যে মনে হবে বুঝি তাঁর স্পষ্ট প্রকাশিত চিন্তাধারার সঙ্গে তা কিছুটা অসংগতিপূর্ণ। এ কথা অবশ্য মানতে হবে যে ঐতিহাসিক বিচারের এই মানদণ্ডের মধ্যে বেশ খানিকটা বিপদের সম্ভাবনা রয়ে গেল, বিশেষত পল্লবগ্রাহিতার, আর সেই কারণেই এই মান প্রয়োগের বেলায় খুব সাবধান থাকতে হবে, কিন্তু তাই বলে এর থেকে সত্যে উপনীত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই সে কথাও ঠিক না।

বাস্তবে অবশ্য সখের 'দার্শনিক' হয়তো বড়জোর কষ্টেসৃষ্টে তাঁর

সময়কার প্রধান প্রধান ঘটনাপ্রবাহ থেকে এবং জগৎ বিষয়ে কোনো এক ধরনের ধারণার ব্যাখ্যা যা কিছুটা গোঁড়ামির পর্যায়ে পেঁছে গেছে (ইত্যাদি), তার থেকে খানিকটা বিমূর্ত চিন্তা করতে পারেন। কিন্তু রাজনীতির বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর কালের ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর এইসব কল্প আদর্শের থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন। ঐ সব ধারণাকে তিনি অনেক বেশি প্রত্যক্ষ হিসেবে দেখতে পারেন এবং অনেক বেশি মৌলিকভাবেও। ধারণাগুলোর একেবারে ভিতরে প্রবেশ করে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব এবং এমনি করে তিনি ধারণাগুলোকে অনেক জরুরিভাবে বিশদ করে তুলতে পারেন। এখানেও [রোজা] লুক্সেমবুর্গের এই চিন্তাটা খুব প্রয়োজনীয় এবং এর ইঙ্গিতটা তাৎপর্যপূর্ণ: তিনি লিখছেন যে কর্মকাণ্ডের দর্শনের কিছু কিছু প্রশ্ন আলোচনা করাই অসম্ভব যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা সাধারণভাবে ইতিহাসের গতিপ্রবাহে কোনো বাস্তব রূপ পাচ্ছে বা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যেও তাদের দেখা মিলছে। যৌথ-আর্থনীতিক পর্ব, জনসমাজে আধিপত্যের জন্য লড়াইয়ের পর্ব এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পর্ব—এই তিন পর্বেই থাকে আনুষঙ্গিক নির্দিষ্ট বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপ। এবং এইসব ক্রিয়াকলাপ কিন্তু ইচ্ছামতো বানিয়ে তোলা যায় না বা আগেভাগে তাক করাও যায় না। আধিপত্যের লড়াইয়ের পর্বে বিকাশলাভ করে রাজনীতির বিজ্ঞান; রাষ্ট্রীয় পর্বে উপরিকাঠামোর সব কিছুরই বিকাশ সাধন করতে হয়, যদি না রাষ্ট্রের অবলুপ্তির বিপদটাকেই ডেকে আনতে চায় কেউ।

কর্মকাণ্ডের দর্শনের ইতিহাসবাদিতা

কর্মকাণ্ডের দর্শন যে নিজেকে ইতিহাসবাদী দৃষ্টিতে দেখে, অর্থাৎ দার্শনিক চিন্তার এক পরিবর্তমান স্তর হিসেবে, সেটা শুধুমাত্র সমগ্র চিন্তা-তন্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে তাই নয়, এই সুপরিচিত বক্তব্যের মধ্যেও সেটা যথেষ্ট পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত: ঐতিহাসিক বিকাশ কোনো একটা মুহূর্তে আবশ্যিকতার শাসন থেকে স্বাধীনতার শাসনে স্তরান্তরিত হবার লক্ষণ-সমূহে চিহ্নিত হবে। এ পর্যন্ত যত দর্শনের (দার্শনিক তন্ত্রসমূহের) সাক্ষাৎ মেলে তাদের সবই কিন্তু সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বসমূহের ক্ষত-চিহ্নলাঞ্ছিত প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু নয়। কিন্তু কোনো একটি দার্শনিক তন্ত্রের নিজস্ব বিচারের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাবে না যে তার মধ্যে এই দ্বন্দ্বের সচেতন প্রকাশ ঘটেছে, কারণ এই প্রকাশটাকে বুঝতে গেলে বিভিন্ন তন্ত্রগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে তাদের নিজেদের অন্তর্বিরোধের পটভূমিতে দেখতে হবে। প্রত্যেক দার্শনিকই মনে করেন যে তিনি মানবিক সত্তার ঐক্যেরই প্রকাশ ঘটাচ্ছেন, বস্তুত এর অন্যথা তাঁর পক্ষে সম্ভব না; ঐ মানবিক সত্তার ঐক্য বলতে বোঝায় ইতিহাস ও প্রকৃতির ঐক্য। বস্তুত, এরকম কোনো বিশ্বাস যদি না থাকত, তাহলে মানুষ কিন্তু কর্মকাণ্ডে

লিপ্ত হতে পারত না, তারা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতেও পারত না; দার্শনিক তন্ত্রসমূহ তখন মতাদর্শের রূপ পরিগ্রহ করত না এবং 'জনপ্রিয় বিশ্বাসের' গ্রানাইট দৃঢ় ভূমিতেও রূপান্তরিত হতে পারত না; ঐ জনপ্রিয় বিশ্বাসই কিন্তু 'বস্তুগত শক্তি'-র তুল্য শক্তিধর হয়ে ওঠে।

দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে হেগেল একাই এক স্বতন্ত্র অধ্যায়, কারণ তাঁর দার্শনিক তন্ত্রে, কোনো না কোনোভাবে, এমনকী হয়তো এক ধরনের 'দার্শনিক রোমান্স' হিসেবেই বাস্তব কী এ সম্বন্ধে কিছু একটা ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, একটাই তন্ত্রের মধ্যে এবং একজন দার্শনিকের মধ্যেই দ্বন্দ্বের সেই সচেতনতা পাওয়া সম্ভব যা আগে পেতে হত বিভিন্ন তন্ত্রের একটা সমাবেশ থেকে এবং বিবাদ-বিতর্ক ও দার্শনিকদের পরস্পর বিরোধিতার মধ্যে।

কোনো একটা অর্থে কিন্তু কর্মকাণ্ডের দর্শন হেগেলীয় তত্ত্বের বিকাশ ও সংস্কারসাধন; এটা এমন এক দর্শন যা এককাট্টা উগ্র মতাদর্শগত উপাদানের থেকে মুক্ত (অথবা নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টায় রত); এ দর্শন এমন এক চৈতন্য যার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি বর্তমান, যেখানে একক ব্যক্তিমানুষ হিসেবে এবং এক সম্পূর্ণ সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে দার্শনিক নিজেই শুধু এই অসঙ্গতিগুলোকে যে অনুধাবন করেন তাই নয়, নিজেকেই এই অসঙ্গতির অন্যতম এক উপাদান হিসেবে তিনি উপস্থাপিত করেন এবং ঐ প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব-অসঙ্গতির এই উপাদানটিকে জ্ঞানের ও সে কারণে কর্মের এক সূত্রে উত্তরণ ঘটিযে তোলেন। 'সাধারণভাবে মানুষ', এই ধারণাটি যে ভাবেই উপস্থাপিত হোক না কেন, সেটা নাকচ হল এবং 'সাধারণভাবে মানুষ' অথবা প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত 'মনুষ্য-প্রকৃতি'-র প্রকাশ হিসেবে চিহ্নিত যে-কোনো 'এককেন্দ্রিক' ধারণাকে নির্বাসিত ও বিনষ্ট করা হল।

কিন্তু এমনকী কর্মকাণ্ডের দর্শনও ঐতিহাসিক অসঙ্গতির এক প্রকাশ, বস্তুত সবচেয়ে সচেতন বলেই এসব অসঙ্গতির সর্বোত্তম সম্পূর্ণ প্রকাশ। এর মানে দাঁড়াল যে, এই দর্শনও কিন্তু 'আবশ্যিকতায়' আবদ্ধ, ঠিক স্বাধীন নয়, এবং সে স্বাধীনতার অস্তিত্বও তো নেই, এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে সে অস্তিত্ব এখন সম্ভবও নয়। অতএব, ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে ঐসব দ্বন্দ্ব-অসঙ্গতির অস্তিত্ব যদি লোপ পায় তাহলে অন্তত নিহিতার্থে এটা প্রতিষ্ঠা করা গেল যে কর্মকাণ্ডের দর্শনও অনস্তিত্ব হয়ে যাবে, অথবা অবান্তর হয়ে উঠবে। 'স্বাধীনতা'র জমানায় দ্বন্দ্ব-অসঙ্গতি ও সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার ভূমিতে তো আর চিন্তা ও ধারণার জন্ম সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে দার্শনিক—কর্মকাণ্ডের দার্শনিক—কিছুটা মোটা দাগে এটুকুই মাত্র বলতে পারেন, তার বেশি তো নয়; বর্তমানের দ্বন্দ্ব-অসঙ্গতির এই ক্ষেত্র থেকে তাঁর মুক্তি নেই; ঐ কিছুটা মোটা দাগে ছাড়া তাঁর পক্ষে দ্বন্দ্ব-অসঙ্গতিবিহীন কোনো দুনিয়ার কথা বলা সম্ভব নয়, তা বলতে গেলেই তাঁকে এক কল্পজগৎ গড়ে তুলতে হবে।

এ কথা বলার উদ্দেশ্য অবশ্য এই নয় যে কল্পজগতের কোনো দার্শনিক মূল্য নেই, কারণ কল্পজগতের রাজনৈতিক মূল্য তো আছে এবং প্রত্যেক রাজনীতিই নিহিতার্থে দর্শন, হয়তো খুব ছাড়া ছাড়া, খানিকটা অসংলগ্ন-ভাবে। এই অর্থে ধর্মের চেয়ে বড় কল্পজগতের, অর্থাৎ এত বড় এক 'অধিবিদ্যা'-র সন্ধান ইতিহাসে আর জানা নেই। কারণ ধর্মই হল ঐতিহাসিক জীবনের প্রকৃত দ্বন্দ্ব-অসঙ্গতিগুলোকে কোনোমতে সুসমঞ্জস করে তোলার জন্য পৌরাণিক আঙ্গিকে এক সমারোহময় প্রচেষ্টা। ধর্ম বলে যে, গোটা মনুষ্যজাতিরই 'প্রকৃতি' এক ; সাধারণভাবে মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব, কারণ মানুষ তো ঈশ্বরেরই সৃষ্টি, ঈশ্বরের সন্তান, অতএব মানুষ প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভাই, অন্য মানুষের সঙ্গে সবাই সমান, এবং মানুষে মানুষে সবাই স্বাধীন ; এবং মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিফলিত এমনিভাবেই চিনতে পারে ; ঈশ্বর তো সমগ্র মানবজাতির 'আত্মসচেতনতা' ; কিন্তু ধর্ম একথাও বলে যে এসব কোনো কিছুই এই জগতের নয়, অন্য কোনো জগতের (কল্পজগতের)। এভাবেই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ধারণা মানুষের মনে উপ্ত হতে থাকে, বিশেষ করে সেইসব স্তরের মানুষের মধ্যে যারা নিজেদের অন্য মানুষের সঙ্গে সমান বলেও দেখতে পায় না বা ভাই বলেও ভাবতে পারে না, বা এমনকী অন্যদের তুলনায় নিজেদের স্বাধীন বলেও মনে হয় না। এই কারণে জনগণের প্রত্যেকটি বিপ্লবী আলোড়নের মধ্যেই কোনো না কোনোভাবে, বিশেষ বিশেষ ধরনে বা বিশেষ মতাদর্শে এই দাবিগুলো সব সময়ে উত্থাপিত হয়েই থাকে।

এই জায়গায় ভিলিচ [লেনিন] প্রস্তাবিত একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯১৭-র এপ্রিল কর্মসূচির যে-অংশে একমুখী বিদ্যালয়ের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষত ঐ অংশের এক টীকায় (১৯১৮-র জেনিভা সংস্করণ দ্রষ্টব্য), সেখানে রসায়নবিদ ও শিক্ষাবিদ লাভোয়াজিয়র-এর কথা বলা হয়েছে। এই লাভোয়াজিয়রকে ত্রাসের সময়ে গিলোটিনে দেওয়া হয়েছিল ; একমুখী বিদ্যালয়ের ধারণা এঁরই প্রস্তাব, উনি ঐ সময়ের মতিগতি বুঝেই ঐ প্রস্তাব এনেছিলেন—ঐ যুগটা তো ছিল এমন যে ১৭৮৯-এর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে এক বিকাশমান বাস্তবের সন্ধান সম্ভব হয়েছিল, শুধু সরকার গড়ার কোনো মতাদর্শমাত্র নয় ; ঐ কালটা এইসব সাম্যবাদী পন্থা থেকে প্রেরণা নিয়েছিল। লাভোয়াজিয়র-এর কাছে এটা তখনো কল্পজগতেরই একটা উপাদান ছিল (যে-সমস্ত সাংস্কৃতিক স্রোতোধারাতে মনুষ্য 'প্রকৃতি'-র একত্বকে মেনে নেওয়া হয় তার সব ধারাতেই এই উপাদান ফিরে ফিরে আসে) ; ভিলিচ-এর কাছে এটা ছিল অবশ্য এক রাজনৈতিক সূত্রেরই তত্ত্ব-ব্যাখ্যার দিক থেকে তাৎপর্যময়।

কর্মকাণ্ডের দর্শনের তত্ত্ববক্তব্য যদি এই হয় যে প্রত্যেক শাশ্বত ও পরম বলে প্রতীয়মান 'সত্য'-এর বাস্তব ভিত্তি আছে এবং এদের প্রত্যেকের মূল্যও 'সাময়িক' (জগৎ ও জীবনের প্রত্যেক ধারণার ঐতিহাসিকতা), তাহলেও

মানুষকে এটা 'হাতেনাতে' বোঝানো খুব শক্ত যে কর্মকাণ্ডের দর্শনের নিজের ক্ষেত্রেও এরকম ব্যাখ্যা সম্ভব, অন্তত কর্মব্যাপারে লিপ্ত হতে গেলে যে ধরনের দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রয়োজন তাতে ঘা দিয়ে এরকম ব্যাখ্যা দাঁড় করানো খুব শক্ত। উপরন্তু এটা এমন এক সমস্যা যা প্রত্যেক ইতিহাসবাদী দর্শনের ক্ষেত্রেই বারে বারে দেখা দেবে ; শস্তা তর্কে বাজিমাৎ করেন যাঁরা তাঁরা এর সুযোগ নেবেন (বিশেষত ক্যাথলিকরা) ; এতে করে একই ব্যক্তির মধ্যে অবস্থিত 'বৈজ্ঞানিক' ও 'বক্তৃতাবাজ', দার্শনিক ও কর্মী পুরুষের বৈপরীত্য দেখাবার সুযোগ পেতে পারেন তাঁরা, এবং এ থেকে এরকম সিদ্ধান্তেও পেঁছে যেতে পারেন যে ইতিহাসবাদ অতি অবশ্যই আমাদের ঠেলে দেয় এক ধরনের নৈতিক সন্দেহবাদিতায় ও অবক্ষয়ে। এই সমস্যা থেকে অনেক ক্ষুদ্র ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয় নানা রকমের বিবেকনাট্য আর মহাপুরুষদের মধ্যে পাওয়া যায় ভোল্‌ফ্‌গাং গ্যোয়টের ধরনে এক রকমের 'অলিম্পীয়' মানসিকতা। এই কারণেই আবশ্যিকতার জমানা থেকে স্বাধীনতার জমানায় উত্তরণের প্রস্তাবটা খুব নিবিড় সূক্ষ্মতায় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার।

এর ফলে এমনকী কর্মকাণ্ডের দর্শনও মতাদর্শ শব্দটার এক জঘন্যতম অর্থে মতাদর্শই হয়ে উঠতে চায়, অর্থাৎ যেন শাশ্বত ও পরম সত্যের এক জবর তন্ত্র। একথাটা বিশেষভাবে সত্য 'সমাজতত্ত্বের সহজপাঠ'-এর ক্ষেত্রে, যেখানে আকাঁড়া জড়বাদের সঙ্গে এটাকে গুলিয়ে ফেলা হয়, তার 'বস্তু'-র ধারণার অধিবিদ্যার সঙ্গে যখন এটাকে মিশিয়ে ফেলা হয়, ঐ ধারণা তো শাশ্বত ও পরম বটেই।

এ কথাটাও বলা প্রয়োজন যে আবশ্যিকতা থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণ ঘটে মানুষেরই সমাজের মধ্য দিয়ে, প্রকৃতির মধ্য দিয়ে নয় (যদিও প্রকৃতি বিষয়ে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি বা আমাদের বৈজ্ঞানিক মতামতের ওপর এর প্রভাব থাকতেই পারে)। এমনও বলা যেতে পারে যে কর্মকাণ্ডের দর্শনের সমস্ত তন্ত্রটাই হয়তো কোনো এক সংহত দুনিয়ায় অবান্তর হয়ে গেল, এবং তখনও বহু ভাববাদী ধারণা, বা তাদের কোনো কোনো অংশ যা আবশ্যিক-তার জমানায় ছিল কল্পচারিত্রের, হয়তো 'সত্য' হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তা ঐ উত্তরণের পরে। সমাজ যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত তখন শুধুমাত্র একটা 'মেজাজ'-এর কথা বললে চলবে না, তাহলে তার মানে দাঁড়াবে শুধু সমাজমনস্কতা। (এ তথ্যের প্রকৃত অর্থে স্বীকৃতি রয়েছে আধুনিকতার* ওপর জেনতীল্-এর বইতে যেখানে শোপেনহাউয়ার-এর অনুসরণে তিনি বলেন যে ধর্ম হল জনগণের দর্শন, আর দর্শন হল সামান্য কয়েক জনের, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের ধর্ম।) কিন্তু এ রকমভাবে কথা বলা তখনই সম্ভব যখন সংহতি স্বপ্রতিষ্ঠ (ইত্যাদি)।

* জি. জেনতীল—**ইল্ মোদেরনিজ্‌মো এ ই রাপোরতি ত্রা রেলিজিওনে এ ফিলোসোফিয়া**, বারি, লাতেরজা, ১৯০৯।

অর্থনীতি ও মতাদর্শ

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিহিত শর্ত হিসেবে এই যে দাবিটা করা হয় যে, রাজনীতি ও মতাদর্শের প্রত্যেক পরিবর্তনই কাঠামোর প্রত্যক্ষ প্রকাশ এবং তার ব্যাখ্যাও সেইমতো করা দরকার, এটাকে তত্ত্বগতভাবে এক আদিম বালখিল্যতার চিহ্ন হিসেবে প্রতিরোধ করা উচিত; বাস্তবেও নির্দিষ্ট সব রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের প্রণেতা মার্কসের সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এর মোকাবিলা করা দরকার। এ দিক থেকে সব চেয়ে জরুরি হল **অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার** এবং প্রাচ্য সমস্যার ওপর রচনাবলি, কিন্তু অন্যান্য লেখাও দেখা দরকার (**জর্মনিতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব, ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ** এবং অন্য গৌণ রচনাও)। এই সব রচনার বিশ্লেষণ করতে পারলে মার্কসের ঐতিহাসিক প্রয়োগপদ্ধতি এতে করে আরো ভালোভাবে অনুধাবন করা হবে, তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় যে সব তাত্ত্বিক বক্তব্য ছড়ানো ছিটোনো রয়েছে সেগুলোকে একত্রিত করে ব্যাখ্যা করে আরো পরিষ্কার ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে। এতে করে মার্কস তাঁর নির্দিষ্ট গবেষণার মধ্যে কীরকম সব সাবধানতা অবলম্বন করার কথা ভেবেছিলেন তাও বুঝতে পারা যাবে; এই সব সাবধানতার কথা কিন্তু তাঁর সাধারণ রচনাবলিতে আসতে পারত না। (এ সব কথা থাকতে পারত বের্নহাইম-এর মতো কারুর রচনায়, তার খুব সুশৃঙ্খল ও প্রণালীবদ্ধ ব্যাখ্যার মধ্যে; বের্নহাইমের বইটাকে—**লের্‌বুখ ডের হিস্‌টরিশ্চেন্‌ মেথডে**—ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পণ্ডিতি অথবা 'জনপ্রিয় ম্যানুয়াল'-এর মডেল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে; এই বইটাতে ভাষাতাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যের পদ্ধতির প্রকাশ ছাড়াও ইতিহাসের মার্কসীয় ধারণার স্পষ্ট আলোচনা পাওয়া সম্ভব; ঐ পদ্ধতিটাকে যদিও বের্নহাইম নীতি হিসেবে নিশ্চিতভাবে আঁকড়ে থাকেন, তবুও ঐ বইয়ের মধ্যে এক নিহিত বিশ্ববীক্ষার পরিচয়ও আছে)। ঐ সাবধানতার প্রসঙ্গে নিচের উদাহরণগুলোর কথা বলা যেতে পারে:

১. যে-কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে (ক্ষণমুহূর্তের ফটোগ্রাফের ছবির মতো) কাঠামোটাকে স্পষ্ট করে চিনে নেবার অসুবিধা। যে-কোনো নির্দিষ্ট সময়ের রাজনীতি বস্তুত কাঠামোর মধ্যেকার বিবিধ বিকাশমান ঝোঁকের প্রতিফলন; যদিও এমন কোনো কথা নেই যে ঝোঁকগুলো সব বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করবেই। কাঠামোর কোনো একটা পর্বকে নির্দিষ্টভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা তখনই সম্ভব যখন সমস্ত স্তর-পরম্পরার মধ্য দিয়ে কাঠামোর বিকাশ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, তার আগে নয়; প্রক্রিয়া চলাকালীন এ রকম বিশ্লেষণ করতে গেলে তা করতে হবে কাল্পনিকভাবে এবং সে ক্ষেত্রে ব্যাপারটা যে কাল্পনিক তাও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে রাখতে হবে।

২. এর থেকে এরকম সিদ্ধান্তেও আসা সম্ভব যে, কোনো একটা বিশেষ রাজনৈতিক ক্রিয়া হয়তো অগ্রগণ্য শ্রেণীসমূহের নেতৃত্বের হিসেবের ভুল; এবং এ ভুলটা হয়তো এমন যে সেটা ঐ অগ্রগণ্য শ্রেণীসমূহের সংসদীয়

ও সরকারি স্তরের 'সংকট'-এর মধ্য দিয়ে শুধরে নিয়ে ইতিহাসের বিকাশের পথে তাকে উৎরে যাওয়া সম্ভব হবে। যান্ত্রিক ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মধ্যে ভুলের কোনো অবকাশ নেই ; এই চিন্তা অনুসারে প্রত্যেক রাজনৈতিক ক্রিয়া সরাসরি কাঠামো দিয়ে নির্ধারিত এবং সেই অর্থে প্রকৃত ও স্থায়ীভাবে কাঠামোর রূপান্তর। 'ভুল'-এর সূত্রটা বেশ জটিল ; কখনো কখনো আমরা হয়তো ভুল হিসাব নির্ভর ব্যক্তিগত মানসিক প্রবণতার কথা ভাবছি অথবা এমনও হতে পারে যে অগ্রগণ্য শ্রেণীর মধ্যেই কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা অংশ আধিপত্যমূলক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল এবং সে চেষ্টায় তারা হয়তো অসফল।

৩. এ কথাটা যথেষ্ট পরিষ্কার করে মনে রাখা হয় না যে অনেক রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মই অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক প্রয়োজনের দ্বারা নির্ধারিত ; অর্থাৎ, দল বা গোষ্ঠী বা সমাজের সংহতি রক্ষার প্রয়োজনে অনেক সময়ে ঐ সব কাজকর্মের দরকার পড়ে। ক্যাথলিক ধর্মসংঘের ইতিহাস থেকে এর পরিষ্কার উদাহরণ মিলবে। ধর্মসংঘের ভিতরের প্রত্যেকটি মতাদর্শগত সংগ্রামের জন্য যদি প্রত্যক্ষ কাঠামোগত এক প্রাথমিক ব্যাখ্যা সব সময়ে খুঁজতে হয় তাহলে কিন্তু হিসেবের গরমিল হবেই : এই কারণেই যত সব আজগুবি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক রোম্যান্স লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, এ কথা স্পষ্ট যে এই সব আলোচনার বেশির ভাগই সাংগঠনিক প্রয়োজন ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সঙ্গে জড়িত। 'পবিত্র আত্মার পুরোযাত্রা' বিষয়ে রোম ও বাইজানতিয়ুম-এর আলোচনার মধ্যে ইয়োরোপীয় প্রাচ্যের যুক্তি যে, এই যাত্রা পিতা থেকে শুরু এবং প্রতীচীর যুক্তি যে, এই যাত্রা পিতা ও পুত্রের থেকে শুরু—এর ব্যাখ্যা কাঠামোর মধ্যে খুঁজতে যাওয়া হবে হাস্যকর। এই দুই ধর্মসংঘ, যাদের অস্তিত্ব ও সংঘাত কাঠামোর ওপর এবং সমস্ত ইতিহাসের ওপর নির্ভরশীল, তাদের প্রশ্নগুলো এমনভাবে তুলেছিল যেন কোনো মতে একটা পার্থক্য বজায় রাখা যায় এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ অভ্যন্তরীণ সংহতিও বিনষ্ট না হয়, কিন্তু এ-পক্ষের যুক্তি ও-পক্ষের যুক্তিও হতে পারত এবং এ কথা দুই ধর্মসংঘের জন্যই প্রযোজ্য। তফাত ও সংঘাতের সূত্র তাতেও বজায় থাকত এবং তফাত ও সংঘাতের এই সমস্যাই ঐতিহাসিক সমস্যা, কোন পক্ষ থেকে কোন ধ্বজা ওড়ানো হল তাতে কিছু এসে যায় না।

টীকা ২

খ্রিস্টীয় সময়কালের গোড়ার দিকে ঠিক এই বিতর্কগুলোর কথা বলতে গিয়ে **প্রয়োম দেল লাভোরো**-র অন্তর্গত মতাদর্শগত ধারাবাহিক কাহিনীগুলোর লেখক (তিনি অবশ্য কুখ্যাত ফ্রানৎস্ হ্যাইস ছাড়া আর কেউ নন) তাঁর **রুশী ডাঁই ও তার তাৎপর্য** নামের প্রহসনধর্মী রূপকথায় বলেন যে, এ সবই প্রত্যেক কালের বস্তুগত অবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, এবং আমরা যদি এই প্রত্যক্ষ সংযোগগুলোকে ঠিকমতো শনাক্ত না করে উঠতে

পারি, তাহলে বুঝতে হবে যে তথ্যগুলো আমাদের থেকে বড় বেশি দূরের, নতুবা আমাদের মননে অন্য কোনো দুর্বলতা রয়েছে। এ অবস্থাটা বেশ সুবিধাজনক, কিন্তু বিজ্ঞানের দিক থেকে তাৎপর্যহীন। বস্তুত, প্রত্যেক বাস্তব ঐতিহাসিক পর্যায় তার নিজস্ব কিছু চিহ্ন রেখে যায় পরবর্তী পর্যায়ে ; ঐ চিহ্নগুলোই পূর্ববর্তী ঐ পর্যায়ের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড দলিল হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক বিকাশের প্রক্রিয়াটা কালে এমনভাবে সংহত হয়ে ওঠে যে বর্তমানের মধ্যে অতীতের সবটুকু ধারণ করা থাকে এবং বর্তমানের মধ্যে অতীতের সেই অংশটুকু রূপ পরিগ্রহ করে যে-অংশটুকু 'আত্যন্তিক'—ঐ আত্যন্তিক অংশের মধ্যে প্রকৃত অন্তঃসারকে প্রকাশ করে এরকম 'অজ্ঞেয়' কোনো অংশের অবশেষ এখন আর নেই। যে-অংশটা হারিয়ে গেছে অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতে দ্বান্দ্বিকভাবে যেটা রূপান্তরিত হয় না, তার আর বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই ; এসব হল খানিকটা আলগাভাবে ফেনিয়ে ওঠা 'গাঁজলা', কাহিনীবিন্যাস মাত্র, ইতিহাস নয়, শেষ পর্যন্ত এসব হল বর্জনীয় ও অকিঞ্চিৎকর এক অধ্যায়।

নীতিবিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

আমার মতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নৈতিকতার ভিত্তি খুঁজতে হবে এই বক্তব্যের মধ্যে : 'যে সব সামাজিক সমস্যার সমাধানের অবস্থা ইতিমধ্যেই সমাজে সৃষ্টি হয় নি সমাজ কিন্তু সেসব সমস্যাগুলোকে ঠিক সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করে না।' যেখানে এইসব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে 'এই সব সমস্যার সমাধান "কর্তব্য"-এ **রূপান্তরিত** হয়, "ইচ্ছাশক্তি" **মুক্তি পায়**।' নৈতিকতার স্বরূপ তখন হয়ে দাঁড়ায় এমন এক উপযুক্ত অবস্থার অনুসন্ধান, যেখানে কোনো বিশেষ লক্ষ্য অভিমুখে পরিচালিত ইচ্ছাশক্তি তার মুক্তি পেতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে পারে যে ঐ উপযুক্ত অবস্থা বর্তমান। একথা যদি মেনে নেওয়া যায় যে যে-'নৈতিকতার' বিচার করা হচ্ছে তা কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, অনেক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এক গোটা সমাজের জন্য, তাহলে ঐ অভীষ্টগুলির উঁচুনিচু স্তরবিন্যস্ত হবারও কোনো প্রশ্ন নেই, যে সব অভীষ্ট লাভ করা সম্ভব হবে সেগুলিকে শুধু গুণগত মান হিসেবে ভাগ করে ফেলার প্রশ্ন এটা।

নিয়মিতি ও আবশ্যিকতা

কর্মকাণ্ডের দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কীভাবে ঐতিহাসিক বিকাশের বেলাতে নিয়মিতি ও আবশ্যিকতার ধারণায় পৌঁছতে পেরেছিলেন ? আমার মনে হয় না যে এটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে পাওয়া গিয়েছিল, বরঞ্চ মনে হয় রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ভূমিতে জাত কিছু ধারণার বিশদীকরণ হিসেবে একে পাওয়া গেছে, বিশেষত ধনবিজ্ঞান ডেভিড রিকার্ডোর কাছ থেকে যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল বা তার থেকে যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে থেকে। নির্ধারিত বাজারের ধারণা ও তথ্য : অর্থাৎ, এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে

নির্দিষ্ট চূড়ান্ত এবং স্থায়ী কিছু শক্তি ঐতিহাসিকভাবেই বিকাশলাভ করেছে এবং এইসব শক্তির কার্যকারণের মধ্যে এক ধরনের 'স্বয়ংক্রিয়তা' বর্তমান থাকে যার জন্য খানিকটা পরিমাণে 'ভবিষ্যদ্বাণী' সম্ভব হয় ; এবং সেইসব ব্যক্তিগত উদ্যম, যারা বৈজ্ঞানিকভাবে এইসব শক্তির স্বরূপ-প্রকৃতি আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তাদের বেলাতেও ভবিষ্যতের জন্য কিছুটা নিশ্চিতি সম্ভব হয়। 'নির্ধারিত বাজার' তাই 'উৎপাদন যন্ত্রের নির্ধারিত কাঠামোর মধ্যে সামাজিক শক্তিসমূহের নির্ধারিত সম্পর্ক'-এর সমার্থক, এই সম্পর্কটাকে নিশ্চিত করা হয় (অর্থাৎ, স্থায়ী করা হয়) এক নির্ধারিত রাজনৈতিক, নৈতিক ও আইনকানুনের উপরিকাঠামোর সাহায্যে। এই নিশ্চিত এবং স্থায়ী শক্তিসমূহের চরিত্র নির্ণয় ও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংক্রিয়তা প্রতিষ্ঠান্তে (অর্থাৎ, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ও অযৌক্তিক সরকারি হস্তক্ষেপের থেকে আপেক্ষিকভাবে তাদের মুক্ত থাকা), বিজ্ঞানী কোনো প্রকল্পপ্রকাশের চেষ্টাতেই ওই স্বয়ংক্রিয়তাকে একেবারে সর্বাঙ্গীণ করে তুলেছেন ; বাস্তবে ঘটনাবলি যেরকম বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্ব সহকারে নানা রকম সংযোগের মধ্যে মিলেমিশে থাকে তার মধ্যে থেকে তিনি নিতান্ত অর্থনৈতিক ঘটনাবলিকে আলাদা করে নিয়েছেন। তিনি কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন, স্বীকার্য ও সিদ্ধান্ত এই ন্যায়বিন্যাসের স্থাপনা করেছেন এবং এইভাবে তিনি এক নির্ধারিত অর্থনৈতিক সমাজের বিমূর্ত তন্ত্র নির্মাণ করেছেন। (এই বাস্তবসম্মত এবং প্রমূর্ত বৈজ্ঞানিক নির্মাণের উপরে পরবর্তীকালে 'মানুষ' এই শুদ্ধ সাধারণীকৃত বিমূর্ত এক নতুন ধারণা আরোপ করা হয়েছে ; 'ঐতিহাসিক' ও গড়পড়তা এই ধারণাকেই, এর বিমূর্ততা সমেত 'প্রকৃত' অর্থনৈতিক বিজ্ঞান হিসেবে দেখা হয়েছে।)

এই যে সব অবস্থার মধ্যে ধ্রুপদী অর্থনীতির জন্ম হয়েছিল সে কথা খেয়াল রেখে একটা নতুন বিজ্ঞানের বা ধনবিজ্ঞানের একটা নতুন উপপত্তি (একই কথা অবশ্য) বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে এটা দেখানো প্রয়োজন হবে যে নতুন শক্তি-সম্পর্কের, নতুন সব অবস্থার, নতুন প্রাক্-শর্তের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ; অর্থাৎ কিনা নতুন একটা বাজার 'নির্ধারিত' হয়েছে, তার নতুন 'স্বয়ংক্রিয়তা' এবং তার নিজস্ব স্বপ্রকাশ সমেত, এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলির স্বয়ংক্রিয়তার সঙ্গে তুলনীয় এমনি 'বস্তুগত' চেহারায় যেন সে নিজেকে জাহির করে। ধ্রুপদী অর্থনীতির থেকে 'রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির এক সমালোচন'-এর জন্ম হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আমার মনে হয় না যে এক নতুন বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক সমস্যাটার কোনো নতুন উপপত্তি এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির 'সমালোচন'-এর শুরুটা হল 'নির্ধারিত বাজার' এবং তার 'স্বয়ংক্রিয়তা'-র ধারণার ঐতিহাসিক চরিত্র বিষয়ে বোধ থেকে ; শুদ্ধ অর্থনীতিবিদরা এইসব উপাদানগুলোকে 'শাশ্বত' ও 'প্রাকৃতিক' বলে কল্পনা করেছিলেন। ঐ সমালোচন-এর মধ্যে যে সব শক্তি-সম্পর্ক বাজারকে নির্ধারণ করে তাদের বাস্তবসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করা হয়, তাদের মধ্যেকার

অন্তর্দ্বন্দ্ব খতিয়ে দেখা হয়, নতুন নতুন উপাদানের বিকাশ ও গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত রূপান্তরের সম্ভাবনাগুলোর মূল্যায়ন করা হয় এবং সমালোচিতব্য বিজ্ঞানের 'অস্থায়ী' ও 'পরিবর্তনী' চরিত্রটাকে তুলে ধরা হয়। এই সমালোচন-এ বিষয়টাকে যেমন জীবন হিসেবে দেখা হয় তেমনি মৃত্যু হিসেবেও, এবং এর অন্তরে সেই উপাদানগুলোকে খুঁজে বার করার চেষ্টা হয় যেগুলোর মধ্য দিয়ে ব্যবস্থাটা অপসারিত হবে এবং অব্যর্থভাবে দেখা দেবে তার বিকল্প, এই সমালোচন-এ সেই 'উত্তরসূরি'কেও চিনে নেবার চেষ্টা থাকে, এই উত্তরসূরিকেও তার জীবনীশক্তির স্পষ্ট প্রমাণ দিতে হবে (ইত্যাদি)।

এ কথা ঠিক যে আধুনিক অর্থনৈতিক জীবনে এই 'অনিয়মিত' উপাদানগুলোর গুরুত্ব আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তা সে ব্যক্তিগত স্তর, গোষ্ঠীগত বা রাষ্ট্রীয় স্তর যাই হোক না কেন; এইসব উপাদান প্রথাসিদ্ধ স্বয়ংক্রিয়তাকে খুব গভীরভাবে নাড়াও দিয়েছে: কিন্তু শুধু এইটুকু থেকেই বৈজ্ঞানিক সমস্যাবলির নতুন রকমের উপপত্তির পক্ষে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি দাঁড় করানো সম্ভব নয়, কারণ এই উপাদানগুলি অনিয়মিত বলেই তাদের মাত্রার রকমফের হয় এবং তাদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণীও সম্ভব হয় না। এ সবের জন্য এই বক্তব্য হয়তো সমর্থনযোগ্য যে অর্থনৈতিক জীবনের রূপান্তর ঘটে গেছে, 'সংকট' দেখা দিয়েছে, কিন্তু এসব তো অতি স্বাভাবিক কথা। তা ছাড়া, একথা তো বলা হচ্ছে না যে পুরনো 'স্বয়ংক্রিয়তা' নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; যেটুকু বলা হচ্ছে তা শুধু এই যে অনিয়মিত উপাদানগুলো আগের তুলনায় অনেক বৃহত্তর মাত্রায় ক্রিয়াশীল, বড় মাপের অর্থনৈতিক ঘটনাবলির স্তরে, যেটা নিয়মিত, আর বিশিষ্ট ঘটনা দু-চারটে যেন 'দলছুট'।

ঐতিহাসিক তথ্যের ক্ষেত্রে 'নিয়মিতি', 'সূত্র', 'স্বয়ংক্রিয়তা' বলতে কী বোঝায় সেটা ঠিকমতো প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এইসব আলোচনা থেকেই শুরু করতে হবে। 'নির্ধারণবাদ'-এর এক অধিবিদ্যাগত সূত্র 'আবিষ্কার'-এর প্রশ্ন নয় এটা, বা এমনকী কার্যকারণের এক 'সাধারণ' সূত্র প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারও নয়। প্রশ্নটা হল ঐতিহাসিক বিবর্তনের পথে তুলনায় স্থায়ী শক্তিগুলি কীভাবে গড়ে ওঠে এবং খানিকটা নিয়মিত ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে কীভাবেই বা তাদের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনকী সংখ্যাধিক্যের সূত্রকেও ঐতিহাসিক ঘটনাবলির 'সূত্র' হিসেবে গ্রহণ করা চলে না, যদিও ঐ সূত্রটা তুলনামূলক আলোচনার উদ্দেশ্যে হয়তো খুব প্রয়োজনীয়। কর্মকাণ্ডের দর্শনের ঐতিহাসিক উৎস বিচারের জন্য (কাজটা অবশ্য 'নিহিতার্থ'-এর ধারণার এক বিশেষ উপপত্তির চেয়ে কম জরুরি কিছু নয়), ডেভিড রিকার্ডো প্রবর্তিত অর্থনৈতিক সূত্রের উপপত্তি বিষয়ে অনুধাবন করা দরকার হবে। একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে কর্মকাণ্ডের দর্শনের মূল প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে রিকার্ডো গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র অর্থনীতির 'মূল্য' ধারণাটির

জন্যই নয়, তিনি 'দার্শনিক' দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ, ইতিহাস ও জীবনকে এক বিশেষ রকমভাবে চিন্তা করা ও অনুভব করার একটা পদ্ধতির কল্পনার জন্যও তিনি জরুরি। 'মনে করা যাক…'-এর পদ্ধতি, অর্থাৎ, একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পেঁছবার জন্য স্বীকার্য থেকে শুরু করার পদ্ধতিটাকে আমার মনে হয় কর্মকাণ্ডের দর্শনের প্রতিষ্ঠাতাদের দার্শনিক অভিজ্ঞতার প্রস্থানভূমি (অন্তত অন্যতম বৌদ্ধিক প্রেরণা) হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত। রিকার্ডোকে কখনো এদিক থেকে বিচার করা হয়েছে কিনা সেটা চিন্তা করে দেখা দরকার। ('সম্ভাবনা' এবং 'সূত্র' এই দুই দার্শনিক ধারণাকেও এই দিক থেকে বিচার করে দেখা দরকার: 'যুক্তিসিদ্ধতা' অথবা 'দৈবী'—এই ধারণা, যার মধ্য দিয়ে অতীন্দ্রিয়তাভিত্তিক দূরবীক্ষাতে পেঁছনো যায়; 'সম্ভাবনা'-র সেই ধারণাও, যা অধিবিদ্যাভিত্তিক বস্তুবাদের সূত্রে 'বিশ্বকে সম্ভাবনার হাতে ছেড়ে দেয়'।)

মনে হবে যে ইতিহাসে 'আবশ্যিকতা'-র ধারণা 'নিয়মিত' ও 'যুক্তি-সিদ্ধতা'-র ধারণার সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে জড়িত। 'বিমূর্ত'-কল্পনাময়' ও 'প্রমূর্ত'-ঐতিহাসিক' অর্থে 'আবশ্যিকতা'! আবশ্যিকতা তখনই সম্ভব যখন সক্ষম ও কার্যকর এক যুক্তিভিত্তির অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে, যখন এই যুক্তিভিত্তির অস্তিত্ব বিষয়ে চেতনা মানুষের মনে কাজ করছে, এর মধ্যে দিয়ে যৌথ চৈতন্যে স্পষ্ট লক্ষ্য প্রতিভাত হচ্ছে; এই চৈতন্যের মধ্যে আছে সংস্কার ও বিশ্বাসের এক জটিল বুনোট, 'জনপ্রিয় বিশ্বাস'-এর রূপে তার ক্ষমতাও সুদূরপ্রসারী। যৌথ ইচ্ছার প্রৈতি রূপায়িত হবার প্রয়োজনীয় ও যথোপ-যুক্ত বস্তুগত অবস্থা বিকশিত অথবা বিকাশমানভাবে ঐ যুক্তিভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা দরকার। কিন্তু এ কথাও পরিষ্কার যে এই 'বস্তুগত' যুক্তিভিত্তি, যা হয়তো সংখ্যায় পরিমাপ করা যায়, তা থেকে সংস্কৃতির এক নির্দিষ্ট স্তরকে আলাদা করা যায় না; সংস্কৃতির এই স্তর বলতে আমরা, বুঝি বৌদ্ধিক ক্রিয়াকর্মের এক জটিল বিন্যাস, এবং এ সবের ফল ও ফসল, সর্বগ্রাসী আবেগ ও অনুভূতির এক জটিল বুনোট; সর্বগ্রাসী বলতে বোঝাচ্ছে 'যে কোনো দমে'-এ মানুষকে কর্মমুখী করে তোলার এক ক্ষমতা।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই হল সেই 'যুক্তিসিদ্ধতা' যার মধ্য দিয়ে ইতিহাসে 'যুক্তিসিদ্ধতা'-র অতএব যুক্তিবিমুখতারও কোনো কল্পনাময়—বিমূর্ত ধারণা নয়, রীতিমতো ইতিহাসমুখী—এক ধারণা গড়ে উঠতে পারে।

'দৈব' এবং 'ভাগ্য' এইসব ধারণা, ইতালীয় ভাববাদী দার্শনিকরা, বিশেষত ক্রোচে যে অর্থে তাদের ব্যবহার করেন (কল্পনামুখীভাবে): জিয়ামবাতিস্তা ভিকো-র ওপর ক্রোচের বইটা দেখা দরকার, যে-বইতে 'দৈব'-এর ধারণাকে কল্পনামুখী দর্শনের ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং এরই মধ্যে ভিকো-র দর্শনের ভাববাদী ব্যাখ্যার সূত্রপাত দেখতে পাওয়া সম্ভব। মাকিয়াভেল্লির মধ্যে 'ভাগ্য' এই ধারণার অর্থের জন্য লুইজি

রুসসো-র রচনাবলি সন্ধান করা উচিত। রুসসো-র মতে 'ভাগ্য' শব্দটার দুটো অর্থ আছে ম্যাকিয়াভেল্লিতে—বস্তুগত ও আত্মগত। 'ভাগ্য' হল অবস্থাগতিকের প্রাকৃতিক শক্তি (অর্থাৎ, কার্যকারণ সম্পর্কের জাল), ঘটনা-বলির সম্ভাবনাভিত্তিক সমাহার, এটাই ভিকো-র রচনায় 'দৈব'। এটাই হতে পারে সেই অতীন্দ্রিয় শক্তি (অর্থাৎ, ঈশ্বর), যার পুরাণপ্রতিমা গড়া হয়েছে প্রাচীন-মধ্য যুগের তত্ত্বকথায়, কিন্তু ম্যাকিয়াভেল্লির কাছে এটা ব্যক্তির 'আত্মশক্তি' বই আর কিছু নয় এবং এ শক্তির উৎস হল মানুষের ইচ্ছাশক্তি। রুসসো-র ব্যাখ্যা অনুসারে ম্যাকিয়াভেল্লির 'আত্মশক্তি' কিন্তু আর স্কলাসটিকদের 'আত্মশক্তি' নয়, কারণ তার মধ্যে একটা নৈতিক মাত্রা ছিল এবং সে শক্তির উৎস ঐশ্বরিক; ম্যাকিয়াভেল্লির এই ধারণা লিভি-র ধারণা থেকেও পৃথক, সাধারণভাবে তার মানে ছিল সামরিক শৌর্য; বরঞ্চ এ হল রেনেসাঁস মানুষের 'আত্মশক্তি,' যার মধ্যে আছে যোগ্যতা, সামর্থ্য, ব্যক্তিগত বল, ধীমত্তা, সুযোগের সুচতুর বোধ এবং নিজের সম্ভাবনা বিষয়ে কিছুটা আন্দাজ।

এর পরে রুসসো কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণে দ্বিধান্বিত। তাঁর বেলাতে অবস্থা-গতিকের শক্তি এই অর্থে 'ভাগ্য' এই ধারণা, 'সত্য'-এ রূপান্তরিত হবে; ম্যাকিয়াভেল্লি এবং রেনেসাঁস মানবিকবাদীদের কাছে 'ভাগ্য' কথাটার একটা **প্রকৃতিজ এবং যান্ত্রিক চরিত্র আছে**; রুসসোর কাছে একমাত্র ভিকো ও হেগেল-এর 'যুক্তিসিদ্ধ দৈব'-এর মধ্যেই ঐতিহাসিক বোধের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। একথা অবশ্য উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজন যে, ম্যাকিয়াভেল্লির হাতে এইসব ধারণা কখনোই কোনো অধিবিদ্যাগত চরিত্র অর্জন করে না; প্রকৃত মানবিকবাদের দার্শনিকদের হাতে তা সম্ভব হতে পেরেছিল; ম্যাকিয়া-ভেল্লির কাছে এইসব ধারণা ছিল জীবন সম্বন্ধে এক সরল ও গভীর বোধ-সঞ্জাত (আর তাই তা এক জীবনদর্শনও বটে!) এবং এগুলোকে ভাবাবেগের প্রতীক হিসেবে বুঝে নিতে হবে ও সেইমতো ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রাক্-ম্যাকিয়াভেল্লি পর্বে এই ধারণাগুলির অধিবিদ্যাগত ক্রমবিকাশের জন্য রুসসো উল্লেখ করেছেন: জেনতীল—**জিয়োদানো ব্রুনো এ ইল্ পেনসিয়েরো দেল্ রিনাশিমেনতো** (অধ্যায়: 'ইল্ কোনচেত্তো দেল্লু-য়োমো নেল্ রিনাশিমেনতো' এবং সংযোজন) ['জিয়োর্দানো ব্রুনো ও রেনেসাঁস চিন্তার (অধ্যায়: 'রেনেসাঁসে মানব-ধারণা'), ফিরেনৎসে (ফ্লরেন্স), ভালেক্কি। ম্যাকিয়াভেল্লির মধ্যে এই ধারণাগুলির জন্য দ্রষ্টব্য: এফ. এরকোলে—**লা পোলীতিকা দি ম্যাকিয়াভেল্লি** [ম্যাকিয়াভেল্লির রাষ্ট্রনীতি (রোম ১৯২০)]।

কর্মকাণ্ডের দর্শনের সামগ্রিক সূচি

১. কর্মকাণ্ডের দর্শন বিষয়ে যত প্রশ্ন আলোচিত ও বিবেচিত হয়েছে সটীক গ্রন্থপঞ্জি সমেত তার যদি এক পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রণয়ন করা যায় তাহলে

একটা খুব প্রয়োজনীয় কাজ করা হবে। এই ধরনের বিশেষজ্ঞসুলভ কোষ-গ্রন্থধর্মী কাজের জন্য উপাদান এত ব্যাপক ও বিচিত্র, তাদের গুণগত মানের মধ্যে এত ফারাক ও উপাদানগুলি এত বিভিন্ন ভাষায় রচিত যে, একমাত্র কোনো একটা সম্পাদকীয় সমিতি কাজটা মোটামুটি ন্যায্য সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারেন। কিন্তু এই ধরনের কাজ সংকলিত হলে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে, শিক্ষায় ও স্বাধীন গবেষকদের ক্ষেত্রে একটা বিরাট জরুরি কাজ হবে। কর্ম-কাণ্ডের দর্শনের চর্চায় ও বিস্তারে এবং তা থেকে এক বৈজ্ঞানিক গবেষণাক্ষেত্রের বিকাশ সাধনের জন্য এটা হবে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর ফলে দুটো কালখণ্ডই যেন আলাদাভাবে ভাগ হয়ে যাবে—একটা আধুনিক কাল আর অন্যটা তার পূর্ববর্তী কাল, যখন প্রাথমিক অস্ফুট উক্তি, তোতা-পাখির মতো পুনরুচ্চারণ ও সাংবাদিকতাধর্মী অপেশাদারির প্রাধান্য। এই প্রকল্পটাকে খাড়া করবার জন্য বিভিন্ন দেশে ক্যাথলিকরা যাবতীয় যা কিছু প্রকাশ করেছে তার সমস্ত কিছুর চর্চা করা দরকার—বাইবেল, খ্রিস্টের জীবনী, প্রথম পর্যায়ের যাজকদের কথা, উপাসনা পদ্ধতি, ধর্মীয় বিতর্ক, বিভিন্ন বিষয়ের কোষগ্রন্থ ; এইসব কোষগ্রন্থের মান নিশ্চয়ই অসমান, কিন্তু নিয়ত প্রকাশিত এইসব গ্রন্থের মধ্য দিয়ে ক্যাথলিক ধর্মসংঘের মূল কাঠামো ও তার শক্তি-স্বরূপ শত শত যাজক ও তাঁদের অনুগামীদের মতাদর্শগত ঐক্য রক্ষা পাচ্ছে। (জর্মনিতে কর্মকাণ্ডের দর্শনের গ্রন্থপঞ্জির জন্য এরনেস্ট ড্রান-এর সংকলন দেখা দরকার, ড্রান নিজেই রেক্লাম্ উনিভেরসাল্ বিব্লিওটেক্-এর ৬০৬৮-৬০৬৯ সংখ্যক অংশের ভূমিকায় এর উল্লেখ করেছেন।)

২. বেনর্হাইম্ ঐতিহাসিক পদ্ধতির জন্য যে-কাজ করেছিলেন তার অনুরূপ কিছু কর্মকাণ্ডের দর্শনের জন্য কাউকে করতে হবে। (ই. বেনর্হাইম্—**লেরবুক্ ডের হিস্টরিশেন মেথডে** ('ঐতিহাসিক পদ্ধতির পাঠ্যপুস্তক'), ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯০৮, লাইপৎজিগ্, ডুংকার ও হুমব্লট, আংশিক ইতালীয় অনুবাদ ও প্রকাশনা : সান্দ্রন, পালেরমো।) বেনর্হাইমের বই ঐতিহাসিকতাবাদের দর্শনের ওপর কোনো সন্দর্ভ নয়, যদিও দুয়ের মধ্যে অন্তর্গত সংযোগ একটা আছে। দর্শনের সঙ্গে তথাকথিত 'কর্মকাণ্ডের দর্শনের সমাজতত্ত্ব'-এর সম্পর্কটা ঠিক ঐ বেনর্হাইমের বইয়ের সঙ্গে সাধারণ-ভাবে ঐতিহাসিকতাবাদের সম্পর্কের মতো। একটু অন্যভাবে বলতে গেলে, এই কাজটা হবে ইতিহাসের ব্যাখ্যা ও গবেষণার বাস্তব সূচি প্রণয়নের এক প্রণালীবদ্ধ কর্মসূচি—রাজনীতির ব্যাখ্যাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। তা ছাড়াও প্রত্যক্ষ কিছু নিরিখ ও সতর্ক সাবধানতা ইত্যাদির সংকলন, কর্মকাণ্ডের দর্শনের ধারণা অনুযায়ী রচিত ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির ভাষা-তত্ত্বও এই সংগ্রহভুক্ত হতে পারে। কর্মকাণ্ডের দর্শনের ভিতরকার কিছু কিছু প্রবণতার সমালোচনা সংকলন করতে পারলে সে কাজটাও কোনো না কোনো ভাবে খুব কাজে লাগবে। এইসব প্রবণতার অনেকগুলোই এত মোটা দাগের যে বোধ হয় সে কারণেই তারা আবার বহুল প্রচারিতও বটে।

আধুনিক ইতিহাসবাদ যেভাবে পুরনো ঐতিহাসিক পদ্ধতির এবং সেকেলে ধাঁচের ভাষাতত্ত্বের সমালোচনা করেছে এই সমালোচনার ধরনটাও হবে সেই রকম ; এর থেকেই জন্ম নিয়েছে এক ধরনের শাদাসিধে চূড়ান্তবাদিতার, ব্যাখ্যা ও ঐতিহাসিক নির্মাণের বদলে দেখা দিয়েছে বহিরঙ্গ বর্ণনা ও যাচাই করে না দেখা আকর তথ্যের সূচি, একসঙ্গে কোনোমতে জড়ো করা, প্রায়শ খুব অবিন্যস্ত ও অসঙ্গতভাবে। এই ধরনের প্রকাশনার প্রধান জোর হল এক ধরনের চূড়ান্তবাদী মরমীবাদ যা আজও বিকাশমান এবং সমান জনপ্রিয় ; এদের পক্ষে অযৌক্তিক এক দাবি ছিল এই যে এইসব প্রকাশনা নাকি ঐতিহাসিক পদ্ধতি ও বিজ্ঞানের অনুসারী।*

কর্মকাণ্ডের দর্শনের প্রতিষ্ঠাতাগণ ও ইতালি

[মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর] ইতালি বিষয়ক বা ইতালীয় সমস্যার আলোচনা বিষয়ক সমস্ত রচনাবলির (চিঠিপত্র সমেত) ব্যাপক সংগ্রহ। কিন্তু এরকম যে-কোনো নির্বাচিত সংগ্রহ তো কখনো জৈব এবং প্রকৃত অর্থে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এইসব লেখকদের এমন রচনাও আছে যা সরাসরি হয়তো ইতালি বিষয়ে নয়, কিন্তু ইতালির প্রসঙ্গে তাদের যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে (এই তাৎপর্য নেহাত কোনো সামগ্রিক অর্থে নয়, কারণ সেক্ষেত্রে সব রচনাই তো তাহলে ইতালি বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলে ভাবতে হয়)। এই সংকলনের পরিকল্পনা নিচের নিরিখে করা যায় :

১. ইতালির কোনো নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ বিষয়ক রচনাবলি ;

২. ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিচারের এমন কোনো 'নির্দিষ্ট' প্রসঙ্গ যা সরাসরি ইতালি বিষয়ে রচিত নয়, কিন্তু ইতালির সমস্যা বিষয়ে যা খুব প্রাসঙ্গিক। উদাহরণ : ১৮১২-র স্পেনের সংবিধানের ওপর প্রবন্ধটা ইতালির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কারণ ১৮৪৮ পর্যন্ত ইতালির রাজনৈতিক আন্দোলনে এই সংবিধানের খুবই ভূমিকা ছিল। ঠিক তেমনি হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের প্রুধোঁ-কৃত বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে **দর্শনের দারিদ্র্য** গ্রন্থের সমালোচনা ইতালির বেলায় প্রাসঙ্গিক, কেননা ইতালীয় মনন জগতের নানা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই বিপর্যয়ের ছায়া পড়েছিল (জিওবের্তি, নরমপন্থীদের হেগেলীয় কর্মসূচি, অক্রিয় বিপ্লবের ধারণা, দ্বান্দ্বিক বিপ্লব/সংস্কার)। ১৮৭৩-এর স্পেনের উদারপন্থী আন্দোলনসমূহের ওপর এঙ্গেলস্-এর রচনাবলির সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য (স্যাভয়-এর আমাদেউস-এর রাজত্ব ত্যাগের পরে), এটাও ইতালির জন্য প্রাসঙ্গিক, ইত্যাদি। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনাবলির জন্য সম্ভবত কোনো সংকলন প্রস্তুত করবার দরকার নেই, বিচার-বিশ্লেষণী আলোচনাই যথেষ্ট হবে। সম্ভবত সবচেয়ে জৈব পরিকল্পনা হবে এইরকম তিন ভাগে বিভক্ত একটা কাজ :

* এই প্রশ্নের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : 'রিভিস্তে তিপো'তে প্রকাশিত কিছু মন্তব্য, বিশেষত 'ভিৎসিয়ো-নারিও ক্রিতিকো' বিষয়ে কিছু মন্তব্য।

১. ঐতিহাসিক বিশ্লেষণী ভূমিকা ;
২. ইতালির ওপর রচনাবলি ;
৩. ইতালি সম্বন্ধে অপ্রত্যক্ষভাবে প্রাসঙ্গিক রচনাবলির বিশ্লেষণ— যথা, সেইসব লেখা যার লক্ষ্য ইতালির জন্যও জরুরি নির্দিষ্ট প্রশ্নের মীমাংসা।

সমগ্র বিশ্ব-সংস্কৃতির ওপর পশ্চিমী সংস্কৃতির আধিপত্য

১. একথা যদি মেনে নেওয়াও যায় যে বিশ্বসভ্যতার 'স্তরবিন্যস্ত' সংহতিতে অন্যান্য সংস্কৃতিরও একটা গুরুত্ব ও তাৎপর্য আছে (আর একথা বিনা বিতর্কে মেনে নেওয়াই যায়), তাহলেও বলতে হয় তাদের এই সার্বিক মূল্য শুধু এই কারণে যে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির গড়নে তারা অন্যতম উপাদান মাত্র ; এই ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিই হল একমাত্র ঐতিহাসিক ও প্রমূর্তভাবে বিশ্বসংস্কৃতি—অন্তত ইয়োরোপীয় চিন্তার বিকাশে তাদের যা অবদান এবং সে-চিন্তায় ঐ সংস্কৃতি যতটুকু গৃহীত ততটুকু তো বটেই।

২. অবশ্য, এমনকী ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিও সংহতির একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে এবং যে ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের মনোযোগ, সেই মুহূর্তের চরমবিন্দু হেগেল ও হেগেলবাদের সমালোচন।

৩. এই দুটো কথা থেকে একথাও বেরিয়ে আসে যে আমরা এমন এক সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার কথা আলোচনা করছি যেটা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রূপ ধারণ করে ; এ প্রসঙ্গে জনপ্রিয় সংস্কৃতির কথা তুলে লাভ নেই, কারণ ঐ সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণী ব্যাখ্যান এবং বিকাশসাধনের কোনো প্রক্রিয়ার কথা বলা যায় না।

৪. এ প্রসঙ্গে সেইসব সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার কথাও বলা হচ্ছে না যেগুলোর চরম পরিণতি প্রকৃত ক্রিয়াকর্ম, যেমনটা ঘটেছিল ফরাসি দেশে আঠারো শতকে : অথবা ঐসব প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে একমাত্র সেই প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে যার পরিণতি হেগেল ও ধ্রুপদী জর্মন দর্শন ; এবং এক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়ার পারস্পরিক বাচ্যান্তরতার 'বাস্তব' নমুনা (যে-অর্থে বারবার ধারণাটি ব্যবহার করা হচ্ছে) হিসেবে ঐ প্রক্রিয়াগুলিকে দেখা যেতে পারে। একটা হল ফরাসি, রাজনৈতিক ও আইনগত, আর অন্যটা জর্মন, তাত্ত্বিক ও কল্পনাসমৃদ্ধ।

৫. হেগেলবাদের অবসান থেকে আর একটা নতুন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হচ্ছে বলে ধরা যেতে পারে, এর আগের সবকিছু থেকেই এর চরিত্র ভিন্ন, এ এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে বাস্তব আন্দোলন আর তাত্ত্বিক চিন্তা সংমিশ্রিত (অথবা এমন এক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংমিশ্রিত হবার জন্য চেষ্টা চলছে যা একই সঙ্গে তাত্ত্বিক ও বাস্তব।)

৬. এ কথাটা এমন কিছু জরুরি নয় যে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছে কিছু মাঝারি গোছের দার্শনিক গ্রন্থে, বা বড়জোর এমন কিছু গ্রন্থে যা ঠিক

মহাগ্রন্থ নয়। যে কথাটা খেয়াল রাখা দরকার তা হল যে পৃথিবী ও মানুষকে দেখার একটা নতুন ধরন তৈরি হচ্ছে এবং নতুন এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র কিছু মহান বুদ্ধিজীবীর মধ্যে আবদ্ধ তা নয়, বা পেশাদার দার্শনিকদের মধ্যেও নয়, বরঞ্চ তার মধ্যে একটা ঝোঁক রয়েছে জনপ্রিয় হবার দিকে, একটা স্পষ্ট বিশ্ব-চরিত্র অর্জন করে ব্যাপক একটা ঘটনায় রূপান্তরিত হবার দিকে ; এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এমন এক ক্ষমতা আছে যার জোরে (ফলটা হয়তো কখনো জগাখিচুড়ি গোছের হতেও পারে) জনপ্রিয় চিন্তা ও বস্তাপচা জনসংস্কৃতির মধ্যেও পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়।

৭. এই সূত্রপাতটা যদি বিভিন্ন উপাদানের সংযোগের ফলে ঘটে থাকে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই, উপাদানগুলো আপাতদৃষ্টিতে হয়তো বিচিত্র ধরনের—ফয়ারবাখ. হেগেলের সমালোচক হিসেবে তাঁর যে ভূমিকা, ধর্মের দার্শনিক ও ঐতিহাসিক সমালোচন হিসেবে টুবিঙ্গেন ঘরানা, ইত্যাদি। বস্তুত একথাটা লক্ষ করার মতো যে এ ধরনের পরিবর্তনে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক না থেকে পারে না।

৮. কর্মকাণ্ডের দর্শন হল সমস্ত অতীত ইতিহাসের ফল ও তার সর্বোত্তম সাধনবিন্দু। হেগেলীয় দর্শনের সমালোচনা থেকেই জন্ম নিয়েছিল আধুনিক ভাববাদ ও কর্মকাণ্ডের দর্শন। হেগেলীয় নিহিতার্থবাদ রূপ পায় ঐতিহাসিকতাবাদে, কিন্তু একমাত্র কর্মকাণ্ডের দর্শনেই এই ঐতিহাসিকতাবাদ অথবা পরম মানবতাবাদ। (অনেক আধুনিক ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে নিরীশ্বরবাদ ও দেববাদ বিষয়ে অস্পষ্টতা : নিরীশ্বরবাদ যে নিতান্ত নঞর্থক ও অসার এটা খুব পরিষ্কার, যদি না এটাকে কেবলমাত্র জনপ্রিয় সাহিত্য বিতর্কের একটা পর্ব বলে বিবেচনা করা হয়।)

* * *

জ্ঞান থেকে বোধ থেকে অনুভবে উত্তরণ ও
তার বিপরীত ক্রম অনুভব থেকে বোধ থেকে জ্ঞান

সাধারণ সমাজ 'অনুভব' করে, কিন্তু সবসময়ে যে জানে বা বোঝে তা নয় ; বৌদ্ধিক সমাজ 'জানে' কিন্তু সব সময়ে বোঝে না এবং বিশেষ করে সবসময়ে অনুভব করে না। তাই দু-রকমের বাড়াবাড়ির একদিকে আছে শূন্যগর্ভ পণ্ডিতিয়ানা আর অন্যদিকে আছে এককাট্টা অন্ধ আবেগ। পণ্ডিত যিনি তিনি আবেগময় হতে পারেন না তা নয় ; হতেই পারেন। আবেগময় পণ্ডিতিয়ানা ঠিক বেপরোয়া এককাট্টাপনা এবং গলাবাজির মতোই হাস্যকর ও বিপজ্জনক। বুদ্ধিজীবী ভুল করেন যখন তিনি বিশ্বাস করেন বোধ ব্যতিরেকেও জ্ঞান সম্ভব এবং এমনকী অনুভব ছাড়াও কিংবা আবেগস্পৃষ্ট না হয়েও তা সম্ভব (শুধু জ্ঞানেরই জন্য তাও নয়, জ্ঞানের লক্ষ্যবস্তুর জন্যও বটে) ঃ অন্যভাবে বলতে গেলে বুদ্ধিজীবী যখন ভেবে বসেন যে জনগণের একেবারে প্রাথমিক আবেগের শরিক না হয়ে, তাঁদের না বুঝেও,

কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থানে তাঁদের যথার্থ মূল্যায়ন বা যৌক্তিকতা অনুধাবন না করেও, ইতিহাসের কানুন ও বিজ্ঞানসম্মত ও সঙ্গতিপূর্ণ সেই উন্নততর বিশ্ববীক্ষণ যার অন্য নাম জ্ঞান তার সঙ্গে দ্বান্দ্বিকভাবে তাদের অন্বিত না করেও, কেবলমাত্র জনসাধারণ তথা জাতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র থেকেই তিনি বুদ্ধিজীবী (নিছক পণ্ডিত নন) হতে পারেন। ঐ আবেগ ছাড়া, বুদ্ধিজীবী ও জনসাধারণ তথা জাতির সঙ্গে এই সংবেদনময় সংযোগ ছাড়া রাজনীতি-ইতিহাস সৃষ্টি করা যায় না। এই ধরনের সংযোগ ছাড়া বুদ্ধিজীবী ও জনসাধারণ তথা জাতির মধ্যেকার সম্পর্ক নিতান্ত আমলাতান্ত্রিক ও আনুষ্ঠানিক এক সম্পর্কে দাঁড়িয়ে যায়; বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তখন যেন এক উঁচু জাত কিংবা এক যাজক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়, যাকে বলা যায় জৈব কেন্দ্রীণতা। বুদ্ধিজীবী ও জনসাধারণ তথা জাতির সম্পর্ক, পুরোগামী ও অনুগামীর সম্পর্ক, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক যদি এমন এক জৈব সংহতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যেখানে আবেগ-অনুভব রূপান্তরিত হয় বোধে এবং তার থেকে জ্ঞানে (যান্ত্রিক নয় জীবন্তভাবে) তাহলেই এবং একমাত্র তাহলেই সম্পর্কটা যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক হতে পারে। একমাত্র তখনই সম্ভব শাসক ও শাসিতের মধ্যে, পুরোগামী ও অনুগামীর মধ্যে ব্যক্তিক উপাদানের বিনিময় এবং তখনই কেবল জীবন-যাপনের অংশীদারী সফল হতে পারে আর সেটাই কেবল হতে পারে এক সামাজিক শক্তি—সৃষ্টি হতে পারে এক 'ঐতিহাসিক জোট'-এর।

দে মান জন-অনুভব 'বিচার' করেন: তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য, আধুনিক সভ্যতার এক মোচন মুহূর্তে তাদের পেঁছে দেবার জন্য তিনি তাদের সঙ্গে সমানুভূতি বোধ করেন তা নয়। তাঁর অবস্থাটা হল লোক-বিদ্যার চর্চায় রত সেই গবেষকের মতো, যিনি যেন সব সময়েই ভয়ে ভয়ে আছেন পাছে আধুনিকতা তাঁর চর্চার বিষয়কে বিনষ্ট করে দেয়। ওঁর বইতে যা পাওয়া যায় তা হল, খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিসের পণ্ডিতি প্রতি-ফলন; জন-অনুভব ঠিক যেমন বস্তুগতভাবে নিজেকে উপস্থাপিত করে তাকে তেমনিভাবে জানতে হবে ও চর্চা করতে হবে, শুধুমাত্র ইতিহাসের গতির স্রোতে আবদ্ধ এক নিষ্ক্রিয় কোনো তুচ্ছ বস্তু হিসেবে তাকে দেখলে চলবে না।

টীকা

জায়ন (-বাদ): জায়ন (বা ৎসায়ন) হল জেরুজালেমে অবস্থিত এক পাহাড়, ইহুদি আধ্যাত্মিক জীবনের কেন্দ্র। ইহুদি জনগণের প্রতিশ্রুত ভূমির প্রতীকও বটে। পালেস্তাইনের ইজরায়েল বা ৎসায়ন ভূখণ্ডকে পুনরায় ইহুদি জনগণের কাছে প্রত্যাবর্তনের দাবিতে গড়ে তোলা আন্দোলন বা মতবাদকে ৎসায়নবাদ বলে। ৎসায়নবাদী আন্দোলন ইহুদি ধর্মবৃত্তের মধ্যেই অবস্থিত। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে থেয়োডোর হেরৎসুল্ এই আন্দোলনকে এক সংগঠিত রূপ দেন।

কুলটুরকাম্প্ফ্: উনিশ শতকের শেষদিকে জর্মনিতে ওটো ফন বিসমার্ক রোমান ক্যাথলিক ধর্মসংঘকে জর্মন রাষ্ট্রের অধীনস্থ করবার যে চেষ্টা করেন তাকে কুলটুরকাম্প্ফ্ বলে। এর মোটামুটি সময়কাল ১৮৭১-৮৭। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ওপর নানা রকম বাধানিষেধ আরোপ করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়াও গড়ে ওঠে। ১৮৭৯ থেকে ক্রমে ক্রমে এই নিষেধাজ্ঞা কিছু কিছু শিথিল করা হতে থাকে।

দ্রেফুস কেলেঙ্কারি (১৮৯৪): সমসাময়িক কালে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক ফরাসি কেলেঙ্কারির কাহিনী। আলফ্রেদ দ্রেফুস নামে সেনাবাহিনীর এক অফিসারকে দেশদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি গোপন সামরিক তথ্যাদি ও সংবাদ জর্মনিতে পাচার করতেন। মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে তাঁর শাস্তি হয় এবং তাঁকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। মেজর হুবর্ট আঁরি নামে একজন শাগরেদ জালিয়াতির কাহিনী ফাঁস করে দিয়ে নিজে আত্মহত্যা করেন। তাঁর স্বীকারোক্তির পরে দ্বিতীয়বার বিচার শেষে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে দ্রেফুসকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯০৬ থেকে তাঁর নামে সব কলঙ্কের অবসান ঘটে।

ফ্রীমেসনরি: গোপন সৌভ্রাত্রমূলক এক সঙ্ঘ। ব্রিটেনে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশের মধ্যেই বেশি জনপ্রিয়। মধ্যযুগের পাথর কারিগর ও গির্জাবাড়ি নির্মাতাদের কারুসঙ্ঘের মধ্য থেকে এর উদ্ভব। সঙ্ঘের সদস্যদের বলা হয় ফ্রীমেসন্। ফ্রীমেসনরি ঠিক কোনো খ্রিস্ট-ধর্মান্তর্গত সম্প্রদায় নয়, তবে এর সদস্যদের আচার-আচরণে নৈতিকতা, বদান্যতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ওপর খুব জোর দেওয়া হয়। এবং এর সদস্যেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী। ঐতিহাসিক দিক থেকে উদারনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গেও এর যোগ ছিল।

জেসুইট সম্প্রদায়: লয়োলার সন্ত ইগ্নাতিয়ুস (১৪৯১—১৫৫৬) প্রতিষ্ঠিত রোমান ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়। ছাত্রদের ওপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করছেন এই অভিযোগে ইগ্নাতিয়ুস স্পেনের আলসালাও সালামান্চা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হবার পরে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

রিফর্মেশন নামে খ্যাত পুনর্গঠন আন্দোলনের প্রতিরোধে জেসুইট সম্প্রদায়ের ভূমিকা বিশেষভাবে বিবেচ্য।

জেসুইট শিক্ষা : জেসুইট সম্প্রদায়ের অন্যতম কর্মক্ষেত্র শিক্ষা। এই শিক্ষা-চিন্তার তাত্ত্বিক দলিল ১৫৪৮-১৫৫২-এর মধ্যে জেরোম নাদাল-এর প্রণীত। এই শিক্ষাদর্শনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে ষোড়শ শতকের অন্তিম পর্বে। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে যখন এই শিক্ষাপদ্ধতি তার খ্যাতির শীর্ষে তখন জেসুইট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ছাত্রসংখ্যা প্রায় দু-লক্ষ। জেসুইট সম্প্রদায়ের কলেজি শিক্ষায় প্রথম দু-বছর পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকে ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র ও সাহিত্য। তার পরের তিন বছর থাকে দর্শন, পদার্থবিদ্যা ও গণিত। তার পরের পাঁচ-ছ' বছর এই বিষয়গুলি কলেজে পড়তে হয়; এর পরের পাঁচ-ছ' বছর তাকে চর্চা করতে হয় ধর্মতত্ত্ব। তারও পরে কিছু আধ্যাত্মিক আচার-অভ্যাসের মধ্য দিয়ে তবে জেসুইট শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। এই শিক্ষার স্তরে স্তরে এক প্রায় সামরিক কঠোরতা বর্তমান।

টেলরীকরণ : শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে 'বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা'র প্রবর্তন। ইংরেজিতে যাকে সায়ান্টিফিক ম্যানেজমেন্ট বলা হয় তার সূত্রপাত মার্কিন ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ ফ্রেডরিক ডবল্যু টেলর-এর কর্মে ও চিন্তায়। 'টেলরবাদ' বা 'টেলরীকরণ' শব্দ দুটি তাঁরই নামানুসারে নির্মিত। সংযুক্ত আরো দুটি ধারণা হল 'মার্কিনবাদ' ও হেনরি ফোর্ড-এর নামানুসারে নির্মিত 'ফোর্ডবাদ'। মার্কিন শিল্পে তদানীন্তন নতুন চিন্তাভাবনা ও কর্মপদ্ধতির প্রয়োগ নিয়ে গ্রামশি বিশেষ ভাবিত ছিলেন। সোভিয়েত শিল্পবিকাশের প্রথম যুগে এই মার্কিনবাদের প্রভাব ও প্রয়োগ ছিল উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য গ্রামশি-র 'জেলখানার নোটবই'-এর ইংরেজি ভাষ্যের অন্তর্গত 'মার্কিনবাদ ও ফোর্ডবাদ' রচনা দ্রষ্টব্য।

ফ্রানচেসকো দে সাংকতিস (১৮১৭—১৮৮৩) **:** উনিশ শতকের প্রসিদ্ধ ইতালীয় সাহিত্য সমালোচক। নাপোলির অধিবাসী দে সাংকতিস ছিলেন একজন উদারনৈতিক দেশপ্রেমিক। তিনি ১৮৪৮-এর নাপোলির বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন এবং কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধও হন। পরবর্তীকালে তুরিন ও ৎসুরিখ-এ প্রবাসে জীবনযাপন করেন। ১৮৬০-এ ইতালিতে প্রত্যাবর্তনের পরে শিক্ষাসংস্কারে মনোনিবেশ করেন এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ১৮৭১-এ তিনি নাপোলি বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হন। **স্তোরিয়া দেল্লা লিতেরাতুরা ইতালীয়ানা** (১৮৭০) (ইংরেজি অনুবাদ ১৯৩১) তাঁর রচিত এক প্রধান সাহিত্যকর্ম।

পুয়োতি-র স্কুল : অভিজাত সম্প্রদায়ের শিশুদের শিক্ষার জন্য পুয়োতি পরিচালিত নাপোলি শহরের স্কুল। দে সাংকতিস ছেলেবেলায় এই স্কুলে পড়েছিলেন। এই স্কুলে একটু বয়স্ক ছাত্রদের মতামত ও বক্তব্যকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হত। বয়স্ক মতামতের গুরুত্ব প্রসঙ্গেই গ্রামশি দান্তের

'ইনফেরনো' (একবিংশ সর্গ) থেকে 'সান্তা জিতার বন্ধ' এই অনুষঙ্গ ছুঁয়ে গেছেন।

ডল্টন পদ্ধতি : মাধ্যমিক শিক্ষার এক বিশেষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর রাখা হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব প্রায় অস্বীকৃত, এই বোধ থেকে এই নতুন পদ্ধতির সূচনা। এর প্রবর্তক হেলেন প্যাংকহার্স্ট, ১৯১৯-এ এর সূচনা। ১৯২০-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম জর্জিয়াতে অবস্থিত ডল্টন নগরের প্রতিবন্ধীদের এক স্কুলে এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাকর্মের অন্তর্গত বিষয়গুলিকে এক এক মাসের করণীয় কাজ হিসেবে ভাগ করা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের কাজের পরিকল্পনা অনেকটা নিজেরাই করে। এক এক ভাগের কাজ শেষ করে তবে অন্য আর এক ভাগে যেতে হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে গোষ্ঠীগত কাজে খুব উৎসাহ দেওয়া হয়। ইংলণ্ড, ইয়োরোপ ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও এ পদ্ধতি এক সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। সমালোচকদের মতে এ পদ্ধতি বড় বেশি ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য নির্ভর।

জিয়োভানি জেনতীল (১৮৭৫—১৯৪৪) : ইতালীয় দার্শনিক। ইনি এক সময়ে বেনেদেত্তো ক্রোচের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ বলে পরিচিত ছিলেন। বিশিষ্ট ভাববাদী এই দার্শনিক পরে এক সময়ে ফ্যাশিস্ত মতাদর্শে আস্থাবান হয়ে পড়েন।

বেনেদেত্তো ক্রোচে (১৮৬৬—১৯৫২) : ইতালির বিশিষ্ট দার্শনিক, নন্দন-তাত্ত্বিক ও ইতিহাসবেত্তা। ১৯১০-এ তিনি সেনেট সদস্য হন ও ১৯২০-২১-এ জ্যলিত্তি সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। একদা জেনতীল-এর সুহৃদ ক্রোচে জেনতীল-এর বিপক্ষে '"ফ্যাশিস্ত বুদ্ধিজীবীদের ইশতেহারের" বিরুদ্ধে প্রতিবাদ' এই ইশতেহারের রচয়িতা। যুদ্ধের পরে ১৯৪৪-এ তিনি অল্প সময়ের জন্য আর একবার মন্ত্রী হন। মুসোলিনির ইতালি পরিভ্রমণের সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গোপন সাক্ষাৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে ফ্যাশিবাদের স্বরূপ উন্মোচনে সহায়ক হয়।

আত্মানং বিদ্ধি (পৃ. ৬৬) : গ্রামশির নিজের রচনায় উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দবন্ধ হল **কোনোশি তে স্তেসো**। এর আক্ষরিক অনুবাদ 'তোমার নিজেকে জানো'। প্রাচীনত্বের অনুষঙ্গে আমরা ব্যবহার করেছি বেদান্ত দর্শনের ধারণা। কঠোপনিষদে আছে 'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।' দেহকে রথ বলে জানো আর আত্মা সেই রথের রথী। প্রাচীন গ্রীসের দেলফির দৈববাণীতেও আত্মজ্ঞানের বিধান রয়েছে। সক্রাতেস-এর দর্শনেও অন্যতম মূল সূত্র এই আত্মজ্ঞান। প্লাতো-র **আপোলোগিয়া**-তে সক্রাতেস তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের খণ্ডনে উৎসমুখ হিসেবে ব্যবহার করেন দেলফির দৈববাণী।

পূর্ণতাবাদী (পৃ. ৭১): ইতালীয় নাম **'ইনতেগ্রালিসমো'**। পোপ দশম পাইয়ুস (১৯০৩—১৪)-এর সময়কালে ইতালির এক ধর্মীয় বিপ্রতীপ আন্দোলন। উনিশ শতকের শেষাংশের আধুনিকতাবাদ তথা খ্রিস্টীয়-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টীয় ধর্মসংঘের সঙ্গে রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক নতুনভাবে নির্ণয় করা। সেই অর্থে এই আন্দোলনকে সেকুলার আন্দোলনের অংশ হিসেবে দেখা যেতে পারে। পূর্ণতাবাদী আন্দোলন এরই প্রতিক্রিয়া এবং সেকুলার প্রবণতার বিরুদ্ধে ধর্মসংঘের অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছিল এর উদ্দেশ্য।

নিহিতার্থবাদী দর্শন (পৃ. ৭১): গ্রামশির নিজের উল্লেখ **ফিলোসোফিয়ে ইমানেনটিসটিকে**। ক্রোচে, জেনতীল প্রভৃতি ভাববাদী দার্শনিকদের জন্য সাধারণত গ্রামশি এই অভিধা ব্যবহার করেন। কিন্তু গ্রামশি রেনেসাঁস-পর্বের দর্শনচিন্তারও অনেকখানি এই বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত করেন। ক্যাথলিক পরাবাদ প্রত্যাখ্যান করার আদর্শই গ্রামশির নিহিতার্থবাদের মর্মার্থ।

গণবিশ্ববিদ্যালয় (পৃ. ৭১): ইতালীয় **উনিভেরসিতা পোপোলারি**। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, সাধারণত রাষ্ট্রীয় অধিকার বহিভূর্ত। খানিকটা প্রতিতুলনা পাওয়া যাবে আমাদের ওপন্ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, যদিও এখানে এই প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষত রাষ্ট্রীয় সীমার অন্তর্ভুক্ত।

চূড়ান্তবাদ (পৃ. ৭৮): গ্রামশির ব্যবহারে **ফিনালিসমো**, ইংরেজি অনুবাদে **ফাইনালিজম**, আমরা গ্রহণ করছি 'চূড়ান্তবাদ'। ইতিহাসে খুব নির্দিষ্ট পূর্বনির্ধারিত চূড়ান্ত কোনো পরিণতি যে অবশ্যম্ভাবী এই মতবাদকে চূড়ান্তবাদ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

অঁরি বের্গসঁ (১৮৫৯—১৯৪১): ফরাসি দার্শনিক। বর্তমান শতাব্দীর ফরাসি দর্শনের এক প্রভাবশালী পুরুষ। যৌক্তিকতাবাদের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বের্গসঁর দর্শন চিহ্নিত। এই সূত্রে তাঁকে জাঁ জাক্ রুসোর উত্তরসূরি হিসেবেও বিবেচনা করা সম্ভব। 'সৃষ্টিশীল বিবর্তনবাদ' এই নামে প্রসিদ্ধ তাঁর দার্শনিক চিন্তার মূলে আছে 'জীবন' ও 'জড়' এই দুই প্রত্যয়। এদেরই নিত্য দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে শিল্পীর শিল্পকর্মের মতো বিবর্তনের ইতিবৃত্ত রচিত হয়। সৃষ্টির জন্য উন্মুখ এক বিদ্যমান মৌল প্রাণশক্তির কল্পনার জন্য এই দর্শনচিন্তা বিশ শতকের অনেক মনীষীর আবেগে সহমর্মী হতে পেরেছিল। এই প্রসঙ্গে বার্নার্ড শ ও রবীন্দ্রনাথের নামও প্রাসঙ্গিক। রাজনীতির ক্ষেত্রে ফ্রান্সের গেয়র্গ সোরেল (১৮৪৭—১৯২২) তাঁর বিপ্লবী সিন্ডিক্যালিস্ট শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থনে বের্গসনীয় সৃষ্টিশীলতার ধারণাকে ব্যবহার করেছিলেন। **হিংসা বিষয়ক সন্দর্ভ** (১৯০৬) এ বিষয়ে তাঁর প্রধান গ্রন্থ। বের্গসঁর ইতালীয় প্রভাব প্রধানত সোরেল-এরই সূত্রে। মুসোলিনিও অংশত সোরেল প্রভাবিত ছিলেন। সোরেল নিজে আবার অংশত মার্কস প্রভাবিতও ছিলেন।

স্বজ্ঞাবাদ (পৃ ১০৯) : গ্রামশির ব্যবহারে **সলিপ্‌সিস্‌মো**, ইংরেজি অনুবাদে **সলিপ্‌সিজম**, আমরা গ্রহণ করছি 'স্বজ্ঞাবাদ'। একমাত্র আত্মই যে জ্ঞানের লক্ষ্য ও সম্ভাব্য বিষয়বস্তু এবং সব জ্ঞানের প্রকৃত ভিত্তি এই প্রত্যয় স্বজ্ঞাবাদের চরিত্রলক্ষণ।

ব্যবহারিকতাবাদ : বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিককার একটি প্রভাবশালী দার্শনিক মতবাদ। এর প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে চার্লস স্যাণ্ডারস পিয়ার্স (১৮৩৯—১৯১৪), উইলিয়ম জেম্‌স্‌ (১৮৪২—১৯১০) ও জন ডিউই (১৮৫৯—১৯৫২)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে মতের পূর্ণ সমতা নিশ্চয়ই ছিল না, তবে সমগ্র ধারার জন্য একটা ব্যবহারযোগ্য বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। পিয়ার্স-এর বক্তব্য অনুসরণ করে উইলিয়ম জেম্‌স্‌ (**প্র্যাগ্‌ম্যাটিজ্‌ম্‌, আ নিউ নেম্‌ ফর সাম্‌ ওল্ড্‌ ওয়েজ্‌ অব্‌ থিংকিং**, ১৯০৭) মনে করেন যে, আমাদের চিন্তা পরিচ্ছন্ন করে তোলার একটা উপায় হল যে-কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে আমাদের বাহ্য ব্যবহার বা আচারের ওপর তার কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে তার বিবেচনা করা। এই মতানুসারে আমাদের জীবনের উপর বিভিন্ন বিশ্ববীক্ষার বাস্তবিক প্রভাব বিশ্লেষণই দর্শনের মূল লক্ষ্য। ইতালিতে দৃষ্টবাদের প্রতিক্রিয়ায় এই মতবাদের কিছু প্রভাব ছিল। ব্যবহারিকতাবাদের ইতালীয় প্রবক্তাদের মধ্যে গণিতজ্ঞ জ্যভান্নি ভাইলাতি (১৮৬৩—১৯০৯) ও অর্থনীতিবিদ-সমাজতাত্ত্বিক ভিল্‌ফ্রেদো পারেতো (১৮৪৮—১৯২৩)-র নাম উল্লেখযোগ্য।

ফিলিপ্পো তোম্মাসো মারিনেত্তি (১৮৭৬—১৯৪৪) : ইতালীয় ও ফরাসি ভাষার লেখক, ঔপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকার। ফিউচারিজ্‌ম্‌ নামে খ্যাত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা-প্রবক্তা। পারীর **লে ফিগারো** পত্রিকায় (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯) তাঁর রচিত '**মানিফেস্তো দ্য ফ্যুতুরিজ্‌মে**-'র প্রকাশকেই ফিউচারিজ্‌ম্‌ আন্দোলনের সূত্রপাত বলে ধরা হয়। ইতালির সাংস্কৃতিক জীবনেও এই আন্দোলনের বেশ প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে মারিনেত্তি মুসোলিনির সমর্থক হিসেবে সক্রিয়ভাবে ফ্যাশিস্ত মতাদর্শের শরিক হন। **ফ্যুতুরিসমো এ ফাশিস্‌মো** (১৯২৪)-তে তাঁর বক্তব্যই ছিল যে ফ্যাশিবাদ ভবিষ্যবাদেরই স্বাভাবিক উত্তরণ।

জিয়াকোমো লেওপার্দি (১৭৯৮—১৮৩৭)। ইতালীয় কবি ও দার্শনিক। উনিশ শতকে ইতালির অন্যতম প্রধান লেখক। বাল্যকাল থেকেই নানাবিধ শারীরিক বিকৃতির শিকার, কিন্তু অত্যন্ত প্রতিভাবান বলে স্বীকৃত। ষোল বছর বয়সের মধ্যেই তিনি গ্রীক, লাতিন ও বেশ কয়েকটি আধুনিক ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। পরবর্তীকালে লেওপার্দি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। তাঁর দুঃখময় জীবন ও বিষণ্ণ জীবনবীক্ষার জন্য ইতালীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে লেওপার্দি এক স্মরণীয় নাম। তাঁর রচনার ইংরেজি অনুবাদ : জেম্‌স্‌ টমসন, **এসেইজ্‌, ডায়ালগ্‌স্‌ অ্যাণ্ড থট্‌স্‌** (১৯০৫); আর. সি. ট্রেভেলিয়ান, **ট্রান্সলেশ্‌ন্‌স্‌ ফ্রম লেওপার্দি** (১৯৪১)।

জিয়ামবাত্তিস্তা ভিকো (১৬৬৮—১৭৪৪); ইতালির অন্তর্গত নাপোলির বিশিষ্ট দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। এঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ **সিয়েন্সা নুয়োভা** (১৭২৫)। যে-সব দার্শনিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারণাকে আঠারো শতকী আলোকোদ্ভাসিত যুগের চিহ্নস্বরূপ বিবেচনা করা হয় তার অনেক প্রত্যয়ের মৌল সমালোচনার অন্যতম অগ্রদূত। গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগেই যে আধুনিক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি নিহিত এবং বিজ্ঞানের এই ধরনটাই যে সর্বক্ষেত্রে পালনীয় আদর্শ, ভিকো এই মতের এক জোরালো সমালোচক। ভিকোর জ্ঞানতত্ত্বে, বিশেষত মানববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইতিহাসের ভূমিকা খুবই অগ্রগণ্য। বিজ্ঞান সাধনায় বৈচিত্র্যের সূত্রসন্ধানে এই ধারণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভিকো দেকাতের্র যৌক্তিকতাবাদী তত্ত্বের এক সমর্থ প্রতিপক্ষ। গ্যোয়টে, কোঁৎ প্রভৃতি কবি, দার্শনিক অন্তত অংশত ভিকোর চিন্তায় প্রভাবিত।

পবিত্র পরিবার (পৃ. ১৩০) : *Die Heilige Familie* (ইংরেজি অনুবাদে *The Holy Family*) মার্কস ও এঙ্গেলস-এর প্রথম যৌথ রচনা (প্যারী, সেপ্টেম্বর, ১৮৪৪)। মার্কসের (ও এঙ্গেলস-এরও) চিন্তাধারার বিবর্তনে এ বই খুব গুরুত্বপূর্ণ এক ধাপ। প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাত্ত্বিক বিতর্ক হিসেবে রচিত এ বই। আক্রমণের মূল লক্ষ্য ব্রুনো বাউয়ের অ্যান্ড কোং বলে যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে সেই সমগ্র গোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে ব্রুনো বাউয়ের (১৮০৯—১৮৮২) ছাড়া আর যাঁরা প্রধান তাঁরা হলেন : কার্ল এর্নস্ট রাইখহার্ট, জুলিয়ুস ফাউখের, ব্রুনো বাউয়ের-এর ভাই এড্গার বাউয়ের ও ৎসেলিগা (ফ্রান্‌ৎস জিশলিন্‌স্কির ছদ্মনাম)। বই-এর এক একটি অধ্যায়ে মার্কস-এঙ্গেলস তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় এঁদের এক এক জনকে এক হাত করে নিয়েছেন। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর নিজস্ব স্বাধীন দার্শনিক তত্ত্ববক্তব্য তখনো পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে কোথাও লিপিবদ্ধ করা হয়নি, চিন্তাও তখনো নিতান্ত তৈরি হবার মুখে। কিন্তু এই বইয়ের সমালোচনার ধারা থেকে তাঁদের চিন্তার গতিমুখ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখানেই এ বইয়ের গুরুত্ব ও আকর্ষণ।

গ্রামশির রচনায় এই বইয়ের কথাটা যেভাবে এসেছে সে প্রসঙ্গে কুইন্‌টিন্‌ হোর ও জেফ্রি নোয়েল-স্মিথ অনূদিত ও সম্পাদিত ইংরেজি সংস্করণের সম্পাদকীয় টীকায় (টীকা নং ৬২, পৃ. ৩৬৮) যে মন্তব্য করা হয়েছে তাতে কিছুটা ভুল ধারণা হবার সম্ভাবনা আছে। '**পবিত্র পরিবার** গ্রন্থে একথা বলা হয়েছে…' বলতে গ্রামশি যে একটি নির্দিষ্ট উদ্ধৃতির কথা বলতে চেয়েছিলেন তা নাও হতে পারে। সম্ভবত তাঁর লক্ষ্যে ছিল বস্তু ও বস্তুর বহিঃপ্রকাশ বিষয়ে ঐ বইয়ের মূল বার্তা। সেভাবে দেখলে বইয়ের একাধিক জায়গা উল্লেখ করা সম্ভব যেখানে বস্তু ও তার বহিঃপ্রকাশ, বহিঃপ্রকাশিত লক্ষণ ও চিহ্ন ও অন্তর্নিহিত বস্তু ইত্যাদি নানা রকমভাবে দুটো স্তরের কথা বারবার বলা হচ্ছে। এবং এ দুটো স্তরের মধ্যেকার সম্পর্কের কথাও আসছে। ৎসেলিগাকে তিরস্কার করে এক জায়গায় বলা হচ্ছে : 'যা গুপ্ত তা প্রকাশ

করা তো তাঁর কাজ নয়, যা প্রকাশিত তাকে গোপন করাই তাঁর কাজ।' (মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসংগ্রহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৬।) রহস্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও মার্কস-এঙ্গেলস-এর তালাবন্ধ দরজা, আড়িপাতা ও গুপ্তচর বৃত্তির রূপক খুবই ইঙ্গিতবহ। গ্রামশি সম্ভবত বইয়ের মূল প্রতিপাদ্যের ইঙ্গিতটাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, ঠিক নির্দিষ্ট কোনো উদ্ধৃতি ভাবছিলেন তা নয়।

জাকব্যাঁ (-বাদ): ফরাসি বিপ্লবের সুবিখ্যাত রাজনৈতিক সংগঠন জাকব্যাঁ ক্লাব। ১৭৯০-এর মধ্যে পারী ক্লাবের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১২০০ এবং এর সংলগ্ন ক্লাবের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫২। এর সদস্যদের মধ্যে বুর্জোয়া মধ্যস্তর, কারিগর, সৈনিক ও কৃষক ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ছিলেন। সংখ্যার অনুপাতে বুর্জোয়া মধ্যশ্রেণীর সংখ্যাই বেশি। ১৭৮৯-৯২-এর মধ্যে এই অনুপাত ছিল প্রায় ৬২ শতাংশ। ১৭৯৩ নাগাদ সমগ্র ফরাসি দেশে জাকব্যাঁ ক্লাবের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৮০০০-এর মতো, আর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে জাকব্যাঁ সংগঠন ক্রমশ সন্ত্রাস ও স্বৈরাচারের প্রতীক হয়ে ওঠে। এইসব ক্লাবের ওপর অনেকটা পরিমাণে প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। বিপ্লব রক্ষার স্বার্থে, প্রতিবিপ্লবী শত্রুদের হাত থেকে দেশ বাঁচানোর নামে 'শুদ্ধির তাণ্ডবে' জাকব্যাঁ ক্লাব ক্রমশ জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এই প্রক্রিয়ায় বিপ্লবী রাষ্ট্রের সামাজিক ভিত্তি কালক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৭৯৪-এর ২৭ জুলাই-এ রোবস্‌পীয়ারের পতনের পরে পারী ক্লাব সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়, স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় ১৭৯৪-এর ১১ নভেম্বর।

ক্যালভিনবাদ: ষোল শতকের প্রটেস্টাণ্ট আন্দোলনের প্রধান নেতা ফরাসি ধর্মতাত্ত্বিক জন ক্যালভিন-এর নামাঙ্কিত ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলন। ক্যালভিনের ধর্মতত্ত্বে একাধিক পরিপূরক মতাদর্শের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। এই ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিতে এবং ক্যালভিনের রচনাবলির অনুসরণে বিভিন্ন দেশে যে উপাসনা পদ্ধতি ও নৈতিকতার মান ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকে তাকে সাধারণভাবে ক্যালভিনবাদ বলে চিহ্নিত করা হয়। ষোল শতকের জেনিভাতে ক্যালভিনপন্থী ধর্মসংঘের আচার-আচরণও এই ধর্মমতের বিবর্তনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

রোটারি আন্দোলন: ১৯০৫-এ পল পি. হ্যারিস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাতিষ্ঠানিক বিবর্তনে রোটারি আন্দোলনের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শিল্পোদ্যমের পেছনে সেবার আদর্শকে বড় করে তোলা, ব্যবসা বাণিজ্য ও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজের ক্ষেত্রে খুব উঁচু মানের নৈতিকতা বজায় রাখা এবং বিভিন্ন পেশার বৃত্তিধারীদের এক বিশ্বজনীন সৌভ্রাত্রের অন্তর্ভুক্ত করা এ সবই ছিল রোটারি আন্দোলন প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ। ১৯১২-তে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় ইনটারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব্ রোটারি ক্লাবস। বর্তমান নাম রোটারি ইনটারন্যাশনাল ১৯২২-এ গৃহীত হয়। প্রায় ১৫০টি দেশে এদের কার্যকলাপ বিস্তৃত।

আলেসান্দ্রো মানৎসোনি (১৭৮৫—১৮৭৩): ইতালীয় কবি ও ঔপন্যাসিক। তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস **ই প্রমেসি স্পোসি** (বাগদত্তা) ইতালির রিসর্জিমেন্তো পর্বের জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের উন্মেষে সহায়ক বলে বিবেচিত। উপন্যাস হিসেবেও তিন খণ্ডের এই বৃহৎ গ্রন্থ বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ।

কাউন্ট আনতোনিও গ্রাৎসিয়াদেই (১৮৭৩—১৯৫৩): ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির একজন প্রধান দক্ষিণপন্থী নেতা। ১৯২২-এ রোমে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে কৃষি-প্রস্তাবের প্রণেতা। চতুর্থ বিশ্ব কংগ্রেসে যুক্তফ্রণ্ট নীতির প্রবক্তা। ১৯২৮-এ পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন।

জিয়োর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮—১৬০০): ইতালীয় দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ। অসীম বিশ্বের ধারণা ও সূর্যকেন্দ্রিক জ্যোতির্বিদ্যার প্রচারের জন্য তখনকার প্রতিষ্ঠিত ধর্মসংঘের বিরাগভাজন হন। দীর্ঘদিন ব্যাপী তাঁর বিচারের মধ্যে ব্রুনো যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন ধর্মীয় নেতাদের একথা বোঝাতে যে তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে ঈশ্বর ও সৃষ্টি বিষয়ক খ্রিস্টীয় ধারণার কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় নি। ইনকুইজিশন তাঁকে চাপ দেয় তাঁর তত্ত্ব প্রত্যাহার করে নিতে। তিনি অস্বীকৃত হন। হেরেটিক হিসেবে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়। তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। ১৬০০-র ১৮ ফেবরুয়ারি তারিখে যখন তাঁকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ পড়ে শোনানো হয় তখন ব্রুনো বিচারকদের উদ্দেশে এই মন্তব্য করেছিলেন: 'এই রায় দিতে গিয়ে আপনাদের ভয় এই রায় পেতে আমার যা ভয় তার চেয়ে যেন বেশি বলে মনে হচ্ছে।' চিন্তার স্বাধীনতার পক্ষে এক সক্ষম সংগ্রামী হিসেবে ব্রুনো ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছেন। উনিশ শতকে ইয়োরোপীয় উদারনৈতিক আন্দোলন ও ইতালীয় রিসর্জিমেনতো পর্বের ভাবধারায় ব্রুনো এক প্রধান প্রেরণা।

জর্জ ভালেনতিনোভিচ প্লেখানভ (১৮৫৬—১৯১৮): রাশিয়ার প্রথম পর্বের মার্কসবাদীদের অন্যতম। প্রথম দিকে তিনি রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের কঠোর সমালোচক হিসেবে বৈপ্লবিক জনপ্রিয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন। পরে অবশ্য তিনি জনপ্রিয়তাবাদ থেকেও সরে আসেন। রাশিয়ার কমিউন-ভিত্তিক জমির মালিকানাই যে রুশ ভূমিসম্পর্কের মৌল কাঠামো এ ব্যাপারটাকে তিনি খুব জরুরি মনে করতেন। মোটামুটি কাছাকাছি সময়ে মার্কসেরও অনুরূপ ধারণার সঙ্গে প্লেখানভের এই চিন্তার সঙ্গতি বেশ লক্ষণীয়। তাঁর রুশ অনুবাদে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হয় ১৮৮২-তে। এই অনুবাদের ভূমিকা লেখেন স্বয়ং মার্কস। তাঁর প্রধান রচনার মধ্যে **ইতিহাসের একবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ** ও **ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা** উল্লেখযোগ্য।

১৯০৫-এর পরে রাশিয়ার রাজনৈতিক জীবন থেকে তিনি ক্রমশ নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে থাকেন। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পরে তিনি প্রবাস থেকে স্বদেশে ফেরেন এবং ক্রমে ক্রমে বোলশেভিক ক্রিয়াকর্মের তীব্র সমালোচক হয়ে

ওঠেন। ১৯১৭-র বিপ্লবী ক্ষমতাদখলের সময়ে তাঁর অবস্থান বোলশেভিকদের থেকে অনেক দূরে। এই ব্যবধান সত্ত্বেও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ইতিহাসে প্লেখানভ্ এক স্মরণীয় নাম।

অটো বাউয়ের (১৮৮১—১৯৩৮): অস্ট্রীয় সোশাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির তাত্ত্বিক নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জর্মনির সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সংযুক্তি (আন্‌শ্লুস্)-র প্রধান সমর্থক। ১৯১৭-তে পার্টির অন্যতম প্রধান বামপন্থী নেতা। যুদ্ধের পরে অস্ট্রিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী হন। জর্মনির সঙ্গে সংযুক্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। মিত্রশক্তি এই চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে। অটো বাউয়ের ১৯১৯-এ মন্ত্রীপদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯২৯-৩৪ পর্যন্ত তিনি অস্ট্রীয় জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৩৪-এ ভিয়েনার ব্যর্থ সমাজতান্ত্রিক অভ্যুত্থানের পরে দেশত্যাগ করে প্রথমে চেকোশ্লোভাকিয়া ও পরে ফ্রান্সে যান। জাতিসমূহের প্রশ্ন ও সোশ্যাল ডেমোক্রাসি বিষয়ে তাঁর প্রধান গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯০৭-এ।

সেন্ট টমাস অ্যাকুইনস (১২২৫/২৬—১২৭৪): স্কলাসটিক ঘরানার দার্শনিকদের মধ্যে প্রধানতম বলে স্বীকৃত। তাঁর প্রধান গ্রন্থ **সুম্মা কনত্রা জেনতীলস্** ১২৫৯ থেকে ১২৬৪-র মধ্যে রচিত। এক কল্পিত পাঠকের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টধর্মের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করাই এই বইয়ের লক্ষ্য। বিশ্বাস, শাস্ত্রবচন, প্রত্যাদেশ ইত্যাদির বদলে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাসের যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা করা এই বইয়ের পদ্ধতিগত অবদান। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, প্রাণীর বিকাশ ও সত্তাস্বরূপ, মানুষের আত্মা, বোধি ও নৈতিক আচার-আচরণ, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বহুবিবাহ, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে টমাস অ্যাকুইনস তাঁর চিন্তা ও মতামত বিশদভাবে ব্যক্ত করেছেন।

স্টুর্ম উন্ড্ দ্রাং: আঠারো শতকের প্রসিদ্ধ জর্মন সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আক্ষরিক অর্থে কথা দুটির মানে ঝড় ও টানাপোড়েন। সমাজে সংস্কৃতিতে নানা অদলবদল, ঝোড়ো হাওয়া ও তুমুল পরিবর্তনের দ্যোতক হিসেবে স্বীকার্য এই নাম। এই আন্দোলনের মতাদর্শগত অবস্থান আলোকোদ্ভাসিত যুগের যৌক্তিকতাবাদের বিপরীতে। প্রকৃতি, ব্যক্তি-মানুষ ও তার অনুভব এই আন্দোলনের শরিকদের মনোযোগের কেন্দ্রে। শুধুই নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধিবাদের পূজারী ছিলেন না এঁরা। এই আন্দোলনের দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব গ্যোয়টে ও শিলার। এঁদের মনোভঙ্গির পেছনে যাঁদের প্রভাব সক্রিয় ছিল তাঁদের মধ্যে জাঁ জাক রুসো ও যোহান্ গেয়র্গ হামান্ অগ্রগণ্য। হামানের শিষ্য হের্ডের-এর সঙ্গে তরুণ গ্যোয়টের সখ্য এই আন্দোলনের রূপদানে খুব সহায়ক ছিল। হের্ডের ও অন্যান্যদের সহযোগে রচিত গ্যোয়টের **ফন্ ডয়েট্শের আর্ট উন্ড্ কুন্স্ট্** স্টুর্ম উন্ড্ দ্রাং আন্দোলনের ম্যানিফেস্টো। গ্যোয়টের **তরুণ হের্টের-এর বিষাদ** এই আন্দোলনের অনুবর্তী এক বিশিষ্ট রচনা।

মাক্স আড্লের (১৮৭৩—১৯৩৭): অস্ট্রীয় আইনজ্ঞ, চিন্তাবিদ ও সমাজ-

তাত্ত্বিক। অস্ট্রো-মার্ক্সীয় তত্ত্বধারার অন্যতম প্রবর্তক ও একজন প্রধান শরিক। অস্ট্রিয়ার সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ক্রমশ পার্টির অন্তবর্তী বামপন্থী চিন্তা ও কর্মের সহযোগী। রুডলফ্ হিলফারডিং ও কার্ল রেনার-এর সঙ্গে এক-যোগে শ্রমিকশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইসঙ্গে মার্কসবাদ চর্চার জন্য হিলফারডিং-এর সহযোগে তিনি **মার্কস-স্টুডিয়েন** প্রকাশ করতে থাকেন (১৯০৪)। কিছুটা কাণ্টীয় দর্শনের প্রভাবে মার্কসবাদের সমাজ-তাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তির বিচার-বিশ্লেষণ তাঁর তত্ত্বচিন্তার প্রধান লক্ষণ।
রোজা লুক্সেমবুর্গ (১৮৭১—১৯১৯): রুশ অধিকৃত পোল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত ইহুদি পরিবারে জন্ম। খুব অল্প বয়স থেকেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত হন। ১৮৯৮ থেকে তিনি জর্মন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শরিক। শোধনবাদী তাত্ত্বিক বিতর্কে তিনি এডুয়ার্ড বের্নস্টাইনের প্রতিপক্ষ। সংস্কারবাদী আন্দোলনের প্রয়োজন অস্বীকার না করেও শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকার প্রতি তিনি জোর দিয়েছিলেন। নানা তাত্ত্বিক প্রশ্নে লেনিনের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ ছিল, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগণ্য দল হিসেবে পার্টির ভূমিকা বিষয়ে তিনি লেনিনের সঙ্গে সহমত ছিলেন না। শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব স্বাধীন অভিজ্ঞতা ও সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার বৈপ্লবিক শ্রেণীচেতনার সমৃদ্ধির গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

রোজা লুক্সেমবুর্গের প্রধান তাত্ত্বিক গ্রন্থ **দি অ্যাকুমিউলেশন্ অব্ ক্যাপিটাল** (১৯১৩)। পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিশ্লেষণে এই বই ক্লাসিকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনে বৈদেশিক অর্থনৈতিক শোষণেব তাত্ত্বিক ভূমিকা এই গ্রন্থে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পববর্তীকালে সোশাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জাতীয়তাবাদী ভূমিকার সমা-লোচনায় তার বিপরীত বামপন্থী আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সংগঠন স্পার্টাকুস লীগ-এ তিনি সক্রিয় ছিলেন। আন্তর্জাতিকতা ও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র এই দুই আদর্শের প্রতিই লুক্সেমবুর্গ চিরকাল অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন। এক ব্যর্থ বার্লিন অভ্যুত্থানের পরে ১৯১৯-এ তিনি নৃশংসভাবে নিহত হন।
ডেসিডেরিয়ুস এরাসমুস (১৪৬৬/৬৯—১৫৩৬): ওলন্দাজ মানবিকবাদী চিন্তাবিদ। ১৪৯২-এ যাজকবৃত্তি গ্রহণ করেন। প্যারীতে অধ্যয়নকালে তাঁর স্কলাসটিক চিন্তা সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব আরো স্পষ্ট চেহারা নেয়। এই সময়ে তিনি বিভিন্ন মানবিকবাদী গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসেন। তিনি অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে বক্তৃতা করেন। টমাস মোর, জন ফিশার ও জন কোলেট-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হয়। তিনি ইতালিতেও যান ও সেখানকার অনেক মানবিকবাদীদের সঙ্গেও পরিচিত হন। তিন হাজারেরও বেশি প্রবচন সংগ্রহ **আদাগিয়া** (১৫০৮) তাঁর এক প্রধান গ্রন্থ। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে **এনকোমিয়ুম মোরিয়াল** (১৫০৯), **নিউ টেস্টামেন্ট**-এর সংস্করণ (১৫১৬) ও **দ্য প্রেইজ অব্ ফলি** (১৫৪৯)।

নির্দেশিকা

('গ্রামশি পরিচয়' অংশে পৃষ্ঠাসংখ্যা শব্দ-তে আছে। এখানে উক্ত পৃষ্ঠা 'প' চিহ্ন দিয়ে সংখ্যা-তে দেওয়া হল। মূল পাঠ্য অংশের পৃষ্ঠা 'স্টেরাক' বা 'অবলিক' চিহ্ন দিয়ে অথবা কোনো চিহ্ন ছাড়াই শুরু হয়েছে।)

ত

থ

দ

ধ

ন

প

ল

শ

স